দিগন্ত

আবদুল মান্নান তালিব স্মারক গ্রন্থ

সম্পাদক

আবুল আসাদ

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

মাহবুবুল হক

সাজজাদ হোসাইন খান

অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন

সোলায়মান আহসান

সাইফুল্লাহ মানছুর

তৌহিদুর রহমান

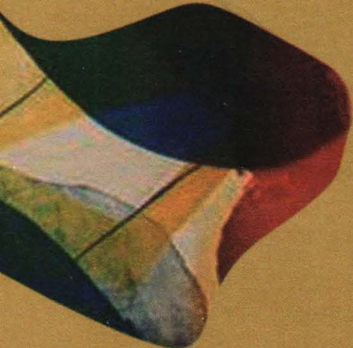

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব স্মারক গ্রন্থ

প্রকাশক
তৌহিদুর রহমান
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১/বি, গ্রীনওয়ে, মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ।
ফোন : ৯৩৩২৪১০

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫

বাসাপপ্র ২৩৫

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

মুদ্রণ
কালার টেক প্রেস, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : পাঁচ শত টাকা মাত্র

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

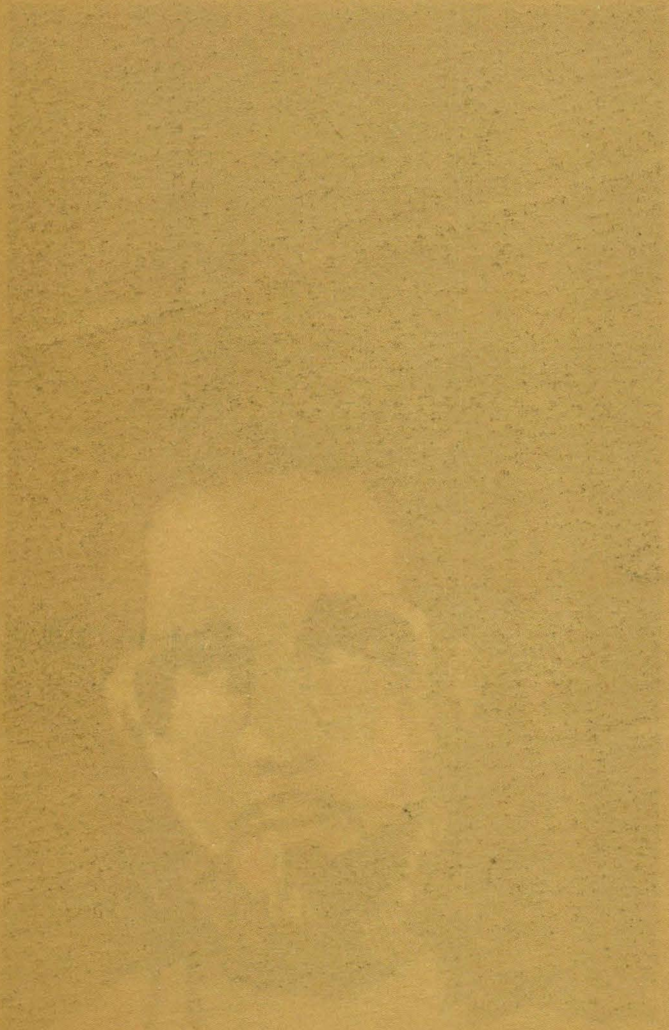

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের জীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর একটি স্মারক গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করছি। তাঁর প্রশংসা-প্রশস্তি আমাদের লক্ষ্য নয়। তালিব ভাইও জীবনে কখনো এটা চাননি। পরের জন্য যার জীবন, তিনি এটা চাইতেও পারেন না। তাঁকে স্মরণ করা আমাদের লক্ষ্য। উদ্দেশ্য তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নেয়া, প্রেরণা পাওয়া। মহৎ জীবন বাতিঘরের মতো। বাতিঘর অন্ধকারের পথিককে পথ দেখায়। এজন্য প্রয়োজন হয় বাতিঘরকে প্রজ্বলিত রাখা। মহৎ জীবনের ক্ষেত্রে এটাই সত্য। তাঁদের কীর্তি কথা যদি উত্তরসূরিরা স্মরণ না করে, আলোচনা না হয়, মূল্য ও মূল্যায়ন না পায়, তা হলে তেলহীন নিভে যাওয়া বাতির মতো তাঁরা বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যান। হারিয়ে ফেলার অভ্যাস আমাদের আছে। সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যাঁরা আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, যাঁরা পথ দেখাতে পারেন, তাঁদের সিংহভাগকে আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে আমরা ঠেলে দিয়েছি। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, আকরম খাঁ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রমুখ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বের জীবন ও সাহিত্যকর্ম, তাঁদের চিন্তা, মননশীলতা ও স্বপ্ন, আমাদের সামনে আছে তা বলা যাবে না। এক ধরনের সংকীর্ণ রাজনীতির কালো ছায়া আমাদের অতীতকে যেন ঢেকে দিতে চাচ্ছে। জীবনানন্দ দাশ আমাদের ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি। জসীম উদ্দীনও বাংলা কাব্যসাহিত্যের একজন অনন্য প্রতিভা। কায়কোবাদ মহাকবি। কিন্তু আমরা কায়কোবাদের কয়টা মহাকাব্যের নাম জানি? জীবনানন্দ দাশকে আমরা স্মরণ করব, কিন্তু জসীম উদ্দীন, কায়কোবাদ, বেনজীর আহমদ, ফররুখ আহমদদের আমরা ভুলে যাবো কেন? আমার ভয় হয় কবি নজরুল আমাদের জাতীয় কবি না হলে তাঁকেও কায়কোবাদের মতো বিস্মৃতির তালিকায় স্থান পেতে হতো কি না? অতীতকে, আমাদের অতীত অগ্রজদের এই ভুলে যাওয়া ভাল কাজ নয়। যারা বা যে জাতি অতীতকে, অতীতের মশাল-বরদারদের ভুলে যায়, তারা সামনে চলার পথ পায় না, তাদের ভবিষ্যৎ বলেও কিছু থাকে না। এমন জাতি স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। এটা আশংকার কথা, ভয়ের কথা, ভাবনার কথা। আমরা সকলে এই ভয় ভাবনার হাত থেকে বাঁচতে চাই। এ লক্ষ্যেই আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে আমাদের অগ্রজদের অন্ধকার থেকে দিনের আলোতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি নানা প্রোগ্রামের মাধ্যমে। আবদুল মান্নান তালিবের জীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ আমাদের চলমান কাজেরই একটা অংশ। আবদুল মান্নান তালিব একজন নীরব সাহিত্য সাধক। কিন্তু অত্যন্ত সমাজ সচেতন। চোখ বন্ধ করা, জগৎ-বিচ্ছিন্ন, বাস্তবতাবিমুখ অন্ধকারে লুকানো সাধক তিনি নন। হাল-নোঙরহীন সাহিত্য-স্বত:স্ফূর্ততা নামক নৈরাজ্যের অনুসারী তিনি ছিলেন না।'আর্ট ফর আর্ট সেক' মানবতাবিরোধী এক উচ্ছৃঙ্খল ধারণা। আবদুল মান্নান তালিবের

www.pathagar.com

চাওয়া-পাওয়ার তৃষ্ণা পূরণে তাঁর সাহিত্য ছিল উচ্চকণ্ঠ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আবদুল মান্নান তালিবের অনুবাদ সাহিত্যকে দেখতে হবে। আবদুল মান্নান তালিবের অনুবাদ সাহিত্য বলতে গেলে বাংলা ভাষায় যুগান্ত সৃষ্টিকারী। এই সাহিত্য যেমন সংখ্যার দিক দিয়ে বড়, তেমনি ওজনে পর্বতের মতো ভারি। তাঁর নব্বইয়ের অধিক গ্রন্থের মধ্যে তাঁর অনুবাদকর্মের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের মতো (খণ্ড শিরোনামসহ)। এর মধ্যে রয়েছে 'পয়গামে মোহাম্মদী', 'ইসলামে রেনেসাঁ আন্দোলন', 'ইসলামী সমাজ দর্শন', 'সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং', 'ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি', 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান', 'সীরাতে সরওয়ারে আলম', 'ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী'র মতো যুগান্তকারী গ্রন্থ। এর সাথে রয়েছে সহীহ আল বুখারী (চতুর্থ খণ্ড), রিয়াদুস সালেহীন (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) শীর্ষক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ। তাঁর সবচেয়ে বড় অনুবাদকীর্তি পবিত্র কুরআনুল মাজিদের তাফসীরের অনুবাদ। ১৯ খণ্ডে সমাপ্ত অনুবাদের মধ্যে ১৪টি তিনি অনুবাদ করেছেন। অনূদিত তাঁর গ্রন্থগুলো পিপাসার্ত লাখো মানুষের তৃষ্ণা মিটিয়ে আসছে।

আবদুল মান্নান তালিবের সাহিত্য প্রকাশনা শুরু ১৯৬২ সালে। কিন্তু তাঁর সাংবাদিকতা শুরু এর অনেক আগে। ১৯৫২ সালে 'বীরভূম' বার্ষিকীর সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু। দৈনিক 'তাসনিম' (১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯) ও 'দৈনিক ইত্তেহাদ' (১৯৫৯ থেকে ১৯৬০)-এর তিনি সাব- এডিটর ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ তিনি সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' সম্পদনা করেছেন। তিনি মাসিক 'পৃথিবী'র সম্পাদক ছিলেন ১৯৮১ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত। সাহিত্য মাসিক 'কলম' তিনি সম্পাদনা করেছেন ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত। তিনি 'দৈনিক সংগ্রামে'র একজন কলামিস্ট এবং ছোটদের 'শাহীন শিবির' পাতার দীর্ঘদিন পরিচালক ছিলেন। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম সাহিত্য গ্রন্থের নাম 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা'। তিনি তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম সমাজের বঞ্চিত অবহেলিত নারীদের জীবন কথার ওপর লিখেছেন। মহিলাদের জীবন ছিল সমাজের অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটা সমস্যার নাম। আবদুল মান্নান তালিব এদের পক্ষেই প্রথম কলম ধরেন। ইসলামের শিক্ষা ও সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর মধ্যে এই সচেতনতা আসে। ইসলামে নারীদের অবস্থান বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি আরো কাজ করেন। 'রসুলের (স.) যুগে নারী স্বাধীনতা' শীর্ষক বিশাল গ্রন্থটির চার খণ্ড তাঁর উদ্যোগে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। আবদুল মান্নান তালিব একটি বহুমুখী সাহিত্য-প্রতিভা। তাঁর রয়েছে মৌলিক গ্রন্থ, শিশু-কিশোর সাহিত্য, সম্পাদিত গ্রন্থ ও বহুমুখী অনুবাদ সাহিত্য। তিনি শিশু-কিশোরদেরকে অর্থহীন রূপকথা শোনাননি। শিশুদের হাতে শিক্ষা ও তাদের জীবন গঠনমূলক বই তিনি তুলে দিয়েছেন। তাঁর শিশুতোষ বইয়ের সংখ্যা এক ডজনের মতো। তাঁর

www.pathagar.com

মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। তবে ১১টির মতো প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে 'বাংলাদেশে ইসলাম', 'ইসলামী সাহিত্য: মূল্যবোধ ও উপাদান', 'ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ', 'ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন', 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন', 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা: ঐতিহ্যিক পেক্ষাপট' প্রভৃতি গ্রন্থ বহুল পঠিত এবং আমাদের সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। 'বাংলাদেশে ইসলাম' একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। বাংলাদেশের ইতিহাস-সন্ধানীদের জন্য গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন' এবং 'ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ' গ্রন্থ দু'টির কথা প্রায় আমার মনে পড়ে। ইসলামী চিন্তার বিকাশ ও পুনর্গঠনের ওপর মূল্যবান দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় গ্রন্থ দু'টিতে।

আবদুল মান্নান তালিবের সাহিত্য জীবনের ব্যাপ্তি ১৯৬২ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু (২০১১) পর্যন্ত। তাঁর সাহিত্য-জীবনের যদি রেখাচিত্র আঁকা যায়, তাহলে দেখা যাবে ১৯৬২ সাল থেকে পরবর্তী তিন দশকে তাঁর সাহিত্যকর্ম চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ১৯৫১ থেকে ২০০০ এই সময়টি তাঁর সাহিত্য জীবনের চূড়ান্ত বিকাশের কাল। এই সময়ে তাঁর ২৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনটি বই মৌলিক, একটি শিশুতোষ, তিনটি সম্পাদিত ও ১৭টি অনুবাদ গ্রন্থ। তাঁর এই বয়সের দু'টি মৌলিক গ্রন্থ হলো 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন', ও 'সত্যের তরবারি ঝলসায়'। আর শিশুতোষ গ্রন্থটি হলো 'পড়তে পড়তে অনেক জানা'। তাঁর এই বইগুলো সময়ের দাবির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বলা যায় তাঁর সাহিত্য প্রতিভা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০১১ সালের পর তাঁর সাহিত্যের রেখা-চিত্র হঠাৎ করে নিম্নমুখী হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত তাঁর মাত্র ৫টি বই পাওয়া যায়। এটা কি পূর্ববর্তী দশকের (১৯৯১ থেকে ২০০০) অসম্ভব পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি, না অন্য কিছু? এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য উপকারী হতে পারে। তাঁর শেষ ১১ বছরের পাঁচটি গ্রন্থ হলো 'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম', 'মা আমার মা', 'ভারত যখন ভাঙলো', 'প্রত্যয়ের সূর্যোদয়' ও 'অপরাজিত'। বইগুলো সমাজ ও জাতীয় সমস্যামূলক। দেখা যাচ্ছে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে নতুন করে দেশ, জাতি ও সমাজ নিয়ে মৌলিক চিন্তা তিনি শুরু করেছেন। এই চিন্তাকে পূর্ণতা দেবার জন্যে আরো কিছু করার পরিকল্পনা তাঁর ছিল। মৃত্যুর আগে এই লেখকের সাথে তাঁর শেষ দেখার সময় তিনি বলেছিলেন, 'অনেক কিছু করার অনেক ভাবনা ছিল। তাঁর জন্য সময় পেলাম না। আজ মনে হচ্ছে জীবনে অনেক সময় নষ্ট করেছি।' আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের এই শেষ কথা থেকে তাঁর উত্তরসূরিদের শিক্ষা নেবার আছে। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব বড়, না শিক্ষক, সংগঠক আব্দুল মান্নান তালিব বড়? এই প্রশ্নে না গিয়ে আমি বলতে চাই ব্যক্তি আবদুল মান্নান তালিবের মধ্যে নানা দুর্লভ গুণের সমাহার ঘটেছে। তিনি সাহিত্য চর্চা করার সাথে সাথে

www.pathagar.com

সাহিত্য-সংগঠকও ছিলেন। ছিলেন তিনি অগ্রগণ্য সাহিত্য প্রতিভার জনকও। আমাদের দেশে কায়কোবাদ, সিরাজী, নজরুল, ফররুখ ধারার বাহক হিসাবে সত্তর-আশির দশক থেকে কবি-সাহিত্যিকদের একটা নতুন প্রজন্মের যে শক্তিমান যাত্রা শুরু হয়েছে, তার একজন নীরব নকশাকার ছিলেন আবদুল মান্নান তালিব। তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক ছিলেন প্রায় ২৭ বছর। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্য পরিষদ লেখক গড়ার প্লাটফরম হিসাবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে তিনি অসংখ্য কিশোর-তরুণের সংস্পর্শে এসেছেন। এঁদেরকেই তিনি উপদেশ দিয়ে উৎসাহ দিয়ে হাতে কলমে শিখিয়ে সাহিত্যের পথে পরিচালনা করেন। বর্তমান প্রজন্মের যাঁরা কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক তাঁদের অনেকেই এটা স্বীকার করবেন। তিনি সাপ্তাহিক 'জাহানে নও'-এর সম্পাদক ছিলেন ৪ বছর। মাসিক 'পৃথিবী'র সম্পাদক তিনি ছিলেন ১৮ বছর। মাসিক 'কলম'-এর সম্পাদক ছিলেন ১৭ বছর। দীর্ঘকাল একাধিক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে থাকায় হাজারো নতুন কবি- সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। এঁরা সকলেই তাঁর পরিচর্যা, তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা, উপদেশ-পরামর্শ পেয়েছেন অব্যাহতভাবে। বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক হিসাবে, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোর সম্পাদক হিসাবে যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন যে, পিতৃসুলভ স্নেহ ও শিক্ষকসুলভ সহযোগিতা তাঁর কাছ থেকে তাঁরা পেয়েছেন। আবদুল মান্নান তালিব সাহিত্য ক্ষেত্রে কবি লেখক গড়ার যে বহুমুখী সুযোগ দীর্ঘকাল ধরে পেয়েছেন, তেমন সুযোগ কদাচিৎ কোনো মানুষের ভাগ্যে ঘটে। সেদিক থেকে তিনি সৌভাগ্যবান। এই সৌভাগ্য তিনি নব্য লেখক গড়ার কাজে ব্যয় করেছেন।

মানুষ হিসাবে তিনি আল্লাহ'র মুহসীন বান্দার সুস্পষ্ট এক প্রতিচ্ছবি। জ্ঞানের সন্ধানে জাতির প্রয়োজনে তিনি হিজরত করেছেন। তাঁর হিজরতকারী গোটা জীবনকে তিনি আল্লাহর জন্য ব্যয় করেছেন। তাঁর কুরআন মাজীদ-এর বিশাল তাফসীর গ্রন্থের অনুবাদ, হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ, অতি প্রয়োজনীয় সব ইসলামী সাহিত্যের অনুবাদ, তাঁর মৌলিক গ্রন্থসমূহ ও দীর্ঘকাল ধরে হাজারো সাহিত্য-মানস গড়ার তাঁর কাজ সবই ছিল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ তাঁর এই ভালো কাজকে কবুল করুন এবং তাঁর জান্নাত নসীব করুন! আল্লাহর বান্দাদের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এমন একজন মানুষের জীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। যারা এই স্মারকে লেখা দিয়ে আমাদের এই উদ্যোগকে সমৃদ্ধ ও সফল করেছেন তাদের ধন্যবাদ। এর যাযাহ তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে পাবেন। আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুই সম্পূর্ণ নয়। অনেকের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। সময় অভাবে এবং নানান টানাপোড়েনে অনেকে লেখা দিতে পারেননি। এসব ব্যক্তির লেখা পেলে নিঃসন্দেহে স্মারক গ্রন্থটি আরো সমৃদ্ধ হতো। আমাদের এই স্মারক গ্রন্থে অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে গেল। আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হবে, এই প্রত্যাশা আমরা করছি।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আবদুল মান্নান তালিব বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তি। তিনি আল-কুরআন, আল-হাদীস, ফিকহ্, ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। শুধু তাত্ত্বিকভাবে জ্ঞান অর্জন করাই নয়, বরং অর্জিত জ্ঞানের আলোকে নিজের জীবন পরিচালনা ও সে জ্ঞানের আলোকে সকলকে উদ্ভাসিত করার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মত একজন সুবিজ্ঞ মুসলিমের দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। এ কারণে তিনি তাঁর সহযোগী-শুভানুধ্যায়ীদের নিকট ছিলেন একজন অনুসরণীয় ব্যক্তি। বহু বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আবদুল মান্নান তালিব বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। একাধারে গবেষক, সৃজনশীল লেখক, কবি, প্রবন্ধকার, অনুবাদক, সাংবাদিক ও সংগঠক। আল-কুরআন আল-হাদীসসহ বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদদের রচিত মূল্যবান গ্রন্থাদি তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় আশিটি। এছাড়াও রয়েছে অনেক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলাম ছিল তাঁর চিন্তা-চেতনার মূল কেন্দ্র। তাঁর রচিত সাহিত্যকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত মৌলিক রচনা, দ্বিতীয়ত অনুবাদ সাহিত্য ও তৃতীয়ত শিশু-কিশোর সাহিত্য।

তাঁর মৌলিক রচনাবলীর প্রধান বিষয় হলো ইসলাম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ইত্যাদি। এসব বিষয়ে তিনি অনেক গবেষণা ও নতুন নতুন তথ্য ও যুক্তির অবতারণা করে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর দ্বারা বাংলাভাষী পাঠকের জ্ঞান ও মনন বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

তাঁর অনুবাদ সাহিত্যের কলেবর যেমন বিপুল তেমনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল-কুরআন, আল-হাদীস, ফিকহ্ ও বিশ্ববরেণ্য বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদদের খ্যাতনামা গ্রন্থাদির অনুবাদ এর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা বাংলা অনুবাদ সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি কুরআন-হাদীস ও বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিদের চিন্তাধারার সাথেও বাংলাভাষী পাঠক সুপরিচিত হয়ে উঠেছেন। আবদুল মান্নান তালিবের শিশুতোষ রচনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সহজ সরল ভাষায় তিনি শিশু-কিশোরদের মন-মানসিকতার উপযোগী অসংখ্য শিক্ষামূলক চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর শিশুতোষ রচনাবলী বাংলা শিশু সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি শিশু-কিশোরদেরকে ভবিষ্যত আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগুলো অনুপ্রেরণা যোগাবে।

সর্বোপরি, আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন ইসলামী ভাবধারার সাহিত্যের অন্যতম রূপকার। ইসলামী সাহিত্যের ধরন-ধারণ, উপাদান-উপজীব্য ও এর রূপরেখা সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে গবেষণা করে তিনি এক্ষেত্রে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সাহিত্য সংগঠন করে, সভা-সমিতি, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি নবীন-প্রবীণ সকল সৃজনশীল ব্যক্তি, বিশেষত তরুণদেরকে তিনি এ ব্যাপারে যথার্থ পথ-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন চিন্তাশীল পথিকৃৎ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী একজন গতিশীল সংগঠক। যুগপৎ লেখালেখি, চিন্তা-চেতনা ও সংগঠনের মাধ্যমে তিনি ইসলামী সাহিত্যের রূপরেখা সকলের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এ যুগের তরুণ কবি-সাহিত্যিক-লেখক অনেকেই তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য সৃষ্টিতে মূল্যবান অবদান রেখে চলেছেন।

সংগঠক হিসাবে আবদুল মান্নান তালিবের মূল্যবান অবদান রয়েছে। 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ'-এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আমৃত্যুপরিচালকের পদে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বলতে গেলে, তিনি ছিলেন এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রাণ-পুরুষ। এছাড়া পাক সাহিত্য

www.pathagar.com

সংঘ, শাহীন ফৌজসহ আরো অনেক সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। গঠনমূলক কাজ ও চিন্তা-চেতনায় উদ্ভাসিত এ ত্যাগী ব্যক্তি সর্বদা ব্যাপৃত থাকতেন সমাজ ও মানুষের কল্যাণ চিন্তায়।
সাংবাদিক হিসাবেও আবদুল মান্নান তালিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দৈনিক সংগ্রাম, মাসিক পৃথিবীসহ বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে তিনি দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন। নিজে সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে তরুণদেরকে এ জাতিগঠনমূলক পেশায় উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে হাতে-কলমে সাংবাদিকতা শিক্ষা দেয়ার কাজে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।
ব্যক্তিগতভাবে আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান, সত্যবাদী, সদালাপী, সদাচারী, ভদ্র, অমায়িক ও নিরীহ প্রকৃতির শান্ত-শিষ্ট আদর্শ মানুষ। তিনি কারো মনে কখনো আঘাত দিতেন না। তাঁর আচরণে সকলে মুগ্ধ হতো। মানুষের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তিনি নিজে সকলের আন্তরিক ভালবাসা অর্জন করেছেন। তিনি ছিলেন সকলের একান্ত প্রিয় এক মহৎ ব্যক্তিত্ব। একজন প্রকৃত মুসলিম হিসাবে তিনি ইসলামের জীবনাদর্শ নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলতেন। আখিরী নবী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের সর্বোত্তম জীবনাদর্শ তিনি সর্বোতভাবে অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করতেন। ইসলামই ছিল তাঁর চলার পথে একমাত্র দিক-দর্শন। ইসলামের বিজয় ও সার্বিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই তিনি সারা জীবন কাজ করে গেছেন। মহান আলাহ্র দরবারে আমরা তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করছি।
আবদুল মান্নান তালিবের জন্ম ১৫ মার্চ ১৯৩৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের অর্জুনপুর গ্রামে। তিনি ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে ঢাকার শান্তিবাগে নিজ বাসায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর বাংলা সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু নানা প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে এ কাজে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব ঘটে। অবশেষে মহান আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে এ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। এতে লেখা দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে ও বিভিন্নভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন আমরা তাঁদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, কবি সোলায়মান আহসান, শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ, মকসেদ আলী, আবদুল্লাহিল মাসুদ, খালিদ সাইফুল্লাহ– এঁদের একান্ত সহযোগিতা ছাড়া এই স্মারক গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়া দুরূহ ছিল। তাঁদেরকে যথাযথ যাযায়ে খায়ের প্রদানের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি। সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ স্মারক গ্রন্থটি হয়তো সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়নি। এতে অনেক অপূর্ণতা ও ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। আশা করি, সহৃদয় পাঠক এটাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

www.pathagar.com

মূল্যায়ন

ইসলামী সাহিত্য : আবদুল মান্নান তালিবের ভাবনা
ড. সদরূদ্দিন আহমেদ ১৯

তাঁর সাহিত্য সাধনা ও পথনির্দেশনা
জুলফিকার আহমদ কিসমতী ২৪

মুক্তমনের সাধক
শাহ আবদুল হান্নান ২৯

আবদুল মান্নান তালিবের সাহিত্য সাধনা
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ৩৩

আলোর পথের পথিকৃৎ
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ৪২

আমার দেখা এক অনন্য সংস্কারক
মাহবুবুল হক ৪৬

Abdul Mannan Talib: The Lighthouse
Shah Abdul Halim ৫৩

ফলভারে বিনম্র এক জ্ঞানবৃক্ষ তিনি
সাজজাদ হোসাইন খান ৫৮

তালিব ভাইকে মূল্যায়ন করা সহজ কাজ নয়
মাসুদ মজুমদার ৬২

আবদুল মান্নান তালিব শ্রদ্ধাভাজনেষু
খন্দকার আবদুল মোমেন ৬৪

উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের এক অনন্য কলম-সৈনিক
আবদুল হালীম খাঁ ৬৯

তাঁর তুলনা কেবল তিনি
হাফিজা বেগম ৭৮

আমার শিক্ষক, আমাদের শিক্ষক
হামিদুল ইসলাম ৮২

www.pathagar.com

বিষয় সূচি

সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ
সোলায়মান আহসান ৮৬
আমাদের তালিব ভাই
মুকুল চৌধুরী ৯৪
অনন্য গবেষক ও বিশ্লেষক
হাসান আলীম ১০৩
বহুমাত্রিক আবদুল মান্নান তালিব
মোশাররফ হোসেন খান ১০৬
আবদুল মান্নান তালিবের জীবন–সাধনা
ড. মাহফুজ পারভেজ ১০৮
নবীন লেখকের অভিভাবক
অধ্যাপক আশরাফ জামান ১১২
আবদুল মান্নান তালিবের শিশু সাহিত্য
শরীফ আবদুল গোফরান ১১৭
একটি কালো গোলাপ
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ১২২
এ কালের যুগ স্রষ্টা
শফিউদ্দিন আহমেদ ১২৬
আমাদেরও দায় রয়ে গেছে
মহিউদ্দিন আকবর ১৩০
একটি নক্ষত্রের নীরব প্রস্থান
জিয়াউল হক ১৩৫
তিনি ইসলামী সাহিত্য ও মূল্যবোধের পথিকৃৎ
মোস্তফা আযম ১৩৯
আলোক সন্ধানী গবেষক
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ১৪৫
একজন সফল অনুবাদক
নয়ন আহমেদ ১৪৯
বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্যের আলোকবর্তিকা
মাসুদুর রহমান খলিফা ১৫১
আদর্শিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির পথিকৃৎ
শহীদুল ইসলাম ১৫৩
আবদুল মান্নান তালিবের শিশু সাহিত্য
রফিক মুহাম্মদ ১৫৭
একজন একাগ্রচিত্তের সম্পাদক
ওমর বিশ্বাস ১৬১

www.pathagar.com

বিষয় সূচি

সাহিত্যের এক নীরব কারিগর
আমিন আল আসাদ ১৬৫
একজন নীরব সাধক
খালিদ সাইফ ১৬৯
তাঁর সাহিত্যে মূল্যবোধ ও ইসলাম
রহমাতুল্লাহ খন্দকার ১৭৪
সোনালি জামানার স্বপ্নদ্রষ্টা
তমসুর হোসেন ১৮১
সময়ের এক সাহসী যোদ্ধা
মোহছেনা পারভীন ১৮৫

স্মৃতির তরঙ্গে
স্মৃতির তরঙ্গে তালিব ভাই
আল মাহমুদ ১৯১
মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব সম্পর্কে আমার অনুভূতি
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১৯৪
মরহুম আবদুল মান্নান তালিব
রাজিয়া মজিদ ১৯৬
আবদুল মান্নান তালিব স্মরণে
শফীউদ্দীন সরদার ২০০
আমার স্মৃতিতে মরহুম আবদুল মান্নান তালিব
খোন্দকার মুহম্মদ ইউসুফ ২০৩
আমার শুভাকাঙ্ক্ষী 'তালিব ভাই'
মোহাম্মদ সা'দাত আলী ২০৭
স্মৃতিতে ভাস্বর তুমি
ফজলুল কাদির ২০৯
স্বাধীনতার অতন্দ্র সৈনিক
মোহাম্মদ মোর্শেদ আলী ২১৭
তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কিছু স্মৃতি
অধ্যক্ষ মাওলানা আ.ন.ম. আবদুশ শাকুর ২১৯
সাধারণের মাঝে তিনি ছিলেন অসাধারণ
এস এম আব্দুচ ছালাম আজাদ ২৩১
একটি মহান ছায়াবৃক্ষের প্রয়াণ
এ. কে. এম. ফজলুল হক ২৩৪
আবদুল মান্নান তালিব : একটি নাম একটি ইতিহাস
নাসির হেলাল ২৩৮

www.pathagar.com

বিষয় সূচি

এক জোহরা সিতারা
আবদুল কুদ্দুস ফরিদী ২৪৫
সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক ও অনুবাদক আবদুল মান্নান তালিব
বেদুঈন মোস্তফা ২৪৭
যে স্মৃতি প্রেরণা যোগায়
মুহাম্মদ কামাল হোসাইন ২৫৫

জীবনকথা
চলে গেলেন উপমহাদেশের বিদগ্ধ আলেম ও সুলেখক
আবদুল মান্নান তালিব
আব্দুল হামীদ কাশেমী ২৬৩
একজন আলোকিত মানুষ
আবদুল্লাহিল মাসুদ ২৬৬
আমি গর্বিত
আয়েশা সুলতানা ২৭৩
যেমন দেখেছি নানাভাইকে
নুসরাত জামিলা ২৭৬

গ্রন্থালোচনা
ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান একটি অনন্য প্রবন্ধ গ্রন্থ
শাহাবুদ্দীন আহমদ ২৮৩
একটি দিকনির্দেশক গ্রন্থ
বুলবুল ইসলাম ২৮৮
ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান প্রসঙ্গে
আসাদ বিন হাফিজ ২৯৩
একটি উচ্চাঙ্গের মননশীল গ্রন্থ ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান
নাসীর আহমদ ২৯৮
সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট
নাসীর মাহমুদ ৩০০
ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান ভাবনার নতুন দিগন্ত
ফারজানা কাদির ৩০২

জীবনদর্শন
একটি জীবন একটি ইতিহাস
তৌহিদুর রহমান ৩০৯

আবদুল মান্নান তালিবের সর্বশেষ লেখা
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ইতিহাসে বিরূপ প্রভাব ৩৪৭

www.pathagar.com

বিষয় সূচি

আবদুল মান্নান তালিবের অগ্রন্থিত লেখা থেকে

বাঙলা বাংলাদেশী মুসলমান হিন্দু সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক ৩৫৩
কুরআনের সাহিত্য উপাদান ৩৫৭
বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা ৩৬২
ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা আমাদের স্বাধীনতা ৩৭৭
আমাদের সাহিত্য কি আমাদের জীবন থেকে আলাদা হবে? ৩৮১
ইকবাল সাহিত্যের আদর্শ ৩৮৩
বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ৩৮৯
শিশু সাহিত্য : আমাদের দেশ ও জাতি গঠনের অংগীকার ৩৯৮

আবদুল মান্নান তালিবের একটি অনন্য গ্রন্থ

মুসলমানের প্রথম কাজ ৪০৫

আবদুল মান্নান তালিবের সাক্ষাৎকার

সাহিত্য থেকে সাহিত্যিক আলাদা নন ৪১৫
সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা একটা গুণগত
পার্থক্য সৃষ্টি করতে পেরেছি ৪২৫
জীবনকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করাই
সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব ৪৩৬

আবদুল মান্নান তালিবের কয়েকটি কবিতা

হে শহীদেরা ৪৪৫
তারকাপুঞ্জে আলাপ ৪৪৬
জানা সব আল্লাহর ৪৪৮
এক দর্শন বিভ্রান্ত সাইয়েদের নামে ৪৪৯
তওহীদ ৪৫০
নৃত্য ৪৫০

www.pathagar.com

মূল্যায়ন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য
আবদুল মান্নান তালিবের ভাবনা
ড. সদরুদ্দিন আহমেদ

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই আমাদের উপহার দিয়েছেন। ইসলামী সাহিত্য নিয়েও তিনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচিত 'ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান' বইতে। বিষয়টি নতুন ও কৌতূহল উদ্দীপক। তাই এ সম্বন্ধে তাঁর মত চিন্তাবিদের ভাবনার পর্যালোচনায় আমরা আলোকিত ও উপকৃত হতে পারি।

ইসলামী সাহিত্য কী তা আলোচনা করার আগে সাহিত্য কী তা জানা দরকার। আবদুল মান্নান তালিব প্রথমেই সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং তা হলো এই: 'হৃদয়ের সুক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্য।' সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বাইরের কোন কিছু অনুভব করার পর ব্যক্তি মাত্রই প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। সাহিত্যিক হৃদয়ের এই সুক্ষ্ম অনুভূতিকে অলংকার, রূপক, ছন্দ এবং ভাব ও শব্দের কারুকার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।' (ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান পৃ: ১৪)

এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। Welleck and Warren লিখেছেন যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু কাল্পনিক: ('...The reference is to a world of fiction, of imagination'). তারা আরও বলেন,

www.pathagar.com

There is a central and important difference between a statement, even in a historical novel... and the some information appearing in a book of history or sociology. Even in the subjective lyric the 'I' of the pote is a fictional, dramatic 'I'. A character in a novel differs from a historical figure or a figure in real life. (Theory of Literature, p.25)

তবে মনে রাখতে হবে যে fictionality বা কাল্পনিকতা সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। একটি সাহিত্যকর্ম অত্যন্ত জটিল সৃষ্টি। এর মধ্যে কাল্পনিক উপাদান ছাড়াও আরও আছে organization, personal expression, realization and exploitation of the medium, lack of practical purpose... (Wellleck and Warren)

আবদুল মান্নান তালিব সাহিত্যের কাল্পনিক দিকটি উল্লেখ করেননি। তাঁর মতে সাহিত্য ক্ষেত্রে আসল গুরুত্বের অধিকারী হচ্ছে সাহিত্যিকের মানসিক কার্যক্রম, যেটাকে Welleck and Warren 'personal expressinon' বলেছেন। তাদের সাথে তালিবের আর একটি পার্থক্য এই যে তারা সাহিত্যের কোন practical purpose নেই বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে তালিব মনে করেন যে, 'মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যহীন কোন বিষয়ের কথা কল্পনাই করা যায় না, তেমনি সাহিত্যেরও উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে সাহিত্যকে প্রপাগাণ্ডায় পরিণত করা উচিৎ নয়।' (ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান)

ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিৎ এ সম্বন্ধে তালিব একটি রূপরেখা পেশ করেছেন। তার রূপরেখা নিম্নরূপ:

১। ইসলামের তিনটি মৌলিক বিষয়- তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত- এমনভাবে কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা সমগ্র পরিবেশকে প্রভাবিত করে। এ তিনটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিবেশের ধারা ও ঘটনার মোড় পরিবর্তন করতে হবে।

২। ইসলামী কবি ও লেখক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উপস্থাপনার মাধ্যমে তার মধ্যে সক্রিয় নৈতিক গুণাবলী ও বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন। অন্যদিকে বর্তমান নৈতিকতাবর্জিত পরিবেশ ও অসুস্থ সমাজ চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করবেন।

৩। আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশ যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তাকে প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে।

৪। বর্তমানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় নারীকে যেখানে স্থাপন করা হয়েছে এবং বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করছে ইসলামী সাহিত্য তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায় স্থাপন করতে এবং ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চায়। নারীকে গৃহের ও পরিবারের মধ্যমণি বানিয়ে আমরা যে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও পরিবারের শান্তির নীড় রচনা করতে চাই আমাদের কবিতায় ও গল্পে তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সমাজ নারীকে কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে এনে তাকে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে ঠেলে দিয়ে যে সমাজ গড়ে

www.pathagar.com

তুলতে চায় তার ক্ষতি, বিপর্যয়, বৈপরীত্য ও ধ্বংসের চিত্রও তাতে ফুটে উঠবে।

৫। পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম আমাদের আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক। এর বিপরীতে ইসলামী আদর্শের রূপরেখা তুলে ধরতে হবে। শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাতে হবে।

৬। একদিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইসলামী সাহিত্য হবে সোচ্চার, অন্যদিকে ইসলামের অর্থনৈতিক সুবিচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে।

৭। ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এটাই হবে আমাদের সবচাইতে আবেগময় বিষয়বস্তু। ইসলাম একটি আন্দোলন এবং ইসলামী সাহিত্য এ আন্দোলনের ফসল। মুসলমানদের জাগ্রত করার জন্য এ আন্দোলনের মূল চিন্তাধারা ও পদ্ধতি তাদের সামনে তুলে ধরা তাই তার একটা গুরুত্বপুর্ণ বিষয়বস্তু।

তালিবের ইসলামী সাহিত্যের ধারণার সঙ্গে টি. এস. এলিয়েটের ধর্মীয় সাহিত্যের ধারণার তুলনা করা যেতে পারে। এলিয়েট ধর্মীয় সাহিত্যে বা কাব্যকে minor department of poetry মনে করেন। তিনি লিখেছেন:

Religious poetry is a variety of minor poetry: The religious poet is not a poet who is treating the whole subject-matter of poetry in a religious spirit but a poet who is dealing with a confined part of this subject-matter: who is leaving out what men consider their major passions and there by confusing his ignorance of them. (Religion and Literature, Selected prose, penguin Books, P.33)

পক্ষান্তরে তালিব বলেছেন, 'ইসলামী সাহিত্য কোন নিছক ধর্মীয় সাহিত্য নয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি বিশেষের ধর্মাচরণের মধ্যে এই সাহিত্য সীমাবদ্ধ নয়। যে সব মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য গড়ে ওঠে সেগুলো যেমন ব্যাপক ও বিশ্বজনীন, ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপ্তি তেমনি বিশ্বজনীন'।

তিনি আরো বলেন, 'ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার আর একটি দিক হচ্ছে সমগ্র মানবতার জন্য এর সুস্পষ্ট আবেদন রয়েছে। ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবোধগুলো যে কোন সাহিত্যের আদর্শ হতে পারে। মানবতার কল্যাণ, সামাজিক সাম্য ও সুবিচার, সৌভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো সকল দেশের, সকল যুগের, সকল মানব সমাজের আপন সম্পদ।' (ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান পৃ ৩৮-৩৯)

আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী সাহিত্য চান, টি. এস. এলিয়েট খৃস্টান সাহিত্য চান। তবে তালিব ইসলামী সাহিত্যের রূপায়ণ চান পরিকল্পিতভাবে, অন্যদিকে এলিয়েট খৃস্টান সাহিত্য চান unconsciously বা অসচেতনভাবে। তিনি মনে করেন যে সাহিত্য যারা সৃষ্টি করেন তারা আন্তরিকভাবে ধর্মের কাজকে এগিয়ে নিতে চান। (seriously desirous of forwarding the cause of religion). তাঁর ভাষায়: 'What I want

www.pathagar.com

is literature which should be unconsciously, rather than deliberately and defiantly Christian'

তবে অন্য এক দিক দিয়ে এলিয়েটের সঙ্গে তালিবের সাদৃশ্য রয়েছে। সেটি হলো সাহিত্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতিফলন নিয়ে। এলিয়েট বলেন যে, গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ সাহিত্য ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিফলন লোপ পেয়েছে। আধুনিক সাহিত্য শুধু এ কথাই বুঝাতে চায় যে জীবনের সব কিছু অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করতে হবে। তাই এ সাহিত্য শুধু temporal, meterial and external nature নিয়ে মাথা ঘামায়। এর চেয়ে উন্নততর আদর্শ আমাদের সামনে পেশ করতে পারে না। এ সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি আরো বলেন,

...it repudiates or is wholly ignorant of our most fundamental and important beliefs and in consequence its tendency is to encourage its readers to get what they can out of life while it lasts... (Religion and Literature)

এ fundamental and important beliefs বলতে এলিয়েট কি বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করে বলেননি, কিন্তু যখন অভিযোগ করেন যে আধুনিক সাহিত্য পাঠকদের শুধু ইহজাগতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে উৎসাহিত করে তখন বোঝা যায় যে তিনি পরকালের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হয় যখন তিনি আধুনিক সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন যে এ সাহিত্য কোন supernatural order এ বিশ্বাস করে না অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে তিনি কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন :

What I wish to affirm is that the whole of modern literature is corrupted by that I call secularism, that it is simply unaware of, simply cannot understand the meaning of, the primacy of the supernatural over the natural life, of something which I assume to be our primary concern. (Religion and Literature)

এখানে প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক জীবনের মধ্যে একটি পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে এবং অতিপ্রাকৃতিক জীবনকে প্রাকৃতিক জীবনের উপর স্থান দেয়া হয়েছে। এ জীবন আমাদের প্রধান বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিৎ বলে এলিয়েট মনে করেন। এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে তিনি অতিপ্রাকৃতিক জীবন (supernatural life) বলতে পরকাল বুঝিয়েছেন এবং স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণার উল্লেখ করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব প্রায় একই ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনিও বস্তুবাদী জীবনের প্রতি সমালোচনায় মুখর। তিনি বলেন, 'বস্তুবাদী জীবন মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও হিংস্রতার জন্ম দিয়েছে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার কাঠামো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। ঈমানের স্ফূলিঙ্গ স্তিমিত হয়ে গেছে। আল্লাহ প্রেমের আগুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মানবতা আজ এক রাশ ছাই ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আজ

www.pathagar.com

এমন সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে যার ভিত্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত।' (ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান)

এলিয়েট আধুনিক সাহিত্যের নেতিবাচক দিকের উপর মন্তব্য করেছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কিভাবে এ সাহিত্যকে বিকৃত করেছে সেটা তুলে ধরেছেন এবং একে বিরামহীনভাবে সমালোচনার তাগিদ দিয়েছেন। তালিব আধুনিক জীবনের সর্বনাশা নৈতিক অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের উপর মন্তব্য করেছেন এবং এ প্রেক্ষিতে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বলা বাহুল্য, আবদুল মান্নান তালিবের ইসলামী সাহিত্যের ধারণা গড়ে উঠেছে কুরআনের আলোকে। সূরা আশ্ শুয়ারায় বলা হয়েছে:

'যারা বিপথগামী তারাই কবিদের অনুসরণ করে। (২৬:২২৫) তোমরা কি জানো না যে তারা (কবিরা) কিভাবে উদভ্রান্তের মত উপত্যকা থেকে উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং তারা যা বলে তা করে না, (২৬:২২৬) তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে, নিরন্তর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অন্যায়ের শিকার হলে আত্মরক্ষা করে।' (২৬:২২৭)

এখানে কবিদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একদল উদভ্রান্তের মত উপত্যকা থেকে উপত্যকায় ঘুরে ফেরে। কোন কোন তাফসীরকার মনে করেন যে কথাটা আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়– এটা রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সে রূপক অর্থটি হলো যে তারা ভাষা ও ভাবের ব্যবহারে বিভ্রান্ত, সঠিক ভাব প্রকাশে অক্ষম। আর একটি দল হলো, তারা যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে, আল্লাহকে সারাক্ষণ স্মরণ করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। তাদের ভাষা ও ভাবের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। তবে অনুমান করা যায় যে তারা এ সবের ব্যবহারে উপরোক্ত ত্রুটিমুক্ত।

এ বক্তব্য থেকে দু'টি মোদ্দা কথা বেরিয়ে এসেছে। এর একটি হলো: ইসলামী সাহিত্য উদ্দেশ্যহীন নয়। এ সাহিত্য আল্লাহতে বিশ্বাস, সৎকাজ এবং অন্যায়-অবিচার প্রতিহত করার প্রেরণা জোগায়। মূলত: এ কথাই তালিব বলতে চেয়েছেন। তার ভাষায়: 'ইসলামী সাহিত্য আন্দোলন ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একটি অংশ'। (ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান পৃ: ৪৭)

দ্বিতীয় মোদ্দা কথাটি হলো: ইসলামী সাহিত্যে থাকবে ভাষা ও ভাবের পরিচ্ছন্নতা। উল্লেখ্য যে, তালিব ইসলামী সাহিত্যের এ দিক[illegible] উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। সম্ভবত: তিনি ধরে নি[illegible] যে সাহিত্যের নান্দনিক দিকটা স্বত:সিদ্ধ যা নতুন করে বলার অ[illegible] রাখে না।

www.pathagar.com

তাঁর সাহিত্য সাধনা
ও পথনির্দেশনা

জুলফিকার আহমদ কিসমতী

জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে কর্ম, কর্মের গতি ও মানের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ধরন প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হলো কর্মফল। এই মানদণ্ডে বিচার করলে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবদুল মান্নান তালিবের জীবন এরই এক জীবন্ত প্রতীক।

আমার সাথে আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের পরিচয় ঘটে ১৯৬২ সালের শুরুর দিকে। তিনি তখন রাজধানী ঢাকার ১৬ কারকুনবাড়ী লেন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকার সম্পাদক। পরিচয়ের মাধ্যম ছিলেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্রনেতা শাহ আবদুল হান্নান, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী হিসাবে সুপরিচিত। কার্জন হলে এ[illegible]টি সেমিনারে শাহ আবদুল হান্নানের সাথে পরিচয়ের সূত্রে তিনি আম[illegible]খালেখির আগ্রহ দেখে আমাকে নিয়ে একদিন বিকেলে তালিব সাহে[illegible]সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সাথে করে আমি একটি লেখাও নিয়েছি[illegible]ম, যা তিনি ঐ সপ্তাহের কাগজে ছেপে দিয়েছিলেন। তখন আমি ঢাকায় একটি প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদনার কাজ করতাম। এভাবে আমি তালিব ভাইয়ের সান্নিধ্যে আসার সুবাদেই তাঁকে ভালভাবে জানা ও বোঝার সুযোগ পাই। তাঁর যোগ্যতা, ধ্যান-ধারণা, জীবনবোধ, জীবনাচার সম্পর্কে আমার নিজের অযোগ্যতাবশত তার পুরোপুরি ব্যক্ত করা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না; তবে আমার জানা মতে তিনি এক সুমহান

www.pathagar.com

চিন্তা নিয়েই ওপার বাংলাস্থ তাঁর পিতৃগৃহ থেকে বের হয়ে প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান এবং সেখানে লেখাপড়া সেরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্যই হলো ইসলাম, কুরআন, হাদীস ও সংশ্লিষ্ট ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভের পর বাংলাভাষী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করে এখানে বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে ইসলাম প্রচারের কাজ করা এবং সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকা। কারণ একটি দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র যেসব নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত, তারা শিক্ষা সাংস্কৃতিক অঙ্গনের চিন্তা মূল্যবোধ দ্বারাই চালিত হয়। প্রচার মিডিয়া যাদের দ্বারা পরিচালিত, তাদের চিন্তাধারা ও জীবনবোধ পরিশুদ্ধ না থাকলে রাজনৈতিক অঙ্গনে সমাজ ও রাষ্ট্রে তার কিরূপ প্রভাব অনুভূত হয়, তা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। মুসলিম প্রধান এদেশবাসী যাতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সুফল ভোগ করে জীবনের উভয়লোকের কল্যাণ লাভের পথে পরিচালিত হয়, তালিব সাহেব তাঁর দূরদৃষ্টির নিরিখে সেই অবকাঠামো তৈরির ক্ষেত্র কর্মজীবনের সূচনা পর্বে এজন্যেই তা বেছে নিয়েছিলেন। যেমন অভিপ্রায় তেমনি কাজ। তালিব ভাইয়ের জীবনের এই ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব দৃশ্য যদিও তিনি দেখে যেতে পারেননি, তবে ইসলামী সাহিত্যে সাংবাদিকতার যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞানগর্ভ সংজ্ঞা ও এ ব্যাপারে লেখার মাধ্যমে পথ নির্দেশনা দিয়ে তিনি এর অবকাঠামো তৈরি করে দিয়েছেন। সেই নির্দেশনা অনুসরণে ইসলামী জীবন বোধে লালিত নব প্রজন্মের কিশোর যুবক শ্রেণীর লেখকদের যেই কলম সৈনিকের দল গড়ে উঠেছে, আশা করা যায় তাদের এই সংখ্যা সমাজে যতই বৃদ্ধি পেতে থাকবে, তাদের দ্বারা সমাজ ততই বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে সঠিক পথের দিশা পাবে। এই সঙ্গে নানান বাস্তব কারণে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা এবং অপসংস্কৃতির প্রভাববলয়ে থাকাতে যারা 'শিল্পের উদ্দেশ্যেই শিল্প' দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখক হয়েছে, তারাও হয়তো একদিন সঠিক পথের দিশা পাবে। আর কিছু না হোক অন্তত এক সময়কার মতো খালি ফিল্ডে গোল দেয়ার মতো মাঝখানে যেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার সেই কাঙালি অবস্থা আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। কারণ এ ময়দানের অন্যেরাসহ আবদুল মান্নান তালিব সাহেবের সংজ্ঞায়িত সাহিত্য চেতনায় ইতোমধ্যেই দেশে যেমন উল্লেখযোগ্য কলম যোদ্ধার সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গনেও এই দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বিলক্ষণ কম নয়। সমাজের এক শ্রেণীর লক্ষ্যহীন ইসলামদরদী বিত্তবানদের দৃষ্টিভঙ্গি এর অনুকূল ও সহায়ক হলে এবং ইসলামের স্বার্থে তারা এ যুগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মিডিয়া খাতে ব্যয় করার সাওয়াবের গুরুত্ব অনুধাবন করলে, তাদের সংখ্যা আশা করা যায়, দ্রুতই বেড়ে যাবে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনাব আবদুল মান্নান তালিব সাহেবের 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' নামক অতি মূল্যবান বইটি আকারে তেমন বড় না হলেও তিনি এর দ্বারা মহাস্রষ্টা আল্লাহতে বিশ্বাসী একজন লেখকের সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত, কিভাবে

www.pathagar.com

সাহিত্য হলে সেটি ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে বৃহত্তর শাসকগোষ্ঠীর কল্যাণে আসবে আর কোন লক্ষ্যহীন সাহিত্য যা শুধু 'শিল্পের উদ্দেশেই শিল্প'-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত হলে মানবতার ক্ষতি সাধন করবে, সেটা অতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। যে ভাষাতেই হোক, সাহিত্যের মূল লক্ষ্য মানবতার কল্যাণবিমুখ হলে সেটা সাহিত্য পদবাচ্যেরই উপযোগী নয়। এ সত্যটি লংঘিত হয়ে আসছে, বিশেষ করে নিছক ভোগবাদী ও বস্তুবাদী জীবন দর্শন ও জীবনবোধের অধিকারী লেখকরাই অনুরূপ লাগাম ছাড়া লক্ষ্যহীন-সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী, যা সমাজে কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই বয়ে আনে বেশি। কল্যাণ আনলেও তা সাময়িক, এ দৃষ্টিভঙ্গিতে তালিব সাহেবের বইটিতে যে সাহিত্য দর্শন উল্লিখিত তা এক সময় আমাদের সমাজে দুর্লভই ছিল। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্য একেবারে ছিল না যে তা নয়, কিন্তু এভাবে তা সংজ্ঞায়িত ছিল না বললেই চলে।

যেমন তিনি এ প্রসঙ্গের অবতারণা পর্বে যে বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন, সেটি হলো 'জীবন ও জগতের সম্পর্ক'। তারপর 'স্রষ্টা কে' ও 'জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি'। এরপর তিনি তাঁর এই মহামূল্যবান বইটিতে এভাবে ধারাবাহিকতার সাথে লিখে গেছেন– ১. সাহিত্য কি?, ২. সাহিত্যের উদ্দেশ্য, ৩. ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, ৪. ইসলামী সাহিত্য কি?, ৫. ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব, ৬. ইসলামী সাহিত্যে প্রেম প্রসঙ্গ, ৭. ইসলামী সাহিত্য ও অশ্লীলতা, ৮. ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য, ৯. ইসলামী সাহিত্যে বিশ্ব, বিশ্বজনীনতা, ১০. ইসলামী সাহিত্যের নিদর্শন।

মোটকথা, সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ ও এর রূপরেখার বর্ণনায় জনাব তালিব সাহেব তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী দ্বারা এটা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, 'ইসলাম যেমন একটি বিশ্বজনীন মতবাদ ও আদর্শ, তেমনি ইসলামী সাহিত্যও একটি বিশ্বজনীন সাহিত্য।' তিনি তাঁর লেখায় এটাও দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা যেমন সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণের বার্তা, তেমনি ইসলামী সাহিত্যও মানবতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের যথার্থ ধারক। ইসলামী সাহিত্য মানুষের সমাজকে কল্যাণ ও সফলতায় ভরে দেয়। মানুষের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণ ও সফলতা অর্জন। নিজের অকল্যাণ ও ব্যর্থতা ডেকে আনার উদ্দেশ্যে কোনো মানুষ কোনো কাজ করে না। বলা বাহুল্য, এ কারণেই লেখক তাঁর বইয়ের এক আলোচনায় পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় সহকারে বলেছেন, 'সাহিত্য মানবতার জন্য, সাহিত্য জীবনের জন্য, সাহিত্য কল্যাণের জন্য, সাহিত্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উৎখাতের জন্য। আর এটাই হচ্ছে ইসলামী সাহিত্যের মৌল পরিচয়।' আবদুল মান্নান তালিবের এই বইটি সমকালীন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশিকা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবদুল মান্নান তালিব একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য সাধনায় তিনি অন্যতম পথিকৃৎ ব্যক্তি ছাড়াও তিনি পবিত্র কুরআন-হাদীস অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন

www.pathagar.com

বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য রচনার দিকনির্দেশনামূলক মূল্যবান গ্রন্থাবলী রচনার বিরাট অভাবটি তিনি পূরণ করা ছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য ও গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকাও তিনি সার্থকভাবে সম্পাদনা করেছেন।

শিশু সাহিত্যের উপর বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যায়। কিন্তু শিশুদের মানস গঠনে ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য অতীতের মুসলিম লেখকদের লেখা বইতে লক্ষ্য করা গেলেও আজকাল সেই ভাবধারার সাহিত্য খুবই কম রচনা করা হয়। আধুনিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে সকলেই যেন ভেসে যাওয়াকে গৌরব বোধ করে। এদিকে শিশু মন কিভাবে গড়ে উঠছে এবং দুর্ভাগ্যবশত উপরে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কোমলমতি এই শিশুরা কিরূপ মানসিকতার অধিকারী হবে, সে দিকটার প্রতি অনেকেরই ভ্রূক্ষেপ নেই। এদিক থেকে আবদুল মান্নান তালিব শিশুদের মানস গঠনে ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর কর্মজীবনের সাংবাদিকতার পর্যায়ে তিনি তাঁর পত্রিকায় শিশুপাতার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। সাপ্তাহিক জাহানে নও পত্রিকায় তিনি শাহীনের মাহফিল নামে শিশু বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি লেখাসংবলিত পাতা প্রকাশ করেন। সেখান থেকেই শাহিন শিবির নামক একটি সংগঠন সারা দেশে গঠিত হয়, যেই সংগঠন থেকে শিশুরা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও ইসলামী সাহিত্য চেতনা নিয়ে গড়ে উঠতো। কোনো কোনো দৈনিকে শাহিন শিবির-এর পাতা মূলত তাঁর সেই কর্মপ্রয়াসেরই ফল যার বদৌলতে সৃষ্ট বহু যুবক এখন নিয়মিত কলম সৈনিক। শিশু মানস গঠনে আবদুল মান্নান তালিবের এই প্রয়াসও নিঃসন্দেহে একটি অসামান্য অবদান।

শুরুতেই বলা হয়েছে যে, আবদুল মান্নান তালিবের জন্ম পশ্চিম বঙ্গে। ১৫ই মার্চ ১৯৩৬ সালে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার থানা মগরাহাটের অর্জুনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা মরহুম তালেব আলী মোল্লা ও মাতা মরহুমা মেহেরুন্নেসা। আবদুল মান্নান তালিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৫০ সালে ১ম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে পরে পাকিস্তানের জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর থেকে দাওরা-এ-হাদীস পড়েন এবং হাদীসশাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞান লাভ করেন। ইসলামী জ্ঞানের গভীরতায় পৌঁছার আকর্ষণই তাঁকে ম্যাট্রিক পাস করার পরই মাদ্রাসায় নিয়ে যায়। সাত ভাইয়ের মধ্যে তিনি ৫ম। ইসলামী জ্ঞানের পিপাসা নিবারণকল্পে তিনি পশ্চিম বঙ্গের শিউড়ি শহরের জিয়াউল উলূম মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। তখন থেকেই তিনি কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং 'জিয়াউল ইসলাম' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ম্যাট্রিক পাসের আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতেন। তিনি পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের টেন্ডুআল্লাইয়ার-এ মওলানা ইহতেশামুল হক থানভী মাদ্রাসায় ১৯৫৫ সালে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসহ মেশকাত শরীফ পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেন। সেখান থেকে গিয়ে লাহোরের জামেয়া আশরাফিয়ায় ১৯৫৭ সালে দাওরা-এ-হাদীস পড়েন। তিনি

www.pathagar.com

উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষ আলেম মওলানা ইদ্রীস কান্দুলবীর মাদ্রাসায় লেখাপড়া এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার পর মওলানা মওদূদীর সংসর্গে যান। তিনি একই সালে উর্দু দৈনিক রোজনামা তাসনীম পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসাবে সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন। একই সঙ্গে নাইট কলেজেও লেখাপড়া করতেন। পরে মওলানা মওদূদীর পরামর্শে কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখেই ১৯৫৮ সালে ঢাকা এসে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকায় বাংলায় সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে দৈনিক ইত্তেহাদ পত্রিকায়ও কাজ করেন।

১৯৬০ সালে দৈনিক ইত্তেহাদ অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে গেলে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও'তেই সাংবাদিকতার কাজ অব্যাহত রাখেন এবং সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এই সাংবাদিকতা কালেই ১৯৬৬ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচএসসি পাস করেন। আবদুল মান্নান তালিবের লেখাপড়া ও ব্যাপক জ্ঞানান্বেষণের প্রতি ব্যতিক্রমধর্মী আকর্ষণের কারণেই তিনি নানাবিধ ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। ফলে তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি - এই ছয় ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গবেষণাধর্মী বহু ভাষা থেকে তিনি সাহিত্যসহ অনেক বিষয় অনুবাদ করেছেন। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিকসহ বিভিন্ন পত্রিকার তিনি সম্পাদনার সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি অনেক মৌলিক ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী ঢাকার রিসার্চ স্কলার ছিলেন। ১৯৭৫ সালের পর রিসার্চ স্কলার ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এদেশের ঐতিহ্যিক ধারার সাহিত্য আন্দোলনে আবদুল মান্নান তালিবের রয়েছে পথিকৃতের ভূমিকা। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার অঙ্গনে তাঁর রয়েছে অসংখ্য শিষ্য, যারা তাঁর দ্বারা লেখক হয়েছেন। আমি নিজেও অনুবাদ কাজে তাঁর কাছে ঋণী।

মহান আল্লাহর দরবারে এটাই প্রার্থনা যে, তিনি দেশ জাতি ধর্মের স্বার্থে সুমহান অবদানের অধিকারী আবদুল মান্নান তালিবকে জান্নাত দান করুন!

www.pathagar.com

স্মৃতিস্মরণের সাধক
শাহ আবদুল হান্নান

আবদুল মান্নান তালিব আমার খুব নিকট বন্ধুদের একজন। কলেজে পড়ার সময় তাঁর সাথে আমার পরিচয়। আমি ছাত্র জীবনেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আবদুল মান্নান তালিবও ইসলামী আন্দোলনেরই কর্মী। তাঁর বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে। সেটা একটা মুসলিম এলাকা।

এখানে এসে ঢাকার নবাবপুরে জামায়াতে ইসলামীর অফিসের নিচেই তিনি থাকতেন। তাঁর সাথে আমার সেখানেই পরিচয় হয়। আমি যখনই জামায়াতের অফিসে যেতাম তখন তাঁর সাথেও দেখা করতাম। তৎকালীন নানা বিষয়ে তাঁর সাথে আমার আলাপ হতো। এর মধ্যে একটা ছিল তখনকার ভারতের মুসলমানদের অবস্থা। তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়েও আলাপ হতো। আর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি নিয়ে তো আলাপ হতোই। আলোচনায় আরো থাকতো এ এলাকার ভবিষ্যত কি, আমাদের করণীয় কি, ইসলামের অবস্থা কি ইত্যাদি নানা বিষয়।

আমি তাঁর সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে একত্রে কাজ করেছি। এর মধ্যে একটা কাজ ছিল পাক সাহিত্য সংঘ গঠন, যদিও এসব বিষয় সম্পর্কে ইতিহাস ভালো করে লেখা হয়নি। আমার বন্ধু, ছোট ভাই অধ্যাপক মতিউর রহমান অবশ্য কিছুটা লিখেছেন। তালিব সাহেবেরও এ বিষয়টা নিয়ে লেখা উচিত ছিল। পাক সাহিত্য সংঘ নামে সাহিত্য সংগঠন গড়ে তুলেছিলাম আমরা পাঁচজন, তাঁদের মধ্যে তালিব সাহেব একজন, তাঁকে আমরা এর সভাপতি করেছিলাম। মুহাম্মদ মতিউর রহমান ছিলেন

www.pathagar.com

এর সাধারণ সম্পাদক। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লোক। অধ্যাপনা করতেন। একজন ছিলেন নূরুল আলম রইসী। তিনি এখন আমেরিকা থাকেন। তিনিও বাংলা সাহিত্যের লোক। আর ছিলেন সালেহউদ্দিন জহুরী। তিনি পত্রিকার কলাম লেখক ছিলেন। আর ছিলাম আমি।

পাক সাহিত্য সংঘ মূলত আমাদের পাঁচ জনের প্রচেষ্টাতেই গড়ে ওঠে। তখন আমার কিছু লেখা হতো না যদি পাক সাহিত্য সংঘ না হতো। এ সংগঠন থেকে তখন ঢাকায় বেশ কয়েকটি সেমিনার করা হয়। ষাট দশকই ছিল মোটামুটিভাবে এ সংগঠনের আয়ুষ্কাল। ওই সময়কার অনেকের হয়তো মনে হতে পারে এটা তেমন ভালো কিছু করতে পারেনি। কিন্তু আমরা যদি মুসলিম প্রেক্ষিত বিবেচনা করি তাহলে তখনকার তিন চারটি প্রধান সাহিত্য সংগঠনের মধ্যে এটি একটি ছিল। তালিব সাহেব এখানে অনেক কাজ করেন। এ সংগঠনের ফলেই আমরা তৈরি হই।

আমি সরকারি চাকরিতে যাওয়ার আগে নিউ এরা পাবলিকেশন্স নামে একটি ছোট্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। তালিব সাহেব 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' নামে একটি বই লেখেন। মেয়েদের সমস্যা, দাবি-দাওয়া, অধিকার ইত্যাদি ছিল বইটির বিষয়। সে বই কিভাবে প্রকাশ করা যায় তার চিন্তা করেই আমরা এই নিউ এরা পাবলিকেশন্স করেছিলাম। অবশ্য নানা কারণে এই নিউ এরা পাবলিকেশন্স টিকেনি। 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' বইটিই ছিল এখান থেকে প্রকাশিত একমাত্র বই। তালিব সাহেবের কাছে এ বইটির কপি ছিল। কিন্তু আমার কাছে এর কোন কপি নেই। এই বইটি ছিল নারীদের পক্ষে কথা বলা এ দেশে প্রথম সাহসী গ্রন্থ। এখন নারীদের উপর অনেক বই বেরিয়েছে। সে সময় নারীদের পক্ষে যেসব উদ্যোগের কথা বলা প্রয়োজন ছিল, তিনি সেই পরিপ্রেক্ষিতে যতটা বলা সম্ভব বলেছিলেন।

আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বাদ দিয়ে আবদুল মান্নান তালিবকে নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। তিনি শুরুতে কবিতা লিখতেন। তবে এ পর্যন্ত তার কোনো কবিতার বই বের হয়নি। সেসব কবিতা আজ একত্র করে অন্তত একটি বই হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। নিঃসন্দেহে তিনি একজন কবি। কবিত্ব শক্তি তাঁর মধ্যে গভীরভাবে রয়েছে। এটাকে তিনি কেন লালন করেননি সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ১৯৬৩ সালের পর থেকে বেশ কিছু সময় আমি উনার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম।

তালিব সাহেব ইকবালের গবেষক ও অনুবাদক। ইকবালের বেশ কিছু গ্রন্থের অনুবাদ তিনি করেছেন। সে বইগুলো পাকিস্তান আমলেই করেছিলেন। যতটুকু মনে পড়ে বেশিরভাগ তিনি ছন্দে অনুবাদ করেছেন। এটা স্বাভাবিক যে, ইকবালের কবিতাকে তো কবিতায় অনুবাদ করতে হবে। সেটাই তিনি করেছেন। তাঁর অনুবাদ খুব সফল অনুবাদ এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি মূল কবিতার স্পিরিটকে ট্রান্সফার করতে পারতেন। ইকবালের কবিতার মূল স্পিরিটকে যারা অনুবাদে সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে একজন। তিনি আরবি জানেন, ফারসি জানেন এবং বাংলা খুবই ভালো জানেন। সেই সাথে

www.pathagar.com

তিনি ইসলামকে গভীরভাবে জানেন বলেই সব মিলিয়ে উনার জন্য এই কাজ করা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। যাদেরই এরকম সুবিধা ছিল তারাই ইকবালের অনুবাদ ভালো করেছেন। আর যাদের এরকম সুবিধা ছিল না তাদের পক্ষে অনুবাদ করলেও সে অনুবাদ অতটা সফল হতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে মূলভাবের ট্রান্সফার ফুটিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়। ইকবালের উপর তার বেশ কিছু ভালো প্রবন্ধও আছে।

আবদুল মান্নান তালিব উল্লেখ করার মতো বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ লিখেছেন। এর মধ্যে একটা হলো 'বাংলাদেশে ইসলাম'। সংস্কৃতির উপর, সাহিত্যের উপর, ইসলামের উপর তাঁর মৌলিক গ্রন্থ রয়েছে। এসব গ্রন্থ তাঁকে একজন মৌলিক লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর বেশির ভাগ গ্রন্থই গবেষণামূলক। প্রচুর পড়াশোনা করে তিনি এসব গ্রন্থ লিখেছেন, সেটা আমি দেখেছি।

আবদুল মান্নান তালিব একজন মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে কখনোই কোনো গোঁড়ামি লক্ষ্য করিনি। তাঁকে উদার চিত্তের একজন মানুষ হিসেবে পেয়েছি। তাঁর মধ্যে উদার চিন্তা দেখেছি। তিনি কোনো মত বা মাযহাবের অন্ধ অনুসারি ছিলেন না। তিনি ইজতেহাদে বিশ্বাস করতেন এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। ইজতেহাদ যাতে বেশি হয় এবং এগিয়ে যায় সেজন্য তিনি লিখেছেন। তিনি নিজেও একজন ফিকাহবিদ। তিনি এক্ষেত্রে এতটা জ্ঞান অবশ্যই রাখতেন যে, তিনি ইসলামের বহু বিষয়ে মতামত দিতে পারতেন। আইনের ক্ষেত্রে যারা মতামত দিতে পারেন তাদেরকেই আমরা ফিকাহবিদ বলি। তালিব সাহেবের এই যোগ্যতা অবশ্যই ছিল, এজন্য তাকে ফিকাহবিদ বলে গণ্য করা যায়। কেননা এক্ষেত্রে তাঁর পড়াশোনা ছিল ব্যাপক। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে যেসব মতামত দিয়েছেন সেগুলোকে এভাবেই দেখতে হবে বলে আমি মনে করি।

আবদুল মান্নান তালিবকে আমি নারীর একজন বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। এটা এই অর্থে যে, তিনি প্রথম বই লিখেছেন *'অবরুদ্ধ জীবনের কথা'* নামে। পরবর্তী সময়ে আমরা দু'জনেই জড়িত হয়ে যাই *'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা'* নামক বইটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে। আল্লামা আবদুল হালীম আবু শুক্কাহর *'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা'* বইটি যখন আমার হাতে ড. আহমদ ততুনজি (ছয়টি খণ্ড) তুলে দেন তখন সেটা নিয়ে আমি তালিব সাহেবকে নিয়ে একটা গ্রুপ করে আলোচনা করি। ড. আহমদ ততুনজি বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব, চিন্তাবিদ ও সংগঠক। তিনি এক সময় আমেরিকান মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের (এমএসএ) সভাপতি ছিলেন। তিনি আইআইআইটির (ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব ইসলামিক থট) সভাপতি ছিলেন। তার দেয়া বইটি সেই গ্রুপকে অনুবাদ করতে দিই। তালিব সাহেব সেটার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন। বইটির ৩য় খণ্ড প্রথম বের হয়, যেটি তালিব সাহেব অনুবাদ করেছিলেন। যে কোনো কারণেই হোক, বইটির ১ম ও ২য় খণ্ড আগে বের হয়নি। ১ম খণ্ডের বিষয়বস্তু মূলত কুরআনে নারীর অবস্থা এবং ২য় খণ্ডে ইসলামে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নায় নারীর কি কি অধিকার আছে সেসব বিষয়। ৩য়

www.pathagar.com

খণ্ডে ১ম ও ২য় খণ্ডের যেসব বিষয়ে সমালোচনা বা প্রশ্ন ওঠে সেসব প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন, অর্থাৎ ৩য় খণ্ড ১ম ও ২য় খণ্ডের ব্যাখ্যা। এই অর্থে এটা স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড। ৩য় খণ্ড বের হওয়ার পর বেশ কিছু কপি আমরা বিক্রি করলেও এর বিরুদ্ধে একদল লোক দাঁড়িয়ে যায়। তারাও ইসলামের কাজের সঙ্গে জড়িত। তারা আমার ও তালিব সাহেবের সমালোচনা করে বইটি যাতে সার্কুলেট না হয় সে চেষ্টা করে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা সে বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হই।

২য় খণ্ডটি প্রিন্টের উপযোগী হয়ে ট্রেসিং অবস্থায় ছল। ট্রেসিং থেকেই আমি ফটোকপি করে তার থেকে কয়েকশ' কপি ছড়িয়ে দেই। আস্তে আস্তে এই আপত্তি থিতিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত (৭/৮ বছর ট্রেসিং অবস্থায় থাকার পর) বইটি বিআইআইটি প্রকাশ করে। ৩য় খণ্ডের ভূমিকায় তালিব সাহেব যে কথাগুলো বলেছেন তাতে সাহসিকতা ছিল। কথাগুলো নারীর পক্ষে ছিল, যার জন্য তাঁকে নিন্দার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি তিনি সেসব কথাই লিখেছেন যা তিনি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেন এবং তিনি সে কথা আমাকে বলেছেনও। তিনি এগুলো সহ্য করেই এ কাজটি করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব আমার বন্ধু। আমরা প্রায় একই বয়সের। ব্যক্তি হিসেবে খুবই চুপচাপ থাকেন। নিরহংকারী মানুষ। খুব বেশি কথা বলেন না। এজন্যই তাঁকে আমি নীরব কর্মীই বলব। আসলে তিনি একজন নীরব নেতা। তার চেয়ে হয়তো অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে দেশের অনেকেই চেনে। কিন্তু সে তুলনায় তাঁকে চিনতে পারেনি। এটা আমাদেরও ব্যর্থতা। যারা বন্ধুবান্ধব তাদেরও ব্যর্থতা। তরুণদেরও ব্যর্থতা যে তারা এরকম একজন মানুষকে উপরে তুলে আনতে পারেনি। হয়তো তারা এখন এই কাজটি ধীরে ধীরে করতে শুরু করেছে এবং এটা করাই উচিত।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের সাহিত্য সাধনা

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন আমার ঘনিষ্টতম বন্ধুদের অন্যতম। বয়সের দিক দিয়ে তিনি আমার এক বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানে-গুণে-চরিত্রে-আচরণে তিনি ছিলেন আমার নিকট একজন আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। ১৯৬০ সনে তাঁর সাথে আমার পরিচয়। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. ক্লাসে পড়ি। আবদুল মান্নান তালিব, শাহ আবদুল হান্নান, নূরুল আলম রইসী, সালেহউদ্দীন জহুরী ও আমি তখন ইসলামী আদর্শভিত্তিক সাহিত্য সংগঠন—'পাক সাহিত্য সংঘ' গঠন করি। আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন সভাপতি ও আমি ছিলাম সাধারণ সম্পাদক। তখন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমরা একই সাথে অভিন্ন লক্ষ্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজ আনজাম দেয়ার চেষ্টা করেছি। সে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু তাঁর সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাব।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আবদুল মান্নান তালিবের অবদান বহুমুখী, নানা বর্ণিল ও কলেবরের দিক দিয়েও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতা, প্রবন্ধ, শিশু-সাহিত্য, অনুবাদ, সম্পাদনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান গতানুগতিকতার উর্ধে, লক্ষ্যভেদী ও আপন স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। সাধারণ, গতানুগতিক চিন্তা-চেতনা ও প্রবণতা থেকে তিনি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেননি, এটা ছিল তাঁর জীবনের এক

www.pathagar.com

নিরবচ্ছিন্ন মিশন— স্বকীয় আদর্শ, ঐতিহ্য, জীবনবোধ, মানবিক প্রকৃত সত্তা ও গুণাবলী তুলে ধরে তার আলোকে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করার এক নিরন্তর মহত্তর প্রয়াস। এ কাজে আবদুল মান্নান তালিব যে গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, আন্তরিকতা ও অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা অন্যদের জন্যও অনুসরণীয় ও প্রণোদনাদায়ক। তাঁর সাহিত্য সাধনা তাঁর জীবন-বিশ্বাস ও জীবনের সকল কর্মায়োজনেরই প্রতিফলন-সবকিছু একই সুতায় গাঁথা।

আবদুল মান্নান তালিব (জন্ম ১৫ মার্চ, ১৯৩৬, মৃত্যু ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম তালেব আলী মোল্লা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক, জামেয়া আশরাফিয়া, লাহোর থেকে ১৯৫৭ সালে দাওরা-ই-হাদীস ও ১৯৬৬ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচ.এস.সি. পাস করেন। বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, আরবি, উর্দু ও ফারসি— এ ছয়টি ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বহু ভাষা শিক্ষার ফলে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সাথেও তাঁর একটি যোগসূত্র সৃষ্টি হয়।

আবদুল মান্নান তালিবের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় শিউড়ির 'জিয়াউল ইসলাম' পত্রিকায়। স্বরচিত কবিতা ছাড়াও কাব্যানুবাদে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। লাহোর থাকাকালে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের বহু কবিতা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে সেখানকার বিভিন্ন পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। ইকবালের ফারসি কাব্য 'রুমূযে বেখূদী'র ব্যাখ্যাসহ বাংলা অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন। করাচীর 'ইকবাল একাডেমী'র তত্ত্বাবধানে ইকবালের আরো একটি কাব্য ও বহু সংখ্যক কবিতা তিনি অনুবাদ করেন। ১৯৫১-৭১ পর্যন্ত সময়ে তিনি কাব্য চর্চায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে এক্ষেত্রে ভাটা পড়ে। কারণ তখন তিনি মননশীল রচনা, অনুবাদ, গবেষণা, শিশুতোষ রচনা ও শিশু-কিশোরদের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে বিশেষ মনোযোগী হয়ে পড়েন।

আবদুল মান্নান তালিবের কবি-খ্যাতি খুব একটা বিস্তৃতি লাভ করেনি। এর দু'টো কারণ হতে পারে। প্রথমত তিনি মাত্র নির্দিষ্ট দু'একটি পত্রিকায়ই লিখেছেন, দুর্ভাগ্যবশত যার প্রচার ছিল অত্যন্ত সীমিত। ফলে বৃহত্তর পাঠক সমাজ তাঁকে জানার তেমন সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয়ত তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কবিতা চর্চা করলেও এ পর্যন্ত তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। একাধারে দারিদ্র্য ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহাই হয়ত এজন্য দায়ী। তাঁর নিজের নির্লিপ্ত মানসিকতাও এ ব্যাপারে কম দায়ী নয়। অবিলম্বে তাঁর সব কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এরপরেই কেবল কবি হিসাবে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে।

দারিদ্র্য ও নানা প্রতিকূলতার সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করে পথ চলেছেন আবদুল মান্নান তালিব। পশ্চিমবঙ্গের বৈরী পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে আদর্শগত-প্রাণ আবদুল মান্নান তালিব নিজের বিশ্বাস ও দ্বীনী কাজের সুবিধার্থে জীবনে কয়েকবার হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন— পশ্চিমবঙ্গ

www.pathagar.com

থেকে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে, সেখান থেকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে, এখান থেকে আবার পশ্চিমবঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত আবার স্বাধীন বাংলাদেশে হিজরত করেন। বিভিন্ন সময় জীবন-জীবিকার তাগিদে তিনি বিভিন্ন ধরনের কর্মে নিয়োজিত থাকেন। তবে সব কাজের মূল ধরন হলো সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-সাধনা। নিচে এর বিবরণ দেয়া হলো :

১. সম্পাদক, সাময়িকপত্র 'জিয়াউল ইসলাম' বার্ষিকী, ১৯৫২, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।
২. সহ-সম্পাদক, উর্দুপত্রিকা 'রোজনামা তাসনীম', লাহোর, ১৯৫৭-৫৯।
৩. সহ-সম্পাদক, 'দৈনিক ইত্তেহাদ', ঢাকা, ১৯৫৯-৬০।
৪. সভাপতি, পাক সাহিত্য সংঘ, ঢাকা, ১৯৬১-৭১
৫. সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদক সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' ১৯৬২-৬৬
৬. রিসার্চ স্কলার, ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭-৭১
৭. সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী, ১৯৬৯-৭১
৮. ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাপ্তাহিক মীযান, কলিকাতা ১৯৭৩-৭৫
৯. রিসার্চ স্কলার, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৭৫-৮৫
১০. সম্পাদক, ত্রৈমাসিক ও মাসিক কলম, ১৯৭৭-৯৪
১১. সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী, ১৯৮১-১৯৯৯
১২. সম্পাদক, শাহীন শিবির, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭৭-৮২
১৩. কলাামিস্ট ও ফিচার এডিটর, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৮৩ –২০১০
১৪. পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭–২০১১

উপরোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী তিনি সাংবাদিকতা পেশা, গবেষণা ও সাংগঠনিক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর সকল কাজের পেছনে একটি মহৎ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কাজ করেছে। তাঁর সাংবাদিকতা করার পেছনে যে প্রধান তাগিদ কাজ করছে তা হলো, পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ সাংবাদিকতার মাধ্যমে একটি মানবিক কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণ। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবন শুধু গতানুগতিকভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটা ছিল তাঁর জীবনের এক নিরবচ্ছিন্ন মিশন। এ মিশন এক নতুন আলোর শপথে দীপ্ত। আবদুল মান্নান তালিব সে আলোর শপথে উদ্দীপ্ত এক প্রাণময় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজে দারিদ্র্য ও বিপদসংকুল সাংবাদিকতার বন্ধুর শ্বাপদঘেরা জনারণ্যে অবিশ্রাম পথ চলেছেন তাই নয়, আরো অনেককেই সে পথে চলার পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন, হাতে ধরে অনেককেই এ পথে চলার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাই সাংবাদিক হিসাবে তাঁকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করার সাথে সাথে এ বন্ধুর, অথচ গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অন্য আরো অনেককেই চলার ক্ষেত্রে তিনি যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তার গুরুত্বও প্রণিধানযোগ্য।

আবদুল মান্নান তালিবের প্রধান পরিচয় তিনি একজন গবেষক। বিভিন্ন বিষয়কে তিনি গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার পক্ষপাতি। তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ইসলামের মূলনীতির দ্বারা পরিচালিত। দীর্ঘদিন যাবত মুসলিম সমাজে জ্ঞান-সাধনার অভাবে, ইজতিহাদের দ্বার অনেকটা রুদ্ধ থাকায় এবং নানা সংস্কার ও গোঁড়ামীর

www.pathagar.com

কারণে মুসলিম সমাজে ইসলামের নামে অনেক অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ, চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারা চলে এসেছে। আবদুল মান্নান তালিব এসব ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা তুলে ধরার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাই শুধু গতানুগতিকভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ না করে তিনি খোলা মনে মৌলিক ও আসল বিষয় ও প্রকৃত সত্য সন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা মুফতী বা মুহাদ্দিসের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

এ দায়িত্ব পালনে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন আধুনিক কতিপয় বিখ্যাত যুগান্তকারী জ্ঞান-সাধকের নিকট থেকে। এঁদের মধ্যে মহাকবি আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল, শহীদ হাসানুল বান্না, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ডক্টর ইউসুফ আল কারদাভী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে এঁরা ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন এবং এঁদের মধ্যে শহীদ হাসানুল বান্না, শহীদ সাইয়েদ কুতুব ও মাওলানা মওদূদী বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নিশানবরদার হিসাবে বিশ্বব্যাপী অগণিত অনুসারী সৃষ্টি করে একবিংশ শতকেও সে আন্দোলনকে এক অপ্রতিহত গতি দানে সক্ষম হয়েছেন।

আবদুল মান্নান তালিব তাঁদেরই একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী ও বিশেষত সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-কর্ম, বিশেষত মৌলিক প্রবন্ধ রচনায় এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিবেচনা করলেও এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। শুধু মৌলিক রচনার ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন মনীষীর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী বাংলা ভাষায় তরজমা করে তিনি জ্ঞানানুশীলনের পথকে বাংলাভাষীদের জন্য অবারিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই তাঁর গবেষণামূলক মৌলিক রচনা ও অনুবাদ-কর্ম উভয়ই যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

তাঁর অপ্রকাশিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এ থেকে সাহিত্যিক-গবেষক, অনুবাদক ও সাংবাদিক আবদুল মান্নান তালিবের একটা মোটামুটি পরিচয় লাভ করা যায়। এর দ্বারা তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। মননশীল মৌলিক রচনা, সম্পাদনা, শিশুতোষ রচনা, অনুবাদ, কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে। অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে অবিচল নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশককাল ধরে আটাত্তরটি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তা আমাদেরকে বিস্ময়-আনন্দে নিরতিশয় অভিভূত করে। ফলে কৌতূহলী পাঠকের শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে তিনি স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর লেখা ও অনূদিত রচনাবলী পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়ে আসছে। তাঁর লেখার একটি বিশেষ গুণ হলো এই যে, কঠিন বিষয়কেও তিনি সহজভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। সহজ, সরল ভাষা, মার্জিত ও

www.pathagar.com

বোধগম্য প্রকাশ-ভঙ্গির কারণে তাঁর লেখা সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট আদরণীয় হয়ে উঠেছে।

আবদুল মান্নান তালিবের মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বাংলাদেশে ইসলাম' একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। লেখকের ইতিহাস-দৃষ্টি ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসা আমাদেরকে অনেক অজানা বিষয়ের সন্ধান দিয়েছে। আমরা যতটা জানতে পেরেছি তার চেয়ে আমাদের জিজ্ঞাসাকে তিনি অধিক জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেদিক দিয়ে তিনি ইতিহাস-পাঠকের সামনে এক নতুন দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস এক জটিল বিষয়। কারণ যাঁরা এ ইতিহাস লিখেছেন তাঁরা নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে পারেননি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান— তাদের সম্পর্কে, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, জীবনায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে ইতিহাস-রচয়িতাগণ— দুর্ভাগ্যবশত যারা প্রায় অধিকাংশই অমুসলমান— তারা যথাযথ, তথ্যপূর্ণ ও প্রমাণ-সাপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পেশ করতে পারেননি, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মুসলমান ও ইসলামের নামে কলংক লেপনের অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন। তাই অনেক সময় তাঁদের লেখা থেকে মুসলমান ও ইসলামের সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আবদুল মান্নান তালিব অসংখ্য বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি, ফারসি গ্রন্থ ও দুষ্প্রাপ্য নানা তত্ত্ব-তথ্য, দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে 'বাংলাদেশে ইসলাম' নামক তাঁর মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি শুধু ইতিহাস-পাঠকের জন্যই নয়, ইতিহাস-গবেষকদের জন্যও একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' ও 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' গ্রন্থ দু'টিও অত্যন্ত মূল্যবান দু'টি গবেষণাপ্রসূত মৌলিক গ্রন্থ। ইসলাম আল্লাহ্প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মহানবী স. স্বয়ং এ জীবনবিধানের ভিত্তিতে এক অনন্য আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের মহান চার খলিফা (রা.) মহানবীর (স.) পদাংকানুসরণ করে সে আদর্শ সমাজকে আরো সম্প্রসারিত ও মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। সে সমাজে আল কুরআনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক অন্যান্য সকল ব্যবস্থাপনা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিচালিত ও সম্পাদিত হতো। আল কুরআনের ভিত্তিতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স.) এ সকল ক্ষেত্রে নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কিন্তু খুলাফায়ে রাশিদার পর খিলাফতের বদলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাসহ সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শ চরমভাবে উপেক্ষিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, অমুসলিমদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই মুসলমানরা অনুসরণ করতে শুরু করে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজস্বতা, স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বলতে তেমন

www.pathagar.com

কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। শুধু মসজিদে যাওয়া, নামায-রোজাসহ কতিপয় বুনিয়াদী ইবাদত ও অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত মুসলমানদের চোখে পড়ার মতো আর কোনই বৈশিষ্ট্য থাকলো না, অথচ মুসলমানরা এমন এক জাতি যার জীবনায়নের সকল ক্ষেত্র অন্য সকল জাতি থেকে স্বতন্ত্র, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সর্বোত্তম। মুসলিম জাতি তাদের এ স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলীর কারণে এক সময় সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল আর এ স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলী বিসর্জন দেয়ার ফলে তারা দীর্ঘকাল বিজাতির গোলামী করতে বাধ্য হয়। আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি-আদর্শের কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে, অমুসলিমদের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য তা বর্তমানের অধিকাংশ মুসলিম-রচিত কাব্য-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি পাঠ করে বোঝার উপায় নেই।

আবদুল মান্নান তালিব কুরআন-হাদীসের নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ, উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও ধারণা উপরোক্ত গ্রন্থ দুটিতে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গ্রন্থ দু'টিতে অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতা ও নতুন বিবেচনার অবকাশ থাকলেও এ যুগে বাংলা ভাষায় এসব বিষয়ে তিনি যে আলোচনার সূত্রপাত করে দিক-নির্দেশকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে আরো ব্যাপক আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তবে আবদুল মান্নান তালিবের উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় এ বিষয়ে নতুন গবেষকদের অনেক চিন্তার খোরাক যোগাতে সক্ষম। তাঁর অন্যান্য মৌলিক রচনাবলীতেও বহু মৌলিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে।

অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন' বইটি আবদুল মান্নান তালিবের জীবনের এক দীর্ঘ সময়ের গবেষণার ফল। এতে ছোট-বড় প্রায় ৭৬টি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। তাঁর সম্পাদিত 'মাসিক পৃথিবী' ও 'দৈনিক সংগ্রম' পত্রিকায় ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লেখা সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়ের সংকলন গ্রন্থ এটি। ইসলামের আলোকে আমাদের জীবন, মুসলমানদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত, আমাদের পতনের কারণ, নতুনভাবে ইসলামের সনাতন শাশ্বত আদর্শের আলোকে জীবন পুনর্গঠন ও তার ফলে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট রূপরেখা এতে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি বর্তমান মুসলিম সমাজের এক দর্পণস্বরূপ। এ দর্পণে মুখ দেখে আমরা নিজেরাই নিজেদের চেহারা অবলোকন করে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারি।

'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থটি আবদুল মান্নান তালিবের মৌলিক গবেষণাপ্রসূত আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা মোট ৩৭টি নিবন্ধ 'জীবন ও সমাজ', 'সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য', 'শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি' ও 'ইসলামী আন্দোলন'–এ চারটি ভাগে ভাগ করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ বিষয়-বিভাগ থেকেই গ্রন্থের মূল

www.pathagar.com

বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক এতে জীবন-সমস্যার নানা জটিলতার কথা উল্লেখ করে তার সঠিক ইসলামী সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন। এ গ্রন্থে লেখক ইসলামী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন অবিচল, আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা ও সমস্যা সম্পর্কেও তেমনি সম্যক অবহিত। উদার মানসিকতা, যুক্তিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি সত্যিকারের জ্ঞান-পিপাসুদের সামনে মৌলিক অনেক বিষয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এ গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে বোদ্ধা পাঠকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, আবদুল মান্নান তালিব কোন গতানুগতিক সাধারণ ইসলামী চিন্তাবিদ নন, আধুনিক জীবন-সমস্যা, যুগ-জিজ্ঞাসা ও ইসলাম-বৈরী সমাজে ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও শাশ্বত আদর্শকে কীভাবে সফলভাবে উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, তিনি সে ব্যাপারে এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন।

'উপমহাদেশে ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের সূচনায় উলামায়ে কেরাম' শীর্ষক গ্রন্থটি আবদুল মান্নান তালিবের একটি মূল্যাবান ইতিহাস গ্রন্থ। এখানে ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের সময় থেকে ইংরেজদের নিকট থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত উপমহাদেশের বরেণ্য আলেমগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করে যে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন তার খণ্ড-ক্ষুদ্র বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। ইংরেজ আমলে মুসলমানগণ শুধু নানাভাবে বঞ্চিত ও নির্যাতিত হয়েছে তাই নয়, তাদের ইতিহাসও বিকৃত করা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের যে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রয়েছে, হিন্দু ঐতিহাসিকগণ এত দিন পর্যন্ত তা ধামা-চাপা দিয়ে রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বিশেষত এক্ষেত্রে আলেম সমাজের যে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সে বিষয়ে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ নীরব। বস্তুত আলেম সমাজ শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, তাঁদের অনেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছেন, স্বাধীনতা আন্দোলন তথা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং এজন্য তাঁদেরকে চরম জুলুম-নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। এরই কিছু চিত্র ও বিবরণ পাওয়া যায় এ গ্রন্থে। সত্যানুসন্ধানে যেমন তেমনি সত্যের জন্য, দেশের জন্য আত্মত্যাগের মহিমান্বিত গৌরব-গাঁথা পড়ে উদ্দীপিত হবার তাগিদেও এ বইটি পাঠ করা প্রয়োজন। একাধারে জীবন-চরিত ও ইতিহাসের বর্ণনা থাকায় বইটি খুবই সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়েছে।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের রচয়িতা হিসাবেও আবদুল মান্নান তালিবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। শিশু-কিশোরেরা জাতির ভবিষ্যত। তাদের মন-মানসিকতা অনুযায়ী রুচিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাদেরকে সঠিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করা, মহৎ ও উন্নত জীবন গঠনে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা শিশু-সাহিত্যিকের গুরু দায়িত্ব। আবদুল মান্নান তালিব এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিয়েছেন। তাঁর

www.pathagar.com

শিশুতোষ রচনায় আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-মূল্যবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। উন্নত আদর্শ ও নৈতিকতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্য রচিত। শিশু-কিশোরদের উপযোগী ভাষার ব্যবহার, কাহিনী অবলম্বন ও পরিমল আনন্দ প্রদানের জন্য রচিত তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্য ও বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক জাতীয় রচনা বিশেষ গুরুত্ববহ। এ জাতীয় গ্রন্থ আমাদের শিক্ষায়তনের বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। আবদুল মান্নান তালিবের এ পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৬টি। শিশু-কিশোরদের উপযোগী তাঁর ছড়া, কবিতা, গল্প-কাহিনীমূলক রচনা বাংলা সাহিত্যের এ শাখায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল এক বিশিষ্ট অবদান। এ জাতীয় রচনার ব্যাপক প্রচার হলে এবং এসব বই স্কুল-মাদ্রাসায় পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হলে দেশ-জাতি, বিশেষত আগামী প্রজন্ম সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার প্রেরণা লাভ করবে। তাঁর এ জাতীয় গ্রন্থের ভাব-ভাষা, বিষয় ও রচনা-ভঙ্গিও শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ উপযোগী।

অনুবাদক হিসাবে আবদুল মান্নান তালিবের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক। আরবি, উর্দু ইত্যাদি ভাষার ৪২টি মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তিনি। এগুলোর মধ্যে তাফহীমুল কুরআন, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ, সীরাতে সারওয়ারে আলমসহ মাওলানা মওদূদীর বিভিন্ন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তাঁর এসব অনুবাদের ফলে একদিকে বাংলাভাষী পাঠক বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের সৌভাগ্য অর্জন করেছে, অন্যদিকে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যকে তা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আবদুল মান্নান তালিবের অনুবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁর অনুবাদের ভাষা মূলের ন্যায় সহজ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। ভাষা ও বিষয়বস্তুর কারণে তাঁর অনুবাদ সাহিত্য বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অবদান চিরভাস্বর, অমলিন ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।

সাহিত্য-সংগঠক হিসাবেও আবদুল মান্নান তালিবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় তরুণ সাহিত্যিকের উদ্যোগে 'পাক সাহিত্য সংঘ' নামে যে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়, তিনি সে প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সহ-সভাপতি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ও তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ আবদুল হান্নান। বর্তমান লেখক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সালেহউদ্দীন জহুরী (কোষাধ্যক্ষ), নুরুল আলম রইসী, এ.কে.এম. নাজির আহমদ প্রমুখ ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমিটির সদস্য। ষাটের দশকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আদলে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবচেতনার উন্মেষ ঘটানো ও আমাদের নিজস্ব রুচিশীল, সুস্থ জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি নির্মাণে 'পাক সাহিত্য সংঘ' তখন যে ইতিবাচক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে, পরবর্তীতে সেই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও উপরোক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত একই ধারায় তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকলেই মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে, আমার

www.pathagar.com

ধারণা, আমাদের সকলের মধ্যে আবদুল মান্নান তালিবের অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে তিনি সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে সমুপস্থিত। তাঁর জীবনের মিশন পূর্ণ করে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর সাংগঠনিক কর্ম-তৎপরতার প্রধান নিদর্শন হিসাবে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে'র প্রতিষ্ঠা ও তার পরিচালনার বিষয় উল্লেখ করা যায়। ১৯৮৭ সাল থেকে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে'র পরিচালক হিসাবে আমৃত্যু আবদুল মান্নান তালিব মূল্যবান ভূমিকা পালন করে গেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, গবেষণা, প্রকাশনা, মননশীলতার বিকাশ, সুস্থ-সৃজনশীল সাহিত্য নির্মাণে বাংলা সাহিত্য পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিবের অবদান সর্বাধিক। নিজে সৃজনশীল কাজের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় তরুণদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে এবং আদর্শিক প্রেরণা সৃষ্টিতে তিনি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আবদুল মান্নান তালিবের অবদান সম্পর্কে উপরে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো তা থেকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান কোথায় এবং কতটুকু তা সহজেই নিরূপণ করা যেতে পারে। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক এবং সেক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান সেটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মূল্যবান অবদানের জন্য আবদুল মান্নান তালিব নিম্নোক্ত পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন :

এক. 'বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই সাহিত্য পুরস্কার', ১৯৯৪।

দুই. 'কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার', ২০০২।

তিন. 'কবি গোলাম মোহাম্মদ সাহিত্য পুরস্কার', ২০০৪।

চার. 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ সম্মাননা ও পুরস্কার'-২০১০।

www.pathagar.com

আলোর পথের
পথিকৃৎ
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

আবদুল মান্নান তালিবের যাত্রা শুরু পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রাম থেকে। জীবনের পথ ও পন্থা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তরুণ বয়সেই তিনি ঘর ছাড়েন। ভারতের নানা স্থানে, নানা কেন্দ্রে মুসাফিরী জিন্দেগী কাটিয়ে তিনি লাহোরে গিয়ে কয়েক বছর মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটান। এ সময় তাঁর জীবনের মঞ্জিল এবং লক্ষ্য অর্জনের কর্মকৌশলও চিহ্নিত হয়ে যায়। ১৯৫৭ সালে আবদুল মান্নান তালিব লাহোরের উর্দু দৈনিক রোজনামা তাসনীম-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে তিনি বাঙালি মুসলমানদের স্বাধীন আবাসকেন্দ্র ঢাকায় চলে আসেন এবং এ জনপদকে তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেন। তিনি ঢাকায় দৈনিক ইত্তেহাদ-এর সহ-সম্পাদক (১৯৫৯-৬০), সাপ্তাহিক জাহানে নও-এর সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক (১৯৬২-৬৬), মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক (১৯৬৯-৭১ ও ১৯৮১-৯৯), ত্রৈমাসিক ও মাসিক কলম-এর সম্পাদক (১৯৭৭-৯৪), দৈনিক সংগ্রাম-এর কলামিস্ট, বিভাগীয় সম্পাদক ও ফিচার সম্পাদক (১৯৭০-৭১ ও ১৯৭৭-২০০১) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মীযান-এর ভারপ্রাপ্ত একজন সম্পাদক ছিলেন। চার দশকের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা পেশায় একজন মিশনারীর এবং সে কারণে একজন শিক্ষকেরও। বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় ইসলামী

www.pathagar.com

ঐতিহ্যের ধারা নির্মাণে তিনি পালন করেন বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ভূমিকা। আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বহু মুসলিম তরুণ তাঁর হাত ধরে সাংবাদিকতার ময়দানে এসেছেন এবং তাঁর কাছে বহু বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের হাতেখড়ি হয়েছে। আবদুল মান্নান তালিব যে কারণে সাংবাদিকতার কঠিন ময়দানকে কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন, সেই একই লক্ষ্যে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত করেন মৌলিক গবেষণায়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীর রিসার্চ স্কলার হিসেবে ইসলামী গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি একই দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের গবেষক হিসেবে। ইসলামী গবেষণায় একটি সুচিন্তিত ধারা নির্মাণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং এখনকার বহু প্রতিষ্ঠিত গবেষক তাঁর হাত ধরেই এ কঠিন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়।

আবদুল মান্নান তালিব সাংবাদিকতা ও গবেষণার পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে তাঁর আদর্শিক লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন। এ কারণে ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি কাব্য চর্চায় নিবিষ্ট ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাক-সাহিত্য সংঘ-এর সভাপতি হিসেবে কবি-সাহিত্যিকদের সংগঠিত ও দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং ১৯৮৭ সাল থেকে আমৃত্যু বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক হিসেবে ইসলামী ঐতিহ্যের ধারায় বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার আধুনিক বিকাশধারাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছেন। ১৯৬২ সালে তাঁর লেখা প্রথম বই 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' প্রকাশিত হবার পর থেকে এ যাবৎ তার ১২টি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ, ৮টি সম্পাদিত গ্রন্থ, ১৬টি শিশু-কিশোর সাহিত্য ও ৪২টি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহের তিনটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক. বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার, বিস্তার, আন্দোলন ও রূপায়ণ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও গভীর বিশ্লেষণমূলক আলোকসম্পাত করে তিনি এক্ষেত্রে দোষ-দুর্বলতা এবং শক্তি ও সম্ভাবনার নানা দিক ও বাঁক চিহ্নিত করে সঠিক কর্মপন্থার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। দুই. ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবোধ ও উপাদান এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তুলে ধরে তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশে ইসলামী লেখক ও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিন. মুসলমানদের মধ্যে ইজতেহাদী চেতনা ও প্রেরণা দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে মুসলিম উম্মাহর জীবনক্ষেত্রে যে স্থবিরতা ও অবক্ষয়ের বিস্তার ঘটেছে, সেদিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। সে দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে যুগে যুগে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তা-বিকাশের ইতিহাসের প্রতিও তিনি আলোকসম্পাত করেন। তিনি ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠনের পথ নির্দেশ করেন এবং আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইসলামের ভিত্তিতে আমাদের এখনকার ভূমিকা কি হবে, তাও তিনি নির্দেশ করেন।

www.pathagar.com

এ ছাড়া যুগে যুগে যেসব মনীষী মুসলিম সমাজের চিন্তার পরিশুদ্ধি ও সমাজক্ষেত্রের সংস্কারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের অবদান তিনি জাতির শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মানুষের সামনে প্রেরণার উৎস হিসেবে উপস্থাপন করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রেও আবদুল মান্নান তালিব স্থির লক্ষ্যাভিসারী। তিনি বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ *তাফহীমুল কুরআন*, হাদীস গ্রন্থ *বুখারী শরীফ* ও রিয়াদুস সালেহীন, সীরাত গ্রন্থ *পয়গামে মুহাম্মদী* ও *সীরাতে সারওয়াবে আলম* অনুবাদ করার মাধ্যমে তাফসীর, হাদীস ও সীরাতের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। কুড়ি শতকের বিশ্ববরেণ্য চিন্তানায়ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর মূল্যবান গ্রন্থাবলি বাংলা ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্যিক উপাদানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করার ক্ষেত্রেও আবদুল মান্নান তালিবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নিজে একজন ভালো কবি ও বাকবোদ্ধা হওয়ার কারণে এবং সেই সাথে ভালো উর্দু ও ফারসি জানার সুবাদে তিনি দার্শনিক-কবি আল্লামা ইকবালের কাব্যসম্ভারের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে পারঙ্গমতার সাথে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলা ভাষার গ্রন্থপঞ্জিতে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত বিষয়বস্তু সংযোজনেও অনুবাদক হিসেবে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বস্তুত এখন থেকে অর্ধশতাব্দী আগে বাংলা ভাষায় ইসলামী প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে শূন্যতা ছিল, তা দূর করতে আবদুল মান্নান তালিবের ৪২টি অনুবাদ গ্রন্থসহ তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। উর্দু ও ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা ছাড়াও তিনি কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের বহু কবিতা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে উর্দুভাষী পাঠকদের কাছে নজরুল-ফররুখকে উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব একজন মৌলিক চিন্তাবিদ। তিনি তাঁর সময়ের তুলনায় অগ্রসর হয়ে ষাটের দশকে, সত্তরের দশকে, আশির দশকে ও নব্বইয়ের দশকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তা তার চারপাশের বহু মানুষের চিন্তাকে আলোকিত, উদ্দীপ্ত ও অগ্রসর করেছে। আলোকিত ও আধুনিক, উদার ও মুক্ত মানুষ আবদুল মান্নান তালিব ষাটের দশকে অবরুদ্ধ জীবনের কথা নামক বইতে নারীদের পক্ষে সময়ের চেয়ে অগ্রসর হয়ে কথা বলেছেন। নব্বইয়ের দশকে তিনি 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' নামক বই অনুবাদ ও সম্পাদনা করে তার চিন্তার ধারাবাহিকতা ও অগ্রসরমানতাকে বিম্বিত করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব বহু আলোকিত মানুষের শিক্ষক। তিনি একজন বড় মাপের শিক্ষক এবং একজন যোগ্য নেতা। প্রচারবিমুখ, নীরব, সংগ্রামী, মিশনারী এই নেতা অসংখ্য তরুণকে তাদের জীবনক্ষেত্রে নতুন আলোকিত সড়কে হাত ধরে পথ চলা শিখিয়েছেন। যাদের মাঝেই অগ্রসর হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছেন, তাদের আশ্রয় হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে, বন্ধু ও দিশারী হিসেবে তিনি ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শিক ধারায় সাহিত্য-সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, গবেষণাসহ মননশীল ও সৃজনশীল কর্মে যারা যুক্ত, প্রত্যক্ষ বা

www.pathagar.com

পরোক্ষভাবে তারা আবদুল মান্নান তালিবের কাছে ঋণী। এমনি আরো বহু কারণে আপাতনিভৃতচারী এই মানুষটির আসন এ দেশের সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সংস্কৃতির ময়দানের অসংখ্য কর্মীর হৃদয়ে সুদৃঢ়। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, গবেষক, অনুবাদক, কবি, সাংস্কৃতিক সংগঠক, নেতা, শিক্ষক, মিশনারী, মুসাফির আবদুল মান্নান তালিবের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে, তিনি কবি গোলাম মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার গ্রহণে সম্মত হয়েছেন। তাঁকে এ পুরস্কার প্রদানের সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি।

www.pathagar.com

আমার দেখা এক
অনন্য সংস্কারক
মাহবুবুল হক

কথা বলতে বলতে চলে গেলেন আমাদের এ কালের মনীষী আবদুল মান্নান তালিব। মানুষ কর্মস্থল ত্যাগ করে বিদেশ গমনের সময় বা হজ পালনের প্রাক্কালে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে যেভাবে কথা বলেন, যেভাবে দায়িত্ব বণ্টন করেন ঠিক সেভাবেই মৃত্যুর আগে আচরণ করছিলেন এই মনীষী। মনে হচ্ছিল মাত্র কিছুদিনের জন্য তিনি কোথাও সফরে যাচ্ছেন। ক'দিন পরেই যেন আবার ফিরে আসবেন! তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রতিনিয়তের কাজগুলো যেন পড়ে না থাকে সেটাই যেন তিনি বার বার পরখ করছিলেন। হাসপাতালে যেতে চাননি, থাকতে চাননি, বাসায় ফিরে আসার জন্য ছটফট করেছেন। বিনয়ী মানুষ সব সময়ে নিম্ন স্বরে কথা বলেছেন, কখনো উচ্চবাচ্য করেননি। উঁচু গলায় কথা বলেননি। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে আসার জন্য রাগ করেছেন। ডাক্তারদের সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলেছেন। আমাদের মতো ভক্ত-অনুরক্তদের বলেছেন, বার দিনের মধ্যে ছয় দিন তো পার হয়ে গেল, বাসায় যেতে দিন। একটু পাক-পবিত্র হই, একটু সুস্থ-সুন্দরভাবে আল্লাহকে ডাকি। যাওয়ার আগে একটু প্রাণ খুলে ডাকি। কেন আপনারা আমাকে আটকে রেখেছেন? আপনারা সবাই ভুল করছেন, আমার সামান্য কিছু কাজ এখনো বাকি আছে, আমাকে সেগুলো সারতে দিন। আমি তো আনন্দ চিত্তে পরওয়ারদিগারের কাছে পৌঁছে যাব। আবেগ বিহ্বলভাবে বেশ উঁচু স্বরে কথাগুলো বলছিলেন এই মনীষী।

www.pathagar.com

সজল চোখ দু'টি ছিল রক্তিমাভ। মনে হচ্ছিল প্লেনের টিকিট কাটা আছে। সময় হলেই প্লেনে উঠবেন, এই যা।

ঘটনাটা বাস্তবে যেন তেমনভাবেই ঘটল। হাসপাতাল ছেড়ে একটু জোর-জবরদস্তি করেই বাসায় এলেন, পাকসাফ হলেন, এবাদত-বন্দেগীতে তন্ময় হলেন, অসম্পূর্ণ অসিয়তনামাটি শেষ করলেন। মৃত্যুর পূর্বদিন বুধবার, ঠিক দুপুরে তালিব সাহেবের ফোন পেলাম। বললেন : অসিয়তনামা সম্পূর্ণ হয়েছে। আপনি এসে স্বাক্ষর করুন এবং অন্যদের স্বাক্ষর নিন। ব্যাংকের বিষয়টি দেখুন, ছেলেদের কাছ থেকে একসাথে টাকাটা সংগ্রহ করুন। আমি তখন বারিধারায়। বললাম, তালিব ভাই, কাল তো আসছি, তখন বাকি কথাগুলো বলবো। আসলে তাঁর কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। আর আমিও ছিলাম ভিন্ন একটি কাজে ব্যতিব্যস্ত। ভাবলাম, কাল তো দেখা হবেই, তখন সবকিছু আলাপ করে নেবো। তখন বুঝিনি এই ফোনালাপই আমার শেষ আলাপ হবে। পরদিন ছিল হরতাল, ভেবেছিলাম, বিকালের দিকে তাঁর বাসায় যাব। দুপুরে খেতে বসেছি এমন সময় ফোন এলো তালিব সাহেবের বড়ো ছেলে নুরুল হুদার। বলল, চাচা, আব্বা তো কথা বলছেন না, আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ডাক্তার ডাকার পরামর্শ দিয়ে ছুটলাম। রাস্তায় গাড়িঘোড়া নেই। অগত্যা রিক্সায় ধানমন্ডি থেকে শান্তিবাগে পৌঁছতে বেশ সময় লেগে গেল। পথিমধ্যেই ফোন পেলাম স্নেহভাজন তৌহিদুর রহমানের। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল : তালিব ভাই নেই। আমরা দিনক্ষণ গুণে উপলব্ধি করলাম তাঁর দেয়া সময় মতোই তিনি চলে গেছেন।

হাসপাতালে তিনি অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু বাসায় এসে সুস্থ বোধ করেছেন, অনেকের সাথে কথা বলেছেন, টেলিফোনে আলাপ করেছেন, সবাই ভেবেছিল তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। আসলেও তাই। সুস্থ হয়েই তিনি বিদায় নিলেন।

অলি-আল্লাহ আর কাকে বলে? এ সবই তো অলৌকিক ঘটনা। আমরা পীর-মুর্শিদের অনেক কল্প কাহিনী শুনেছি। কিন্তু এবার চাক্ষুষ দেখলাম। আল্লাহওয়ালারাই যে অলি-আল্লাহ সেটা বুঝলাম। মানুষ এমন নির্বিকারভাবে ইহকাল ত্যাগ করতে পারে, জীবনে এবারই তা প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। এ যেনো ছিল এক সফরের অবিকল প্রস্তুতি। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কিছুই ছিল না, সামান্য যা ছিল, তা যেনো সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই মনীষীকে নানা অভিধায় অভিহিত করা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন মহান অলি-আল্লাহ।

তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬৭ সালে। এক ছাত্র সম্মেলনে যোগদান করার জন্য দিনাজপুর থেকে ঢাকায় আসি। সম্মেলনটি ছিল ইঞ্জিনিয়ারস ইনস্টিটিউটে। সম্মেলন শেষে বন্ধু সানাউল্লাহ আখুঞ্জির মেহমান হলাম। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর কর্মস্থল 'জাহানে নও' পত্রিকা অফিসে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে হাফেজ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতীসহ আবদুল মান্নান তালিবের সাথে পরিচিত হই। 'জাহানে নও'-এর অফিসটি ছিল ঢাকার কোর্ট-কাছারীর বিপরীত দিকে ১৩ নং কারকুন বাড়ি লেনে। ব্রাউন

www.pathagar.com

কালারের একজন মানুষ, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, চুল ও দাড়ি ছিল অসম্ভব সুন্দরভাবে পরিপাটি করা। সাদা দাঁতগুলো জ্বলছিল উজ্জ্বল মুক্তার মতো। প্রথম সাক্ষাতেই বললেন, আপনাকে আমি চিনি। আপনার লেখা পড়েছি। আপনার গল্প অনেক শুনেছি। আমি খুব লজ্জা পেলাম। আমি তখন কলেজের ৩য় বর্ষের ছাত্র। বললেন, আপনার বন্ধু সানাউল্লাহ আপনার অনেক গল্প শুনিয়েছেন। তিনি তো চান আপনি তাড়াতাড়ি ঢাকায় চলে আসুন। এসে সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজ জোরদার করুন। বললাম, আরো অন্তত একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। গ্র্যাজুয়েট না হয়ে তো আসতে পারছি না। বললেন, ঠিক আছে তাই আসেন। কথায় কথায় সানাউল্লাহর অনেক প্রশংসা করলেন তিনি। বললেন, ইসলামী আন্দোলনের রাজনৈতিক কাজটা কিছুটা হলেও হচ্ছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক কাজটা মোটেও অগ্রসর হচ্ছে না। ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা বিষয়টা ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গমও করছেন। আপনাদের উপলব্ধির আমি প্রশংসা করি, আপনারা সাহিত্য-সংস্কৃতির হাল ধরুন।

সেদিন তাঁর সাথে অনেক আলাপ হয়েছিল। তিনি তমুদ্দুন মজলিসের প্রশংসা করছিলেন কিন্তু বলছিলেন, এঁদের অনেকেই এখন বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। অনেকেই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের স্রোত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি এখন ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজ দুর্বার করতে হবে। আমি সেদিন আমার সামনে একজন আধুনিক মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছি। যিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন। সাধারণত মাওলানা বলতে যা বুঝায় তাঁকে সেরকমটি মনে হয়নি। তিনি ইসলামের কথা বলছিলেন কিন্তু মৌলভী সাহেব বা মাওলানা সাহেবরা ইসলামের কথা যেভাবে বলেন, তিনি ঠিক সেই মাত্রায় চলছিলেন না। বলছিলেন, আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মতো। আমি তাঁর কথায় সেদিন অভিভূত হয়ে পড়ি। নিজের অজান্তেই তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ি।

ঢাকায় আসি ১৯৬৯ সালে। মাঝে তাঁর বেশ কিছু লেখা পাঠ করি, মাঝে মাঝে পত্র বিনিময়ও করি। সানাউল্লাহকে যখন চিঠি লিখতাম, তখন সে খামে তাঁর নামেও মাঝে মাঝে দু'কলম লিখতাম। তিনিও দু-কলম লিখে জবাব পাঠাতেন সানাউল্লাহর খামে। ঢাকায় এসে দেখি তিনি বসছেন পুরানা পল্টনের ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীতে। সম্ভবত এই বাড়িটি ছিল ৪২/১ পুরানা পল্টন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'পৃথিবী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি ছিলেন এর সম্পাদক।

আমি ঢাকায় এসেছি দৈনিক সংগ্রামে কাজ করার জন্য। সাংবাদিকতায় আমার হাতেখড়ি হয়েছিল দৈনিক আজাদের সংবাদদাতা হিসেবে। সংগ্রামে স্থান পেলাম শিক্ষানবীস সাব-এডিটর হিসেবে। ঐ পত্রিকায় আমার আগেই যোগদান করেছেন আবদুল মান্নান তালিব ও সানাউল্লাহ আখুঞ্জি, যথাক্রমে সহকারী সম্পাদক ও সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে। সংগ্রামে কাজ করার কারণে প্রায়ই তালিব সাহেবের সাথে দেখা হতো। যখনই দেখা হতো তখনই তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কথা বলতেন, খোঁজ-খবর নিতেন এবং এই মুহূর্তে কী লিখছি তা জানতে

www.pathagar.com

চাইতেন। বলতেন, শুধু সাংবাদিকতা করলে হবে না। সাংবাদিকতা অনেকটাই এখন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। সংস্কৃতির প্রসঙ্গ সংবাদপত্রে এখন কম থাকে। সংস্কৃতির কাজকে এগিয়ে নিতে হবে।

ঢাকায় এসেই অবশ্য শাহ আবদুল হালিম, সানাউল্লাহ আখুঞ্জি, ডা. সামসুদ্দৌলা, মোহাম্মদ আবদুল হান্নান, শেখ এনামুল হক, এঁদের গঠিত মুক্তবুদ্ধি সাহিত্যের সঙ্গে যোগদান করি। শহীদ মালেকের উপর মুক্তবুদ্ধি একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করে। এর নামকরণ করা হয় 'নিবেদিতপ্রাণ অনির্বাণ'। আমি ছিলাম সেই সংকলনের সম্পাদক, এই সংকলনে তালিব সাহেব একটি লেখা দিয়েছিলেন। সে সময় তালিব সাহেব অনেক অনেক কাজ করতেন। পূর্বে যা বলেছি সেসব ছাড়াও মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবিতা অনুবাদ করতেন এবং 'জাহানে নও'-সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে আমি সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে যোগদান করি। সেই অফিস থেকে পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা হতো। তালিব সাহেবের কাছে পাণ্ডুলিপি চাই। তিনি আমাকে কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন। আমি অত্যন্ত যত্নের সাথে সেসব প্রকাশের বিষয়ে সহযোগিতা করেছি। সেই সুবাদে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মাঝে ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে তাঁর নেতৃত্বে সোশ্যাল সাইন্স একাডেমী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অন্যদের সাথে আমাকেও তিনি এর সাথে জড়িয়েছিলেন। আমি ছিলাম ঐ প্রতিষ্ঠানের ট্রেজারার।

১৯৭২ সালে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা প্রকাশকালে তাঁকে অনেক খুঁজেছি, পাইনি। শুনেছি তখন তিনি তাঁর আদি নিবাসে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই নিবাস ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতা থেকে তখন একটি সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হতো– নামটি এখন আমার মনে নেই। সেই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাঁর লেখা প্রকাশিত হতো। সেসব লেখা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং বারবার ভেবেছি তিনি যদি ভারতেই থেকে যান তাহলে এখানকার বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা কে পূরণ করবে? অবশেষে ১৯৭৪/৭৫-এ একদিন তাঁর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। বললেন, পাকিস্তান আমলের ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী-এর আদলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে চেষ্টা করছেন। নাম দিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। পুরনো ঢাকার জোড়পুর লেনে অফিস নিয়েছেন। আমাকে বললেন, ইসলামিক পাবলিকেশন্স-এর যেসব বই আপনি ছেপেছেন, সেসবের রয়েলটি বাবদ বিআইসিকে টাকা দিন অথবা কমিশন যোগ করে বই সরবরাহ করুন। আমার মনে আছে সাড়ে বার হাজার টাকা দামের এক গাড়ি বই জোড়পুর লেনে পাঠিয়েছিলাম। জোড়পুর লেন থেকে ফকিরাপুল হয়ে বিআইসির অফিস স্থাপিত হয়েছিল সম্ভবত ৭১ নিউ এলিফ্যান্ট রোডে। তখন বিআইসির চেয়ারম্যান ছিলেন মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম। মাওলানা আবদুর রহীম, অধ্যাপক একেএম নাজির আহমদ, আবদুল মান্নান তালিব, আহমদ ইয়াহহিয়া খালেদ, মাসুদ আলী, সিদ্দিক জামাল, মতিউর রহমান

www.pathagar.com

মল্লিক— এঁরা সবাই মিলে বিআইসিকে একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন।

আশির দশকের মাঝামাঝির দিকে বিআইসি থেকে তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদকে পৃথক করলেন। নতুন অফিস নিলেন। আমাদের অনেককেই এর সাথে যুক্ত করলেন। সেই থেকে এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলা সাহিত্য পরিষদ একটি উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নিয়মিত সাহিত্য সভা, অগণিত বই প্রকাশ, সাহিত্য সম্মেলন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের সম্মাননা প্রদান— এসব কাজে তিনি অসামান্য সফলতা লাভ করেছেন। নিজেদের ঘরানাকে ডিঙিয়ে সাধারণভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাদেরকে তিনি উদারভাবে অমূল্য সম্মানিত করার চেষ্টা করেছেন এবং পুরস্কৃত করেছেন। এসব আবদুল মান্নান তালিবের অসামান্য কৃতকর্ম।

কণ্ঠের জড়তায় পরিষ্কারভাবে কথা বলতে অক্ষম হলেও সংগঠক হিসেবে অসামান্য সক্ষমতা দেখিয়েছেন তিনি। জানি না তাঁর অবর্তমানে বাংলা সাহিত্য পরিষদের কী হাল হবে? আমি সত্যি এ বিষয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত।

দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ভাবুক, কবি, সাহিত্যিক, অনুবাদক ও লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি দারুণভাবে ছিলেন রোমান্টিক। সৃজনশীল লেখকরা রোমান্টিক হন। মননশীল লেখকরা সাধারণত রোমান্টিক হন না। তালিব সাহেবের মধ্যে সৃজনশীলতা ও মননশীলতা অফুরন্তভাবে জায়গা করে নিয়েছিল। আমাকে প্রায়ই বলতেন, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে নাটক, গল্প ও উপন্যাস লেখার জন্য একবার তাঁর নির্দেশে বাণিজ্যিক বিষয়ে একটি উপন্যাস লিখি। লেখাটি পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। বলেন, এত ভালো মানুষ সাজার কি দরকার ছিল? মানুষ কি ফেরেশতা? মানুষের জীবনে উত্থান-পতন আছে, পাপ, অপরাধ ও স্খলন আছে, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা আছে। আছে নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা। আপনার উপন্যাসের নায়ক যেন জীবনের এই সিঁড়িগুলো মাড়াননি। নাহ, আপনার এই উপন্যাস চলবে না। আপনি কিছু জীবন্ত মানুষকে উপস্থাপন করুন, যারা একই সাথে পাপ ও পুণ্যের মাঝে অবস্থান করে এবং অবশেষে অনুতপ্ত হয়ে পুণ্যের দিকে ধাবিত হয়। তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও উপন্যাসটি আমি আর রিরাইট করতে পারিনি।

প্রায়ই বলতেন বামপন্থি আন্দোলনের উপর বিশ্লেষণধর্মী লেখার জন্য। যখনই আমার এ ধরনের কিছু লেখা ছাপা হয়েছে, অফুরন্তভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বাসায় এসেও বাহবা জানিয়েছেন।

রোমান্টিসিজমের কথা বলতে গিয়ে অন্য কথায় চলে গেছি। একবার আমাদের এক অগ্রজপ্রতিম বন্ধু দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করলেন, শুরু হয়ে গেল লংকাকাণ্ড। প্রথম স্ত্রী কোনোভাবেই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারছিলেন না। নিজেদের মধ্যে দেন-দরবার চলতে লাগলো, ঘুরে ফিরে সালিসটা এল তালিব সাহেবের কাছে। তিনি ঐ সিনিয়র ফ্রেন্ডকে বললেন, ‘কিছুদিন পর আপনি আরো একটি বিয়ে করুন। দেখবেন সব

www.pathagar.com

ঠিক হয়ে যাবে।' আমি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তালিব সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, এত বড় একটা বিপজ্জনক পরামর্শ আপনি কেন দিচ্ছেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে হেসে জবাব দিলেন, এখন তো প্রথম স্ত্রী ভাবছেন, দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসছেন। যখন দেখবেন যে, উনি তৃতীয় বিয়ে করেছেন, তখন বুঝবেন যে, ভালোবাসার জন্যই তিনি তাকে বিয়ে করেননি। তখন সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এভাবে তিনি ইচ্ছে করলে ৪র্থ বিয়েও করতে পারেন। বাস্তবেও ঘটনাগুলো সেভাবেই ঘটেছে। আমাদের সেই সিনিয়র বন্ধু চার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে খুব স্বস্তিতেই জীবন কাটাচ্ছেন। আসলে তিনি ছিলেন সমাজবিজ্ঞানী। আহমদ ছফা ও ফরহাদ মজহারের লেখা তিনি ভালোবাসতেন।

তাঁর অন্যতম প্রধান বইয়ের নাম 'বাংলাদেশে ইসলাম'। বহুল পঠিত এই বইটি আমি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলাম। এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন রেডিও বাংলাদেশের সাবেক পরিচালক মোহাম্মাদ দানেশ। আমার এলোমেলো জীবনের কারণে বইটি আমি প্রকাশ করতে পারিনি, বইটি বা পাণ্ডুলিপিটি পড়ে আছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক থট অফিসে। উৎসাহীজনরা একটু চাপ সৃষ্টি করলেই আশা করি বইটি প্রকাশ পাবে।

আজ আমরা নারীমুক্তি বা নারীর ক্ষমতায়নের কথা শুনছি। আমার ধারণা, ইসলামিক ঘরানায় এ বিষয়ে প্রথম কাজ শুরু করেছেন তালিব সাহেব। তাঁর লেখা 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সনে। 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' নামের চারখণ্ডের বিশাল বই তিনি অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছিলেন। বইটির মূল লেখক হলেন মিশরীয় পণ্ডিত আব্দুল হালিম আবু সুক্কা। বাংলাদেশের আলেমদের একটি অংশ এই অনুবাদ প্রকাশে বাধা দিয়েছিল, অবশ্য পরবর্তীতে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইসলামিক থট বইটি প্রকাশ করে।

তিনি সব সময় ইজতিহাদের উপর জোর দিতেন। এ বিষয়ে তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়া'র অনুসারী ছিলেন। তাঁকে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কারক মনে করতেন। তাঁর জীবন ও কর্মের উপর তিনি একটি বইও লিখেছিলেন। তাঁর এই বই আমি প্রকাশ করেছিলাম সৌদি আরবের দারুস সালাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স থেকে। আন্তর্জাতিক প্রকাশনা হওয়ায় বিশ্বের দেশে দেশে বাঙালিদের হাতে বইগুলো পৌঁছে যায়।

তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই এ যুগের এক বাতিঘর। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য যে কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এর আধুনিক ও বাস্তবসম্মত জবাব তুলে ধরতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরাই মিশেছেন তাঁরাই তাঁকে উঁচুমানের বিদ্বজ্জন বলে চিহ্নিত করতেন। আমি ড. হাসান জামান, সৈয়দ আলী আহসান, আরিফুল হক, ওবায়দুল হক সরকার, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমসহ অনেকের কাছেই তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুনেছি। এ বিষয়ে একটি বাস্তব নমুনা হলো ১৯৯৬ সালে যখন আমরা সেন্টার ফর ন্যাশন্যল কালচার গঠন করি তখন সৈয়দ আলী আহসান প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টিদের নামের তালিকায় তাঁর নামটিও উত্থাপন করেন। ড. আর এ গনি, এম আসাফউদ্দৌল্লাহ, ড. মোহাম্মদ

www.pathagar.com

মনিরুজ্জামান, ড. এম শমশের আলীসহ প্রস্তাবিত ট্রাস্টিবোর্ডের সবাই সানন্দ চিত্তে তাঁর নামটি গ্রহণ করেন। সেদিনই আমরা অনুভব করেছিলাম তালিব সাহেব কোন্ স্তরের মানুষ। অবশ্য আমরা বুঝেও এতকাল না বুঝার ভান করেছি।

আমরা শুধু নই, বাংলাদেশের তাবৎ জ্ঞানজীবী ও বুদ্ধিজীবীসহ সমাজ পরিচালনায় যারা অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেন তাদের অধিকাংশই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তালিব সাহেবকে এড়িয়ে গেছেন। প্রচারবিমুখ অন্তরালবর্তী মানুষটি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ সাধক পুরুষ। স্বমহিমায় তিনি ছিলেন অত্যুজ্জ্বল। স্বসমাজকে একটি উন্নততর মাত্রায় পৌঁছানোর জন্য অবিরাম কাজ করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ থেকে শুরু করে শিশু-কিশোরদের উপযোগী অসংখ্য লেখা তিনি উপহার দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা হবে দেড় শতাধিক। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। বাংলা, ইংরেজি উর্দু, আরবি, ফারসি, হিন্দিসহ বেশ ক'টি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন।

তরুণ সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের তিনি প্রগাঢ়ভাবে ভালোবাসতেন। মেধাবীদের সাথে বন্ধুত্ব করতেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কবি বুলবুল সরওয়ার, কবি সোলায়মান আহসান, কবি গোলাম মোহাম্মদ, কবি হাসান আলীম, কবি নাসির হেলাল, কবি ওমর বিশ্বাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্য পরিষদের দরজা তরুণদের জন্য সব সময় ছিল অবারিত। তরুণদের গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাদের অপরিণত লেখা তিনি বিনা পারিশ্রমিকে সাগ্রহে দেখে দিয়েছেন। দিনের কয়েকটি ঘণ্টা তাদের সাথে কাটিয়ে নিজেসহ তাদেরকেও দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছেন।

জীবনসায়াহ্নে আইন সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন। বরিত হয়েছিলেন ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর সহ-সভাপতি পদে। সেন্টারের মুখপত্রটি তিনি সম্পাদনা করতেন। তাঁর সম্পাদকীয়গুলো পাঠ করলে সহজেই অনুমান করা যেত তিনি ছিলেন এ যুগের অন্যতম চিন্তাবিদ ও সংস্কারক। শুধু বাংলাদেশের নয়, শুধু মুসলমানের নয়, সারা দুনিয়ার মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই ছিল তাঁর ব্রত। তার জন্যেই কাজ করেছেন তিনি। পেছন ফিরে তাকাননি, সহায়-সম্পদের খোঁজ-খবর নেননি। শুধুই চলেছেন, চলতে চলতে পরওয়ারদিগারের কাছে পৌঁছে গেছেন। আমি যাদের স্নেহছায়ায় লেখক ও সংগঠক হিসেবে বেড়ে উঠেছি তাদের মধ্যে একে একে সবাই চলে গেছেন, যেমন চলে গেছেন ড. হাসান জামান, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, সানাউল্লাহ নুরি, নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি, ওবায়দুল হক সরকার প্রমুখ। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ চলে গেলেন আব্দুল মান্নান তালিবও। আমার মাথার উপর আর ঋদ্ধ স্নেহছায়া রইল না। উদ্ভাসিত প্রশ্নের জবাব এখন কার কাছে চাইব? সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের অন্যতম অভিভাবক ছিলেন তিনি। তাঁর অভাব কে পূর্ণ করবেন জানি না। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে সর্বোত্তম স্থানে অধিষ্ঠিত করুন। এটাই আমাদের একমাত্র কাম্য।

www.pathagar.com

Abdul Mannan Talib:
The Lighthouse

Shah Abdul Halim

I know Abdul Mannan Talib, a humble servant of Allah, since 1958 when our family moved to Dhaka from Gaibandha. Talib was a friend of my elder brother Shah Abdul Hannan. Talib, Prof. Muhammad Matiur Rahman, Poet Nurul Alam Raisi and Shah Abdul Hannan were close friends. They all used to visit our residence at Shantinagar and discuss many issues. The topics would cover literature, culture, women empowerment, social engineering and what not. Talib, all the time, took keen interest in changing the mindset of our intelligentsia and religious scholars, and tried to persuade people through his inspiring discussions and writings. In later years, Talib turned up to be an intellectual ready to challenge any prejudice and malpractice that seemed to be against the pristine teachings and ever lasting spirit of Islam, its norms and ethics. Indeed he was a lighthouse.

The four friends together established 'Pak Sahittya Sangha' and 'New Era Publications'. Talib, in keeping with group's yearning to work for women's empowerment and their rights, produced 'Aboruddha Jibaner Katha' and

www.pathagar.com

later, in 1962, the New Era Publications printed this book. Abdul Mannan Talib, in his later life, turned up as a distinguished fighter of women's causes and he translated into Bengali the monumental work of Abdul Halim Abu Shuqqah, Murshid-e-Amm of Muslim Brotherhood Egypt, 'Tahrirul Mar'ah Fi Asrir Risalah' in Bengali 'Rasuler Juge Nari Shadhinata'. Some people objected to the content of the manuscript and the book saw the day light after overcoming many odds and finally it has been published and marketed by 'Bangladesh Institute of Islamic Thought' (BIIT), Dhaka in four volumes. Any interested reader can go through these volumes to understand the vibrant outlook and attitude of Abdul Mannan Talib, his progressive and dynamic vision as also the stance and standpoint of those who opposed its publication and marketing.

Talib's principal craving, while translating notable works from Arabic and other sources, was to open the doors of research to the vast majority of ulema, religious scholars, who are not familiar with foreign languages and also common readers, who know only Bengali. One of his works however, deserves publication in English for presenting the history and culture of Bangladesh to readers outside. This is 'Bangladeshe Islam' (1979). In fact this book has already been translated into English by Muhammad Danesh, a former Director of Bangladesh Betar, Radio Bangladesh under the supervision of eminent cultural organizer and author Mahbubul Huq, then Managing Director of Srejon Prakashani Limited. The manuscript is lying with Bangladesh Institute of Islamic Thought. BIIT would accomplish a good job if it expedites the publication of this book. However after composition, this book needs to be edited by a very qualified and proficient editor conversant with English language. Its publication in English shall be a great tribute and homage to Abdul Mannan Talib, a distinguished Islamic scholar, who did not get, during his life time, the due prominence as he was shy of publicity.

The other trait of his character was that Talib was sot spoken and never raised his voice on any occasion. A silent, steadfast, consistent and unswerving worker, he

www.pathagar.com

never got frustrated and even when in hospital bed he spoke of the superiority of the Islamic lifestyle. He thought that real scholars of Islam will be born in future when the original and primary materials will all be translated into Bengali. Like Prof. Dr. Yusuf Al Qaradawi, he firmly believed that coming generation of intellectuals will be much superior to the academics and scholars of the golden days of Islam. On this, he believed, like Qaradawi who, when still a student of under graduate at Al Azhar University, while refuting his teacher's claim that no Muslims like the Companions (may God be pleased with them) of the Prophet (peace and blessings be upon him) will be born in future, said that Muslims better than the Companions of the Prophet have already been born and he cited the names of Salahuddin Ayubi, who liberated Jerusalem from foreign occupation, and Imam Ibn Taimiyah as examples. Talib was hopeful of the intellectual capacity of the future generation as was indicated by the last Prophet in the Farewell Pilgrimage address in which he urged his listener to convey his message to others and hoped that later generation would understand the meaning of his message more than those who listen to him directly.

He was indeed dynamic, always ready to accept new ideas that, he thought, will help to push the stride and forward march of the society. Although critically ill, a terminal patient, he read my 7000 plus words discourse explaining the failure of the mainstream Islamist party and the need and justification for launching a new Islamist political party and how it will theologically differ from existing Islamist parties. I thought, like an old guard, he would rebuke me for writing such a thesis at this national political juncture but, to my utter surprise, he appreciated my point of view and commented to Mahbubul Huq in my presence 'Shah Abdul Halim is a mover of Islam. He wants reform and progress.' Talib said so, I believe, as he was a mover himself, committed to social reform and change. Indeed he was a reformist dedicated to revival and renaissance. When doubting sincerity of the people has become the norm, Talib would never disbelief people but would rather try to understand the opposite view. This

www.pathagar.com

article of mine was published in the 'New Nation' on 7 July 2011 under the caption 'Do Islamists need a way out'. Muslim Brotherhood Egypt also posted the article in its webpage

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=28791. http://sonarbangladesh.com/blog/ebong_abd/50458 and http://imbd.blog.com/? p=175 posted the article in their blogs and discussed and debated its content. The article was originally captioned 'Bangladesh Islamists Impasse: The Way Out'.

Talib was progressive in outlook, a man with open mind. This bears out from the fact that when I wrote an article stating that man is sovereign and not God for the simple reason that God's power is never divided whereas under the modern concept, sovereign power is divided between executive, legislature and judiciary. God is therefore not sovereign as His powers are not divided. In that article, I wrote that God is Hakim and sovereignty is a new term and has no exact or equivalent parallel in Arabic. Talib appreciated my point of view although he did not seem to agree with me as he wrote an editorial on the concept of sovereignty in the journal 'Islami Ain O Bichar' published by 'Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Center' and asked me to read it.

Talib was deadly against taqlid or blind imitation. In the book 'Baikaler Ashor' with reference to the question of donating human limbs and organs of the deceased, the author sarcastically remarked: Relatives will be yelling for the dead and people will come to take organs. How could that be? It might appear from this comment that organ transplantation is not allowed in Islam whereas it is permitted if deceased made a will to this effect when alive. Even a living person can donate organs if no harm is done to him or her and there is no commercial deal. I asked Talib: How this could happen that such comments are still being printed by the publisher? I told Talib: May be at certain time the ruling was that organs cannot be donated. But now when scholars are unanimous of their opinion that organ transplantation is allowed, why the translator and the editor did not drop such a view from the book? Talib simply replied: It was not dropped by the

www.pathagar.com

translator or editor because of blind respect and following of the author.

How such a man was treated by our physicians. Talib was admitted at a hospital at Shahjahanpur, Dhaka. Before he left the hospital for residence one day there was sudden shivering while transfusing blood. At that time Mahbubul Huq and myself was present apart from close family members of Talib. Everybody was looking for the doctor in charge of the hospital but despite our best efforts he did not turn up. At this hour Dr. Fahmidur Rahman, an eminent intellectual and social engineer, came to visit the ailing Talib and advised the duty doctor to do the needful but as he is not a physician of this hospital Dr. Fahmid could not pass an order. The doctor in charge of the hospital. however, turned up only when a mid-level political leader came to visit Talib. Now the question is: Does Talib deserve such a behavior?

Talib also was critical of the penetration of materialism among the socio-cultural and political workers. When Mahbubul Huq and myself visited Talib's residence, in reply to a question he admitted that money-theism or the worship of money has no doubt increased among the people than it was 40 years before. Today people are valued by the power they hold, their wealth and possessions, Talib lamented. He regretted from hospital bed that today there is no true Islamic movement.

I would not do justice to the subject I am discussing unless I mention the incident I shall narrate now for which some people consider Talib WaliAllah, a spiritual master. My younger brother Dr. Shah Mostafa Kamal, now residing in Canada, narrated this incident. In 1969 Talib was in the midst of a meeting at Bashaboo, Dhaka. There was attack on the gathering by some hoodlums. Everybody ran for shelter but Talib still remained seated with a placard in hand despite hurling of bricks and surprisingly no stone touched him. Such was his dependence on Allah, his unflinching trust that ultimately Allah will protect.

Such was Talib. May the soul of Moulana Abdul Mannan Talib rest in peace in paradise. Amin.

* The writer is the Chairman of Islamic Information Bureau Bangladesh. He can be reached email:sah1947@yahoo.com.
Web:www.shahfoundationbd.org.

www.pathagar.com

ফলভারে বিনম্র
এক জ্ঞানবৃক্ষ ছিলি

সাজজাদ হোসাইন খান

একটি বিশাল জ্ঞানবৃক্ষ ভূপাতিত হলো গত ২২ সেপ্টেম্বর। প্রায় শত বছরব্যাপী যে বৃক্ষ ছড়িয়েছে আলো, জ্ঞানের স্বর্ণকণিকা। এ পতনকে হয়তো অকস্মাৎ বলা যাবে না। তবে বেদনার তো বলতে হবে অবশ্যই যে বেদনা অনুভবকে আঘাত করে, বিদীর্ণ করে হৃদয়। বৃক্ষ নিজকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে ছায়া দেয়, হাওয়া দেয়, ঠিক তেমনি পতিত বৃক্ষটিও বিলিয়েছে জ্ঞান উজাড় করে আমরণ দেওয়াতেই ছিল যার আনন্দ, তৃপ্তি। তাই তিনি দিয়েছেন ভরপুর অঞ্জলি। এই বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষটির পরিচয় আবদুল মান্নান তালিব যিনি ঘর ত্যাগ করেছিলেন জানার আকুতি এবং জ্ঞানের অন্বেষায় বালক বয়সেই। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলসহ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি-লাহোর পাঞ্জাবে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। কর্মজীবনে প্রবেশ করেন সেখানেই। সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কিছুদিনের ব্যবধানে তিনি বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) ঢাকায় চলে আসেন। এখানেও আবদুল মান্নান তালিব সাংবাদিকতার পেশাতেই যোগ দেন। এ পেশাতেই কম-বেশি যুক্ত ছিলেন আমৃত্যু।

স্মরণযোগ্য, সুসাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অর্জুনপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর আপনজনরা এখনও সে এলাকায়ই বসবাস করছেন। কুরআন-হাদীস, তাফসীর ছাড়াও অসংখ্য আরবি-উর্দু-ফারসি পুস্তকের অনুবাদক তিনি। একজন সুসাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর পরিচয়ের ব্যাপ্তি দেশের সীমা অতিক্রম

www.pathagar.com

করেছে। মৌলিক লেখালেখির পাশাপাশি গবেষণাধর্মী ইতিহাস ও ইসলাম বিষয়ক নানান তত্ত্বমূলক পুস্তক রচনায় আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন শীর্ষ তালিকার একজন। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি একজন প্রথম সারির লেখক। শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনে তাঁর সাহিত্য সত্যের সন্ধান দেয়। কাব্য চর্চায়ও আবদুল মান্নান তালিবের কলম ছিল সচল, বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের জন্যে। মহাকবি ইকবালের অনুবাদেও তিনি উত্তীর্ণ অনুবাদক, সার্থক। জ্ঞানের নানান অলিগলিতে ছিল অবাধ যাতায়াত যে কারণে তাঁর জ্ঞানের বিশালতা যে কোন সন্ধানী পাঠককে বিস্মিত করে, বিশেষভাবে ধর্ম বিষয়ে আবদুল মান্নান তালিবের পাণ্ডিত্য, সৃষ্টিশীলতা ছিল কিংবদন্তিসুলভ। অমায়িক ও বিনয়ী মনোভঙ্গির এই মানুষটি আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রাণঘাতী ব্যাধি ক্যান্সারে। এই ক্যান্সারই আবদুল মান্নান তালিবকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল শেষাবধি। অবাক করার ব্যাপার হলো, মৃত্যুশয্যায়ও তিনি জ্ঞানের জগতকে ত্যাগ করেননি। দর্শনার্থীদের সাথে নিজের কষ্টের কথা নয়, ব্যাধির ব্যাপারে আলাপ নয়, খোঁজ-খবর নিতেন সাহিত্যের, সংস্কৃতির বিকাশ-বৈভবের। ধর্মের প্রতি অনুরাগ তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতো। দেশের অপরাজনীতি তাঁর কষ্টকে দীর্ঘ করতো।

স্বল্পভাষী এই মানুষটি সব সময় নিজকে গুটিয়ে রাখতেন, আড়াল করে রাখতেন তাঁর জ্ঞানের বিশালতাকে। আবদুল মান্নান তালিব তাঁর প্রতি অত্যাচার- অবিচারকে হজম করতেন নীরবে। ক্ষমার মহত্ত্বে তিনি ছিলেন মহীয়ান। সাক্ষাৎ মাত্রই সালাম জানিয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে সহাস্যে বলতেন, কেমন আছেন! এই আচরণটি ছিল তাঁর আমরণ সঙ্গি। মৃত্যুর সপ্তাহ দেড়েক আগেও তিনি এভাবেই আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তাঁর শান্তিবাগের বাসায়। যথার্থ মুমিনদের স্বভাব বুঝি এমনই হয়! বলতে দ্বিধা নেই, আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন সেই মুমিনদেরই উজ্জ্বল উদাহরণ।

৬৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই মহৎ ব্যক্তিটির সাথে পরিচয়। প্রথম সাক্ষাতেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। বলার ভঙ্গি ও বিনয়ী স্বভাব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তখন কলেজ ছাত্র, টুকটাক লেখালেখি করি। দু'একটি প্রকাশ পেয়েছে এদিক-সেদিক। লেখা প্রকাশের জগত এতটা বিস্তৃত ছিল না তখন। পত্র-পত্রিকা ছিল আঙ্গুলে গোনা। এ রকম বৈরি আবহাওয়ায়ই লেখালেখির প্রতি ঝুঁকেছিলাম যেজন্যে আবদুল মান্নান তালিব আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। একজন যথার্থ শিক্ষকের মতো লেখক হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় সব কলাকৌশল তিনি আমার সামনে উপস্থিত করেছিলেন। জীবনের শেষ সময়গুলোতেও তিনি তাঁর এই অভ্যাসটি জারি রেখেছিলেন। কারো প্রতিভার সামান্যতম লক্ষণ নজরে এলেই তিনি তার পরিচর্যা ও পরিচর্চায় মনোযোগী হতেন। এভাবে অসংখ্য লেখক তিনি তৈরি করেছেন। এটা করেই যেন তৃপ্তি পেতেন! ঊনসত্তর-সত্তরের কথা, সম্ভবত ৪১/৪২ পুরানা পল্টনে ছিল তাঁর দপ্তর, মাসিক পৃথিবীর অফিস। সেখানে প্রতিদিনই তাঁর সাথে আড্ডা জমাতাম।

www.pathagar.com

পরিচয়ের দু'একদিনের মধ্যেই তাঁর জ্ঞানের বিস্তার সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গিয়েছিলাম। ধারণা পোক্ত হবার পর আবদুল মান্নান তালিবের সান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারিনি। একজন সৎ লেখকের জন্য কি ধরনের পড়াশোনা প্রয়োজন সে ব্যাপারে ধারণা দিতেন, এমনকি লেখকের জীবন যাপনের পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও পরামর্শ রাখতেন। তিনি মাঝে-মধ্যেই বলতেন, একজন লেখক যেমন তার সমাজ এবং দেশের কল্যাণের পথকে মসৃণ করতে পারে পাশাপাশি সমাজ এবং দেশের অকল্যাণেরও কারণ হতে পারে। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ তিনি উপস্থাপন করতেন। মূলত তিনি ছিলেন সাহিত্যগতপ্রাণ। বেশ কিছু ভাষা তাঁর আয়ত্তাধীন থাকায় তিনি তাঁর এই অভ্যাসটি কাজে লাগিয়েছিলেন অবাধে। আবদুল মান্নান তালিবের সাহিত্য সৃষ্টির পরিধি এই সত্যটিকেই তুলে আনে বারবার। সাহিত্যের নানান শাখা-প্রশাখায় তিনি যাতায়াত করেছেন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ইতিহাস, গবেষণা, শিশুসাহিত্য ও অনুবাদের মতো দুরূহ কাজেও তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। এই সম্পৃক্ততা তাঁর সৃজনশীলতার ধারকে উপস্থাপন করে এবং করবে বোদ্ধা মহলে অনন্ত সময়।

আবদুল মান্নান তালিব ইকবাল চর্চায় পথিকৃৎ না হলেও ইকবাল চর্চায় তিনি একজন শুদ্ধতম অনুবাদক। কারণ তিনি মূল থেকে ইকবালকে বঙ্গ ভাষায় স্থাপন করেছেন। ইকবাল অনুবাদকদের অধিকাংশই ইংরেজির দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু আবদুল মান্নান তালিব ইকবালের কবিতার মূল ভাষা উর্দু-ফারসি থেকে ভাষান্তর করেছেন যেজন্যে তাঁর অনুবাদ হয়েছে অধিকতর মূলানুগ, প্রাণস্পর্শী। একজন সার্থক অনুবাদক হিসাবেও আবদুল মান্নান তালিবের অবস্থান তালিকার শীর্ষে তো অবশ্যই, বিশেষ করে ধর্ম বিষয়ে তত্ত্বমূলক পুস্তক রচনায়ও তিনি একটি উজ্জ্বলতম স্তম্ভ।

চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের সান্নিধ্যে অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাঁর সাথে। প্রথম জীবনের অনেক লেখাতেই তাঁর হাতের স্পর্শ আছে। তিনি আমার ছড়ার ব্যাপারে সপ্রশংস ছিলেন, পছন্দ করতেন। প্রথম ছড়া গ্রন্থ 'স্বৈরাচারের ঐরাবত'-এর প্রকাশকও তিনি। এ ছাড়া যে পুস্তকটি আমাকে লেখক হিসাবে পাঠক সমাজে উপস্থাপন করেছে সে পুস্তকটিও তাঁর আদেশেই লিখেছিলাম যেটি প্রায় মাস ছয়েক যাবত তাঁর পরিচালিত শাহিন শিবিরে প্রকাশ পেয়েছিল। পরবর্তী সময় পুস্তকটি 'সোনালী শাহজাদা' শিরোনামে বাজারে আসে এবং দারুণ পাঠকপ্রিয়তা পায়। বর্তমানে পুস্তকটির সপ্তম মুদ্রণ চলছে। এই অভাবনীয় পাঠকপ্রিয়তার সবটাই আবদুল মান্নান তালিবের প্রাপ্য।

আমাকে একজন সুলেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও ব্যতিব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। সবার জন্যেই ছিল তাঁর এমন আয়োজন। তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল আশির দশকে ত্রৈমাসিক 'কলম' সম্পাদনার সময়। তখন 'কলম' ছিল একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকা। আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক আর সম্পাদক হিসাবে ছিলাম আমি। তখনই সম্পাদনার নানান কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত হয়েছিলাম নতুনভাবে। একজন যথাযথ

www.pathagar.com

অভিভাবক হিসাবেই তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন, হাতে-কলমে শিখিয়েছিলেন। তাঁর সেই শিক্ষা চলার পথকে সজীব রেখেছে আজ অবধি। আটাত্তর সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময় আবদুল মান্নান তালিব আমাকে মতিঝিলের বাসা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সংগ্রামের বংশাল অফিসে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দৈনিক সংগ্রাম আবার নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু। সে সময় সাহিত্য পাতার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কবি আল মাহমুদকে। মধ্যস্থতাকারীদের একজন ছিলাম আমি। সেই সুবাদে আবদুল মান্নান তালিব আমাকে নির্দেশ দিলেন তাকে সহযোগিতা করার। সেই থেকে আজ অবধি তার নির্দেশ পালন করে যাচ্ছি। তিনি সংগ্রামের শিশুপাতা শাহীন শিবিরের পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন দীর্ঘ সময়। এই পাতাটি ছিল তাঁর লেখক তৈরির পাঠশালা। আজকের অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখকের জন্ম হয়েছে তাঁর এই পৃষ্ঠা থেকে।

কবি আবদুল মান্নান তালিব নির্বিরোধ নিরহঙ্কার একজন মানুষের প্রতিকৃতি। ধর্মবোধে উজ্জীবিত থাকতেন এবং উজ্জীবিত করে তুলতেন সহযোগীদের প্রতিনিয়ত। এটি ছিল তাঁর কর্মকুশলতার অন্যতম পদ্ধতি। সত্য প্রতিষ্ঠার আয়োজনে তাঁর অবদান তাঁর ভূমিকা পাথেয় হয়ে থাকবে বহুদিন। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে অতিরিক্ত পরিশ্রম তাঁকে শারীরিকভাবে দুর্বল করে ফেলেছিল। এই দুর্বলতা ব্যাধিরূপে বাসা বাঁধে শরীরে। সুলেখক আবদুল মান্নান তালিবের ইন্তেকালের খবরটি দশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছিয়েছিলেন কবি খালীদ শাহাদাৎ। তবে এমন একটি দুঃসংবাদ শোনার প্রস্তুতি ছিল যেজন্যে সুজন হারানোর ধাক্কাটা সহ্যের বাইরে চলে যায়নি। তাঁর শান্তিবাগের বাসায় যখন পৌঁছলাম তখন গোসল ও জানাযার আয়োজন চলছে। এরই মধ্যে তাঁর বহু শিষ্য উপস্থিত হয়ে গেছেন শান্তিবাগে, ব্যথিত হৃদয়ে। ইন্তেকালের বারো দিন আগে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তিনি আর মাত্র বারো দিন আছেন এই নশ্বর জগতে। তাঁর এই ঘোষণার দিনটি ছিল দশ সেপ্টেম্বর। তিনি পৃথিবী ত্যাগ করেন বাইশ সেপ্টেম্বর, ঠিক বারো দিনের ব্যবধানে। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসেও আমরণ সত্যের প্রতি অন্যতম আবদুল মান্নান তালিব তাঁর কথা ও কর্মের একাত্মতা প্রমাণ করে গেলেন উত্তর প্রজন্মের কাছে।

www.pathagar.com

তালিব ভাইকে মূল্যায়ন করা সহজ কাজ নয়

মাসুদ মজুমদার

নিভৃতচারী তালিব ভাইকে জানি দীর্ঘদিন থেকে। বহুমাত্রিক প্রতিভা ও ওজস্বী মানসম্পন্ন এ মনীষীর জীবন বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। একদিকে তিনি ছিলেন চিন্তাবিদ, অন্যদিকে তাঁর প্রতিভার ভিন্নমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছিল সাংবাদিকতায়। গবেষণা ছিল তাঁর নেশা। মৌলিক সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন মৃত্যু অবধি। প্রচারবিমুখ গবেষক আবদুল মান্নান তালিব সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সাংগঠনিক প্রজ্ঞার গুণে। সত্যানুসন্ধানী মানুষ হিসাবে ধর্মচিন্তা, ঐতিহ্য ভাবনা ও ইতিহাস অন্বেষা তাঁকে স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে পরিচিত করেছিল।

গবেষণায় তাঁর কর্মপরিধি ছিল জ্ঞানের সব শাখায় বিস্তৃত। আমরা যারা তাঁর অনুজপ্রতিম কিন্তু সমসাময়িক, তাদের কাছে তালিব ভাইয়ের পরিচয় একটু ব্যতিক্রমধর্মী। রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান তাঁকে স্পর্শ করতো বলে মনে হতো না। বাহুল্যের ব্যাপারে এতটা নির্মোহ মানুষ বিরল। সম্ভবত কুরআন, সুন্নাহ ও ফেকাহশাস্ত্রের অতলস্পর্শী জ্ঞান তাঁকে বিনয়ের অবতার বানিয়ে দিয়েছিল। মৃদুভাষী ও ক্ষীণ কণ্ঠের এ মানুষটি ছিলেন ইনসানে কামেল। অনেকটা দরবেশ প্রকৃতির। তাই প্রকৃতিও তাঁকে ছায়া দিতো। কুরআন-সুন্নাহ, হাদীস-ফেকাহ এতটাই আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, জীবন-জিজ্ঞাসা ও যুগ-যন্ত্রণার সব জবাব যেন তাঁর জানা ছিল। আবার আধুনিক জ্ঞান রাজ্যও ছিল তাঁর আয়ত্তে। তালিব ভাইয়ের গ্রন্থসম্ভার গুণগত মান ও সংখ্যার বিবেচনায় ঈর্ষা জাগার

www.pathagar.com

মতো। মনে হয়, যৌবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি মুহূর্তও তিনি বৃথা নষ্ট করেননি। মুহূর্ত মেপে সময় ব্যয় করেছেন। বাংলা ভাষার অনুবাদ শাখায় তিনি অন্যতম ব্যক্তি। এই শাখাও তাঁর হাতে বিকশিত হয়েছে। অনুবাদে তাঁর মুনশিয়ানা মৌলিকত্বের স্বাদ বহন করতো। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন উৎসাহী গবেষক হিসাবে তালিব ভাই ধর্মের মানবিক আবেদনটা স্পর্শ করতে চাইতেন। ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদ কিন্তু অসাম্প্রদায়িক এই তালিব ভাই ছিলেন অজাতশত্রু। তাঁর বন্ধু ছিল, সুহৃদ ছিল, ভক্ত ছিল, ছাত্র ছিল, স্নেহাধন্য ছিল কিন্তু নিন্দুক ছিল না কেউ।

মৌলিক, অনূদিত, সম্পাদিত গ্রন্থ ও সাময়িকী পত্র-পত্রিকা মিলে তাঁর বয়সের তুলনায় কর্মের পরিধি যেন বড়। সাংবাদিকতায় তাঁর মধ্যে কোনো গতানুগতিকতার ছাপ প্রত্যক্ষ করিনি। সাংবাদিকতা ও গবেষণাকে এক সাথে চালিয়ে যাওয়ার মতো এই দুর্লভ প্রতিভার জুড়ি মেলে না। তিনি শুধু একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষই ছিলেন না, আমানতের হেফাজত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তাঁকে অন্যভাবে মূল্যায়নের দাবি রাখে।

সংযমী অথচ মুক্ত চিন্তার এই মানুষটির ভেতর সাধু প্রকৃতি ও সততা এক সাথে ঠাঁই নিয়েছিল। বলার ক্ষেত্রে তাঁর জড়তা কলমের শক্তির মাধ্যমে এতটাই পুষিয়ে নিলেন, যার তুলনা তিনিই। সাধারণ জীবনযাত্রা ও চালচলনে অভ্যস্ত তালিব ভাইকে নিয়ে যুৎসই মন্তব্য করার মতো সাহস ও শক্তি কোনোটিই আমার নেই। যা আছে তাঁর প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা। মৃত্যুর ক'দিন আগে দেখার আগ্রহ জানিয়েছিলেন। যাই-যাচ্ছি করে যাওয়া হলো না। অবশেষে সংবাদ পেয়ে তাঁর বাসায় ছুটে গেলাম, ততক্ষণে তিনি অন্তিমশয়ানে। লাশের কোল ঘেঁষে বসে আছেন হালিম-মাহবুব ভাই।

আমরা তাঁকে হারিয়েছি তাঁর পরিণত বয়সে। তবে আল্লাহর উপর ভরসা বোধ করি তিনি কোনোকালেই হারাননি। তাই মর্দে-মুমিন বান্দা হিসাবে তাঁর অন্তর্ধান আমাদের শোকাহত করেছে– অতৃপ্তির সাগরে ভাসায়নি। মহান আল্লাহ তাঁকে কবুল করবেন তাঁর সৎ কর্মের জন্য। নেক আমল ও অফুরন্ত গবেষণাভাণ্ডার তাঁকে অমর করে রাখবে। এরই সাথে সদকায়ে জারিয়ার বদৌলতে তিনি হবেন জান্নাতবাসী– এমন প্রত্যাশা ও কামনাই এই অগ্রজের প্রতি আমাদের শেষ কর্তব্য। মহান আল্লাহ পাক তাঁকে কবুল করুন। আমিন!

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব শ্রদ্ধাভাজনেষু

খন্দকার আবদুল মোমেন

১৯৬৮ সাল। আমি তখন উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল কলেজ রংপুর-এর প্রথম বর্ষ বি.এ. (অনার্স) বাংলার একজন শিক্ষার্থী। বন্ধুবর সোহরাব হোসেন একদিন একটি বই দিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ার অনুরোধ করলেন। আমি তাকে বললাম, কী ব্যাপার, অসাধারণ কিছু আছে না কি এ বইতে? সে বললো 'পড়েই দেখ না কী আছে এতে!' বইটির শিরোনামের দিকে তাকিয়ে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। শিরোনামটি 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা'। গ্রন্থের লেখক আবদুল মান্নান তালিব। ভাবলাম হয়তো বা ক্রীতদাসদের জীবনচিত্র বা জেলখানায় বন্দী মানুষের জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছে এই বইতে। বইটি খুব ভাল সময়ে আমার হাতে এসেছিল— সেদিন আমার অবকাশ ছিল প্রচুর। জানুয়ারি মাস। শীতের দিন। বুঝতেই পারছেন উত্তরবঙ্গের শীত! রাত ন'টার মধ্যেই খেয়ে দেয়ে লেপ- কম্বল-কাঁথা গায়ে দিয়ে বইটি নিয়ে শুয়ে পড়লাম। বইটি নাড়াচড়া করে ভেতরে বাইরে এক আধটু দেখে আমার ভুল ভেঙে গেল। ক্রীতদাস নয়। বন্দী মানুষের জীবনচিত্রও নয়। নারী সমাজের পর্দা প্রথা এ বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত বোঝা সম্ভব হলো না লেখক এর পক্ষে না বিপক্ষে। শিরোনামটি আকর্ষণীয় ও শিল্পসম্মত। তাই আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। রাত যখন গভীর তখন আমার চোখ বইটির শেষ পৃষ্ঠায়। বুঝলাম তিনি পর্দার পক্ষেই কথা বলেছেন অত্যন্ত শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে। গ্রন্থটি পাঠ শেষে আমার অনুভব উপলব্ধির সারাৎসার যা দাঁড়ালো :

www.pathagar.com

১. বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ওয়াজ মাহফিলের মতো নয়। অভিনব কৌশলে বিজ্ঞানসম্মত এবং যৌক্তিক উপস্থাপনায় বক্তব্য হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

২. গ্রন্থের শিরোনাম, বক্তব্য উপস্থাপনা, ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির কারণে যে কোন পাঠকই বইটি পড়তে আগ্রহী হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

৩. পাঠশেষে যে কোন পাঠকই যদি তিনি যুক্তিবাদী হয়ে থাকেন তাহলে পর্দা প্রথার আবশ্যিকতা উপলব্ধি করতে পারবেন। পালন করুন আর নাই করুন, অন্তত পর্দা প্রথার বিরোধিতা থেকে তিনি বিরত হবেন।

এ বইয়ের মধ্য দিয়েই লেখক আবদুল মান্নান তালিবের সাথে আমার পরিচয়। তারপর মহাকালের এক দীর্ঘ অংশ অতিবাহিত হয়েছে। তখন স্বাধীন বাংলাদেশের আট বছর বয়স অর্থাৎ ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষালাভের পর ঢাকায় এসেছি কর্মসংস্থানের আশায়। আস্তানা গেড়েছি নবাবপুর রোডের এক মেসে। ঢাকায় অবস্থানের শুরুতে জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে একদিন কবি মতিউর রহমান মল্লিক-এর সাথে নিউ এলিফ্যান্ট রোডে গিয়ে হাজির হলাম বিআইসি অফিসে। সেখানেই 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' গ্রন্থের লেখক আবদুল মান্নান তালিবের সাথে আমার প্রথম সরাসরি পরিচয়। তখন তিনি 'কলম' সাহিত্য মাসিকের সম্পাদক এবং বিআইসি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কাজে ব্যাপৃত।

প্রথম পরিচয়ে কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। যদিও তাঁর কথা জিহ্বার জড়তাবশত সবটাই বুঝতে পারছিলাম না, তবে বুঝলাম তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। এরপর যতবার এসেছি তাঁর সান্নিধ্যে খুব সতর্ক- সাবধানতাসহ তাঁর কথা পুরোটাই উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। গঠনমূলক স্বভাবের অধিকারী আবদুল মান্নান তালিব ভাই লেখক হবার পরামর্শ ও নির্দেশনা দিতেন সব সময়ই। আমরা উজ্জীবিত হয়ে কর্মপ্রেরণা লাভ করেছি– জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক কাজে মনোনিবেশ করেছি।

সম্ভবত ১৯৯৫ সালের কথা । মগবাজার অয়ারলেস ডাক্তারের গলিতে বাংলা সাহিত্য পরিষদের অফিসে ডেপুটি ডিরেক্টরের পদে যোগদান করলাম। আবদুল মান্নান তালিব তখন এ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর। তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে আমার যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো তার সারসংক্ষেপ হলো ঃ

১. সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে আবদুল মান্নান তালিব সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম নকীব।

২. ভারতে জন্মগ্রহণকারী আবদুল মান্নান তালিব হিজরত করে প্রথমে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে অত:পর পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন শুধুমাত্র কালচারাল মুভমেন্টে যথার্থ ভূমিকা পালনের নিয়তে।

www.pathagar.com

৩. বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তিনি খুব সংকট অনুভব করতেন অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে। সম্ভবত বছর খানেক সময় আমি তাঁর ডেপুটি হিসেবে কাজ করেছি। কিন্তু অর্থাভাবের কারণে তিনি খুব বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একদিন বললেন, 'মোমেন সাহেব! আপনাকে খুব আশা করে এনেছিলাম কিন্তু এখন তো কোন উপায়ান্তর দেখছি না। কোনো একখান থেকে আশ্বাস পেয়েছিলাম তাই সাহস করে আপনাকে নিয়োগ দিয়েছি। কিন্তু তারা হঠাৎ 'পাইপ লাইন' বন্ধ করে দেওয়ায় ডেপুটির পদটি আপাতত খালি রাখতে হচ্ছে। আপনার আর্থিক সংকট না থাকলে অনারারি করার আহ্বান করতাম।'

একই প্রতিষ্ঠানে কিছু দিন চাকুরি করায় আবদুল মান্নান তালিবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমার দক্ষতা ও যোগ্যতার উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাঁর কাছেই শিখেছি নিবিষ্ট মনে কাজ করার একাগ্রতা। একটি Mission successful করার লক্ষ্যে দিনের পর দিন অধ্যবসায়ের সাথে কীভাবে কাজ করে যেতে হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আবদুল মান্নান তালিব। 'কথা কম কাজ বেশি'– এ কথার জীবন্ত নজির আবদুল মান্নান তালিব। নীরবে নিভৃতে অনবরত কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে একদল সাহিত্য-কর্মী সৃষ্টির কাজে তালিব ভাই পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হয়েছেন দিনের পর দিন। সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টির কাজে আবদুল মান্নান তালিব একজন দক্ষ সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেছেন আজীবন। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, শিশু সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আরবি, উর্দু, ইংরেজি ও ফার্সি ভাষায় তাঁর ভালো দখল ছিল। ফলে তাঁর অনূদিত সাহিত্য রসসিক্ত হয়ে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

বহুমুখি প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১-তে অনন্ত জীবনে পাড়ি জমালেন। তৌহিদুর রহমান সহসাই খবরটি যখন টেলিফোনে জানালেন তখন আমার মনে হচ্ছিল একটি বিরাট বট বৃক্ষের ছায়া আমাদের মাথার উপর থেকে যেন সরে গেল। আমরা যেন এতিম হয়ে গেলাম! সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলনে আমরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়লাম। শত সংকটের মাঝেও যিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের হালটি শক্ত করে ধরেছিলেন তেমনটি করে এখন কে হবেন আগুয়ান? এ জিজ্ঞাসা আমাদের ভাবিয়ে তোলে বৈকি! আবদুল মান্নান তালিব-এর বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কালানুক্রমিকভাবে সাজালে সেগুলো হবে : অবরুদ্ধ জীবনের কথা (১৯৬২), মুসলমানের প্রথম কাজ (১৯৭৫), বাংলাদেশে ইসলাম (১৯৮৯), ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান (১৯৮৪), আমল আখলাক (১৯৮৬), ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন (১৯৮৭), ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ (১৯৮৮), সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট (১৯৯১), ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন (১৯৯৪), সত্যের তরবারী ঝলসায় (২০০০), আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম (২০০১), উপমহাদেশে ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের সূচনায়

www.pathagar.com

উলামায়ে কেরাম (২০০২)। এ ছাড়া অসংখ্য সম্পাদিত গ্রন্থ, অনূদিত গ্রন্থ ও শিশু সাহিত্য তাঁর বিপুল সাহিত্য কর্মের স্বাক্ষর বহন করবে ভবিষ্যত মানুষের কাছে।

আবদুল মান্নান তালিব-এর সাহিত্য কর্ম বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় তাঁর কাজের লক্ষ্য ছিলো একটি পাটাতন নির্মাণ করা, একটি ভিত রচনা করা যার ওপর দাঁড়িয়ে ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতির ইমারত প্রতিষ্ঠিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর রচিত 'ইসলামী সাহিত্যঃ মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয় সুস্থ সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশে যারা কলম সৈনিকের দায়িত্ব পালন করবেন তাদের জন্য পরামর্শ ও নির্দেশনার ভূমিকা রাখবে।

'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।'

আবদুল মান্নান তালিবের কাজের যোগফল এমনটিই ছিলো। আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ লেখক। তিনি আজীবন ধীরে ধীরে যেসব সাহিত্য কর্ম করে গেছেন তা লক্ষ্যবস্তু অর্জনে পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত করবে নিঃসন্দেহে। তাঁর অনূদিত কুরআনের তাফসীর ও হাদীস অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সাবলীল ও পাঠকসমাদৃত।

লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন আখেরাতমুখী। আখেরাতের জবাবদিহিতার মানদণ্ডে টিকবে কী টিকবে না এটাই ছিলো তাঁর লেখক-চেতনা।

'মুসলমানের প্রথম কাজ' গ্রন্থে তিনি যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে : এলেম (জ্ঞান), আমল (জ্ঞানের প্রয়োগ), খেদমত (মানব সেবা) মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা বিকাশের জন্য এ তিনটি কাজই প্রত্যেক মানুষের জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হওয়া সমীচীন। এলেম, আমল ও খেদমত প্রত্যেক মানুষের জীবনে রুটিন ওয়ার্ক হলে মানুষ ইনসানে কামিলের পথে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হবে নিঃসন্দেহে। ফলে বৃহত্তর সমাজ পরিশুদ্ধ হয়ে কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করবে।

একটি গ্রন্থ পাঠকের চিন্তা-চেতনায় ভাঙ্গা-গড়ার কাজ করে। বিষয়ের যৌক্তিক উপস্থাপনা, ভাষার সাবলীলতা পাঠকের চিন্তায় নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তার পুরাতন ধারণাকে ভুল ও অসার প্রমাণিত করে। নতুন চিন্তা-চেতনায় তিনি তখন আলোকিত পথে পা বাড়িয়ে দেন। কোনো কোনো গ্রন্থ পাঠকের মনে এ ধরনের ভাঙ্গা-গড়ার ভূমিকা পালন করে। আবদুল মান্নান তালিব রচিত গ্রন্থগুলোর প্রকৃতি ঠিক এ রকমই। তাঁর গ্রন্থগুলোর প্রতিপাদ্য বিষয় চিন্তা উদ্রিক্তকারী। পাঠকের মনে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। নিবিষ্ট মনের পাঠক অবশেষে লেখকের সাথে একমত না হয়ে পারেন না।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন একজন একনিষ্ঠ প্রাকটিসিং মুসলমান। তিনি কখনো দ্রুত নামাজ পড়তেন না। ধীরে সুস্থে খুসু-খুজুর সাথে নামাজ আদায় কত যে তৃপ্তিদায়ক তাঁর পেছনে নামাজ পড়ে তা অনুভব করেছি।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব দায়িত্ব পালনে ছিলেন খুবই সতর্ক মানুষ। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লাভালাভের চিন্তায় আক্রান্ত হননি কখনো। আমি অবাক হয়ে গেলাম তাঁর 'মুসলমানের প্রথম কাজ' গ্রন্থের শেষে 'ইসলামী বই-এর তালিকা' শীর্ষক একটি বিজ্ঞপ্তি দেখে। বিভিন্ন সাব-হেড লাইনে মোট ১২৭টি গ্রন্থের নাম তিনি জানিয়ে দিলেন পাঠককে। পঠন-পাঠনের জন্য পাঠকের প্রতি একটি সুন্দর সিলেবাস। তিনি যা প্রচার করলেন তা বিভিন্ন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ। নিজের লেখা একটি গ্রন্থের শেষে এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত মানুষের পরিচয় বহন করে। মানুষ এতে উজ্জীবিত না হয়ে পারে না। মৃত্যুর পূর্বে আবদুল মান্নান তালিব তাঁর যাবতীয় সহায়-সম্পদ যাতে ইসলামী শরা-শরীয়ত মতো ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হতে পারে তার জন্য একটি অসিয়তনামা প্রণয়ন করেন এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য চার সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। প্রাকটিসিং মুসলমান হিসেবে তাঁর এ দায়িত্ব সচেতনতা সবার জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

মহান আল্লাহ এই ভালো মানুষটির যাবতীয় কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডকে কবুল করুন। তাঁর মানবীয় দোষ-ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করে তাঁকে সর্বোচ্চ জান্নাতের বাগানে রাজকীয় নিবাস দান করুন।

আমীন!

www.pathagar.com

উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের এক অনন্য কলম-সৈনিক আবদুল হালীম খাঁ

এক.

নিজের চেহারা নিজের চোখ দিয়ে দেখা যায় না। দেখার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াতে হয়। আয়না বলে দেয় চেহারাটা কেমন। আর নিজের দোষ-গুণ নিজে পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় না। নিজের সঠিক রূপ জানার জন্য আয়নার মতো নিরপেক্ষ লোকের প্রয়োজন। আমাদের সমাজে আয়নার মতো নিরপেক্ষভাবে দোষ-গুণ প্রকাশের মতো লোকের খুবই অভাব। এ বিষয়ে প্রায় সবাই পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন। ভক্তরা গুণীজনদের শুধু গুণের দিকটাই তুলে ধরেন, অন্যদিকে অভক্তরা ভুল-ত্রুটিগুলো প্রচার করে বেড়ান। সমাজে যে সত্য প্রকাশের লোক নেই এমন নয়, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম এবং দুর্বলমনাও বটে। এ জন্য সত্যসন্ধানী গুণীজনদের কথা কোথাও তেমন একটা উচ্চারিত হয় না।

অথচ সমাজে যাঁরা সৎ মহৎ কীর্তিমান গুণীজন তাদের কীর্তির কথা বেশি বেশি প্রচার করা উচিত, যাতে তাঁরা উৎসাহিত হন এবং সমাজ মানসে, বিশেষ করে যুব সমাজে ভালো কর্মের প্রভাব পড়ে। কিন্তু আমাদের সমাজে এই রীতি চালু নেই। মহৎ লোকের মহৎ কর্মের প্রচার নেই। প্রচার আছে অসৎ লোকের। প্রচার করা হয়, অমুকের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র। আসলে যারা ফুলের মতো পবিত্র এবং অসংখ্য মহৎ কাজ করছেন, দেশ ও জাতির কল্যাণ করছেন, তাঁদের কথা সমাজের অনেকেই জানতে পারে না। তাঁরা সারা জীবনই অচেনার অন্ধকারে পড়ে থাকেন।

www.pathagar.com

তাঁদের জীবন কেটে যায় মেঘে ঢাকা চন্দ্র-সূর্যের মতো। সৎ ও মহৎ মানুষ চিরকালই প্রচারবিমুখ হয়ে থাকেন। তারা গোপনে গোপনে কাজ করেই আনন্দ পান।

সমাজের সাধারণ মানুষ সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য ও হক-বাতিলের পার্থক্য খুব কমই বুঝতে পারেন। তারা প্রচারের ঢেউয়ের উপর ভাসে, স্রোতের টানে চলে। ন্যায়-অন্যায়, অসৎ ও মহৎ লোকের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব যাদের আমাদের সমাজে তারা ভীষণভাবে পিছিয়ে আছেন। গুণীজনের গুণের কথা বলতে তারা খুব কৃপণ।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, ঐতিহাসিক, অনুবাদক, বহু ভাষাবিদ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী ও পথিকৃৎ মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব যাঁকে আমরা সমবয়সী বন্ধুর মতো ভালোবাসতাম এবং সংক্ষেপে তালিব ভাই বলে ডাকতে আমাদের ভালো লাগতো, তাঁকে নিয়ে কিছু লিখতে বসেই এ কথাগুলো এবং এমনি আরো ঝাঁক ঝাঁক কথা মনের কোণে ভেসে উঠছে।

তালিব ভাইয়ের মতো এতো বড় জ্ঞানী-গুণীজন আমাদের সমাজে আর কয়জন আছেন? অথচ জীবিত থাকতে তাঁকে নিয়ে দু'কথা কেউ না পত্র-পত্রিকায় লিখলেন, না তাঁকে নিয়ে কোনো সভা-সম্মেলন করে দু'কথা বললেন। তিনি সারা জীবন Unhonoured ও unsung থেকে গেলেন। অবশ্য মানুষের কাছে কোনো সম্মান ও প্রশংসার আকাঙ্ক্ষী তিনি ছিলেন না। তিনি সারা জীবন যে মহৎ কর্ম ও সাধনা করেছেন তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছেন। তবে মহৎ কর্মীদের কর্মের স্বীকৃতি ও সম্মান দিলে তারা আরো বেশি উৎসাহিত হন এবং কর্মে আরো প্রেরণা পেয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, উত্তরসূরিরাও এ মর্মে প্রেরণা পেয়ে থাকেন। আবদুল মান্নান তালিব তাঁর কর্মের যথাযথ স্বীকৃতি পাননি, বরং কখনো কখনো কোনো দিক থেকে তিনি কষ্ট পেয়েছেন। তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তিনি নীরবে সে কষ্ট বুকে চেপে গেছেন।

দুই.

স্কুলজীবন থেকে আমার বই পড়ার দারুণ নেশা ছিল। হাতে যখন যেখানে যে বই পেতাম তাই পড়তাম। পত্র-পত্রিকা পড়তাম। ছাপা কাগজের টুকরো পথে-ঘাটে পেলে খুঁটে তুলে পড়তাম। ছাপা কাগজে বা বইয়ে কারো নাম ছাপা দেখলে তাকে আমি বিরাট মানুষ মনে করতাম। সেই সময়ে পথে খুঁটে পাওয়া এক টুকরো কাগজে কি একটা লেখার উপর 'আবদুল মান্নান তালিব' এই নামটি আমি দেখেছিলাম প্রথম। পথে কুড়িয়ে পাওয়া এক টুকরো কাগজে ছাপা সেই নামটি যে আমার এতো প্রিয় হবে, মানুষটি এতো বড় গুণীজন হবেন, হবেন পরম শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার পাত্র 'তালিব ভাই' তা সেই বয়সে সামান্যও ভাবতে পারিনি। তার পরে মানে অনেক পরে তাঁর অনেক লেখা পড়েছি, সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা পড়েছি, বই পড়েছি। এখনো পড়ছি। আমার

www.pathagar.com

সংগ্রহে তাঁর রচিত ও অনূদিত অনেক বই আছে। বইগুলো দেখে দে তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করি।

তিন.

তালিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং আলাপ হয় প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে। সন-তারিখ মনে নেই। তখন বায়তুল মুকাররমে ছিল অফিস। কবি মুকুল চৌধুরীর কক্ষে আলাপ করছিলাম। মুকুল চৌধুরী বললেন, তালিব ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে? আমি 'না' বললে উনি বললেন, চলুন, তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। বলেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের এক কক্ষে ঢুকে বললেন, ইনি আমাদের আবদুল মান্নান তালিব ভাই। আর এ হলেন কবি আবদুল হালীম খাঁ। মুখ ভর্তি কালো মিচমিচে চাপদাড়ি। পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবী। মাথায় সুন্দর কালো চুলের উপর সাদা টুপি। আমি সালাম দিলাম। উনি হেসে বললেন, বসুন। কেমন আছেন? আপনার কবিতা নিয়মিতই পত্রিকায় পড়ি। আর কি লিখছেন, প্রবন্ধ, গল্প লেখেন না? আপনার একটা কবিতার বই প্রকাশের ইচ্ছে আছে আমাদের...

তারপর তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' ও 'মাসিক কলমে' অনেক লিখেছি। বাংলা সাহিত্য পরিষদে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছি। দেখা হলেই হাতের কাজ ফেলে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। তিনি আমার সঙ্গে সাধারণত আলাপ করতেন মুসলিম জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে। মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতনের কারণ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে কিভাবে মুসলমানদের আবার জাগিয়ে তোলা যায়। মাঝে মাঝে আল্লামা ইকবালের উর্দু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। তিনি আমাকে এ দেশের পীর আউলিয়াদের ইসলাম প্রচারের উপর লিখতে বলতেন। তাঁর উৎসাহে আমি লিখেছি 'শাহজালালের জায়নামাজ' উপন্যাস। তাঁর কাছে পাণ্ডুলিপি জমা দিলে তিনি খুব খুশী হন এবং পাণ্ডুলিপি পড়ে মন্তব্য করেন, আপনার উপন্যাসে শাহজালালের অলৌকিক কাহিনী বেশি প্রকাশ পেয়েছে ইতিহাসের চেয়ে। এখন বিজ্ঞান ও বাস্তবতায় বিশ্বাসী মানুষ... । আমি বলেছিলাম, আজো মানুষ অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনী শুনে আনন্দ পায়। আর এ বিজ্ঞানের যুগে হাওয়াই জাহাজ জেটবিমান যেমন চলছে তেমনি এ সময়ে গরু-মহিষের গাড়ি ও ঠেলাগাড়ি শুধু গ্রামে নয়, শহরেও চলছে। আমার কথা শুনে হাসলেন তালিব ভাই। তিনি উপন্যাসটি ইসলাম প্রচার সিরিজ হিসাবে জুলাই ২০০৫ সালে প্রকাশ করেছিলেন।

তালিব ভাইর সুলিখিত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' ১৯৮৪ সালে বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হলে পত্রিকায় আলোচনার জন্য আমাকে এক কপি দিয়েছিলেন। আমি দৈনিক সংগ্রামে বইটির আলোচনা লিখেছিলাম। এরপর তালিব ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বলেছিলাম, আপনার বইটি সকল শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকদের জন্য খুবই উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের জন্য এক আলোকবর্তিকা। কিন্তু কোনো

www.pathagar.com

লাচনা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়েছে। যদি আলোচনাগুলোতে াহিত্যের কিছু কিছু উদাহরণ দিতেন তবে সাধারণ ুবই সহজ হতো। তালিব ভাই বলেছিলেন, ঠিকই সংস্করণ প্রকাশ করার সুযোগ পেলে তা করবো

ালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে একটি কবিতার ংলা সাহিত্য পরিষদে জমা দিয়েছিলাম। তালিব ভাই কবিতাগুলো দেখে ঠিকঠাক করে দিয়েছিলেন এবং প্রকাশ করবেন বলে কথাও দিয়েছিলেন। অসুস্থতার কারণে তিনি প্রকাশ করতে পারেননি। কম্পোজ করা পাণ্ডুলিপিটি তৌহিদ ভাইয়ের কাছে রয়েছে। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কয়েকদিন কথাও বলেছি, তখন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। তবে ইতিমধ্যে তালিব ভাইয়ের দিকনির্দেশিত কবিতাগুলো নিয়ে বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে 'প্রতিদিন আমার পৃথিবী' নামে কবিতার বইটি অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

চার.

সব মানুষই ব্যক্তি নন। একজন মানুষ যখন তার মাধ্যমে বিশেষ কিছু ব্যক্ত হয়, সমাজ মানুষের কাছে তার বিশেষ কিছু বলার মতো বিষয় থাকে এবং তা বলেন কাব্য-সাহিত্য-ভাষণে, নীতি-আদর্শ ও কর্মে তখনই তিনি ব্যক্তি হন। মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন এমনি এক ব্যক্তি যাঁর সমাজ, দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু বলার ছিল। তিনি সারা জীবন তাঁর কাব্য সাহিত্যে ধ্যানে, কর্মে ও সাধনায় সেই বক্তব্যই বলে গেছেন তাঁর নিজস্ব ভাব, ভাষা ও স্টাইলে। সেই বক্তব্যের ভেতরই রয়েছে তাঁর আসল পরিচয়। আবদুল মান্নান তালিবের রয়েছে বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার। জীবনের শুরু থেকে আমৃত্যু তিনি যে কর্ম করেছেন সেই কর্মেই খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁকে।

প্রত্যেক মানুষের পিতা-মাতা থাকে, জন্মস্থান থাকে, কিছু শিক্ষা-দীক্ষা অভিজ্ঞতা থাকে। এ দিক দিয়ে সব মানুষ সমান। তাতে কারো কম-বেশি কোনো পার্থক্য নেই এবং এই পরিচয়ই আসল পরিচয় নয়। আসল পরিচয় তার কথা, কাজ ও চরিত্রে। একজন সাহিত্যিকের পরিচয় ও কৃতিত্ব তার সাহিত্যে, কর্মীর কৃতিত্ব ও পরিচয় তার কর্মে এবং নেতার পরিচয় তার নেতৃত্বে। তালিব ভাইয়ের এ রকম অনেক দিকের অনেক পরিচয় রয়েছে। সে পরিচয় অবশ্য একেকজনের কাছে একেক রকম। তাঁর পরিবার-পরিজনের কাছে তিনি একরূপ, আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে অন্য রূপ, তাঁর শিক্ষকের কাছে তিনি ছিলেন এক রূপ, তাঁর সহকর্মীদের কাছে ছিলেন অন্য রূপে। তাঁর সাহিত্যের পাঠকদের কাছে তাঁর হয়তো আরেক রূপ ছিল। তাঁর মতাদর্শের সঙ্গে যাদের মিল ছিল না তাদের কাছে তিনি অন্য আরেক রূপে ছিলেন। একজন মানুষের পরিপূর্ণ চরিত্র ও পরিচয় জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দেখা যায় একই ব্যক্তি সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কোনো মানুষই আয়নার মতো নিরপেক্ষ নয় বলে এ রকমটি হয়ে থাকে। আবদুল মান্নান তালিবের

www.pathagar.com

জন্মস্থান ও শিক্ষা পশ্চিম বঙ্গে এবং পাকিস্তানে। তাঁর ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন এখনো রয়েছেন অধিকাংশ পশ্চিম বঙ্গেই। পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে প্রকাশিত আজিজুল হক সম্পাদিত পাক্ষিক 'বাংলার রেনেসাঁ' পত্রিকায় তালিব ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর সহোদর ছোট ভাই আবদুল হামীদ কাশেমী একটি আর্টিকেল লিখেছিলেন। তাঁর লেখাটিতে তালিব ভাইয়ের পরিবার ভাইবোন সংখ্যাসহ শিক্ষা ও কর্মজীবন সম্পর্কে জানা যায়। আবদুল হামীদ কাশেমী সাহেবের লেখাটি তথ্যপূর্ণ বিবেচনা করে এখানে অংশ বিশেষ তুলে দেয়া হলো। 'চলে গেলেন উপমহাদেরমের বিদগ্ধ আলেম ও সুলেখক আবদুল মান্নান তালিব' হেডিং দিয়ে কাশেমী সাহেব লিখেছেন :

'আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, গবেষক, মশহুর আলেমে দ্বীন— আমার অগ্রজ সহোদর। আমার চার বছরের বড় মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব সাত ভাইয়ের মধ্যে পঞ্চম এবং ১২ ভাইবোনের মধ্যে নবম স্থানে অবস্থান করতেন। ১৯৩৪ সালে পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম হাজী তালিব আলী ও মরহুমা মেহরুন্নেসার ঘরে আজ থেকে ৭৭ বছর পূর্বে চোখ মেলে চান আবদুল মান্নান তালিব। আব্বার সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও বিশাল পরিবারে আলালের ঘরের দুলালের মতো প্রতিপালিত হননি। আব্বা ছিলেন খুব কড়া মেজাজের লোক। পরিবারের কেউ সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ভরসা রাখতো না, এমনকি আম্মাজানও! সর্বদা দহলিজে একজন গৃহশিক্ষক বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশের নোয়াখালি এলাকার অধিবাসী মরহুম মাস্টার হাবিবুল্লাহ ভুঁইয়া ছিলেন প্রথম শিক্ষাগুরু। বাংলা, ইংরেজি এমনকি বিশুদ্ধ কুরআন শরীফও তাঁর কাছেই শিক্ষা লাভ করেন। ইনি দেশ বিভাগের পূর্বে মগরাহাট জুনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৯ সালে পাসপোর্ট আইন চালু হওয়ায় ইনি দেশে ফিরে যান। মাওলানা ১৯৫০ সালে মগরাহাট মুসলিম হাই স্কুল থেকে সুনামের সঙ্গে ১ম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রতিটি ক্লাসে ১ম স্থান তাঁর রিজার্ভড ছিল। এর এক বছরের বড় সহোদর ভাই মাওলানা ডাক্তার আবদুল হান্নান (রহ) তবলীগ জামাতের বিখ্যাত মুবাল্লিগ একই সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পড়াশুনায় আবদুল মান্নান তালিব বড় ভাইকে সর্বদা পেছনে রাখতেন। এর চেয়ে ২ বছরের বড় সহোদর ভাই তবলীগ জামাতের বিখ্যাত মুবাল্লিগ মাওলানা আবদুল হাকিম কাশেমী ১৯৫০ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ– বর্তমানে আজাদ কলেজ থেকে আইএসসি পাস করে ঢাকায় এমবিবিএস পড়তে চলে যান। একই বছরে এঁরা দুই ভাই পালা করে ১ চিল্লার নিয়তে নিজামুদ্দীন মারকাজে চলে যান। ওখান থেকে জামাতে পুনায় যান। নিজামুদ্দীনে ফিরে জানতে পারেন বড় ভাই আবদুল হান্নান জামাতে মুরাদাবাদ গেছেন এবং সেখানে মাদ্রাসায় হালাহে দারাইনে হিফজে কুরআন বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। জানতে পেরে এরও ইচ্ছে হলো আমি বাড়ি না ফিরে মাদ্রাসায় পড়বো।

www.pathagar.com

এই নিয়তে ইনিও (আবদুল মান্নান তালিব) মুরাদাবাদে গমন করে মাদ্রাসা এমদাদিয়াতে ভর্তি হয়ে যান। আব্বাজানের ইচ্ছে ছিল সেজ ছেলে আবদুল হাকিমকে ডাক্তার তৈরি করাবেন। এই জন্য ঢাকা মেডিকেলে পড়তে পাঠান। আর এঁদের দু'জনের একজনকে ওকালতি পড়াবেন কিন্তু দু'জনেই আব্বার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দুনিয়ার লাইন ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জিন্দেগী পরকালের লাইন গ্রহণ করে ধন্য হন। এক ভাই হয়ে গেলেন মুহাদ্দিস, মুবাল্লিগ। আর এক ভাই হলেন দুই শতাধিক গ্রন্থের অমর লেখক ও গবেষক মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব (রহ)। মুরাদাবাদে ২ বছর পড়ার পর বাড়ি ফিরে পরবর্তী শিক্ষা জীবন শুরু করেন বীরভূমের সিউড়ীর মাদ্রাসা জিয়াউল ইসলামে ভর্তি হয়ে। এখানেই মাদ্রাসার বার্ষিক মুখপত্র জিয়াউল ইসলামে প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ লেখায় তাতেই হাতেখড়ি। এখান থেকেই পরবর্তী কালে দৈনিক ১০০ পৃষ্ঠা লেখার ইরাদা করেছিলেন। বড় ভাই হাফেজ আবদুল হান্নান মুরাদাবাদ থেকে হেফজ শেষ করে জালালাবাদে মাওলানা লাইনে ভর্তি হন। ঐ সময় জালালাবাদ মাদ্রাসার একজন উস্তাদ কিছু ছাত্রসহ করাচির সিন্ধু প্রদেশে টুন্ত অলাইয়ার শহরে দারুল উলুম মাদ্রাসায় গমন করেন। এরা দুই ভাই তাঁর সহগামী হয়ে করাচি গমন করেন ১৯৫৩ সালে। এখানকার শায়খুল হাদীস, এশিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিস, বুখারী শরীফের ২০ খণ্ডের ভাষ্যকার হযরত থানবী রহ.-এর কাছে ভাইজান (আবদুল মান্নান তালিব) বুখারী পাঠ করে ১ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর লাহোরে চলে এসে সীরাতে মুস্তফা ও মা আরিফুল কুরআনের লেখক এবং মিশকাত শরীফের আরবী ভাষ্যকার আততালীকুস সবীর গ্রন্থকার মাওলানা ইদরিস কান্ধলবীর সাহচর্যে পড়াশোনা করেন। এই সময় উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক এশিয়া'য় ধারাবাহিক বিশেষ আর্টিকেল লেখায় ব্রতী হন। ১৯৫৩-৬০ সাল অবধি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ও গ্রন্থকার মাওলানা আবদুর রহীমের সান্নিধ্যে আসার ফলে বাংলা ভাষার জগতে অবাধ বিচরণের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন।

অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানে তথা পূর্ব বাংলার ঢাকায় গমন করে 'সাপ্তাহিক জাহানে নও' পত্রিকায় প্রথমে সাংবাদিক, পরে সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে 'মাসিক পৃথিবী' ও 'মাসিক কলম' একযোগে পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। পশ্চিম পাকিস্তানে থাকাকালীন তিনি উর্দুতে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংলা ও উর্দু ভাষায় তিনি এমন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, ভাষান্তরে তাঁর সমকক্ষ মানুষ খুব কমই নজরে পড়ে। শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া সাহারানপুরী (রহ) রচিত তবলীগ জামাতের সর্বশ্রেষ্ঠ তালিমের গ্রন্থ ফাজায়েলে আমাল বা তবলীগী নেসাব মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে এই জামাতের প্রধান হাতিয়ার ছিল আল্লামা হাফেজ মহিউদ্দিন রচিত আরবি গ্রন্থ রিয়াদুস সালেহীন ও তার উর্দু তর্জমা। তবলীগে নেসাব মুদ্রিত হওয়ার পর এই কিতাব কেবল আরবি মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় স্থান পায়। কিন্তু এর ভাবাদর্শ এতই মনোমুগ্ধকর ও লোভনীয় ছিল যে, মাওলানা মরহুম আবদুল মান্নান

www.pathagar.com

তালিব এর বঙ্গানুবাদ এমন আকর্ষণীয় ভাষায় রূপান্তরিত করেন, যার ফলে দু'খণ্ড কিতাবকে চারখণ্ডে (ব্যাখ্যাসহ) মুদ্রিত করতে হয়। মাওলানার ভাষার ঔজ্জ্বল্যে কেবল আমেরিকায় বাঙালি অধিবাসীদের মধ্যে তখন পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হয়। এমনিভাবে লক্ষ্ণৌ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মাওলানা সুলায়মান নদভীর কালজয়ী বক্তব্যের সংকলন খুদবাতে মাদ্রাজের বঙ্গানুবাদ 'পয়গামে মুহাম্মদী' বাংলা সাহিত্য জগতে অমর সৃষ্টি। 'বাংলাদেশে ইসলাম' বঙ্গে ইসলাম আগমনের প্রামাণ্য গবেষণামূলক সুবিশাল গ্রন্থ। সুবিখ্যাত বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ, সুলায়মান নদভীর বিশাল গ্রন্থ 'সিরাতুন নবী'র কয়েক খণ্ডের অনুবাদ, কবি ইকবালের রুমুজে বেখুদী, বালে জিবরীল, বাঙ্গে দারা প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থের বাংলা কাব্যে অনুবাদ তাঁর যোগ্যতার বিরাট দলিল।'

পাঁচ.

আবদুল মান্নান তালিবের জীবন ছিল মিশনারী জীবন। তিনি গোটা জীবন মুসলমানদের কল্যাণ ও ইসলামী জীবনাদর্শের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেছেন। তাঁর গভীর অনুসন্ধানে আত্মবিস্মৃত বাংলার মুসলমানরা পেয়েছে আত্মার পরিচয়। তাঁর চিন্তা ও লেখনী দ্বারা ইসলাম উপস্থাপিত হয়েছে সামগ্রিক জীবনাদর্শরূপে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। নানাবিধ ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ছিল খুব বেশি। ফলে তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, উর্দু ও হিন্দি— এই ছয়টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। ১৯৫৭ সালে লাহোরের বিখ্যাত মাদ্রাসা জামেয়া আশরাফিয়ায় দাওরা-ই-হাদীস পড়াকালীন তিনি মশহুর আলেমে দ্বীন মাওলানা ইদরিস কান্ধলভীর একান্ত সান্নিধ্য লাভ করেন। সেই বছরই লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু 'দৈনিক তাসনীম'-এর সহ-সম্পাদক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি লাহোর ত্যাগ করে ঢাকা এসে দৈনিক ইত্তেহাদ-এর সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ শুরু করেন। তারপর তিনি সাপ্তাহিক জাহানে নও (১৯৬২-১৯৬৬), কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মিযান (১৯৭৩-১৯৭৫), মাসিক কলম (১৯৭৭-১৯৯৪), মাসিক পৃথিবী (১৯৮১-১৯৯৯), দৈনিক সংগ্রামের ছোটদের পাতা শাহিন শিবির (১৯৭০-১৯৭১) ও (১৯৭৭-১৯৮২), দৈনিক সংগ্রামের ফিচার বিভাগ (১৯৮৩-১৯৮৭), বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৯৭৮-২০১১) ও ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (১৯৯৯-২০১১) সম্পাদনা করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদ-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনের পাশাপশি ১৯৯৯ থেকে ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর ভাইস-চেয়াম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদক হিসাবে ছিলেন অনন্য। তিনি বিভিন্ন সময় যেমন বিভিন্ন রকম পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, তেমনি তৈরি করেছেন লেখক, গবেষক, অনুবাদক ও সম্পাদক।

www.pathagar.com

তিনি বলতেন, ইসলাম যেমন একটি বিশ্বজনীন মতবাদ ও আদর্শ তেমনি ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশ্বজনীন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'কুরআন ও হাদীস থেকে বিচ্যুত হবার কারণে আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, মূল্যবোধহীনতা, ধর্মহীনতা আসছে। আমাদের এই শক্তির দিকেই ফিরে যেতে হবে অর্থাৎ মূল ধারার দিকেই ফিরে যেতে হবে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমাদের সাহিত্যিক মূল্যবোধ আহরণ করতে হবে। বর্তমান এর উপর কিছু কাজ শুরু করে দিয়েছি।'...আমি এই ধারাকে উজ্জীবিত ও পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছি। গোড়াতেই ১৯৬১ সালে আমরা করেছিলাম পাক সাহিত্য সংঘ, ইসলামী ভাবধারাভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। তারপর আমাদের যে বাংলা সাহিত্য পরিষদ আসছে সেই একই ধারাভিত্তিক। আমরা চেষ্টা করে আসছি, সারা দেশে এখন আমাদের সমমনা অসংখ্য সাহিত্য সংগঠন গড়ে উঠেছে। আমাদের সাথে এখন শত শত লেখক জমায়েত হয়ে গেছেন। আল্লাহর রহমতে আমাদের এখন হতাশার কোনো কারণ নেই। কারণ আমরা লেখকের সংখ্যা বাড়াতে পারছি এবং অসংখ্য আগ্রহী লেখক এখন চলে আসছেন। মানে এতে আশার সঞ্চার হচ্ছে, আমরা কিছু করতে পারবো। আমরা বাংলা সাহিত্যে একটা শক্তিশালী ইসলামী ধারা সৃষ্টি করতে পারবো। আবদুল মান্নান তালিব আশাবাদ ব্যক্ত করে আরো বলেন, আসলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ধারাটি উজ্জীবিত করার জন্য আমরা এই ইসলামী ধারার আবির্ভাব ঘটাই। এটাই আমাদের আসল কাজ। ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে আমরা সঠিক ধারণা সৃষ্টি করেছি। ইসলাম যে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, জীবন থেকে আলাদা কোনো বিষয় নয়, বরং জীবনের সমস্ত বিষয়ই ইসলামী সাহিত্যের অঙ্গ। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম সব একই সাহিত্যের অঙ্গ। এই যে প্রযুক্তি এটাও সাহিত্যের অঙ্গ। আমরা এই বিষয়টিকে প্রবল ও মুখ্য করার কারণে এতে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়েছে।...সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা একটা গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি করতে পেরেছি।'

মান্নান তালিবের সাহিত্যের সকল শাখায়ই পারদর্শিতা ছিল ঈর্ষান্বিত হওয়ার মতো। তিনি যেমন মৌলিক গবেষণা করেছেন তদ্রূপ কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কলাম, শিশুতোষ রচনায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাফসীর, হাদীস, ইসলামী আকীদা, ফিকহ্, উসূলে ফিকহ, উপন্যাস, চিন্তামূলক প্রবন্ধ, ইকবালের কবিতা, অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক তিনি অনুবাদ করেছেন।

তিনি কবি নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের কবিতা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে উর্দু ভাষীদের কাছে নজরুল ও ফররুখকে পরিচিত করেছেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী দিকনির্দেশনা দিতে বহু নতুন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা তিনশ'-এর বেশি। মৌলিক রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭৬টি। অপ্রকাশিতও রয়েছে অনেক গ্রন্থ।

আবদুল মান্নান তালিবের প্রথম প্রকাশিত বই, 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' (১৯৬২), ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে

www.pathagar.com

ইসলাম' (১৯৭৯) তাঁর অসাধারণ গবেষণা গ্রন্থ। এ পুস্তকে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছেন বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয়। কবি-সাহিত্যিকদের পরমুখাপেক্ষিতা মুক্ত করতে তিনি রচনা করেছেন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান', 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট', 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন', 'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম' তাঁর মৌলিক গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি। তাঁর এই গ্রন্থগুলো কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতসেবীদের আদর্শাশ্রয়ী হতে উৎসাহিত করে। তাঁর অনূদিত নসীম হিজাজীর উপন্যাস এদেশের শিশু-কিশোরসহ সকল শ্রেণীর পাঠকদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

শিশুদের জন্য রচিত এসো জীবন গড়ি, পড়তে পড়তে অনেক জানা, মা আমার মা, আমাদের প্রিয় নবী, মজার গল্প, কে রাজা, হাতিসেনা কুপোকাত প্রভৃতি গ্রন্থ শিশু-কিশোরদের মানস গঠনে খুব উপযোগী। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সাংগঠনিক তৎপরতার ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিব দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল নিরলসভাবে কাজ করেছেন। জীবন কালে তিনি তাঁর কাজের যথার্থ সম্মান ও স্বীকৃতি পাননি। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ২০০০ সালে কিশোর কণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার এবং ২০১০ সালে বাংলা সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর নিরলস নিবেদিতপ্রাণ সাহিত্যসেবী এ যাবত যেসব পুরস্কার ও স্বীকৃতি পেয়েছেন তার চেয়ে আরো বড় পুরস্কার ও স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল। তবে পুরস্কার ও স্বীকৃতি দ্বারা সব সময় সবার মূল্যায়ন হয় না। যথার্থ প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ কখনো পুরস্কারের উদ্দেশ্যে কাজ করেন না। আবদুল মান্নান তালিব জীবনকালে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন না হলেও আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এখন তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণের অনন্য সিপাহসালার।

তাঁর কর্ম, ত্যাগ, সাধনা ও মূল্যবান সাহিত্য-সম্ভার আমাদের প্রেরণা দেবে এবং তিনি আমাদের চেতনায় অমর হয়ে থাকবেন চিরকাল।

www.pathagar.com

তাঁর তুলনা কেবল তিনি

হাফিজা বেগম

পঁচাত্তর ঊর্ধ্ব বর্ধিত পাঁচ মাস বয়সে তাঁর মৃত্যু হলো। কিন্তু আমার মনে হলো– আকাশে রোদের প্রখরতা কমার আগেই যেন নিভে গেল আলোর রশ্মি। এমনি তারুণ্যময় কর্মদীপ্ত মানুষ ছিলেন তিনি। এই আলোকিত মনীষীকে আমি পেয়েছিলাম সৌভাগ্যের সোপান হিসাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যে আমি অতি অল্প দিন তাঁর নৈকট্য পেয়েছিলাম। এই স্বল্পকালীন ব্যবধানে তাঁকে মনে হয়েছে জ্ঞানালোকের অথৈ অর্ণব। সাহসী ডুবুরীই কেবল পেতে পারে মুক্তা। এছাড়া তার কর্মমূল্য বিচার করা কঠিন। কেবল বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতায় নয়, পৃথিবীর নানা সাহিত্য, ভাষা বিজ্ঞান, তাওহিদী চিন্তা ও গবেষণায় তিনি ছিলেন বিরল এক ঋদ্ধ পুরুষ।

উক্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে নিজের মূঢ়তা ও ক্ষুদ্রতার জন্য লজ্জা হতো আমার। তবে তিনি সর্বদা আমার মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। দূরে সরিয়ে রাখলে সুন্দর কাজটি অসমাপ্ত থেকে যেতে পারে মনে করে নিজের বিচরণ ভূমিতে টেনে নিয়ে তা আদায় করে নিতেন– এমনি ছিল তাঁর কর্মকৌশল।

প্রথম যখন তাঁর সাথে আমার দেখা হয় তখন তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালকের চেয়ারে বসা। কিন্তু তাঁর চেয়ার পর্যন্ত পৌঁছার আগে প্রথম দেখা করতে হলো তাঁর এ্যাসিসট্যান্ট তৌহিদুর রহমান সাহেবের সাথে। তিনি আমার উদ্দেশ্য শুনে প্রথমেই বাধা দিলেন।

www.pathagar.com

বললেন, আমপারার কাব্য অনুবাদ! সর্বনাশ! এ ধরনের কাজে হাত দিয়েছেন? এতে সামান্য অজ্ঞতার জন্য পরজিন্দিগীতে অভিশাপ টেনে আনবেন? আমি সাশ্রু নয়নে তৌহিদুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে উঠে পড়লাম। দু'পা ফেলতেই তৌহিদ সাহেব আবার কি মনে করে ডাকলেন– নিয়ে গেলেন বড় স্যারের কাছে। আড়ষ্ট চিত্তে বসলাম সামনাসামনি! কিন্তু একি? প্রথম দৃষ্টিতেই মধুর হাসি! নিমিষেই খাতাখানা দেখে বললেন, আমিও আপনার এলাকায় থাকি শান্তিবাগে। আগামী শুক্রবার সকাল দশটায় খাতা নিয়ে বাসায় আসেন। বাসায় গেলাম। সেই যে গেলাম তিন বছর প্রায় প্রতি শুক্রবার এই শিক্ষাগুরুর কাছে আমি যাতায়াত করলাম। আর এটা ছিল আমার জীবনের সবচে সুন্দর সময়। এক মহামানবের মুখোমুখি বসে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কাজ করছিলাম মুগ্ধ চিত্তে। কি কর্মময় নিরলস জীবন তাঁর! বই টানছেন, আনছেন, তাৎপর্য বলে দিচ্ছেন, পুঁথি-পুস্তক ছাড়াই প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন, অর্থসহ কুরআনের আয়াত মুখস্থ বলে যাচ্ছেন। একটি অর্থের জন্য কুরআন শরীফের উর্দু, আরবি, ফারসি, ইংরেজি ব্যাখ্যা মুখে মুখে বলে দিতেন, সে কি আমার পরম সৌভাগ্য নয়!

আমাকে বলেছিলেন, কাজটি নির্ভুল করতে সচেষ্ট থাকবেন। আরবির অর্থ সবাই জানে না। আপনি বাংলা টীকা ও ব্যাখ্যাগুলো পড়ে নেবেন, তাতে গূঢ় অর্থগুলো পরিষ্কার হয়ে আসবে। আমপারার কাব্যে প্রায়ই আরবির শিল্পিত শব্দ ব্যবহার করবেন। যেমন শারাবান তহুরা, মুত্তাকী, সহিফা, তাগদির, ইল্লিয়্যীন, তাসনিম ইত্যাদি। তাঁর কথাগুলো শিরোধার্য করেছি। তিনি খুবই আস্তে কথা বলতেন, তবে দ্রুত লয়ে। ফলে অনেক সময়ই তাঁর অর্থবহ অনেক বাক্য আমার কর্ণগোচর হতো না। দ্বিতীয়বার জানতে চাইলে আবার বলতেন এবং আবারও। কিছুতেই বিরক্তি নেই। অল্প পরিসরে বাস, কিন্তু সহজ সরল ব্যবহার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর-বাড়ি ও মানুষগুলো।

বাসাখানা চার কক্ষবিশিষ্ট ফ্লাট, কক্ষগুলো ছোট ছোট। বাড়িটি তাঁর নিজেরই। ঘরে পুঁথি-পুস্তকের অভাব নেই। মেঝের কিছু উপর থেকে বিশেষ কায়দায় ছাদ পর্যন্ত চারদিকে কাচের ক্যাবিনেট করে বই-পুস্তক রক্ষিত আছে। শেলফে ধূলাবালির চিহ্ন নেই। ঝক ঝক করছে বইয়ের নাম। শ্রেণীবদ্ধভাবে অতি যত্নে সাজানো বই-পত্র– যেন এখনই রাখা হয়েছে ওগুলোকে ওখানে, তবে ইদানিং বইয়ের সংখ্যা বেড়ে সংসারে ব্যবহৃত আলমারীর উপর পর্যন্ত চলে এসেছিল। বইঘরের মাঝখানে খাট পাতা সেখানে শুয়ে-বসে তিনি পড়াশুনা করতেন, লিখতেন ও পাহারা দিতেন এই কক্ষের ধন। বই-পত্র তিনি কাউকে দিতেন না। তাঁর উক্তি জ্ঞানই দুনিয়ার আসল সম্পদ। জ্ঞানের জন্য বই-পুস্তক হাতছাড়া করবেন না। বই হলো ওহি। ওহি থেকে বই শব্দ এসেছে-ওহি/বহি/বই। প্রকৃতির সাথে বই–এই দুই উপকরণে তিনি জ্ঞানরাজ্যে সোনায় সোহাগা হয়েছেন। বইয়ের পৃষ্ঠাসহ প্রয়োজনীয় উক্তি মুখস্থ বলতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু সে সোনামুখ যেদিন বিবর্ণ হয়ে গেল সেদিন আমার বইয়ের প্রকাশিত শেষ কিস্তি ঘরে এলো। তবে প্রথম কিস্তির একটি বই তিনি হাতে তুলে নিতে পেরেছিলেন এবং বন্ধুর মতো বলেছিলেন, আপনার সংগে দেখা হলো জীবন সায়াহ্নে। বইটি ভালো হয়েছে। পাতা উল্টালেন এবং হাসলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বইটি শিয়রের ডানদিকে রাখলেন। চোখের পানি ছেড়ে বললেন, আমার আরো অনেক কিছু করার ছিল। আর আমার ভেতরটা খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। মনে হলো জীবনে আর কলম ধরতে পারবো না। তারপর ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তিনি ইন্তেকাল করলেন। ক্যানসারের কঠিন কষ্ট নিয়ে চার মাস তিনি মৃত্যুর সংগে যুদ্ধ করেছেন। এ চার মাস তিনি প্রায় নিরন্ন ছিলেন। ফলের সামান্য রস খেয়ে বেঁচে ছিলেন এবং দিনে একাধিকবার গোসল করতেন। এত কষ্টের মাঝেও ওয়াক্তের নামাজে কামাই ছিল না, কাজাও হয়নি কখনো। মৃত্যুর আগখানিতেও তিনি যোহরের নামাজ শেষ করেছিলেন। ঈমানের প্রদীপ্ত প্রজ্ঞায় তিনি ছিলেন আশৈশব উজ্জ্বল।

প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত উপযুক্ত মানুষটির নাম আবদুল মান্নান তালিব। জন্ম ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে ভারতের চব্বিশ পরগনার অর্জুনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতার নাম ছিল তালিব আলী মোল্লা আর মাতার নাম মেহেরুন্নেসা। আমি তাঁকে স্যার বলে ডাকতাম। তাঁর কাছে যাতায়াত কালে আমি প্রায় রোজই একটি কথা মনে করতাম। একদিন বলেই বসলাম, স্যার, আমার হাতের কাজটা শেষ হয়ে গেলেও আমি আপনার পিছু ছাড়বো না। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আবার বললাম, আপনার জীবন কথা শুনবো এবং লিখবো। স্বভাবসিদ্ধ শান্ত মেজাজে ও দ্রুত লয়ে ঠিক এই ভাষায় বললেন, আপনি যা করতে এসেছেন তা সঠিকভাবে করেন, আমার জীবনী লেখার প্রয়োজন নেই।

আমি সাহস করে বললাম, আছে স্যার, আছে। পরবর্তী জেনারেশনের অনুপ্রেরণার জন্য আপনি অনুকরণীয়। তিনি আরো শক্ত ভাষায় বললেন, মানব সৃষ্টির প্রথম দিনে আল্লাহ সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিলেন তা হলো ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলীফাহ। মানুষকে আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতিনিধি হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখা মানুষের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটাই শেষ নয়। এ জীবনের পরে পরজীবন শুরু। সেখানে মানুষ তার স্রষ্টাকে কতটা সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তার হিসাব শুরু হবে। দুনিয়ার কর্তৃত্ব কতদিনের? আল্লাহর হক কে কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে তার চুলচেরা হিসাব হবে। নিজের গৌরব জাহির করতে কেউ পৃথিবীতে আসেনি। আমাদের উচিত কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবেক চলা। আল্লাহর হুকুম পালন করা। জীবনীতে বিচিত্র রং-রস এত দেয়া হয় যে, তা আর জীবনী থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে উপন্যাস হয়ে যায়। সে প্রাচুর্য আমি চাই না।

তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বহুমাত্রিক প্রতিভাধর এ ব্যক্তির মূলত সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মতাদর্শ

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার প্রয়াস রয়েছে। সেজন্য সমাজে প্রথম ইসলামী কালচার প্রয়োজন। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষকে পরিশুদ্ধ করে। সে ভিত্তিতে লেখকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করা। সাহিত্যে মানব কল্যাণ, সামাজিক সাম্য, সুবিচার ও ভ্রাতৃত্ববোধ চায়। ইসলামও তা চায়। তবে ইসলামী সাহিত্যকে নিছক ধর্মীয় সাহিত্য করা যাবে না, তাতে দিতে হবে বিশ্বজনীনতা। তার বিষয়বস্তুতে কুরআন সুন্না ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ হলেও তাঁর ভাষা-অলংকার, শিল্প কৌশলে আনতে হবে আধুনিক গতিময়তা। সেজন্য প্রয়োজনীয় স্লোগান হবে— বিশ্বসাহিত্য পড়বো, ইসলামী সাহিত্য গড়বো।

আগেই বলেছি যে, আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন জ্ঞানরাজ্যের অথৈ সাগর। উপর্যুক্ত খণ্ডিত বাক্যে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা অসম্ভব। একাধারে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, গবেষক, অনুবাদক, সাংবাদিক, সংগঠক, ইসলামী চিন্তাবিদ তথা একজন সাধক। তাঁর সমকক্ষ গুণীজনই পারেন তাঁর কীর্তির মান নির্ণয় করতে। তা না হলে একবাক্যে বলতে হয় যে, তাঁর তুলনা কেবল তিনিই।

www.pathagar.com

আমার শিক্ষক,
আমাদের শিক্ষক
হামিদুল ইসলাম

একটি অভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা ক'জন গিয়েছিলাম একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে। সাথে ছিলেন দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ এবং বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক জনাব আবদুল মান্নান তালিবের মতো ভারি মাপের মানুষও। ব্যাংকের বড় কর্মকর্তা জনাব নূরুল ইসলাম আমাদের সাথে তার প্রাথমিক আলোচনার শুরুতেই বললেন, উপস্থিত আপনাদের মাঝে বসে আছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, সুতরাং তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রেখেই আমি আমার আলোচনা শুরু করছি। অবাক হয়ে গেলাম। জনাব আবদুল মান্নান তালিব, আমাদের সবার তালিব ভাই কখনো শিক্ষকতা করেছেন বলে তো শুনিনি। সম্পর্ক তো আজকের নয়। কিন্তু নূরুল ইসলাম সাহেবের বক্তৃতার একটু ভেতরে প্রবেশ করতেই বুঝতে অসুবিধা হলো না, কেন আবদুল মান্নান তালিব শিক্ষক, সবার অবিসংবাদিত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। ১৯৬৭ সাল। সবে শেষ হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। তখনও কৈশোরের গণ্ডি পেরোইনি। ঢাকা তখন সবদিক থেকেই আমাদের চোখে স্বপ্নের শহর। স্বপ্ন আর একটা ছিল– অই বয়সেই আমরা লেখালেখির অসম্ভব সুন্দর এক স্বপ্নময় ভুবনে বিচরণ শুরু করছি। জাতীয় দৈনিকগুলোর শিশু-কিশোর পাতায় দু-চারটি পদ্য কিংবা গল্প ছাপা হচ্ছে। যারা এসবের দেখভাল করেন তারা তো আমার চোখে স্বপ্নের রাজপুরুষই। হ্যাঁ, তারা ঢাকা থাকেন। ঠিকানা যা-ই থাকুক, এই সব নায়কদের মূল ঠিকানা তাদের কর্মস্থল পত্রিকা

www.pathagar.com

অফিস। এক চমৎকার সকালে চলে এলাম ঢাকা! সঙ্গী, অই বয়সের তুলনায় ভীষণ পাকা এবং তুখোড় বক্তা মোহাম্মদ আশরাফ হুসেইন। স্কুলের ছাত্র অবস্থায় তার লেখা ছাপা হয় তখনকার বনেদি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান-এ! তাকে গুরু না মেনে কি উপায় আছে! আরো ঈর্ষণীয় ব্যাপার হলো, যার সাথে আমাদের ঘটা করে দেখা হবে তাঁকে আশরাফ চেনে আরো আগে থেকেই। শুধু চেনা নয়, তাঁর সাথে আছে আশরাফের প্রচণ্ড ঘনিষ্ঠতা।

স্টেশনে নেমেই দ্বিধাহীন আশরাফ আমার গাইড-কাম-ফিলোসফার কাম-বন্ধু রিকশায় চেপে বসলো। ঠিকানা ১৩ নাম্বার কারকুন বাড়ি লেন। এখনকার দিনের মতো ঢাকা তখন যানজট আর কংক্রিটের অরণ্যে আবৃত শহর নয়, বরং বলা চলে অসম্ভব মায়াময়, সমস্ত নাগরিক সুবিধামণ্ডিত স্বপ্নের শহর। যা একটু ভিড় তা এই নবাবপুরেই। তার মাঝ দিয়েই যাত্রা। ঘোর কাটতে না কাটতেই ইপ্সিত ঠিকানায়। নব্য লেখিয়েদের মক্কা তখন যে কোনো পত্রিকা অফিস। তেমনি একটি অফিসে এসেছি আমরা। কৈশোরের গন্ধ এবং ছোট্ট মফস্বল শহরের আমেজ লেগে থাকা আমাদের মতো খুদে লেখকদের হার্টবিট তখন দূর থেকেও শোনার কথা। দরজা ঠেলে যেখানে পৌঁছলাম সেখানে সৌম্যদর্শন যিনি বসে আছেন, তিনি সাপ্তাহিক জাহানে নও-এর সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান তালিব। আমাদের স্বপ্নের নায়ক। প্রাথমিক ঘোর কাটতেই দেখি আমার ছোট্ট হাতটি তিনি লুফে নিয়েছেন। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর তালিব ভাই আমার মতো পুঁচকে এক কিশোরের সাথে আপনি আপনি করে গল্প শুরু করায় কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললাম, তালিব ভাই, আমি অনেক ছোট, আমাকে আপনি বলবেন না। উনি বললেন, ঠিক আছে-ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিকই তো আছে। শত অনুরোধের পরও তিনি তুমিতে আর নামেননি। অসম্ভব এই বিনয়ী মানুষটি এখনও আমাদের সাথে আপনি সম্বোধনে কথা বলেন।

জামালপুর শহরে আমাদের একটি সাহিত্য সংগঠন ছিল। লেখার প্রাথমিক প্রসববেদনা আমাদের ওখান থেকেই শুরু। সাহিত্যের মধুর তর্ক, লেখালেখির বর্তমান হাল ও আড্ডা আমাদের বিকেলকে মধুর করে রাখত। অবাক হয়ে দেখলাম, তালিব ভাই তার খবরও রাখেন। আমাদের লেখার মান নিয়ে তিনি কোনো ঋণাত্মক মন্তব্য না করে সমালোচকের চমৎকার কাঁচি দিয়ে কেটে চললেন আমাদের লেখালেখির শরীর। তারপর আলাপ শেষে আমাদের যে ব্যবস্থাপত্র দিলেন তা রীতিমতো অবাক করা। ভালো বাংলা লিখতে বা শিখতে গেলে কি কি বই অবশ্য পাঠ্য এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, ভালো লেখার প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে সমসাময়িক লেখকদের লেখা প্রচুর পড়া। ভালো-মন্দ সবই। আর খুব ভারী কিতাবের দরকার নেই। এখান থেকে বেরুনোর পর সদরঘাটের মোড়ে দেখবেন পুরনো পত্রপত্রিকা আর বইয়ের দোকান। ওদের কাছেই পাবেন দেশ পত্রিকা। কলকাতা থেকে বেরোয়। যেহেতু পুরনো তাই দাম কম। নিয়ে যান একগাদা। অবসরে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ পত্রিকাটাই পড়বেন। মনে হয় বাংলা ভাষাটা নিয়ে আপনি খুব বিপদে পড়বেন না। তার পরামর্শ শিরোধার্য করে ওভাবেই যাত্রা শুরু। ঠকিনি। দেশ-এর আদর্শ নয়– তার ভাষাশৈলী, সাহিত্যের আধুনিক প্যাটার্ন আমাদের সমৃদ্ধ করেছে।

১৯৬৯ সালে এইচএসসির পর পাকাপাকিভাবেই ঢাকায় চলে এলাম। এর মাঝে আমার লেখালেখির সাথে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে আঁকাআঁকি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে অনার্স পড়ব। পাশাপাশি চলবে আঁকাজোঁকা। তালিব ভাই তখন একটি সিরিয়াস গবেষণা পত্রিকা মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক। সুতরাং ওই দিনই বিকেলে তাঁর সাথে মোলাকাত। তিনি তো আগে থেকেই চাইছিলেন যেন ঢাকায় চলে আসি। আর এখন আঁকাআঁকির কথা শুনে মহাখুশি। বললেন, ঠিক আছে, আমার পৃথিবীর প্রচ্ছদ এঁকে দিন। তার প্রস্তাব শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বলেন কি? রীতিমতো প্রচ্ছদ- তাও আবার পৃথিবীর মতো সিরিয়াস একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকার। অসম্ভব ব্যাপার! অসম্ভব কেন? যা-ই করুন আপনাকেই করতে হবে। এভাবেই আমাদের তৈরি হতে হবে। আর প্রস্তুত হোন– আমাদের একটি দৈনিক পত্রিকা বের হচ্ছে, সেটাতেও আপনাকে কাজ করতে হবে। এটা আমার অনুরোধ। তালিব ভাইয়ের অনুরোধ তো আমাদের কাছে আদেশের চাইতেও শক্তিশালী। সেদিন সারা রাত ঘুমুইনি। পৃথিবীর প্রচ্ছদ আমার মস্তিষ্কের কক্ষপথে ঘুরছিল অবিরাম। পত্রিকার কাজ তো শুধু ক্রিয়েটিভ শিল্পকর্ম নয়, এর সাথে আছে গ্রাফিক্সের নিপুণ মাপজোকের ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, এসব প্রতিবন্ধকতা পায়ে ঠেলে তালিব ভাই যদি সব সময় সাহস যুগিয়ে সামনে না টানতেন তাহলে হয়তো আঁকাআঁকির ব্যাপারটি শখের বিষয় হয়েই থাকত।

১৯৭০ সালে দৈনিক সংগ্রামের যাত্রা শুরু। এর শিশুকিশোর পাতা শাহীন শিবির পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন তালিব ভাই। সুতরাং গ্রাফিক্সের মুনশিয়ানা নয়, ছোটদের জন্য আঁকাআঁকির মতো দুরূহ কাজটিও শুরু করতে হলো। এ ব্যাপারেও তার পরামর্শ ও উৎসাহ আমাকে আজ এখানে টেনে এনেছে। এ যে কী মজার জগৎ এটা বোঝাতেই তিনি দিনের পর দিন গল্প করে যেতেন কাজের ফাঁকে।

এরপর পদ্মা-মেঘনা-যমুনায় পানি গড়িয়েছে অনেক। আমরাও আমাদের পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে ফেলেছি। নিজেদের একটু গুছিয়ে নেব ভাবছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। প্রকাশনা ও মিডিয়া জগতে এসেছে বিপ্লব। আমরাও এর সাথে তাল রেখে চলতে চেষ্টা করছি। তালিব ভাই তখন কি করছেন? কি করতে পারেন? হ্যাঁ, কোনো বৈষয়িক আহ্বানে নয়, নেহায়েতই এই জগৎকে ভালোবেসে এক প্রকাশনা সংস্থা নিয়ে আছেন। সেটা দিয়েই আমাদের সাথে ক্ষীণ যোগাযোগ।

এর মাঝেই আবার নতুন করে মাসিক পৃথিবী ও সাহিত্যপত্র কলম বের করার আয়োজন চলছে। উদ্যোক্তা ইসলামিক সেন্টারের নাজির ভাই। আর এসব দেখাশোনা করবেন কে? তালিব ভাইয়ের বিকল্প তো তালিব ভাই নিজেই।

www.pathagar.com

সুতরাং তাঁকে কেন্দ্র করেই কবি-সাহিত্যিক আর শিল্পীদের মেলা বসে গেল। বের হলো নতুন কলেবরে পৃথিবী ও কলম। কিন্তু আজীবন প্রচারবিমুখ এই মানুষটি নানা অভিমান নিয়ে একদিন তারই হাতে গড়া এ কাগজগুলো ফেলে রেখে বাংলা সাহিত্য পরিষদের একদম নিজস্ব গণ্ডিতে শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। আমরা এখনও তাঁকে ঘিরে জ্বলছি টিম টিম করে। এখনও আমাদের নির্বাচন হয়। দেখা যায় আর সবার বেলায় যাই হোক, তালিব ভাই সব সময়ই প্রায় ১০০ ভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, বরং বলে নেয়া ভালো– উনি এই দায়িত্বটা চান না– আমরাই চাপিয়ে দিই। আমরাই তাঁকে আমাদের ঘোষিত শিক্ষক বানিয়ে নিই।

www.pathagar.com

সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের পথিকৃৎ

সোলায়মান আহসান

প্রতিটি স্থাপত্যে দালানের নীচে কিছু অংশ মাটির গভীরে থাকে, যা দেখা যায় না। মাটির উপর দৃশ্যমান দালানের সৌন্দর্যের তারিফ করা হয়— মুগ্ধ দর্শক তা দেখে নানা প্রিয় উচ্চারণ করে থাকে, যদি সে স্থাপত্য সত্যিই দৃষ্টিনন্দন হয়। সৌকর্যমণ্ডিত ও পাশাপাশি অনেক স্থাপত্যের তুলনায় বেশি দামি উচ্চতায় আকাশ ছোঁয়া হয়, তবে তার প্রতি দৃষ্টি আরো ঘনিষ্ঠ হয়— চলে তার সৌন্দর্য বর্ণনা, গুণ-কীর্তন। কিন্তু এসব সৌন্দর্যপিপাসীরা কোন দিন বলে না ঐ সৌন্দর্য বর্ধনে মাটির নীচে যা রয়েছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ইট-পাথর-রডের ধৈর্যশীল মিশ্রণ সিমেন্ট-বালুর কথা। এটাই স্বাভাবিক। যা দৃশ্যমান থাকে তাকেই আমরা সত্য হিসেবে জানি— অদৃশ্যকে জানতে চাইনে। সেই সত্যকে উদ্ঘাটন করার মতো উদার দৃষ্টি কদাচিৎ দেখা যায়।

এ কথাটি মনে পড়ল আবদুল মান্নান তালিব সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে। 'তালিব ভাই' এমন একজন মানুষ ছিলেন, সারা জীবন যিনি স্থাপত্যের মাটির নীচের অংশ হয়ে কাজ করে গেছেন, কোন দিন দৃশ্যমান হতে চাননি। শুধু আদর্শের প্রয়োজনে যেখানে যখন তিনি অনুভব করেছেন কাজ করার, করেছেন নীরবে। অনুচ্চ স্বভাব ছিলো তাঁর। আজ যদি অন্বেষণ করে দেখি 'তালিব ভাই' কোথায় কী করেছেন তাহলে দেখা যাবে আমরা আজ দেশে সাহিত্য-সাংবাদিকতা-শিক্ষা-সংস্কৃতি-গবেষণায় যতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছি বা যা করতে পেরেছি, তার পেছনে এই

www.pathagar.com

নীরব কর্মীর কিছু না কিছু অবদান রয়েছে, যদিও আমরা অনেকেই স্বীকার করতে চাইব না। এ অস্বীকৃতির পীড়ন তাঁকে জীবদ্দশায়ও কম সইতে হয়নি!

তালিব ভাইর গুণপনা কিসে ছিল না? সাহিত্য ও ইসলামী বিষয়ে গবেষণা, সৃজনশীল সাহিত্য, অনুবাদ, শিশু সাহিত্য, কবিতা চর্চা, সংগঠক হিসেবে নেতৃত্ব দান বিবিধ। তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল কুরআন-হাদীসে গভীর জ্ঞান অর্জন। জীবনের জন্য যা কিছু তিনি করেছেন কুরআন-হাদীসের আলোকে শ্রেয় দিকটির উন্মোচন করার জন্যই। আমরা যারা সৃজনশীল সাহিত্য নিয়ে মেতে আছি-আমাদের সামনে ইসলামের আওতায় সাহিত্যের স্বরূপ কী তা ছিল অনেকটাই অন্ধকারে, তালিব ভাই এগিয়ে এলেন। তিনি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করলেন, 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান'। প্রথমে তিনি প্রবন্ধ হিসেবে একটি সেমিনারে (১৯৮৩) এটা পাঠ করেছিলেন। আমাদের সবার অনুরোধে তিনি ওটাকে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাসম্পন্ন করে প্রবন্ধ-গ্রন্থে রূপ দেন।

'মুসলমানরা যা কিছু লেখে তাই ইসলামী সাহিত্য বলে অনেকের ধারণা। আবার ধর্মীয় বিষয়ে যা কিছু লেখা হয় সেগুলোকেও অনেকে ইসলামী সাহিত্য মনে করেন। ইসলামকে একটি মাত্র ধর্ম মনে করার কারণে দ্বিতীয় ধারণাটি এসেছে। আর মুসলমানের লেখা যদি ইসলামের উদ্দেশ্যের বিপরীত ও ইসলামের স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে জানি না কে তাকে ইসলামী সাহিত্য আখ্যা দেবার সাহস করবে?' (ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান, পৃষ্ঠা-...)

গ্রন্থের সূচনায় তিনি যে অবতারণা করেছেন এটি ছিল আমাদের সবার কাছে একটি অমীমাংসিত সমস্যা।

ত্রয়োদশ শতকে আমাদের এদেশে মুসলমানরা যখন প্রথম ইসলামী সমাজের গোড়া পত্তন করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের আদর্শকেই তারা গ্রহণ করেছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। এর প্রথম প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের মানবতাবাদকে তারা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ফলে দেবদেবীর পরিবর্তে মানুষ হয়ে উঠেছিল সে সাহিত্যের বিষয়বস্তু। (ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান পৃষ্ঠা-...)

'তালিব ভাই' গোটা গ্রন্থে তিনি মানব জাতির পৃথিবীতে আগমন, আগমনের উদ্দেশ্য, মানুষের জন্য সাহিত্যের উপযোগিতা, সাহিত্য কি, সাহিত্যের মৌল উদ্দেশ্য, ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, ইসলামী সাহিত্য কি, ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব, ইসলামী সাহিত্যে প্রেম প্রসঙ্গ, ইসলামী সাহিত্য ও অশ্লীলতা, ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা, ইসলামী সাহিত্যের নিদর্শন ইত্যাকার শিরোনামে আলোকপাত করেছেন। তাঁর আলোচনা দীর্ঘ নয় তবে বক্তব্য চৌম্বকধর্মী। অল্প কথায় ব্যাপক বিষয় বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন 'সাহিত্য কি?' শিরোনামে তিনি প্রথম বাক্যটি দিয়েই ব্যাপক বিষয়কে ধারণ করেছেন এভাবে— 'হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্য।' আবার 'জীবনের উদ্দেশ্য কি' শিরোনামে তিনি বলেছেন— 'লক্ষ লক্ষ

www.pathagar.com

কোটি কোটি বছর ধরে এই উপকরণগুলোকে কেবল আমাদের উপযোগী করেছেন। এত কিছু সাজ-সরঞ্জাম যোগাড়যন্ত্র করে তিনি আমাদের সৃষ্টি করলেন। আর এ সৃষ্টির পেছনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটা কেমন করে বলা যায়? ' (ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান পৃষ্ঠা-...) এভাবে তিনি মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অথবা আভাস ইঙ্গিতে সত্যটি ব্যক্ত করেছেন। আবদুল আন্নান তালিব ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য যে এক নয় তা ইতিহাসের নিরিখে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

'মুসলিম সাহিত্য যেখানে কেবলমাত্র মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য সেখানে ইসলামী সাহিত্য মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার সৃষ্ট সাহিত্য। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, কোনো অমুসলিমের হাতে সৃষ্টি হলেও তা ইসলামী সাহিত্য।' (ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান, পৃষ্ঠা ৩০)

'তালিব ভাই' প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দিয়েছেন। আগে আমাদের সামনে ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অস্পষ্টতা ও দ্বিধায় ছিল জড়তা। তা কেটে যায়। 'তালিব ভাই' স্পষ্টভাবে বলেছেন— 'ইসলামী সাহিত্য কোনো নিছক ধর্মীয় সাহিত্য নয়।' অথচ আমরা ইসলামী সাহিত্য বলতেই বুঝি যে সাহিত্যে কুরআন-হাদীস, শরীয়ত-মারেফত ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাখ্যা, আলোচনা কিংবা এতদসংক্রান্ত বিষয়কে উপজীব্য করে লেখা থাকবে, সেটাই ইসলামী সাহিত্য।

'তালিব ভাই' ইসলামী সাহিত্যের নিদর্শনের ব্যাপারে খানিকটা হতাশা ব্যক্ত করেছেন। '....আবদুল কাহের জুরজানী ও তাঁর মত আরো কোনো কোনো আরবী সাহিত্যের সমালোচকের মতে উমাইয়া ও আব্বাসীয় পূর্বের সাহিত্য যথাযথ সমালোচনার অভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সাহিত্যের রূপ নিতে সক্ষম হয়নি।' (ইসলামী সাহিত্যঃ মূল্যবোধ ও উপাদান, পৃষ্ঠা ৩৭)

'পার্শ্ববর্তী ফারসি সাহিত্যে আত্তার, রুমী প্রভৃতি সুফীবাদে আক্রান্ত কবিদের কবিতায় ইসলামী সাহিত্যের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে তাঁদের মধ্যে শেখ সাদীর কবিতাই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল।

আধুনিক যুগের কবি আল্লামা ইকবাল উর্দু ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের এমন নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন যা বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী সাহিত্যের বিপ্লবী চেতনাকে পরিপূর্ণ রূপ দানে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী ভাবধারা যে উন্নতমানের বিশ্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম ইকবালের সাহিত্য তার প্রমাণ। ইকবাল সাহিত্য সুফিবাদে আক্রান্ত নয়, বরং ইসলামের অধ্যাত্ম চিন্তায় পরিপুষ্ট, যাকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'ইহসান'।' (ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান, পৃষ্ঠা ৩৭)

'তালিব ভাই' বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য চর্চার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বলেছেন। 'ইসলামী সাহিত্য আন্দোলন' চলছে এমন এক কর্মকাণ্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলেছেন, 'এর জন্য মৌলিক ভিত্তি হবে—'আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতে বিশ্বাস ও মানবতার কল্যাণ।'

www.pathagar.com

'তালিব ভাই' ইসলামী সাহিত্য চর্চার জন্য মৌলিক চিন্তার বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছেন। এতোদিন আমাদের সামনে ইসলামী সাহিত্য চর্চার কোন পথনির্দেশিকা ছিল না। যা ছিল তা আভাস-ইঙ্গিত মাত্র। কিন্তু 'তালিব ভাই' বুঝতে পারলেন, যদি পথনির্দেশিকা না থাকে, তবে প্রকৃত অর্থে এবং সঠিক পথে 'ইসলামী সাহিত্যের আন্দোলন' দানা বেঁধে উঠবে না। এমনি এক দিকনির্দেশনামূলক গ্রন্থ লিখলেন তিনি 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট'। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি বলেছেন, 'বিশ্ব সাহিত্য মানবতার সম্পদ। এজন্য এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের সাহিত্য থেকে প্রেরণা লাভ করে এবং অনেক সময় নিজেদের প্রয়োজনীয় উপাদানও সংগ্রহ করে।' (সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা: ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট)।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা অনুধাবন করতে সমর্থ হই, সাহিত্যের পরিসর যেভাবে ব্যাপক, তেমনি ইসলামী সাহিত্যের পরিমণ্ডলও ভাষা, দেশ, জাতি ভেদে বিশাল আয়তনে বিস্তারিত।

'তালিব ভাই' শিল্প সম্পর্কে বলেছেন, শিল্পের উদ্দেশ্য জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করা অর্থাৎ লিও টলস্টয় তাঁর গ্রন্থে যেভাবে (What is Art?) বলেছেন, 'মানব সমাজের পক্ষে যা এত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত, যার জন্য এত শ্রম, মানুষের জীবন, এমনকি মূল্যবোধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় সেই শিল্প বস্তুটি কী?'

জবাবে তিনি বলেছেন... 'সব ধরনের শিল্পেরই একদিকের সীমায় আছে বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধি এবং অপরদিকে শিল্প রচনার অসার্থক প্রয়াস।' (শিল্পের স্বরূপ, What is Art?, টলস্টয়) টলস্টয় বিস্তীর্ণ পটভূমিতে আলোকপাত করে যে বিষয়টি বলার জন্য তিনি প্রতিবাদ্য স্থির করেছেন, তা হলো স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, কবিতা শিল্পের সকল মাধ্যমকে হতে হবে। মানুষের কল্যাণের জন্য, শুধু আনন্দদায়ক নয়।

'তালিব ভাই' তাঁর গ্রন্থেও বলতে চেয়েছেন, 'বস্তুত সমগ্র বিশ্বনিখিল এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর সৃষ্টি। এই সমগ্র সৃষ্টির পেছনে তাঁর একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ কাজ করছে। ...তাই শিল্প নির্বিশেষে হোক বা নৈর্ব্যক্তিক তা কখনো লক্ষ নিরপেক্ষ হয় না। আর উন্নত শ্রেষ্ঠ শিল্প আল্লাহ নির্ধারিত লক্ষ সম্পাদনের মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত রাখে।' (সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা: ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট, পৃষ্ঠা ১০)।

টলস্টয় অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, রাশিয়ার শিল্পের পৃষ্ঠপোষক এক অর্থে সাধারণ জনগণ, কারণ কোটি কোটি রুবল ট্যাক্স হিসেবে সরকার গ্রহণ করে তার একটি সিংহ অংশ শিল্প-সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যয় করে থাকে। কিন্তু সেই অর্থে যে শিল্প চর্চা হচ্ছে তা নন্দনতাত্ত্বিক বা শুধু সৌন্দর্য ও আনন্দদায়ী হয় তবে তিনি (টলস্টয়) শিল্পের উদ্দেশ্যের খেলাপ হিসেবে মন্তব্য করেছেন। টলস্টয় শিল্পকে অত্যন্ত সচেতনভাবে নিরপেক্ষ এবং গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ হওয়ার কথা বলেছেন।

'তালিব ভাই' তাঁর 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' গ্রন্থে বিস্তারিত বলতে চেয়েছেন সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মূল উপলক্ষ সুন্দরের

www.pathagar.com

জন্য মানব হিতের নিমিত্তে। যা স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে বিঘ্নিত করে– মানব জাতির মৌল ধারাকে ব্যাহত করে, সমাজ পরিবেশকে দূষিত করে, অমানবিক আচরণকে প্রশ্রয় দেয় পারস্পরিক সম্পর্কে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, হানাহানিকে প্ররোচিত করে, কাম ও ক্রোধকে উসকে দেয় তথা যতো ধরনের অমঙ্গলকে আবাহন করে, তা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আরাধ্য হতে পারে না। এটাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

'সাহিত্য অবশ্যি সুন্দরের নাম। অসুন্দর, কুৎসিৎ ও অশ্লীলকে সাহিত্য পদবাচ্য বলা যায় না। ...তেমনি সাহিত্যের অংগনে অসুন্দর অশ্লীলতা বিরাজ করলে তাকে সাহিত্য না বলে বরং সাহিত্যের ভাগাড় বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত হবে। (সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট, পৃষ্ঠা. ১১-১২)

'তালিব ভাই' তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন, সাহিত্য ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক কি, সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা কাকে বলে, লেখকের সামাজিক দায়িত্ব কতটুকু আছে? এসব অত্যন্ত জরুরি বিষয় নিয়ে। তিনি বার বার বলতে চেয়েছেন মানুষের পৃথিবীতে আগমনের যেমন উদ্দেশ্য আছে তেমনি মানুষের কৃত সকল কর্মকাণ্ডের মতো সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চারও মৌলিক উদ্দেশ্য থাকতে হবে তা সুকৃতি, সুন্দর, দায়িত্ববোধ— নিজ ও সমাজের প্রতি, সর্বোপরি গোটা পৃথিবীকে সুন্দরের দিকে আহ্বান করা, উদ্বুদ্ধ করা।

এ গ্রন্থে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়টি উদ্ঘাটন করেছেন, যা আমাদের কাছে প্রকৃত অর্থে ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন তা হলো– সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন : ইসলামী দৃষ্টিকোণ। 'তালিব ভাই' বিষয় অবতারণার শুরুতে তিনটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে আলোকপাত ও বিশ্লেষণ করেছেন। এক. বর্তমানে আমাদের দেশে যে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন চলছে তার মধ্যে কিভাবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ফুটিয়ে তোলা যায়। দুই. ইসলামের দৃষ্টিতে এই সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনকে বিচার বিশ্লেষণ করা। তিন. সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের ইসলামী দৃষ্টিকোণ কি হওয়া উচিত অর্থাৎ ইসলাম কোন ধরনের সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চায়।

আসলে আমরা যারা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে জড়িয়ে গেছি, আমাদের সামনে নানাবিধ সমস্যা। এ কাজকে আগলে রাখতে যারা সদা প্রয়াসী, তাদের সামনে এ ধরনের কোন দিকনির্দেশনা নেই। এক শ্রেণীর লোক বলতে চান, ইসলাম সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার গণ্ডিকে উন্মুক্ত করেনি। আরেক শ্রেণীর লোক বলেন, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক বা পরিপন্থী। আরেক শ্রেণী আছেন যারা কতিপয় শর্ত আরোপ করে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রকে স্বীকার করেন তবে কাঁধে চড়িয়ে দেন এমন সব দায়িত্বের জোয়াল যা বহন করে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 'তালিব ভাই' তাঁর গ্রন্থে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিনির্ভর ও সময়োপযোগী আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

তিনি বলেছেন, দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা ও যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার অভাবে উপমহাদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে মুসলমানরা পিছিয়ে গেছে, প্রবেশ করেছে পৌত্তলিক, জড়, অপ সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। অন্যদিকে ভিন্ন ভাষা

www.pathagar.com

এ জাতি এগিয়ে গেছে অনেক দূর। তিনি অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে মুসলমান সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবীদের মনোযোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি যে মূলনীতির আলোকে চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন তা হলো—

১. আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস।
২. শিরককে জীবনের সকল পর্যায়ে বর্জন করা।
৩. আখিরাতে জবাবদিহিতার চেতনা সর্বদা জাগ্রত রাখা।
৪. আল্লাহ ও রসূলের পছন্দকেই একমাত্র জীবনসত্য মনে করা।
৫. নিজের স্বার্থ, সমাজের স্বার্থ এবং দেশ ও জাতির স্বার্থের চেয়ে প্রকৃত হক ও ইনসাফকে বড় মনে করা।

'তালিব ভাই' তাঁর গ্রন্থে ইসলামী সাহিত্য চর্চার প্রতিকূলতা নিয়েও পূর্বাপর ধারাবাহিকতা উল্লেখ করে উত্তরণের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যেহেতু মুসলমানরা আধুনিক বাংলা সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে হিন্দুদের অনেক পরে শুরু করেছে এবং ইতোমধ্যে ইউরোপের আধুনিক কলাকৌশল ও নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্র শিল্পের মাধ্যমে হিন্দুরা সাহিত্যের সমস্ত অংগন নিজেদের মতো করে গড়ে নিয়েছে এই অবস্থা হতে বের হতে মুসলমানদের অনেক বেশি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে। এক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের মতো সাহিত্য প্রতিভার জন্ম এক ধরনের যুগান্তকারী ঘটনা। একা নজরুল ইসলামই মুসলমানদের সাহিত্যে এগিয়ে যাওয়ার এক দুর্বার গতি সৃষ্টি করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি ছিল শিরক ও নাস্তিক্যবাদের ব্যাপকতা। নজরুল এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের ব্যবহার করেছেন। এরপর তিনি আমাদের সংস্কৃতি কি, বিভ্রান্ত সংস্কৃতির আবর্তে আমাদের সংস্কৃতি কিভাবে বিপন্ন, বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ইসলামী সংস্কৃতি কাকে বলে, সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ও অরাজকতা কিভাবে ঘটছে, প্রতিকারের উপায় কি ইত্যাদি আলাদাভাবে তিনি আলোকপাত করেছেন।

মোদ্দাকথা, 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপরেখা তিনি দিয়ে গেছেন। জানি না আমাদের জন্য যে পরিশ্রম ও সাধনা করে মণিমুক্তা রেখে গেছেন তা কতটুকু কাজে লাগাতে পারবো আমরা। আমাদের পঠন-পাঠন, খোঁজ-খবর রাখার যে অবস্থা দেখছি, তাতে মনে হয় না আমরা এসব দিক নির্দেশনা কাজে লাগাতে পারবো।

তালিব ভাইয়ের শিশুসাহিত্যে অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত বিশাল পরিসরে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিশুদের মন-মানস ও চরিত্রকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে ইসলামী আদর্শকে তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। ছোটরা সরাসরি কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইবে না। তাই তাদের সামনে আদর্শের পরিচয় তুলে ধরতে হবে সহজ ভাষায় গ্রন্থ ও গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে। তিনি শিশুদের ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে শিশুতোষ সাহিত্য রচনা করেছেন।

www.pathagar.com

তিনি শিশুপাঠ্য উপযোগী করে বেশ কিছু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন- সহজ পড়া (১৯৮২)। ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ), ইসলাম শিক্ষা (১ম ও ২য় ভাগ)। এসো জীবন গড়ি (১ম ও ২য় ভাগ)। পড়তে পড়তে অনেক জানা, মা আমার মা, আমাদের প্রিয় নবী, মজার গল্প, কে রাজা, হাতিসেনা কুপোকাত ইত্যাদি।

'শিশু সাহিত্য : আমাদের দেশ ও জাতি গঠনের অংগীকার' শীর্ষক প্রবন্ধ একটি সেমিনারে (০২. ০৬. ২০০৩) তিনি (তালিব ভাই) পাঠ করেন। প্রবন্ধটি আমাদের জন্য কত বড় দিকনির্দেশক ছিল সেদিন বুঝতে না পারলেও আজ প্রবন্ধটি হাতে নিয়ে মনে হচ্ছে- তিনি আমাদের চলার সকল উপায় বলে দিয়ে গেছেন, তবু কেনো আমরা আজও পথহারা? প্রবন্ধের শুরুতে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, শিশুদের কি পড়ানো হচ্ছে? কি শেখানো হচ্ছে? শিশুরা কি সত্যিকার মানুষ হচ্ছে? সত্যিকার দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে— পরবর্তীকালে যারা জাতি গঠন করবে, দেশের নাগরিক হবে, জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তাদেরকে কি সেভাবে তৈরি করা হচ্ছে?

এভাবে অনেক প্রশ্নের ঝুড়ি আমাদের সামনে মেলে ধরেন। বলা বাহুল্য প্রবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায় 'সদাচার, সৎকর্ম, নৈতিক মূল্যবোধ, পুরাতন ঐতিহ্য, যা কিছু তার বলে বিবেচিত হয়ে আসছে সুদীর্ঘ অতীত কাল থেকে সবকিছু ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে একটা বিপরীতমুখী নতুন মনন, নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র বিধি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। মার্কস-এংগেলীয় চিন্তাধারায় লেনিন-মাও-এর কর্মধারা মিশেলে যে তরংগ সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের চিন্তাজগতে তার দাপাদাপি চলছিল সত্তর-পঁচাত্তর বছর ধরে। আমাদের দেশে সাহিত্য ও চিন্তার জগতে এর প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে।' (প্রবন্ধঃ শিশু সাহিত্য : আমাদের দেশ ও জাতি গঠনের অংগীকার) তিনি প্রশ্ন করেছেন, আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ করে শিশুসাহিত্যে যে ধ্বস নেমেছে তার প্রতিকার কি? প্রতিকার তিনি দিয়েছেন। তাঁর ঐ প্রবন্ধে তিনি চার দফা কর্মসূচীভিত্তিক শিশু সাহিত্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রথম দফা

আল্লাহর প্রতি ঈমান। এ ঈমানে থাকবে বলিষ্ঠতা। সকল প্রকার মিশেল ও ভেজালমুক্ত অনাবিল স্বচ্ছতা। আল্লাহর প্রভুত্বের কাছে সকল প্রভুত্ব নতি স্বীকার করবে।

দ্বিতীয় দফা

আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা. হচ্ছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম আদর্শ। জীবন পথে চলার ক্ষেত্রে আমাদের তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয় দফা

আমাদের সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

চতুর্থ দফা

আমাদের জীবনকে গড়ে তুলবো ফুলের মতো পবিত্র করে। দেশকে, জাতিকে, মানুষকে ভালবাসবো।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন একজন নীরব সাধক। তিনি ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অত্যন্ত নিভৃত গ্রাম অর্জনপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নিতান্ত আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান পরে পূর্ব পাকিস্তানে (১৯৭৩-এর পর বাংলাদেশে) এসে তিনি গোটা জীবন গবেষণা, লেখালেখি করে জাতি গঠনে বিশাল কর্ম লালন করেছেন। একাধারে তিনি কুরআন-হাদীসকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করে সরাসরি কুরআন-হাদীসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, অপর দিকে সাহিত্য-সাংবাদিকতা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা দিকনির্দেশনামূলক অব্যাহত লেখালেখির মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন প্রকৃতপক্ষে আদর্শের বিজয় উত্থান। আজ প্রয়োজন তালিব ভাইয়ের এসব দিকনির্দেশনামূলক লেখার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সৃষ্টি করা— এর মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং যতো বাধা-বিপত্তি আসুক, হতোদ্যেম না হয়ে এগিয়ে যাওয়ার ব্রত নেওয়া।

www.pathagar.com

আমাদের তালিব ভাই
মুকুল চৌধুরী

১.

তালিব ভাই; আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় তালিব ভাই। মরহুম আবদুল মান্নান তালিবের (জন্ম: ১৫ মার্চ ১৯৩৬, মৃত্যু: ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১) কথা মনে পড়লেই দু'চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক পরিপাটি, পরিতৃপ্ত, পরিচ্ছন্ন ও সৃষ্টিশীল– সৃজনশীল ধ্যানী– মানুষের প্রবুদ্ধ-মুখ। তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে অন্তরঙ্গতার শেষ দিন পর্যন্ত– দীর্ঘ ত্রিশ বছর তাঁকে একই অবয়বে দেখেছি। দেখেছি একই উজ্জ্বলতায়। একই বিভায়। একই দীপ্তিতে। সৌজন্য ছিল তাঁর ভূষণ। সৃজনে ছিলেন তিনি শোভিত। চিন্তায় ছিলেন প্রাজ্ঞ। কর্মে ছিলেন নিবিষ্ট। সৃষ্টিশীলতায় ছিলেন আত্মমগ্ন অথচ পরিকল্পিত। প্রণোদনায় ছিলেন তিনি তৃষ্ণা নিবারণকারী এক তৃষ্য জলাধার। তরুণদের কাছে তিনি ছিলেন এক আকর্ষণীয় সংবেদ্য-ব্যক্তিত্ব। জ্ঞান-পিপাসু তরুণরা তাঁকে ঘিরে থাকতো– যেনো এক মৌচাক ঘিরে আছে চাকের মৌমাছিরা। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁকে কখনও ব্যস্ততা দেখাতে দেখিনি। শত হতাশায়ও তিনি কখনও হতাশা প্রকাশ করেননি। শত অসুবিধাও তাঁর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এক মহাপরিকল্পনায় চালিত ছিল তাঁর জীবন। চতুর্মাত্রাবিশিষ্ট এই জীবনের কেন্দ্রে ছিল এক আন্দোলন যাকে ঘিরে প্রথম মাত্রায় তাঁর নিজের আত্মশুদ্ধি– আত্মোন্নয়ন; দ্বিতীয় মাত্রায় সাহিত্য– সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাটাতন তৈরির চ্যালেঞ্জিং কাজ; তৃতীয় মাত্রায় চিন্তা ও জ্ঞানের পুনর্গঠন ও শুদ্ধিকরণের লক্ষ্যে সৃষ্টিশীলতা ও

www.pathagar.com

সৃজনশীলতার নিরন্তর প্রয়াস এবং চতুর্থ মাত্রায় পরবর্তী জেনারেশনকে প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদান; তাদের বিকাশের সুপ্রশস্ত সড়ক নির্মাণ। এই চার মাত্রা বা বৃত্তে আজীবন আত্মমগ্ন ছিলেন তিনি এবং আশেপাশে তাকালে দেখি তাঁর এই আত্মমগ্নতা সাধনারূপে সিদ্ধি লাভ করেছে। ফলে বলতে দ্বিধা নেই– তালিব ভাই এক সফল জীবন সাধক। আবদুল মান্নান তালিব এক সফল জীবন সাধকের নাম।

২.

তালিব ভাই জন্মেছিলেন অবিভক্ত ভারতের, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামে। ১৯৫০ সালের দিকে জ্ঞানের তৃষ্ণা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় উত্তর প্রদেশে। সেখান থেকে লাহোরে। জড়িয়ে পড়েন পত্রিকার সাথে। ১৯৫৯-এ চলে আসেন বাংলাদেশে; তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। আবার পত্রিকার সাথে; পরে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে, আবারও পত্রিকায়। তিনি বহুবার আলাপচারিতায় তাঁর অনিশ্চিত জীবনের শুরুর দিনগুলোর কথা বলতেন আর অতীতচারিতায় নয়– জীবন সংগ্রামের পেছনের যে রোমাঞ্চ তাও নয়– বলতেন স্বপ্ন নির্মাণের আকুলতার কথা। জ্ঞান-সাগরে সাঁতরানোর কষ্ট– কঠিন প্রতিজ্ঞা– প্রতীতির প্রত্যয়দীপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা। তালিব ভাই মানে এক জ্ঞানান্বেষী তরুণের– জ্ঞানপিপাসু এক যুবকের– জ্ঞান অনুসন্ধানী এক প্রাজ্ঞ প্রবীণ জীবনের অনুসন্ধনায়কের গল্প। এই গল্পের বহু তরুণের মতো আমিও এক মুগ্ধ পাঠক।

৩.

এই পাঠের সূচনায় আমি তাঁকে চিনতাম না। কিন্তু তিনি আমাকে চিনতেন (এ-ই তো ছিল তাঁর কাজ, মানুষ খোঁজা)। তিনি তখন সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক 'কলম'-এর প্রধান সম্পাদক। সম্পাদক ও প্রকাশক : সাজ্জাদ হোসাইন খান। প্রকাশনা- প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার। খুব বেশি দিন হয়নি লেখালেখি শুরু করেছি। লেখা মানে সেও তো মাত্র কবিতা। 'কলম'-এর জন্য সাহস করে পাঠিয়ে দিলাম এক দীর্ঘ কবিতা। নাম : 'নূরে মুজাস্সম হযরত মুহাম্মদ স.-এর আগমন এবং কতিপয় কণ্ঠ'। নামের মতো কবিতাটিও ছিল বেশ দীর্ঘ। এক মাস যেতে না যেতেই দেখলাম ক্রাউন সাইজের পত্রিকায় দুই পৃষ্ঠা জুড়ে সেই কবিতা ছাপা হয়ে গেছে। সংখ্যাটি ছিল 'কলম'-এর ২য় বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, আগস্ট–জানুয়ারি ১৯৮০-১৯৮১। আমার জন্য এ ছিল এক বিরাট প্রাপ্তি।

আমি তখন সিলেটে। এমসি কলেজে অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সাল ১৯৮০। ডিসেম্বরে অনার্স পরীক্ষা শেষ হলো। যেদিন পরীক্ষা শেষ হলো– পরদিনই ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা। আমাদের সময় নিয়ম ছিল– পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার আগেই মাস্টার্সে ভর্তি হতে হতো। আমরা ছিলাম চট্টগ্রাম ইউনিভারসিটির আওতায়। সহপাঠি বন্ধুরা যখন পাহাড় ঘেরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছে, আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সিঁড়ি ভাঙছি। উঠেছি ৯৪/১ নিউ

www.pathagar.com

এলিফ্যান্ট রোডে। পাশেই ৭১ নিউ এলিফ্যান্ট রোডে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের অফিস। সময় : জানুয়ারি ১৯৮১। একদিন দুরু দুরু বুকে গিয়ে হাজির হলাম তাঁর টেবিলের সামনে। পরিচয়-পর্বটি খুব একটা দীর্ঘ হয়নি। নাম বলতেই জানুয়ারি সংখ্যা পত্রিকার একটি সৌজন্য কপি বাড়িয়ে দিলেন। মুখে স্নিগ্ধ হাসি– 'আপনার কবিতা ছাপা হয়েছে। আপনার ঠিকানায় সৌজন্য কপিও পাঠানো হয়েছে। সম্মানীর টাকা নিয়ে যাবেন।' জীবনে এই প্রথম লেখার সম্মানী প্রাপ্তি। খুশিতে আমি আকর্ণ বিস্তৃত। তালিব ভাই চায়ের অর্ডার দিলেন। বললেন, 'সিলেটের মানুষ চা তো খাবেনই।' সেই ফাঁকে ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নিলেন। কোথায় উঠেছি, জেনে নিলেন। জেনে নিলেন কী পড়ছি। লেখালেখির প্রসঙ্গেও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বললেন, 'সিলেটের প্রকৃতি তো খুবই বৈচিত্রময়-সুন্দর। গল্প লিখুন– উপন্যাস লিখুন। নবী-রাসূলগণের জীবনের ঘটনা নিয়েও লিখতে পারেন। গদ্যও লিখুন। আমাদের সাহিত্য- সমালোচকের বড়ই অভাব।'

হাতে একটি অসম্পূর্ণ লেখা ছিল। বন্ধু সালেহ্, কবি নিজামউদ্দীন সালেহ'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ– 'সবুজের আগ্নেয় প্রপাত' প্রকাশিত হয়েছে সিলেট থেকে। কবি আফজাল চৌধুরী মহাউৎফুল্ল। তাঁর এক নম্বর সাগরেদ সালেহ, দুই নম্বর সোলায়মান আহসান, তিন নম্বরে আমি। আমার উপরেই নির্দেশ– ভালো একটি রিভিউ লিখতে হবে। পরীক্ষা আর ভর্তির ঝামেলায় শুরু করেও শেষ করতে পারিনি। এক রাতে বসে গেলাম শিল্পী হামিদ ভাইয়ের (হামিদুল ইসলাম) টেবিলে। কোথায় রিভিউ হয়ে গেলো দীর্ঘ প্রবন্ধ। মনে পড়ে গেলো তালিব ভাইয়ের কথা— 'আমাদের সাহিত্য-সমালোচকের বড়ই অভাব।' নিয়ে গেলাম সেই লেখা। এক নজরে পড়লেন এবং ফাইলবন্দী করে রেখে দিলেন। আরেকটু ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতা। বাড়ি-ঘরের খোঁজ-খবর নিলেন। আব্বা-আম্মা, ভাই-বোনের কথাও। 'সবুজের আগ্নেয় প্রপাত' দশ পৃষ্ঠার শিরোনামের এ লেখাটিও যথারীতি ছাপা হয়ে গেলো 'কলম'-এর পরবর্তী সংখ্যায়; আগস্ট–অক্টোবর ১৯৮১ : তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায়। পরের বার গেলাম একটি গল্প নিয়ে। হযরত ইউনুস (আ.)-এর জীবনের ঘটনা নিয়ে লেখা কাহিনী। আমার উপস্থিতিতে পুরো লেখাটি পড়লেন। বেশ কিছু পরামর্শ দিলেন। বললেন, কলকাতার 'কাফেলা' সম্পাদক আবদুল আজীজ আল-আমান এ ধারায় অনেক গল্প- কাহিনী লিখেছেন। হাতের কাছে 'কাফেলা'র কপি ছিল। এক কপি দিয়ে দিলেন। বললেন, 'লেখা পাঠান। লেখা পাঠানোর আগে আসবেন। আমি চিঠি লিখে দেবো।' পরের সপ্তায় গেলাম একগুচ্ছ কবিতা-ভর্তি খাম নিয়ে। খামের উপরে 'কাফেলা'র ঠিকানা লেখা। মুখ খোলা। তালিব ভাই চিঠি লিখে দেবেন, সেই চিঠি পেলে তা সহ খামের মুখ বন্ধ করবো। যেতেই হাতের কাজ ফেলে রেখে 'কলম'-এর প্যাডে চাইনিজ উইংসন কলমে সুন্দর হস্তাক্ষরে চিঠি লিখতে বসে গেলেন। সেই চিঠি খামে ভরে দৌড়ালাম নিউ মার্কেট পোস্ট অফিসে। পোস্ট করে বসে আছি। দশ দিন যায়, পনের দিন যায়, মাস যায়– অপেক্ষা করি। তালিব ভাই'র কাছে গিয়েছি মাস দু'য়েক পরে।

www.pathagar.com

তাঁর মুখ জুড়ে সেই স্মিত-স্নিগ্ধ হাসি। যেনো খেজুর পাতার প্রান্তে বাতাসের মৃদু-মন্দ আন্দোলন। বাঁ হাত বাড়িয়ে টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। 'কাফেলা' পত্রিকার প্যাকেট। দুই কপি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'খুলে দেখুন।' সূচীপত্রে চোখ বুলাতেই আমি বুঝলাম, তালিব ভাই'র উইংসন কলম আর পেলিকেন কালিতে চড়ে আমি ইতোমধ্যেই কলকাতা পৌঁছে গেছি। –'কাফেলা'র প্রথম পৃষ্ঠায়ই আমার নাম আর তিন পৃষ্ঠা জুড়ে আমার 'গুচ্ছ কবিতা'। পরে আবদুল আজীজ আল আমান সাহেব অনেক চিঠি লিখেছেন। নিয়মিত 'কাফেলা' পাঠাতেন। কলকাতায় যাওয়ার দাওয়াতও দিয়েছিলেন। ১৯৯৪-৯৫ সালে তাঁর বেগম ঢাকা এসে (তখন আমান সাহেব ইন্তেকাল করেছেন) আমাকে খুঁজে বের করেছিলেন। আমিও তাঁর (আবদুল আজীজ আল আমানের) বাংলাদেশ থেকে বইপত্র প্রকাশ ও প্রকাশিত বইপত্রের রয়্যালটি পাওয়ার বিষয়ে তাঁর মিসেসকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছি। – এই যে এক স্বনামধন্য লেখক – সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক, যা তাঁর মৃত্যুর পর পরিবার পর্যন্ত গড়িয়েছিল– এর অনুঘটক ছিলেন তালিব ভাই এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর সেই গুণ– নতুনদের প্রণোদনা প্রদানই কাজ করেছে। কবি বুলবুল সরওয়ার ঘন ঘন কলকাতা যেতেন। আমান সাহেবের সঙ্গে তাঁরও অন্তরঙ্গতা ছিল– সম্ভবত এ ক্ষেত্রেও তালিব ভাই'র ভূমিকা ছিল।

তালিব ভাই আমার প্রথম কবিতার বই 'অস্পষ্ট বন্দর'-এর প্রকাশক। আশির দশকের শুরুর দিকে (সম্ভবত ১৯৮৩ সালে) 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি এর পরিচালক। ৯০-এর শুরুতে নবীন-প্রবীণ লেখকদের অনেকগুলো বই প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন। সম্ভবত ৬০–৬৫টি। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে আমার 'অস্পষ্ট বন্দর'-এর প্রকাশ। যথারীতি রয়্যালটি দেওয়ারও ব্যবস্থা করলেন। মনে আছে, প্রথম কবিতার বইয়ের রয়্যালটি বাবদ দেড় হাজার টাকা পেয়েছিলাম। এখন পর্যন্ত– এই একুশ শতকেও কবিরা তাদের প্রথম কবিতার বই নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রকাশ করেন, রয়্যালটি তো স্বপ্নেরও অতীত! তালিব ভাই আমাকে প্রথম বই প্রকাশের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই তো দিলেনই, উল্টো শিখিয়ে দিলেন– বই ছাপা হলে রয়্যালটি পাওয়া যায়। এই একটি জায়গায় তালিব ভাই কখনও আপস করেননি। না নিজের ক্ষেত্রে না অপরের ক্ষেত্রে। লেখকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর এই আপসহীনতা অনেকেই ভালোভাবে নেননি। যদিও মহৎ মানুষ তালিব ভাই তাঁর লিখিত প্রায় অধিকাংশ বই-পুস্তক বিনা রয়্যালটিতে ছাপতে দিয়েছেন।

একই সময়ে তিনি উদ্যোগ নিলেন বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রবীণ লেখকদের সম্মাননা প্রদানের। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে কয়েক বছরব্যাপী বাংলা সাহিত্য পরিষদ আমাদের প্রবীণদের সম্মানিত করেছেন। সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পাদক মোহাম্মাদ নাসির উদ্দীন, প্রিন্সিপাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, কবি জাহানারা আরজু, কথাশিল্পী শাহেদ আলী, অধ্যাপক

www.pathagar.com

আবদুল গফুর, সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী, কবি আল মাহমুদ, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ, অভিনয়-শিল্পী ওবায়েদুল হক সরকার, সঙ্গীতজ্ঞ আসাফ উদ্-দৌলা, কবি আলদুল মান্নান সৈয়দ, ডক্টর মালিহা খাতুন, ঔপন্যাসিক রাজিয়া মজিদ প্রমুখ।

তালিব ভাই ১৯৭৭–১৯৮২ সময়কালে দৈনিক সংগ্রমের 'শাহীন শিবির'-এর পরিচালক ছিলেন। এ পাতায়ও তিনি তরুণদের– নবীন লেখকদের অগ্রাধিকার দিতেন। মনে আছে, তিনি আমাকে দিয়ে অনেকগুলো কিশোর প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছিলেন। সেই লেখাগুলোই পরবর্তীতে আমার চাঁদের কথা, মানুষের চন্দ্র বিজয়, সেই দীপ্ত শপথ– গ্রন্থত্রয়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আমি একা কেন– শত না ফোঁটা ফুলের তরুণ কলি এভাবে আবদুল মান্নান তালিবের সংস্পর্শে এসে আজ সুশোভিত ফুলের সুগন্ধ ছড়াচ্ছে।

৪.

তাঁর দ্বিতীয় মাত্রাটি– সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পাটাতন তৈরির কাজটি বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে ভেতরে-বাইরে, দু' জায়গাতেই। ভেতরে এর প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয়নি দীর্ঘদিন পর্যন্ত। সমমনা লেখকেরও অভাব ছিল। লেখক তো ছিলেন হাতে গোনা মাত্র তিনজন। এক আবদুল মান্নান তালিব, দুই. অধ্যাপক মুহম্মাদ মতিউর রহমান, আর তৃতীয়জন নূরুল আলম রইসী। অবশ্য নেপথ্য থেকে উৎসাহ জোগাতেন কবি ফররুখ আহমদ।

বাইরের সংগ্রামটি ছিল আরও জটিল। একদিকে মার্কসবাদী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন, অন্যদিকে তুমুল জাতীয়তাবাদী জাগরণ। কোন প্রকারের অভিজ্ঞতাও হাতের কাছে ছিল না। সুতরাং শুধুমাত্র একজন সংগঠকের পক্ষে এ কাজ শুরু করা প্রকৃতই দুরূহ ছিল। সংগঠক-কাম-চিন্তক-এর প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন অথচ আদর্শিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিত্তি রচনার। সেই দুরূহ দায়িত্বটি আবদুল মান্নান তালিব স্বেচ্ছায় স্বস্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন এবং আজকের বিবেচনায় তিনি তাঁর এ দায়িত্বটি সফলভাবে পালন করে গেছেন।

৫.

এতো কিছুর পরও তালিব ভাই অসম্ভব সৃষ্টিশীল–সৃজনশীল মানুষ ছিলেন। এ সৃজনশীলতার আবার দু'টি দিক। একটি শিশু-কিশোরদের চিন্ময় ও মিষ্টি-মধুর চিত্তগ্রাহী জগত নির্মাণ। এ জগত ঘাঁটলে দেখি–'সহজ পড়া', 'ছোটদের ইসলাম শিক্ষা', 'এসো জীবন গড়ি', 'পড়তে পড়তে অনেক জানা'র মতো জীবন গঠনমূলক বই। পাশাপাশি দেখি– 'আমাদের প্রিয় নবী', 'মা আমার মা', 'মজার গল্প', 'কে রাজা', 'হাতিসেনা কুপোকাত'-এর মতো জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনীও। যে গল্প, যে কাহিনী একজন শিশু-কিশোরকে এক সোনালি অতীতের গৌরবগাথার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটায়। তাঁর 'হাতিসেনা কুপোকাত' সূরা

www.pathagar.com

ফীল-এর কাহিনী অবলম্বনে লেখা। আমার একটি কবিতা আছে, 'মূর্খতার আইয়ামে' শিরোনামের (১৯৯৪ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ফেলে আসা সুগন্ধি রুমাল'-এর প্রথম কবিতা) কবিতাটি লিখে তাঁকে দেখাতে গিয়েছিলাম তাঁর মালিবাগের বাসায়। প্রায়ই তাঁর বাসায় যেতাম এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললে নতুন নতুন আইডিয়া পাওয়া যেতো। হতাশা কেটে যেতো। নতুন করে উজ্জীবিত হওয়া যেতো। তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণাদায়ী এক শক্তি। কবিতাটি শোনার পর তাঁর 'হাতিসেনা'র পুরো পাণ্ডুলিপিটি পড়ে শুনিয়েছিলেন।

তালিব ভাই চিন্তা ও জ্ঞানের– ইতিহাসের পুনর্গঠন ও শুদ্ধিকরণের কাজও করেছেন, যা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। এ মাত্রায় তাঁর অন্যতম বড় কাজ 'বাংলাদেশে ইসলাম' শীর্ষক মৌলিক গবেষণা-কর্মটি। ২৬৩ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থটির এ পর্যন্ত তিনটি সংস্করণ হয়েছে (প্রথম সংস্করণ : ১৯৮০, তৃতীয় সংস্করণ ২০০২)। গ্রন্থটি যে পরিশ্রমের ফসল ও প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থ তার প্রমাণ এর তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জি। ৮৩টি তথ্যসূত্র ও ৭০টি গ্রন্থপঞ্জিতে সমৃদ্ধ এ গ্রন্থে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন পূর্ব অবস্থা থেকে শুরু করে স্থিতি লাভ পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাস উঠে এসেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাস নির্মাণে 'ইসলাম' অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ইসলাম এদেশের জনগণের শুধু ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটায়নি, জাতি হিসেবে স্বতন্ত্র সত্তাও যোগ করেছে। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনায় 'ইসলাম' প্রসঙ্গটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আর এ প্রাসঙ্গিক ও জরুরি বিষয়টি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও অনুসন্ধানী ভাষায় এ গ্রন্থ-পৃষ্ঠায় তুলে এনেছেন তালিব ভাই।

এখন আমার হাতের কাছে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ। দেখতে পাচ্ছি, গ্রন্থটিকে মোট নয়টি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়সমূহের উপর চোখ বুলানো যেতে পারে : ১. পূর্বকথা; ২. প্রাচীন বাংলা; ৩. প্রাক-ইসলাম যুগ; ৪. ইসলামের প্রচার ও প্রসার; ৫. ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়; ৬. ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা-১; ৭. ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়; ৮. ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা-২ এবং ৯. সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা। তালিব ভাই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত উল্লিখিত ৯টি অধ্যায়ে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের সুদীর্ঘকালের প্রামাণ্য ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যপূর্ণ ভাষায় বিধৃত করেছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাস এর আগেও রচিত হয়েছে। তাহলে এ গ্রন্থের উপযোগিতা কি? এর সহজ জবাব, বিভিন্ন ইতিহাসবিদ-ঐতিহাসিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনা করেছেন। তালিব ভাই গ্রন্থের ভূমিকায় এর সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে লিখেছেন:

'ইসলামের ইতিহাস আর মুসলমানদের ইতিহাস আসলে এক কথা নয়। মুসলমানদের একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস থাকতে পারে। সেটা ঠিক ইসলামের ইতিহাস নয়। ইসলাম একটি দেশের ও একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কি প্রভাব বিস্তার

www.pathagar.com

করেছে, তাদের জীবনধারাকে কতদূর আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এবং দেশের অন্যান্য মতবাদ, আদর্শ ও ধর্মের সাথে তার সংঘাত কোন্ পর্যায়ে চলেছে– এ সবের বিবরণই ইসলামের ইতিহাস।' [ভূমিকা, পৃ. ৫]

তিনি আরও বলেছেন: 'ইসলাম এ দেশের মানুষকে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। বাংলার ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা তাই মানুষের দেহে প্রাণের মতো। বাংলাদেশে ইসলামের এ বিশিষ্ট ভূমিকাই এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।' [ভূমিকা, পৃ. ৫]

তাঁর এ বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ গ্রন্থ রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, তালিব ভাই সম্পূর্ণ পৃথক ও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের ইতিহাসকে পুনর্গঠন করেছেন এবং এটিই হচ্ছে এ গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য।

বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে অসামান্য অবদান রয়েছে, এ অবদানকে যুব সমাজের সামনে তুলে ধরে নানামুখী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে এ গ্রন্থ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আজও যারা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে এক অভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তোলার বিনাশী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের এ প্রয়াস যে এ দেশের ইতিহাসে নতুন কোন বিষয় নয়, সে সম্পর্কেও পাঠক অবহিত ও সতর্ক হতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় আস্থা রয়েছে। তাই আমি মনে করি, নানা দিক থেকে এ গ্রন্থ শিকড়সন্ধানী ও সত্য-অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য এক অপরিহার্য অবশ্য পাঠগ্রন্থ। এ গ্রন্থ পাঠে বিদগ্ধ পাঠক সমাজ, বিশেষত যুব সমাজ নিজেদের আত্ম-আবিষ্কারের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠায় বলীয়ান হয়ে দেশ ও সমাজের ভাঙন ও অবক্ষয় এবং নানামুখী ষড়যন্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলেই তালিব ভাই'র পরিশ্রম সার্থক হবে।

আবদুল মান্নান তালিব সাহিত্য-সংস্কৃতির কর্মীদের জন্য গাইড বুক হিসেবে রচনা করে গেছেন 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' (প্রকাশকাল : ১৯৮৪) শিরোনামের গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে উঠে এসেছে সাহিত্য- সংস্কৃতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্যকর্মীদের করণীয় সম্পর্কিত যাবতীয় দিকনির্দেশনা।

জীবন-জ্ঞান ও চিন্তা-গঠনমূলক বইয়ের মধ্যে আছে : মুসলমানের প্রথম কাজ (১৯৭৫), আমল-আখলাক (১৯৮৬), ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ (১৯৮৮), ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন (১৯৯৪), আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম (২০০১)। 'ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন' (১৯৮৭) তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

তাঁর সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যাও ডজন খানেক। এগুলোর মধ্যে 'নির্বাচিত গল্প' গ্রন্থটির উল্লেখ করতেই হয়। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থে অনেকগুলো গল্প স্থান পেয়েছে, যা আমাদের গল্প-সাহিত্যের জন্য মডেলস্বরূপ।

www.pathagar.com

তালিব ভাই এক দক্ষ অনুবাদক ছিলেন। তাঁর অনুবাদের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ। খতমে নবুয়ত, পয়গামে মুহাম্মদ, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, সীরাতে সরওয়ারে আলম-এর মতো ক্লাসিক্স বই ছাড়াও রাসায়েল ও মাসায়েল, রিয়াদুল সালেহীন, সহীহ আল বুখারী, তাফহীমুল কুরআন-এর মতো আবশ্যিক গ্রন্থও তিনি দক্ষ হাতে অনুবাদ করেছেন।

এভাবে তালিব ভাই তাঁর শতাধিক মৌলিক, অনূদিত, সম্পাদিত ও শিশু-কিশোর গ্রন্থের মাধ্যমে চিন্তা ও জ্ঞানের এক স্বকীয়-স্বতন্ত্র সংকলিত জগৎ নির্মাণ করে গেছেন।

তাঁর একটি কবিমনও ছিল। আল্লামা ইকবাল তাঁর প্রিয় কবি। আশির দশকে ইকবালের তাঁর অনূদিত কবিতা 'কলম'-এ নিয়মিত প্রকাশিত হতো। এর একটি নমুনাঃ

নিজের খুদীকে না হারালে
তুমি হতে না হাকিম বোর্গসর উপবীত।
হেগেলের শুক্তির বুকে মুক্তো নেই
যাদু তার উদ্ভব কল্পনায় বুঁদ।
জীবন কেমন করে হবে শক্তিশালী,
খুদী হবে চিরন্তন!
মানুষ চায় স্থিতিশীলতা
চায় এক জীবন পদ্ধতি–
পৃথিবীর রাত্রির আঁধারে উজ্জ্বল করে যে
আর মুমিনের আজানে দেয় বিশ্বজাগরণী সুর।
আসলে আমি নিখাদ সোমনাতী
আমার পিতৃপুরুষ লাত মানাতের পূজারী।
তুমি সাইয়েদ হাশেমী খান্দানের,
আর আমার দেহে প্রবাহিত ব্রাহ্মণের রক্ত।
দর্শন আমার পানি ও মৃত্তিকায় মিশানো
আর আমার দিলের সূক্ষ্ম তারে ঝংকৃত।
ইকবাল যদিও নির্গুণ
খবর রাখে তার প্রতিটি মূর্ছনার।
তোমার প্রেমের শিখা উষ্ণতাহীন
তাই শোনো এক অপরূপ তত্ত্ব আমার কাছে–
প্রজ্ঞার পরিণতি হলো :
জীবন দর্শন থেকে মানুষ সরে যায় দূরে
আর গরহাজির থাকে আল্লাহর দরবারে।
চিন্তার সংগীত আওয়াজবিহীন হলে
কর্ম প্রবণতায় নামে মৃত্যুর শীতলতা।
জীবন পথকে সোজা রাখাই দ্বীনের বৈশিষ্ট্য,
মুহাম্মদ ও ইবরাহীমের রহস্যই দ্বীন।
মুহাম্মদের কথায় হৃদয় পূর্ণ করো।
হে আলীর পুত্র, ইবনে সীনার প্রয়োজন নেই।
তোমার নেই

www.pathagar.com

পথের রেখা দেখার মতো চোখ,
তাই কুরাইশী নেতা
উত্তম বুখারার নায়কের চেয়ে।

[ইকবালের কবিতা : এক দর্শন বিভ্রান্ত সাইয়েদের নামে। অনুবাদ : আবদুল মান্নান তালিব। কলম। আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮১। তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

এই কবিতাগুলো সংগৃহীত হওয়ার প্রয়োজন এবং এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে তালিব ভাই'র কর্মদিগন্তে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। তিনি পবিত্র আল-কুরআনের কাব্যানুবাদও করেছেন। এগুলোও পাঠকের হাতে আসা জরুরি।

তালিব ভাই সম্পাদক ছিলেন। উর্দু-বাংলা মিলিয়ে অনেক পত্রিকায় কাজ করেছেন। সহ-সম্পাদক থেকে সম্পাদক হয়েছেন এবং শুনেছি, স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে তাঁর লেখা 'পৃথিবী' পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলো এক-একটি স্বতন্ত্র চিন্তাশীল প্রবন্ধের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। সেগুলোও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক।

জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর সাথেও যুক্ত হয়েছিলেন এবং এর মুখপত্র 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকার সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করেছেন। সেখানে তাঁর অনেকগুলো ফিকাহ্ বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণা প্রবন্ধ পড়ার সুযোগ হয়েছে। এগুলোও সংগৃহীত হওয়া এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

সর্বোপরি– তালিব ভাই'র অপ্রকাশিত, অগ্রন্থিত লেখাগুলো বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা আশু কর্তব্য।

পরিশেষে বলবো, তালিব ভাই'র জীবন ছিলো এক সন্ধানী জীবন। তিনি ছিলেন এক মহৎ জ্ঞান অনুসন্ধায়ক। সারাটি জীবন জ্ঞানের সন্ধান ও সাধনায় কাটিয়ে দিয়েছেন এবং লব্ধ জ্ঞানকে অকৃপণ হস্তে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে অকাতরে বিতরণও করে গেছেন।

সংগঠক, সম্পাদক, লেখক, অনুবাদক ও গবেষক– বহুকৌণিক ব্যক্তিত্ব ও সমাজচিন্তক আবদুল মান্নান তালিবের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের চারপাশ আজ আলোয় আলোকিত। আলোয় উদ্ভাসিত। সেই আলোকে অবগাহন করে আগামী জেনারেশন এক অগ্রসর ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে সক্ষম হলে তবেই তাঁর সাধনা, শ্রম ও ত্যাগ ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

www.pathagar.com

অনন্য গবেষক ও বিশ্লেষক
হাসান আলীম

আবদুল মান্নান তালিব একজন মৌলিক প্রতিভাধর সাহিত্য গবেষক, তাত্ত্বিক ও ধর্ম বিষয়ক পণ্ডিত বিশ্লেষক। বহুভাষাবিদ তিনি। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। সরাসরি আরবি ভাষা থেকে কুরআন ও হাদীস অনুবাদ করেছেন। ইকবালের ফারসি ভাষার কাব্যের অনুবাদ করেছেন। উর্দু ভাষা থেকে নসীম হেজাজী, মওদূদী র., ইকবাল, নঈম সিদ্দিকীসহ আরও খ্যাতিমান লেখকদের গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন বাংলায়। ভারত ও পাকিস্তানে তিনি যখন কর্মরত ছিলেন তখন উর্দু ভাষার সাহিত্য পত্রিকা ও বাংলা ভাষার সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। কুরআন থেকে গবেষণা করে তিনি ইসলামী সাহিত্যের মূলনীতি ও কর্ম কৌশল সম্পর্কে তত্ত্বমূলক গ্রন্থ ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান, সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট, ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন প্রভৃতি রচনা করেন।

এসব গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও উপন্যাস রচনার মূলনীতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। লেখক নয়, বরং লেখার বিষয়ই নির্ণয় করবে তা ইসলামী কিনা। একজন অন্য ধর্মের সাহিত্যিক যেমন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের লেখাও ইসলামী হতে পারে যদি তা ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আবার একজন মুসলিমের লেখাও অনৈসলামী হতে পারে যদি তা ইসলামের মূল বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।

www.pathagar.com

গল্প, উপন্যাস বা কবিতার বিষয় কি হবে, গল্প উপন্যাসের মূল চরিত্র বা পার্শ্ব চরিত্রের বর্ণনা, নায়ক, প্রতি-নায়কের সংলাপের কতটুকু স্বাধীনতা রয়েছে ইত্যাদি বিষয় তিনি আলোকপাত করেছেন। আবদুল মান্নান তালিব প্রায় ১৭৬টির মত গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। এসবের মধ্যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ, অনুবাদ, কাব্যানুবাদ, ইসলামী তত্ত্বমূলক গ্রন্থ, ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলনের গ্রন্থ, ইতিহাস বিষয়ক, কুরআন হাদীসের অনুবাদ, শিশু সাহিত্য প্রভৃতি রচনা করেছেন।

সম্পাদনা করেছেন প্রবন্ধ, সাহিত্য পত্রিকা, শিশু সাহিত্য পত্রিকা ও আইন বিষয়ক পত্রিকা। তরুণ বুদ্ধিদীপ্ত লেখকদের তিনি আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। তাঁর সম্পাদিত মাসিক পৃথিবী, মাসিক কলম ও বাংলা সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি তরুণ লেখকদের মধ্যে সাড়া জাগাতে পেরেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সাহিত্য ক্লাস, ডিসকোর্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও দরসের মাধ্যমে আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন। গড়ে তুলেছেন একদল সৃজনশীল সাহিত্যিক, একদল চিন্তক, গবেষক।

নারী জাগরণ, নারীর আধুনিকায়নের জন্য ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' তাঁর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমের শেকড়ের সন্ধান দিয়েছেন তিনি 'বাংলদেশে ইসলাম' নামক একটি উচ্চাঙ্গের গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করে।

আবদুল মান্নান তালিব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। শিশু সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি ছোট্ট সোনামণিদের জন্য মজার মজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। সহজ পড়া, ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, এসো জীবন গড়ি, পড়তে পড়তে অনেক জানা, মা আমার মা, আমাদের প্রিয় নবী, মজার গল্প, কে রাজা, হাতিসেনা কুপোকাত প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য শিশুতোষ রচনা। মা আমার মা, কে রাজা, হাতিসেনা কুপোকাত– তাঁর পরীক্ষামূলক শিশুতোষ গ্রন্থ। এগুলোর কোন কোনটিতে তিনি কুরআনী বাক্য বিন্যাস অর্থাৎ গদ্য-পদ্যের মিশেল করেছেন। চমৎকার তাঁর বাক্য রচনা পদ্ধতি। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে আবদুল মান্নান তালিবের অবদান অসামান্য। প্রায় শতাধিক গ্রন্থ তিনি বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

এসব গ্রন্থ কোনটি সাহিত্যের, কোনটি কুরআন হাদীসের আবার কোনটি তত্ত্বময় বিশ্লেষণাত্মক। তাফহীমুল কুরআন, সহীহ আল বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন, মুসলিম শরীফের মুকাদ্দমা, রাসায়েল ও মাসায়েল, সীরাতে সরওয়ারে আলম, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, পয়গামে মোহাম্মদী, খতমে নবুয়ত, ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ, আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি, ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বীমা, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ভাষাভিত্তিক জাহেলিয়াতের পরিণাম, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি, ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের শর্তাবলী, চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান প্রভৃতি তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য ফিরিস্তি।

www.pathagar.com

ব্যক্তি আবদুল মান্নান তালিব একজন কামেল দরবেশ ছিলেন বলে আমার বিশ্বাস। তিনি অতি সাধারণ অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশভূষায় চলাফেরা করতেন। সাহিত্যের কারণে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর বাসায়, কর্মস্থলে বহুবার আমি তাঁর সান্নিধ্যে যাবার সুযোগ পেয়েছি। সাহিত্য ও ইসলাম প্রসঙ্গে তাঁর সাথে আমার দীর্ঘ আলাপচারিতা হয়েছে। নিকট থেকে তাঁকে অনেক বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, অথচ নিরহংকার মনে হয়েছে। তিনি অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান অতি সহজে দিতে পারতেন। কুরআনের আলোকে আধুনিক যুগে সাহিত্যের বিভিন্ন জটিল তত্ত্ব তিনি পরিবেশন করেছেন। তিনি যে পরিমাণ জানতেন তার খুব কম অংশই প্রকাশ পেয়েছে। কবিতায় তাঁর দক্ষতা ছিল। কুরআনের ধারাবাহিক কাব্যানুবাদ হয়েছে 'পৃথিবী' নামক পত্রিকায় কিন্তু গ্রন্থাকারে তা এখনও প্রকাশ পায়নি। কবিতাও তিনি লিখেছেন প্রথম দিকে কিন্তু তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়নি। সমাজ, আইন ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়েও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তা গ্রন্থাকারে খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, পাণ্ডিত্য, ইসলামী তত্ত্বজ্ঞান অনেক বেশি ছিল। অনেকে তাঁর কাছে থেকেও তাঁকে পুরো অনুধাবন করতে পারেননি– তাঁর চিন্তার আধুনিকতাকে স্পর্শ করতে পারেননি। তিনি গবেষণা ও সাহিত্যের মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি ও সংস্কার ঘটাতে প্রয়াস পেয়েছেন, সার্থকও হয়েছেন।

www.pathagar.com

বহুমাত্রিক
আবদুল মান্নান তালিব

মোশাররফ হোসেন খান

২২ সেপ্টেম্বর ২০১১। এই দিনে চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, অনুবাদক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রিয় ভাই—আবদুল মান্নান তালিব। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন একজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব। গোটা জীবন তিনি সাহিত্য, মুসলমানদের কল্যাণ ও ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও প্রসারে অতিবাহিত করেছেন। আপন ধর্ম, ঐতিহ্য, জাতীয় পরিচয় ও সত্যের সন্ধানে তিনি নিবেদিত ছিলেন। তাঁর গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশাল চত্বর। তিনি ছিলেন এক বিরল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। একই সাথে তিনি কুরআন, হাদীস, ফেকাহ, আইন, ইতিহাস, আন্তঃধর্ম, সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য, কবিতা, ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতেন।

আমাদের সমাজে একই সাথে এতো গুণের সমাহার তেমনটি দেখা যায় না। এখানে যাঁরা সাহিত্য করেন সাধারণত তাঁরা অন্য বিষয়ে আগ্রহী থাকেন না। আবার যাঁরা গবেষণা বা অনুবাদে অবদান রাখেন তাঁরা মৌল সাহিত্যের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হন না। যাঁরা আরবি জানেন তাঁরা হয়তো অনুবাদ করতে পারেন, কিন্তু মৌলিক সাহিত্যে তেমন অবদান রাখতে সক্ষম হন না। এক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন দু'ধারী তরবারির মতো। তিনি সকল বিষয়ে সমান দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের ছাপ রেখেছেন। এটা একটি বিস্ময়কর বিষয় বটে!

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন কুরআন-হাদীসে সুবিজ্ঞ এবং সাহিত্য সাধনায় পথিকৃৎতুল্য। আল কুরআন ও হাদীস অনুবাদের পাশাপাশি ইসলামী নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি অনুবাদ ও রচনা করেছেন। শিশুদের মানস গঠনের জন্যও তিনি লিখেছেন প্রচুর।

আগেই বলেছি, আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী। তাঁর লিখিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহ সামনে রাখলে এই বক্তব্য আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

জ্ঞানপিপাসা ছিল তাঁর অদম্য। আজীবন পঠন-পাঠন ও জ্ঞানপিপাসায় ছিলেন তিনি অতৃপ্ত এক চাতকের মতো। ১৯৮৬ সালের কথা। একবার একটি পত্রিকায় ইতিহাস বিষয়ক একটি বইয়ের পরিচিতি ছাপা হয়েছিল। ঠিকানা দেয়া ছিল শান্তিনগর। বাসার নম্বরটিও বইটিতে দেয়া ছিল। বইটি সম্ভবত ইতিহাস বিষয়ক ছিল যতদূর মনে পড়ছে। তালিব ভাই আমাকে নিয়ে এক সন্ধ্যায় বের হলেন বইটির খোঁজে। আমরা তিন ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করেও ঠিকানার হদিস পাইনি। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। তালিব ভাই বইটি না পেয়ে সেদিন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। এমন জ্ঞানতৃষ্ণাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা সমাজে বিরল।

তালিব ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ১৯৮৬ সাল থেকে। এটা হলো সাক্ষাৎ-পরিচয়ের কাল। এর আগেও তাঁর সাথে পরিচয় ছিলো লেখালেখির ময়দানে। পরিচয়ের পর থেকেই আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে, যা অব্যাহত ছিল শেষ পর্যন্ত। যতবারই তাঁকে দেখেছি, যত বেশি তাঁকে দেখেছি, তাঁর যত কাছাকাছি গিয়েছি, বলতে দ্বিধা নেই, ততই মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর মধ্যে এক সম্মোহনী শক্তি ছিলো। ছিলো মানুষকে কাছে টানার, আপন করে নেওয়ার এক অপরিসীম দক্ষতা ও ক্ষমতা।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন স্বল্পভাষী। বিনয় ও ভদ্রতা ছিলো তাঁর একান্ত ভূষণ। যেটা এই সমাজে সহজলভ্য নয়।

কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাশীল লেখক ও গবেষকরা মানুষের কথা ভাবেন। সমাজের কথা ভাবেন। দেশ ও জাতির কথা ভাবেন। বিশ্বের কথা ভাবেন এবং সেটা প্রকাশ করেন তাঁদের লেখা ও বক্তব্যে। কিন্তু তাঁদের নিয়ে ভাববার তেমন কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। দুর্ভাগ্যের তো বটেই! যাঁরা গোটা জীবনটাই ব্যয় করেন সৃষ্টিশীলতায়, দেশ জাতির জন্য, শেষ পর্যন্ত তাঁরাই থেকে যান সকল প্রকার হিসাবের বাইরে। অতীত ও বর্তমান তো সেই সাক্ষ্যই বহন করে।

তালিব ভাইয়ের জীবনও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। নানা মাত্রিক লাঞ্ছনা, অপমান, অবহেলা তাঁকেও বারবার স্পর্শ করেছিলো। লেখকদের জীবনে যে ধরনের বিড়ম্বনা ও বিসম্বাদ আসে, তাঁর জীবনেও তেমনটি এসেছিলো। গুণীর মর্যাদা পাওয়ার প্রত্যাশা করা কিংবা সৃষ্টিশীল কাজের বিনিময় পাওয়া এই সমাজে আদৌ কি সম্ভব! তেমনটিই আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত বেদনার সাথে। জানি না এই বেদনার ভার আর কতদিন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বয়ে বেড়াতে হবে!

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের জীবন-সাধনা

ড. মাহফুজ পারভেজ

১.

সাধারণ বিবেচনায় সমাজে এখনো গতানুগতিক ধরনের একটি চাকরিই অনেকের কাছে পরমার্থ। নিজে লক্ষ্য করে দেখেছি, অনেক মানুষই নিশ্চিন্তে জীবনভর চাকরিটি করার স্বপ্ন দেখার পর আর কিছু দেখার ক্ষমতা রাখেন না। অথচ ইতিহাস সেইসব মানুষকেই বেশি শ্রদ্ধা করে, যারা কোনো রকম একটা চাকরি বা জীবন যাপনের পরিবেশ পেলেই মেনে নেন না, যারা নিজেরা নৈরাশ্যে ভুগে অপরকে দংশন করে সময় কাটাতে ভালোবাসেন না, যারা নিজের ব্যর্থতার জন্য অন্যের উপর দোষারোপ না করে নিজেকে উন্নততর করে নিতে চান, নিজের আদর্শকেই জীবনভর সামনে রাখতে চান এবং যারা অজানার পথে পা দিতে দ্বিধা করেন না। হয়ত তাদের কাজের মাধ্যমে নাম-যশ-অর্থ কিছু কিছু আসে বটে, কিন্তু কাজটি কেবল বস্তুগত তুল্যমূল্যে পরিমাপের বিষয় তারা কখনোই ভাবেন না। তারা কাজ করতে করতে নিজের ভেতরে একটি অবিনশ্বর সত্যকে দেখতে পান। একটা বড় ট্রুথ বা কেন্দ্রীয় সত্য তার সামনে চলে আসে। এই ট্রুথ তাকে কাজে লিপ্ত করতেই থাকে। তার আর রিটায়ার করা হয় না। এঁরাই শ্রদ্ধেয় হন; সাধারণের মধ্যে হয়ে ওঠেন অসাধারণ। এঁরাই কর্মবীর হয়ে ওঠেন। মূলত তাঁরা একটি সাধন-ার জগতে বসবাস করেন। তাঁদের চাকরি বা পেশা সাধনার অধীনে চলে আসে। সাহিত্যিক-গবেষক আবদুল মান্নান তালিব পুরোটা জীবন

www.pathagar.com

পরিপূর্ণভাবে একটি সাধনার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন। তাঁকে নিয়ে কিছু লেখার সময় তাঁর 'জীবন–সাধনা'র মূল সত্যটিই বার বার বড় হয়ে চোখের সামনে চলে আসছে। এ বিষয়টিকেই আমি এখানে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

২.

সাহিত্যিক-গবেষক আবদুল মান্নান তালিবের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় হয়নি, এমন কি কোথাও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎও হয়নি। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই এখানে উল্লেখ করছি যে, পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ দূরে থাকুক, তাঁকে আমি কোনোদিন দেখিওনি পর্যন্ত, তথাপি আমি তাঁর সম্পর্কে জানি, এই দাবিও আমি করতে পারি। প্রধানত দু'টি সূত্রে আমি তাঁর সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

প্রথমত, আবদুল মান্নান তালিবকে যারা গভীরভাবে দেখেছেন এবং তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন, এমন কয়েক জনের সঙ্গে আমি পরিচিত, যাদের কাছ থেকে আমি তাঁর সম্পর্কে একটি তথ্যনিষ্ঠ চিত্র পেয়েছি। এক্ষেত্রে অন্তত দু'জনের নামোল্লেখ করা যেতে পারে– একজন সম্পাদক আবুল আসাদ এবং অন্যজন ছড়াকার সাজজাদ হোসাইন খান।

দ্বিতীয়ত, আবদুল মান্নান তালিবের গ্রন্থরাজি ও লেখালেখি, যার মাধ্যমে তাঁর জীবন-দর্শন ও আদর্শ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া সম্ভব। তাঁর 'জীবন-সাধনা'র মূল ভাবনাটিও জানা সম্ভব।

এই দু'টি সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর পরিচ্ছন্ন 'জীবন-সাধনা' পরিপূর্ণ অনুধাবন করতেও অসুবিধা হয় না।

৩.

প্রসঙ্গত আবদুল মান্নান তালিবের সময়কালের একটি প্রেক্ষাপটগত চিত্র আমাদের সামনে রাখলে তাঁর সম্পর্কে পর্যালোচনাটি ভালোভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। তাঁর কর্মকাল মোটের উপর একটি সঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। যখন উপনিবেশোত্তর উপমহাদেশে নবসৃষ্টির একটি প্রবণতা সকলের মধ্যেই ক্রিয়াশীল ছিল এবং সকলেই নিজের বিশ্বাস ও আদর্শের অনুকূলে সমাজ বিনির্মাণে প্রয়াসী হন, তখন তাঁর আবির্ভাব। রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বকে দৃঢ়মূল করতে তখন পরিচালিত হয় অনেক সাংস্কৃতিক উদ্যোগ। এ কাজে প্রথম এগিয়ে আসে কমিউনিস্টরা যার নেপথ্যে কাজ করেন সত্যেন সেন, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখ যে ধারাটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক ধারায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বর্তমানে তাতেই অঙ্গীভূত ও লীন হয়ে গেছে। বিপরীত দিকে, একটি মুসলিম-জাতীয়তাবাদী চেতনাও তখন বিকাশ লাভ করেছিল ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ড. হাসান জামান প্রমুখের মাধ্যমে। আবদুল মান্নান তালিব বেছে নিয়েছিলেন একটি তৃতীয় পথ যা উজ্জীবিত হয়েছিল ইসলামী আন্দোলনের দার্শনিক ভাবধারায়। বলতে দ্বিধা নেই, অত্যন্ত নিঃসঙ্গ ও একাকী পথিক হিসাবেই তাঁকে শুরু করতে হয়েছিল তাঁর বিশ্বাসের জমি তৈরির কাজটি; তাঁর বিশ্বাস ও ভাবসম্পদকে

www.pathagar.com

বিকশিত করার প্রচেষ্টাটি। সে সময় দার্শনিক ও রাজনৈতিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পাটাতন গড়ে তোলা খুব সহজ কাজ ছিল না। কেননা স্থানীয়ভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদ তখন এখানকার জনমানসকে আচ্ছন্ন করেছিল উত্তুঙ্গ আবেগে। পাশাপাশি বাইরের আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে এসে হানা দিয়েছিল আরেক উগ্র মতবাদ– কমিউনিজম। তলে তলে বৃদ্ধি পাচ্ছিল দেশজ জাতীয়তাবাদের উগ্র রণমূর্তিও।

এমনই দ্বন্দ্বমুখর-ত্রিকোণ বিন্যাসে আকীর্ণ পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারূপে ইসলামকে উপস্থাপনের প্রয়োজনে অনেক চ্যালেঞ্জ বা কর্তব্যকর্ম তাঁর সামনে ছিল:

১. বাংলা ভাষায় সঠিকভাবে ইসলামকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তুলে ধরার প্রয়োজনে ইসলামী সাহিত্যের নির্মাণ;
২. ঔপনিবেশিক আক্রমণে বিকৃত-ইতিহাসের শুদ্ধিকরণ;
৩. চিন্তা ও জ্ঞানের নানা শাখার ইসলামীকরণ;
৪. ইসলামের সাংস্কৃতিক রূপরেখাকে দেশজ আঙ্গিকে সাজানো;
৫. রাজনৈতিক আন্দোলনের সহযোগী সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর বিকাশ সাধন; এবং
৬. ইসলামের সপক্ষে একটি সার্থক সমাজ বিনির্মাণের উপযুক্ত সাংস্কৃতিক জনশক্তি গঠন ইত্যাদি।

৪.

আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী আন্দোলনের বিশাল ময়দানের উপর্যুক্ত ক্ষেত্রগুলোতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদিত করেন। আরো স্পষ্টভাবে বলা ভালো, ইসলামী আন্দোলনের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে নিয়ে তিনি গভীর ধ্যানীর মতো, নিবিষ্ট কর্মীর মতো, প্রাণবন্ত চিন্তকের মতো বহুমাত্রিক তৎপরতায় মগ্ন ছিলেন। এই কর্মক্ষেত্রই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর 'জীবন-সাধনা'। লেখনী, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার মাধ্যমে তিনি তিল তিল করে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে থাকেন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নবমূল্যায়নের মানদণ্ডরূপে ইসলামী বিশ্লেষণী ধারার সূচনা করেন; জীবন-জগত-সমাজ-সংসার-ভাষা-সংস্কৃতিসহ সকল সামাজিক-মানবিক-নন্দনতাত্ত্বিক প্রপঞ্চকে নিয়ে নিরন্তর অধ্যয়ন-গবেষণা-চর্চা করতে থাকেন; বিশেষ করে তাঁর কালের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইসলামের নিরিখে জীবন-জিজ্ঞাসার একটি তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতেও তিনি সক্ষম হন। তাঁর সাধনার ক্ষেত্র ছিল বিরাট; তিনি ছিলেন প্রায় একাকী। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ছিল নিরেট গাঁথুনিতে বোনা– মজবুত। এক জীবনে যে বিশাল রচনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন আর যে বিপুল ও সংখ্যাতীত মানুষকে তিনি প্রাণিত করেছেন, তাতে তাঁর শ্রম, প্রচেষ্টা, মিশন তথা সামগ্রিকভাবে তাঁর 'জীবন-সাধনা' সফল হয়েছে। তিনি তৎকালের সমাজের নিরিখে বিরূপ পরিস্থিতি ও ভ্রান্ত মানসিক জগতের কাঠামোতে শাশ্বত আলোর বান নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর সংগ্রাম ও সাধনা ব্যক্তি থেকে সমাজে-সংগঠনে প্লাবিত হয়ে উদ্ভাসিত করেছে আমাদের চারপাশ।

www.pathagar.com

আজ বাংলাদেশে, স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী শূন্যতায়, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র আর পুঁজিবাদের অমানবিকতার বিরুদ্ধে সর্বজনীন-কল্যাণকর বিকল্পরূপে ইসলামের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সম্ভাবনার জ্বলন্ত সত্য যখন সকলের সামনে অতিদ্রুত, অতিবাস্তব আবহে উন্মোচিত হচ্ছে, তখন পেছনের প্রস্তুতিপর্বের সংগ্রামমুখর আদি দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকালে পথিকৃতের মতো দেখতে পাওয়া যায় আবদুল মান্নান তালিবকে; তাঁর 'জীবন-সাধনা'কে। তিনি, আবদুল মান্নান তালিব, ইতিহাসের সমান্তরালে আমাদের জাতিসত্তার অতীত ও বর্তমানের পরম্পরাগত সেতুবন্ধের মতো পথ-নির্দেশক হয়ে ভবিষ্যতের অনিবার্য বিজয়ের মহাসড়কের পথে সবাইকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন তাঁর অনিঃশেষ 'জীবন-সাধনা'র আলোকোজ্জ্বল সৌন্দর্যে।

www.pathagar.com

নবীন লেখকের অভিভাবক
অধ্যাপক আশরাফ জামান

এক.

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, সুস্থ চিন্তাধারার লেখক ও সংগঠক মওলানা আবদুল মান্নান তালিব এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার আহ্বানে চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হলো যা কোনদিন পূরণ হবার নয়।

একজন আদর্শবাদী সাহিত্যিক এবং সংগঠক হিসেবে সারা জীবন তিনি নিরলস কাজ করে গেছেন। বিশ্রাম নিতে পারেননি কখনো। মহান করুণাময় এজন্যই বোধ হয় তাঁকে চিরবিশ্রাম দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন!

তালিব ভাইয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পূর্বে পরিচয় হয়, তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সম্ভবত দৈনিক সংগ্রাম অফিসে এ পরিচয়। তারপর ঘনিষ্ঠতা। এর কিছুদিন পর তিনি যখন নিউ এলিফ্যান্ট রোডস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে বসতেন তখন আমি গাজীপুর জেলার জামালপুর কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক পদে চাকরি করি। সে সময় তিনি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কলম' ও গবেষণা 'মাসিক পৃথিবী' দু'টি সম্পাদনা করতেন। কলমে আমার লেখা কবিতা ও প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশ করতেন। কয়েকটি লেখা প্রকাশ পেলে ঢাকায় এসে উনার কাছ থেকে তার সম্মানী নিয়ে যেতাম। সে তরুণ বয়সে লেখার জন্য সম্মানী পাওয়া আমার কাছে বিরাট পাওয়া ছিল। সম্ভবত

www.pathagar.com

সময়টা ১৯৮২-৮৩ সাল হবে। উনি আমাকে লেখা পাঠানোর তাগিদ দিতেন, উৎসাহ দিতেন ভাল লেখার জন্য।

তালিব ভাইয়ের কাছে দেশের ও পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের ধারা সম্পর্কে অনেক কিছু শুনতাম। একদিন আমি উনাকে সাহিত্য সংগঠন তৈরির ব্যাপারে প্রস্তাব রাখলাম। বললাম, তালিব ভাই! দেখুন দেশে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে ইসলামপন্থীদের কোন সাহিত্য সংগঠন নেই, অথচ বামপন্থীদের লেখক শিবিরসহ অনেক সংগঠন রয়েছে। নাস্তিক্যবাদী বা ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠনে আমরা যেতে পারি না।

পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য পরিষদ গঠিত হলো। অবশ্য আমি দূরে থাকার জন্য যোগাযোগ রাখতে পারিনি। তবে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায়ই হতো। আমি একজন সদস্য হিসেবে সুদূর টাঙ্গাইল থেকে এসেও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতাম।

১৯৮৭ সালের শেষের দিকে টাঙ্গাইলে একটি কলেজে চাকরির উদ্দেশ্যে চলে গেলাম। মাঝে মধ্যে এসে মগবাজারে সংগ্রাম ও সোনার বাংলা অফিসে যেতাম লেখার সম্মানী বিল আনা ও নতুন লেখা দেওয়ার জন্য। এ সময় তালিব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম বাংলা সাহিত্য পরিষদ অফিসে। তিনি ছিলেন সাহিত্য পরিষদের পরিচালক। তালিব ভাই আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। আমি তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ ছিলাম। তাঁর সাক্ষাতে কোন দিন চা-বিস্কুট বা অন্যকিছু না খেয়ে চলে এসেছি তা মনে পড়ে না। এ গুণ দেখেছি মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে। এক সময় সাংবাদিকতার দায়িত্ব পালন করতে গেছি সন্তোষের বাড়িতে। ভাসানী হুজুর কখনো কিছু না খেয়ে আসতে দেননি।

নিরহংকারী এই জ্ঞানতাপস অত্যন্ত ভদ্র, শান্ত ও বিনয়ী ছিলেন। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষা জানতেন। তাঁর রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দুইশ'। আল্লামা ইকবালের কবিতার বঙ্গানুবাদ করেছেন। মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর তাফহীমুল কুরআনের উর্দু তরজমা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর পদ্য ও গদ্যের ভাষা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল। সব জাতীয় লেখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

দুই.

সুসাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। তাঁর রচিত ও প্রদর্শিত সাহিত্যধারা গড্ডালিকা প্রবাহের মতো নয়, ছিল আদর্শভিত্তিক। এক সময়কার অনেক নবীন লেখক তার পরিচর্যায় ধীরে ধীরে পরবর্তী সময়ে লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আমার মতো লেখকের তিনি ছিলেন শিক্ষক। ছিলেন সাহিত্য সাধনার পথিকৃৎ।

তালিব ভাই সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন। একটা ধারণা দিয়ে বলতেন, দেখুন, গল্প-উপন্যাস এভাবে লিখুন। বলতেন, তার মধ্যে থাকবে গল্প এবং সমাজকে দিতে হবে নির্দেশনা।

www.pathagar.com

আমি উপন্যাস লিখি জেনে আমাকে উপন্যাস লেখার স্টাইল ও বক্তব্য কি হওয়া উচিত এমন ধারণা দিলেন। তিনি বললেন, আপনি কলকাতার আধুনিক লেখক সমরেশ মজুমদারের কালপুরুষ বইটি পড়ুন। এর নায়ক অর্ক চরিত্রটি লেখক কত সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছেন লক্ষ্য করুন। সেখানে সমাজের চিত্র অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। ভাষার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের মতো সহজ সরল ভাষা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

তালিব ভাইয়ের সাহিত্য সম্পর্কিত উপদেশ শুনে বুঝতে পারতাম অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পর্কে। তিনি উপন্যাস না লিখলেও ইংরেজি ও বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান রাখতেন। একদিন আমাকে একটি উপন্যাস লেখার উপকরণ বা ধারণা দিলেন। বললেন, ভালো হলে তা বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করবেন। 'নতুন সূর্য' নামে একটি উপন্যাস লিখে তার পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলাম।

আমার লেখা প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থের একটি শুভেচ্ছা কপি তালিব ভাইকে উপহার দিতাম। আমার প্রকাশিত 'অধ্যাপক' উপন্যাস পড়ে প্রশংসা করেছিলেন তালিব ভাই।

তিন.

তালিব ভাই ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও সদালাপী। তাঁর অফিসে গেলে লেখার কাজ বন্ধ করে কথা বলতেন। কখনো একটু বিরক্ত হতে দেখিনি। আমি তাঁকে কখনো অধীনস্থদের সঙ্গে জোরে বা ধমকের সুরে কথা বলতে শুনিনি।

বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের দুরবস্থা ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তালিব ভাই অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মাসিক পৃথিবী, দৈনিক সংগ্রাম, সোনার বাংলাসহ অন্যান্য পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছিলেন নিরলস কলম সৈনিক। মৃত্যুর কয়েক দিন আগেও লিখে গেছেন। সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা সভা ও সেমিনারে তালিব ভাই গঠনমূলক বক্তব্য পেশ করতেন। মৃত্যুর মাত্র মাস তিনেক আগে সুসাহিত্যিক অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান-এর জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য শুনলাম। অনুষ্ঠান শেষে দেখা হলো, কুশল বিনিময় হলো। এটাই ছিল আমার শেষ দেখা। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি এ ধরাধাম থেকে চলে গেছেন। কিন্তু এখনও পরশ আমি সব সময় অনুভব করি।

চার.

'ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন' নামক গ্রন্থে সুলেখক আবদুল মান্নান তালিব ইমামের জীবনের শৈশব থেকে শুরু করে যৌবন ও মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক কাজকে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষায় লেখা এ জাতীয় গ্রন্থ বিরল। ইসলামের আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে সারা জীবন ইমামকে জেল-জুলুম, এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। ইমামকে ইসলাম প্রচারের বন্ধুর পথ ধরে চলতে গিয়ে অনেক

www.pathagar.com

শাসকের রোষানলে পড়তে হয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার চরিত্র সম্পর্কে লেখক লিখেছেন, 'নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা যেমন ইমামের লক্ষ ছিল না তেমনি অসৎ আলেমদের প্রভাব থেকে সরকারকে মুক্ত করাও ছিল একটি প্রধান উদ্দেশ্য। মুসলমানদের চিন্তা, আকীদা, বিশ্বাস ও কর্মকে সকল প্রকার শিরকের আবিলতা মুক্ত করে প্রভাত সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল করে তোলা এবং আল্লাহর দীনকে সব রকমের জড়তা ও বিভ্রান্তিমুক্ত করে সজীব ও সচল করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা।'

মিসরের সুলতানের রোষানলে পড়ে ইমাম তাইমিয়াকে কারাগারে যেতে হয়। তিনি কারাগারে গিয়ে কয়েদীদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে থাকেন। কারাগার পরিণত হয় মাদ্রাসায়।

আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন, 'ইমাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া সত্যের খাতিরে কখনো রাজদণ্ডের ভ্রূকুটির পরোয়া করেননি। সত্যের তিনি ছিলেন উলঙ্গ প্রকাশ। ...জালেম শাসকের সামনে হক কথা বলা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।'

ইমাম তাইমিয়া ছিলেন একজন মর্দে মুজাহিদ। সিরিয়া, মিসর, ইরাকসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। একদিকে ইসলামবিরোধী শক্তি অন্যদিকে একশ্রেণীর আলেম ও রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী করেছে তাঁর উপর জুলুম, অত্যাচার, কিন্তু কোন বাধাই তাঁকে দীন প্রচারের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। লেখক মাত্র ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে ইমাম তাইমিয়ার জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় লিখেছেন।

পাঁচ.

আবদুল মান্নান তালিবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ হচ্ছে, 'সত্যের তরবারি ঝলসায়।'

এতে লেখক রসূল স.-এর নেতৃত্বে পরিচালিত বদরযুদ্ধের অবস্থান, পটভূমি, প্রেরণাসহ যুদ্ধের সাফল্যের বর্ণনা সুন্দর করে উপস্থাপন করেছেন। এ যুদ্ধ পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল তার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'এ যুদ্ধ মুসলমানদের জন্য জয় ও পরাজয়ের একটি বিধান লিখে দিয়ে গেছে। মুসলমানদের ও ইসলামের বিজয় এ বিধানের বাইরে সম্ভবপর নয়।'

রসূলের সহযোগী, তাবেয়ী এবং ইসলামের মর্দে মুজাহিদ কয়েকজন দীনি নেতার জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থটিতে। যাঁরা ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সংগ্রামে সারা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। প্রয়োজনে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দীনের দাওয়াত প্রচার করতে কুণ্ঠিত হননি। এজন্য জেল-জুলুম, অত্যাচার এমনকি মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছেন। লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন দীনি সংগ্রামী মানুষদের।

লেখক বইটিতে তুলে ধরেছেন আদর্শ মুমিন সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ইমাম আওযায়ী, ফুযাইল ইবনে ইয়ায, ইমাম সুফিয়ান, ইমাম হাযেম,

www.pathagar.com

শায়খ আবদুল আযীয, ইমাম আবু হানিফা প্রমুখের জীবনালেখ্য। তাঁদের স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন।

ছয়.

সাহিত্য মানব জীবনের দর্পণ। সাহিত্যের রূপ আদর্শ কেমন হবে তা নিয়ে রূপকারদের নানাজাতীয় মতামত যুগে যুগে প্রকাশ পেয়েছে। ম্যাথু অর্নল্ড থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহু সাহিত্যিক তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। আবদুল মান্নান তালিব তাঁর এ বিষয়কেন্দ্রিক গ্রন্থ 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান'-এ ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন।

গ্রন্থটিতে লেখক দার্শনিক অভিব্যক্তি প্রথম প্রকাশ করেছেন মানুষের জীবন ও জগত সম্পর্কে। স্রষ্টা কে? মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। লেখক বলেছেন, 'হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্য। বাইরের কোন কিছু সূক্ষ্মভাবে অনুভব করার পর ব্যক্তিমাত্রই তা প্রকাশের আকাঙক্ষা পোষণ করে। সাহিত্যিক হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম অনুভবকে অলংকার, রূপক, ছন্দ এবং ভাষা ও শব্দের কারুকার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক নিবিড়।'

সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'সাহিত্য নিছক শিল্পের প্রয়োজনে সৃষ্টি (Art For Art's Sake) নয়। তিনি লিখেছেন, 'মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যবিহীন কোনো বিষয়ের কথা কল্পনাই করা যায় না। সে উদ্দেশ্য ভালো হতে পারে মন্দ হতে পারে, ছোট হতে পারে বড়ও হতে পারে। তেমনি সাহিত্যেরও উদ্দেশ্য রয়েছে।' তিনি লিখেছেন, 'ইকবাল তাঁর কবিতায় এমন কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছেন যা পূর্ণ সাহিত্যরসে সিঞ্চিত, কিন্তু সাথে সাথে তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সহজ প্রকাশও তার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছে। যেমন তিনি গতি দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম প্রবণতাকে 'প্রেম' নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই প্রবণতা থেকে তাঁর কাব্যের একটি স্বতন্ত্র চরিত্র সৃষ্টি করেছেন শাহীন, ইকাব, কালিন্দর ও মর্দে মমিন নামে।'

ইসলামী সাহিত্য বলতে লেখক সেই সাহিত্যকে বলেছেন যা মানবতাকে নৈতিকতার অনৈসলামী মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে আনে এবং তাকে ইসলামী মূল্যবোধের দিকে আহ্বান জানায়। ইসলামী সাহিত্যে Art For Art's Sake-এর স্থান নেই। লেখকের মতে ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব রকম জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর। লেখক ইসলামের দৃষ্টিতে দু'টি যুবক-যুবতীর বৈধ প্রেমকে ন্যায়সঙ্গত বলেছেন। তবে সে প্রেম হতে হবে নৈতিকতার সীমানার মধ্যে।

লেখক বলেছেন, 'ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, কোনো অমুসলিমের হাতে সৃষ্টি হলেও তা ইসলামী সাহিত্য।' এখানে লেখক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ভাই গিরিশচন্দ্র প্রমুখের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে মুসলিম লেখকদের লেখার মধ্য দিয়ে ইসলামী সাহিত্যের বীজ বপন করা হয়েছে বলে লেখক মন্তব্য করেছেন।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের শিশু সাহিত্য

শরীফ আবদুল গোফরান

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যে আবদুল মান্নান তালিবের অবদান স্মরণীয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে বড়দের আসরের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও ছোটদের জন্য তিনি মূল্যবান অবদান রেখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। শিশু পত্রিকা ও বড়দের পত্রিকায় শিশু বিভাগগুলোর সঙ্গে আবদুল মান্নান তালিবের সংস্রব ছিল বলে তিনি শিশুর মন বুঝতেন। শিশু বিভাগ পরিচালনা, ছোটদের রচনার সংশোধন, প্রকাশক হয়ে তিনি নিজেই শিশু সাহিত্যিকরূপে খ্যাতিমান হলেন।

সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব শিশু সাহিত্যের সকল গলিতে প্রবেশ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁর জীবনীমূলক গ্রন্থই বেশি। কিন্তু নীরস জীবনী রচনা না করে তিনি গল্পাকারে জীবনের আদর্শ ও মহত্ত্ব তুলে ধরেছেন। আবদুল মান্নান তালিবের গল্পধর্মী জীবনী রচনায় ভক্ত প্রাণের নিবিড় পরিচয় বিম্বিত। মহৎ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে তিনি ছোটদের নিকট শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দময় বিপ্লবী জীবনের প্রত্যক্ষ ছবি প্রদর্শন করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব ঝরঝরে, সাবলীল ও গতিময় ভাষায় শিশুতোষ রচনাবলী লিখেছেন। তাঁর ব্যবহৃত আরবি, ফার্সি ও বাংলা শব্দের অর্থসংবলিত ব্যবহার শিশু সাহিত্যের ধারাকে সহজ, সরল,

www.pathagar.com

প্রাঞ্জল ও উজ্জ্বল করেছে। প্রচলিত আরবি, ফার্সি শব্দের সার্থক প্রয়োগ ইসলামের ইতিহাসের চরিত্রগুলোকে জীবন্ত, বোধগম্য ও যথার্থ ঐতিহ্যানুসারী করতে সহায়তা করেছে। প্রত্যেক মহান ব্যক্তিত্বের চরিত্র বৈশিষ্ট্য গল্পের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে তাঁর শিশু সাহিত্যে। এতে শিশুরা আনন্দ, উল্লাস, ফুর্তির দোদুল-দোলায় আরোহণ করে মনীষীদের সঙ্গসুখ লাভে সমর্থ হয়। মহৎ জীবনের গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হয়। আবদুল মান্নান তালিব রচিত শিশুতোষ রচনাবলী : সহজ পড়া (১৯৮২), ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (১-৩ ভাগ ১৯৮০, ১৯৮১ ও ১৯৮২), ইসলাম শিক্ষা (১-২ ভাগ), ১৯৭৬, এসো জীবন গড়ি (১-২য় ভাগ, ১৯৭৫ ও ১৯৭৬), পড়তে পড়তে অনেক জানা (২০০০), মা আমার মা (২০০১), আমাদের প্রিয় নবী (১৯৭৫), মজার গল্প (১৯৭৬), কে রাজা (১৯৮১), হাতিসেনা কুপোকাত (১৯৯০) ও আদাবু আরাবিয়া (১৯৮৪)।

শিশু সাহিত্যে আবদুল মান্নান তালিবের প্রথম বই 'আমাদের প্রিয় নবী'। এ বইয়ের প্রতিটি লেখাই গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে বিভিন্ন শিশু-কিশোর পত্রিকায় 'অনেক কথা অনেক জানা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

'আমাদের প্রিয় নবী' বইয়ে তিনি যে সমস্ত ঘটনা সংযুক্ত করেছেন তা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ও প্রামাণিক। যেহেতু পাঠক-পাঠিকারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সে কারণে তিনি ঘটনার জটিলতা ও বিস্তৃতিকে কমিয়ে আলাদা আলাদা শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন। নবীচরিত কথার ধারা অনুসরণে তাঁর বিষয় বিন্যাসে কোথাও কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। একজন আদর্শ পুরুষ তথা ধর্মীয় নেতার জীবন ও চরিত্রের মূল কথা, নীতিনিষ্ঠা আর সুগভীর মানবতাবোধ নির্বাচনভিত্তিক ঘটনার বিন্যাস কোথাও গৌণ নয়।

'আমাদের প্রিয় নবী' গ্রন্থে আবদুল মান্নান তালিব গল্পাকারে ছোটদের জন্য আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যতগুলো গুণ থাকলে মানুষ সকল বিষয়ে সবার বড় হতে পারে তা তাঁর সবই ছিল। চৌদ্দ শ' বছরের বেশি অতীত হয়েছে, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়েই অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে, অথচ আমাদের প্রিয় নবীর অনুমোদিত সামাজিক রীতিনীতি ও আইন-কানুন আজও সবার অনুকরণীয়। তিনি সকল দেশের সকল যুগের আদর্শ মহাপুরুষ। নিরহঙ্কার স্বভাব, শত্রুমিত্র ভেদ না করে মানবসেবা ও পরম শত্রুকেও ক্ষমা করা, এসব ছিল আমাদের প্রিয় নবীর ইসলাম প্রচারের প্রধান অস্ত্র এবং এই অস্ত্রবলেই তিনি মানুষের মনকে সত্যিকারভাবে জয় করতে পেরেছিলেন। আবদুল মান্নান তালিব 'আমাদের প্রিয় নবী' গ্রন্থে হযরত মোহাম্মদ স.-এর অনেক অসাধারণ গুণের কথা প্রমাণসহ ছোটদের জন্যে গল্পে বর্ণনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ধর্মের ব্যাপারে সহিষ্ণুতা ও ঐশ্বর্যের মধ্যেও ভোগে নিরাসক্তি।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের 'হাতিসেনা কুপোকাত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তিনি আমাদের প্রিয় নবীর শিশুবোধ জীবনকথা বর্ণনায় যে স্টাইলের প্রবর্তন করেছিলেন, এ গ্রন্থেও তাই অনুসৃত। 'হাতিসেনা কুপোকাত' গ্রন্থটি তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের বীরত্বের একটি ঘটনাকে নিয়েই ছোটদের জন্য রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ছোটদের উপযোগী করে আওরঙ্গজেবকে নিয়ে এত সুন্দর করে গল্পাকারে আর কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ঘটনাবহুল জীবন ও বহু বিচিত্র গুণের পূর্ণ বা বিস্তারিত পরিচয় দেয়া সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি আওরঙ্গজেবের হাতির খেলার একটি ঘটনাকেই গল্পাকারে প্রকাশ করেছেন 'হাতিসেনা কুপোকাত' গ্রন্থে। আওরঙ্গজেব ছিলেন চিন্তায়, কথায় ও কাজে একজন খাঁটি মুসলমান। সকল বিষয়ে, সকল অবস্থায় ছিল তাঁর ইসলামের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। সব কিছুই তিনি করেছেন অকপট ধর্মবিশ্বাস থেকে। তাঁর জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কাজের প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তিনি জীবনে এমন কিছুই করেননি যা ইসলাম ধর্মানুমোদিত নয়। 'হাতিসেনা কুপোকাত' গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের পূর্ণ জীবনী না থাকলেও তাঁর একটি ঘটনাই প্রমাণ করে তিনি কত বড় একজন শাসক ছিলেন! আবদুল মান্নান তালিবের 'হাতিসেনা কুপোকাত' পড়লে সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবনটাই অলৌকিকভাবে সকল পাঠকের হৃদয়ে ভেসে উঠবে।

১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় আবদুল মান্নান তালিবের 'কে রাজা' গল্প গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি পশু-পাখিদের নিয়ে এত সুন্দর একটি গল্প লিখেছেন যা ছোটদের আনন্দ ও শিক্ষা গ্রহণের বড় মাধ্যম। 'কে রাজা' যদিও পশু-পাখিদের নিয়ে লেখা তবুও এতে আমাদের বর্তমান সামাজিক জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বর্তমানে আমাদের সমাজে হানাহানি, মারামারি ইত্যাদি ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব, 'কে রাজা' গল্প- গ্রন্থে লেখক তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'কে রাজা' গ্রন্থে আবদুল মান্নান তালিব পশু-পাখিদের সমস্যাগুলোই শুধু তুলে আনেননি, তিনি সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে তাও গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। 'কে রাজা' একটি সার্থক গল্প গ্রন্থ।

আবদুল মান্নান তালিবের 'কে রাজা' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশের পর ১৯৮১ সালেই তার নাট্যরূপ দেয়া হয়। বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী নুরুল কবির এ গল্পটিকে নাটকে রূপ দেন। পরবর্তীতে নুরুল কবিরের ব্যবস্থাপনায় ও আমার পরিচালনায় ধানমণ্ডি বয়েজ স্কুল মিলনায়তনে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। তখন 'কে রাজা' নাটকটি দর্শকদের মাঝে ব্যাপক সাড়াজাগায়। আমার জানামতে পরবর্তীতে নাটকটি দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে মঞ্চস্থ হয়। তাছাড়া আবদুল মান্নান তালিবের প্রকাশিত ছড়া-কবিতার বইও রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় তিনি একজন গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও কবি। একজন পূর্ণাঙ্গ শিশু সাহিত্যিক পূর্ণাঙ্গ মানুষ। বাংলা শিশু সাহিত্যের এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে আবদুল মান্নান তালিব স্পর্শ করেননি। তবে তাঁর সাহিত্য সাধনা

www.pathagar.com

ছিলো মুসলিম শিশু সাহিত্য বিকাশে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। আবদুল মান্নান তালিব আলোর জগতের একজন অভিসারী। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর পদচারণা রয়েছে। তাঁর বহু লেখা স্কুলপাঠ্য। লক্ষণীয়, তিনি তাঁর লেখায় শিশু-কিশোরদের জ্ঞানের রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানান। জ্ঞানের আলো জ্বেলে এই মনীষী অসংখ্য অপরিণত ছোট শিশুদের মনের অন্ধকার ঘোচান। উপদেশের সুরে আনন্দময় কথা ও ভাষা প্রয়োগ করে তিনি লিখেছেন ছড়া-কবিতা, লিখেছেন জ্ঞানানুসারী গদ্য। তাঁর শিশু সাহিত্য অল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে স্বল্প পরিসরে সামান্য আলোকপাত করা হলো মাত্র।

আবদুল মান্নান তালিব জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালের ১৫ মার্চ পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাটের অর্জুনপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম তালেব আলী মোল্লা, মা মেহেরুন্নেসা। তিনি মাকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু মায়ের স্নেহ তিনি বেশি দিন ভোগ করতে পারেননি। মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি মাকে ছেড়ে চলে আসেন। আমৃত্যু মায়ের ভালোবাসার তিনি কাঙাল ছিলেন। মায়ের আদর ভালোবাসার কথা তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। ভালবাসার কাঙ্গাল আবদুল মান্নান তালিব মায়ের জন্য আমরণ কেঁদেছেন। মৃত্যুশয্যায়ও হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে মায়ের জন্য চোখ মুছেছেন। সুহৃদদের বলেছেন, আমি মায়ের ভালোবাসা বেশি দিন ভোগ করতে পারিনি। এখনো মায়ের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মায়ের স্মৃতিকে নিয়ে আবদুল মান্নান তালিবের শিশুতোষ গ্রন্থ 'মা আমার মা'। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। এই গ্রন্থটি আবদুল মান্নান তালিব হৃদয় দিয়ে লিখেছেন যার সাথে জড়িয়ে আছে তাঁর মায়ের ভালোবাসা, স্নেহ ও স্মৃতি-নিংড়ানো কতো ইতিহাস। পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে আবদুল মান্নান তালিব একদিকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানের ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করেন, অপর দিকে দেশ-বিদেশের নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস তাঁর প্রিয় বিষয়। এ কারণে তিনি ইতিহাসের গ্রন্থ রচনা ছাড়াও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে গদ্যে-পদ্যে সহজ ভাষায় ছোটদের জীবন গঠনের সাহায্যকারীরূপে উপস্থাপন করেন। অসংখ্য কবি-সাহিত্যিকের প্রিয় শিক্ষক আবদুল মান্নান তালিব গল্পের মাধ্যমে ছন্দের ললিত ভঙ্গি সহযোগে, আদর্শ জীবনের ব্যাখ্যাসংবলিত যে পাঠ্য গদ্য-পদ্য রচনা করেছেন, তা শিশু-সাহিত্যের উজ্জ্বল আদর্শ। ছোট-বড় সবার এই প্রিয় মানুষটি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যখন হাসপাতালে শুয়ে ছিলেন তখন তাঁকে দেখতে গেলে তিনি দুঃখ করে বলেন, আমি কারো কাছে কিছু চাই না। আমাকে দেবেন আল্লাহ। আমি এখানে কিছু নিতে আসিনি, আমি এসেছি দিতে, অথচ আমার শিশু সাহিত্যগুলো সঠিকভাবে আমার প্রিয় পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি। যেসব প্রতিষ্ঠান আমার শিশুতোষ গ্রন্থগুলো প্রকাশ করেছে তারাও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেনি। তিনি চোখের পানি

www.pathagar.com

মুছতে মুছতে বলেন, আমার মায়ের ভালবাসায় সিক্ত 'মা আমার মা' বইটি পাঠকদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি। বাস্তবে তাই। এখন আবদুল মান্নান তালিবের শিশুতোষ বই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর শিশু সাহিত্যের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, যে জাতি গুণী মানুষের কদর করে না, সে সমাজে গুণী মানুষের জন্ম হয় না। এজন্য আমরা দুর্ভাগা জাতি। জীবিত থাকা অবস্থায় এসব বড় মানুষের জানার চেষ্টা ও মূল্যায়ন করা হয় না, অথচ মরার পর এসব জ্ঞানী মানুষের জীবন নিয়ে আলোচনা করার জন্য প্রথম কাতারে পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে বসে থাকে অনেকে। এসব মেকি ভালোবাসা পরিহার করে সত্যিকার আলোর পথে ফিরে না এলে সমাজের কোনদিন উন্নতি হবে না। আবদুল মান্নান তালিবরা যুগে যুগে এভাবে আসবেন, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে চলেও যাবেন। এজন্য ঋণী থেকে যাবো আমরা। ঋণী থাকবে গোটা জনগোষ্ঠী।

www.pathagar.com

একটি

কালো গোলাপ

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

'কালো ও সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'

জনপ্রিয় গানের এই লাইন দু'টি কার চোখ দেখে কবি রচনা করেছিলেন জানি না। তবে আমি একজন কালো হরিণ চোখের কালো মানুষ দেখেছি। বাগানে নানান বর্ণের গোলাপ দেখেছি। কালো গোলাপের শুধু নাম শুনেছি- চোখে দেখিনি। মনে হয়েছে ঘোড়ার ডিমের মতো- ঘোড়া কখনো ডিম দেয় না, একথা সবার জানা। তবে কালো রঙের গোলাপ আছে কিনা তা হলপ করে বলা যায় না।

সুদান, নাইজেরিয়া বা সোমালিয়ার মতো কালো মানুষ হয়তো বাংলাদেশে নেই। 'লোকটা কালো'-বলতে এদেশে যাদের বুঝায় তেমন একজন মানুষের সাথে একদিন পরিচয় হয়েছিল। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আর একজন উজ্জ্বল ফর্সা লোক। আমি তখন একজন শক্তিমান কাপুরুষ যুবক। হিন্দু পরিবারে জন্ম নিলে হয়তো নাম রাখা হত মহাবীর দুর্বল সিংহ। নাদুস নুদুস শরীর ও সুন্দর চেহারার ভিতর ছিল এক ভীতু মন। কেউ জোরে ধমক দিলেই কেঁদে ফেলতাম, এমনকি সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখারও সাহস পেতাম না।

www.pathagar.com

মেধাবী ছাত্ররা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। ম্যাট্রিক ও ইন্টারমেডিয়েটে বিজ্ঞান বিভাগে ভাল রেজাল্ট করলেই সে স্বপ্ন দেখা যায়। মানবিক বিভাগে ভাল রেজাল্ট করলে সে স্বপ্ন দেখা যায় না। মানবিক বিভাগে ভাল রেজাল্ট করে দেখার মতো স্বপ্নই আমি খুঁজে পাইনি।

কথায় বলে, স্বপ্নে পোলাও খেতে চাইলে ঘি একটু বেশি দিয়েই খাও। স্বপ্নে মিষ্টি খেলে জিলাপি খায় কোন্ বোকায়? স্কুল পরীক্ষায় একবার রচনা এসেছিল 'যদি আমি এক কোটি টাকা পাইতাম' বাংলা শিক্ষক পরামর্শ দিয়েছিলেন, বই মুখস্থ করে না লিখে যার যার স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলতে।

স্বপ্নে ভাল কিছু খেতেও ইচ্ছে হয় না বদহজমের ভয়ে। তাই আমার উত্তর ছিল, 'যদি আমি এক কোটি টাকা পাইতাম, সকল ভাত গুড় দিয়ে খাইতাম।'

যেহেতু আমার মতো কাপুরুষ ও গরীব ছেলের সবচেয়ে প্রিয় খাবার ছিল গুড়। টাকা পেলে জন্মের মতো গুড় খাব। খাওয়ার জন্য লক্ষ্য গুড়। জীবনেরও একটা লক্ষ্য থাকে। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের সাহসও ছিল না। শেষ-মেষ ঠিক করলাম, কবি ও লেখক হব, যার জন্য বিজ্ঞান বিভাগে ভাল রেজাল্টের প্রয়োজন নেই, বাবার অঢেল টাকারও প্রয়োজন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতাও নেই।

ঘরে বসেই শুরু করি সাহিত্য চর্চা। ছন্দ খুঁজে বেড়াই প্রতিটি কথায়। চল যাই, ভাত খাই। দেখে এলাম কামিনী, ঘুম আসে না যামিনী। আকাশে উঠেছে তারা, তুমি উঠানে খাড়া। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' দিয়ে শুরু করে যদি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া যায়, তবে আমি একজন খ্যাতিমান কবি হতে পারব না কেন? দল বেঁধে লেকে গোসল করার সময় ছন্দ আওড়াতাম, আমরা সবাই মানমুসল, নদীতে নামিয়া করি গোসল। ছন্দ মিলানোর জন্য মুসলমানকে মানমুসল লেখা যায়। তবে ভারতের কন্যাকুমারীকে কখনো কুমারীকন্যা বলা যায় না। আমার মতো জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থ যুবকরাই ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এরাও আমার মতো কবি ও লেখক হতে চায়। তাদের নিয়ে গড়ে তুলি সাহিত্য সংগঠন– বিনা পুঁজি ও বিনা চাঁদায়।

কুঁজোর যেমন চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে হয়, কাপুরুষেরও তেমনি বীর হতে সাধ জাগে। নজরুলের– 'বল বীর, বল চির উন্নত মম শির'-এর মতো আমিও 'অগ্নিবীণা' লিখতে চাই।

ভীম পদতলে টিক্কা করিব গুড়া গুড়া
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব শিমুলের তুলা
আছড়িয়ে ভাঙবো যত ফাটা মাটির হাড়ি
পচা কাপড় ফেলবো ছিঁড়ে দুহাতে টান মারি।

জমে উঠেছিল সংগঠন। সাহিত্য সভা, সাহিত্য আড্ডা, আলোচনা সমালোচনায় মুখর ছিল সংগঠনটি। কিন্তু কোন অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক ছিল না। ফলে আমরা ছিলাম অনেকটা এতিম। একদিন পেয়ে গেলাম কাঙ্ক্ষিত অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক। ডাক্তার জামেদ আলী হোমিওপ্যাথ।

www.pathagar.com

অবস্থা দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল, যার নাই কোন গতি, সেই করে হোমিওপ্যাথী। কিন্তু তার চমৎকার কবিতা, সুন্দর গল্প ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনে বুঝে নিলাম, তিনি একজন যোগ্য অভিভাবক। নূরানী চেহারার এই সুন্দর মানুষটিই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সেই কালো মানুষটির সাথে যাঁর নাম আবদুল মান্নান তালিব। উস্তাদের উস্তাদ বলে একটি কথা আছে। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই উস্তাদে আলা উস্তাদ। কালো দুটি চোখে দুর্লভ প্রতিভার জ্যোতি।

প্রচারবিমুখ এই মানুষটি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর তাফসীর ও আলোচনা শোনার জন্য ভিড় করেন খ্যাতনামা আলেম-উলামারা। সাহিত্য বিষয়ক পরামর্শের জন্য সমবেত হন প্রখ্যাত লেখক-সাংবাদিকরা। পরামর্শের জন্য আসেন সাহিত্য সংগঠকরা। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিটি যেন এক বিরাট পাবলিক লাইব্রেরি। নিজেই লিখেছেন শত শত বই। শিশু সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য, কবিতা, প্রবন্ধ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রয়েছে তাঁর বিস্ময়কর অবদান।

দেখে অবাক হলাম। ডজন খানিক বই লিখেই বড় লেখক, গাড়ি-বাড়ির মালিক হওয়া যায় যেখানে, সেখানে তাঁর কিছুই নেই। অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন সকল অর্জন। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য কখনো সঞ্চয় করেননি। শুধু খরচ করেছেন। আমার মতো ইয়াতিম লেখকদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন। লেখা ছাপানো ও বই প্রকাশে শুধু উৎসাহ দেননি, নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন। অখ্যাত লেখকদের তালিম দিয়েছেন, সম্পাদনা করেছেন, ছাপিয়েছেন। নিজে পরিশ্রম করে অন্যের বই প্রকাশ করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিবের পরিশ্রমের ফসল বাংলা সাহিত্য পরিষদ। বিপুল সংখ্যক বইয়ের প্রকাশনা আছে এই প্রতিষ্ঠানের। এই বিপ্লব ঘটেছে তাঁরই হাতে। দেশবরেণ্য লেখকদের নিয়ে বর্ণাঢ্য সাহিত্য সম্মেলন করেছেন একাধিকবার। অখ্যাত ও নতুন লেখকদের সম্মানী দিয়ে উৎসাহিত করার ব্যাপারে তিনি একটি মাইলফলক। তিনিই প্রশ্ন তুলেছেন, পত্রিকার সম্পাদক, কম্পোজিটর, প্রুফরিডার, প্রেসম্যান, মেশিনম্যান সবাই বেতন পায়, শুধু লেখক বঞ্চিত হবে কোন্ কারণে?

আবদুল মান্নান তালিব প্রায়ই লেখকদের সতর্ক করতেন একটি কথা বলে। 'আমার কোন লেখা যেন জাহান্নামে যাওয়ার কারণ না হয়। মরহুম কবি আব্দুস সাত্তার ছিলেন আবদুল মান্নান তালিবের একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত সমজদার। এক সাথে বসলে রসালো আলাপে জমে উঠত আসর। বিভিন্ন আড্ডায় তিনি একটি গল্প শোনাতেন। এক প্রখ্যাত কবি ও এক কুখ্যাত ডাকাত একই সময়ে মারা যায়। কবরস্থানে পাশাপাশি দাফন করা হয়। যথাসময়ে আজাবের ফেরেস্তা এসে দু'জনকেই সমান তালে পিটাতে থাকে। বরেণ্য কবি হাত জোড় করে জানতে চায়, একজন সম্মানিত কবি ও একজন ঘৃণিত ডাকাতের প্রতি একই আচরণ— এটা কেমন ইনসাফ? ফেরেস্তারা কোন জবাব দেয় না। পিটুনি চলতেই থাকে সমান তালে। কিছুদিন পর ডাকাতের মার থেমে যায়। কিন্তু কবির মার

www.pathagar.com

চলতেই থাকে। তাজ্জব হয়ে কবি এমন অবিচারের কারণ জানতে চায়। এবার ফেরেস্তা জবাব দেয়, ডাকাত ডাকাতি করেছে নির্দিষ্ট কিছু দিন। তার অপরাধের শাস্তি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কবির অশ্লীল কবিতা পড়ে এখনো মানুষ কুপথে যেতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। অতএব, মানুষ যতদিন তার লেখা পড়বে, তার শাস্তিও চলবে ততদিন।

আবদুল মান্নান তালিবের লেখা শুধু পাঠকদের নয়, বিভ্রান্ত লেখকদেরও দেখিয়েছে সত্য ও ন্যায়ের পথ। তাঁর লেখা 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' এক অমর সৃষ্টি। 'তোমরা মানুষকে ডাক আল্লাহর পথে, বুদ্ধিমত্তার সাথে ও উত্তম ভাষায়' পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ আজীবন পালন করে গেছেন তিনি। জিহ্বায় সামান্য জড়তা থাকলেও তাঁর বলা ও লেখার ভাষা ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

রাজনৈতিক নেতাদের মৃত্যুতে দলের পক্ষ থেকে বাণী প্রচার করা হয়, 'জাতি একজন মহান সেবক হারাল।' জাতির এসব মহান সেবকরা সন্তানদের জন্য গুলশান বনানীতে বাড়ি ও ব্যাংকে বিশাল অংকের টাকা রেখে যায়। আবদুল মান্নান তালিব সন্তানদের রেখে গেছেন শান্তিবাগের তাঁর শ্বশুরের বাড়িতে! এমন কি নিজের লেখা বইয়ের সম্মানীও দান করে গেছেন মানবতার কল্যাণে।

আবদুল মান্নান তালিব জানতেন, তাঁর অবর্তমানে ছেলেমেয়েরা হয়তো পথ ভুলে যেতে পারে, দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে পারে, কিন্তু আলমারীতে রেখে যাওয়া বইগুলো কখনো ভুল করবে না। চিরদিন অগণিত মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ডাকবে। তাই সন্তানদের চেয়ে বেশি যত্ন করতেন বইগুলোকে। এরাই যেন তাঁর আসল সন্তান!

'এই পৃথিবীর পরে, কতো ফুল ফুটে আর ঝরে/সে কথা কি কভু কারো মনে পড়ে?'

অনেক ফুল ফোটে আর ঝরে যায়। কিন্তু কালো গোলাপ বেশি ফোটে না। আবদুল মান্নান তালিবের মতো ক্ষণজন্মা ফুলের নাম কালো গোলাপ।

www.pathagar.com

এ কালের
যুগ স্রষ্টা
শফিউদ্দিন আহমেদ

পরম করুণাময় মেহেরবান মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। কোন ব্যক্তি বা কোন বিষয় সম্পর্কে লিখতে হলে সে সম্পর্কে কম-বেশি জানাশুনা থাকা অবশ্যই জরুরি। আরো জরুরি সে সম্পর্কে যথার্থ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জন। তা না হলে আলোচিত বিষয়টি যেমন প্রাণবন্ত হয় না, সর্বসাধারণের কাছে তা গ্রহণযোগ্যও হয় না। তা ছাড়া গ্রহণযোগ্য হওয়ার মূলে রয়েছে বিষয়টির উপস্থাপন তথা আলোচনা সঠিক কি বেঠিক হওয়ার মূল তাত্ত্বিকতা প্রকাশের মাধ্যমে। কথাটা কোন হেলাফেলা কিংবা কাকতালীয়ও নয়, বরং এটাই বাস্তবতা।

আজ আমি এখানে পাঠকের কাছে এমন এক ব্যক্তির বিষয়ে আলোচনা করতে চাই, যাঁর সাথে কোন আত্মীয়তার বন্ধন না থাকলেও তাঁর চিন্তা চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে আমার আত্মার অটুট মিল আছে। তবে আমার মতো অর্ধশিক্ষিত, জ্ঞানবর্জিত, অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে তাঁর বিষয়ে পুরোপুরি ভাষায় ব্যক্ত করা হয়তো সম্ভব হবে না, যে কারণে স্বল্প জ্ঞান নিয়ে আমার মন-মগজ ও লেখনী থেকে সুন্দরভাবে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবো না, তবুও আল্লাহুর উপর ভরসা রেখে সামান্য কিছু লেখা পাঠককে উপহার দেবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

আসলে মরহুম আবদুল মান্নান তালিবের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। এই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তর জানাশুনাও আমার নেই। তিনি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের বাসিন্দা। আর আমার বাড়ি বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণপ্রান্ত সাগরপাড়ের দেশ বরগুনা জেলা সদরের বিষখালী নদীর পাদদেশে। জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় ও বিগত ২০০৭ সনের ১৫ নভেম্বর প্রলয়ংকরী সিডর আক্রান্ত বিধ্বস্ত একটি জনপদ এটি। অজানা, অজ্ঞাত ও অখ্যাত নাম-ধাম পরিচয়হীন, উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর দারিদ্র্য কবলিত নিপীড়িত জনসংখ্যা অধ্যুষিত নলটোনা ইউনিয়নের সাত নম্বর ওয়ার্ডের অধিকারবঞ্চিত আমি এক নগণ্য বান্দা। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ অর্থাৎ সেই পাকিস্তান আমল থেকে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে প্রকাশিত 'মাসিক পৃথিবী' নামক গবেষণাধর্মী একটা পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক, প্রচারক ও এজেন্ট। বলা যায় সেই শুরু থেকেই মরহুম আবদুল মান্নান তালিবের সাথে আমার পরিচয় অর্থাৎ তিনি ছিলেন আমার আত্মার আত্মীয়। আমি 'মাসিক পৃথিবী'র একজন বিদগ্ধ পাঠক হওয়ার কারণে তাঁর লেখাগুলো নিয়মিত শুধু পাঠই করিনি তাঁর চিন্তাশীল ও গবেষণাধর্মী লেখাগুলো হৃদয়ঙ্গম করেই তাঁর সাথে আমার সখ্য গড়ে ওঠে।

তবে সত্য কথা, তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত কোন যোগাযোগ ছিল না, আর ছিল না বলেই তাঁর ভেতরের মানুষটির চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য জানা আমার পক্ষে কোন দিন সম্ভব হয়নি। বলতে গেলে এটা আমার একটা দুর্ভাগ্যেরও ব্যাপার। তাঁর সম্পর্কে আমি যা কিছু জেনেছি তা সবই তাঁর লেখা পাঠ করে এবং মৃত্যু-পরবর্তীতে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যা লেখা হয়েছে তা পাঠ করে। আমার এ লেখার উপজীব্য বিষয় সেটাই।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন এ কালের একজন মহান ইসলামী চিন্তাবিদ। তাঁর পরিচয় অল্প কথায়, স্বল্প পরিসরে লেখা সম্ভব নয়। আর আমি তো স্বল্প শিক্ষিত, স্বল্প জ্ঞানের একজন মানুষ মাত্র। তাঁর প্রাথমিক ও বাহ্যিক পরিচয় হলো তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, অনুবাদক। গবেষণাধর্মী লেখা তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। তা ছাড়া তিনি ছিলেন একজন সৎ ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিক। বহু ইসলামী বই-পুস্তকের সফল অনুবাদক হিসেবে তাঁর পরিচয় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে।

সব কাজেই ছিল তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা। সম্পাদক হিসাবেও তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উদ্যোগে ও পরিচালনায় বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার থেকে 'মাসিক পৃথিবী' পত্রিকাটি বাংলাদেশসহ সমগ্র মুসলিম-অমুসলিম দেশসমূহে বাংলাভাষী ইসলামী জ্ঞানপিপাসুদের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার ঘটনা এ কালে বিরল। তিনি পবিত্র আল কুরআনের একজন সফল তাফসীরকারক। এতসব কারণে তাঁকে ইসলামী জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে ভূষিত করা মোটেই অসমীচীন নয়।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদসহ অনেক প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা তাঁর মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের বড় একটা পরিচয়।

পারিবারিক, সাংসারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বরত অবস্থায়ও তাঁর লেখনী ছিল সবল ও সচল। বহু বইয়ের লেখক তিনি। সেগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো তা সবই ইসলাম ও মানবতার স্বার্থে লিখিত। জাগতিক সুনাম, সুখ্যাতি ও লাভালাভের চিন্তা-ভাবনা মুক্ত ছিল। এটা তাঁর সাহিত্য ও জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি যা বিশ্বাস করতেন সাহিত্যে তাই লিখেছেন। সর্বোপরি বাতিলের সাথে আপস না করে একমাত্র ইসলামের উন্নতি ছিল তার গোটা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তাঁর লিখিত বইগুলো সঠিক ইসলামের প্রসার ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে রাখবে। সে হিসাবে সত্যিই তাঁর লেখা পুস্তকগুলো ইসলামী জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে।

তাঁর লেখার আরো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো শুধু ধর্মীয় সাহিত্য নয়, বরং মানব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো– রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিক জীবন, ইসলামী শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুসলিম চিন্তা-চেতনা তথা তাওহীদ ও রেসালতের মতো মৌলিক বিষয়গুলোর সারমর্ম। আর তা তিনি সরল, সহজ ও সাবলীল ভাষায় লিখেছেন। এমন উপস্থাপনা আজকালকার লেখকদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। তাঁর লেখা পড়ে সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকজনও জ্ঞানার্জন করে ইসলামের পথে চলার সঠিক নির্দেশনা পেয়েছে, বিশেষ করে তাঁর শিশুসাহিত্য, অনুবাদকৃত তাফসীর, হাদীসগ্রন্থ ইত্যাদি। আর এটাই তো একজন সত্যিকার ঈমানদার মানুষের যাবতীয় এবাদতের কাঙ্ক্ষিত বস্তু।

তাঁর লিখিত ও অনূদিত বইয়ের সংখ্যা দেড়শতাধিক। সাদা মাটা চোখে দেখলে মনে হবে আবদুল মান্নান তালিব একজন কবি, প্রাবন্ধিক ও মুক্ত মনের নিরহংকার মানুষ। তিনি ছিলেন একজন সফল ইসলামী গবেষক, ইসলামী সাহিত্যবিদ, সফল অনুবাদক, পবিত্র আল কুরআনের সফল তাফসীরকারক। মুসলিম জাতি ও ইসলামের উন্নতি, জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও যাবতীয় মানসিক ব্যাধির মূলোৎপাটন ও সংস্কারই ছিল তাঁর গোটা জীবনের কাম্য বস্তু। এতসব কারণ তাঁকে শুধু অমরই করেনি, বরং ইতিহাসে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে।

এতো গেলো আবদুল মান্নান তালিবের বাইরের পরিচয়। ভিতরের মানুষটির পরিচয় আরো উজ্জ্বল, যা কিনা সততায় ভরপুর অর্থাৎ তাওহীদ ও রেসালতের প্রতিভূ হিসাবে এক বর্ণাঢ্য মানুষ, যুগস্রষ্টা সফল ব্যক্তিত্ব। এই আলোকিত মানুষটি আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর প্রতিভা ও জীবনালেখ্য আমাদের জন্য ধ্রুবতারা সদৃশ অন্ধকারে আলোকের পথ দেখাবে। বর্তমানে তাঁর স্মৃতি ও কর্মকাণ্ডকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে চিরজাগরূক রাখার জন্য 'আবদুল মান্নান তালিব ফাউন্ডেশন' গড়ে তোলার প্রয়াস সত্যিই শুভ ও প্রশংসনীয় কাজ। তা ছাড়া তাঁকে জানার

www.pathagar.com

জন্য বাংলা সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক তাঁর গোটা জীবনের কর্মকাণ্ড প্রকাশের জন্য বর্তমানে একটা স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এটাও আমাদের জন্য পরম গৌরবের বিষয়। এতে করে অজানা লোকদের জন্য তাঁকে জানার একটা সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গেল— আলহামদুলিল্লাহ!

মরহুম আবদুল মান্নান তালিবের মেধা, জ্ঞান, শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী শক্তি, জ্ঞানের গভীরতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে ও ইসলামী শিক্ষার মৌল উপাদানগুলো অন্য সবার চাইতে আলাদা মর্যাদা পেয়েছে। এতবড় বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আবদুল মান্নান তালিব সর্ব-মহলে গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ার বিষয়টি বড়ই ভাবনার। তবে বিষয়টি শুধু তাঁর বেলায়ই নয়, বরং বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানী-গুণী, দেশপ্রেমিক, মানবদরদী লোকজন সমকালীন ক্ষমতাদর্পীদের রোষানলে পড়ে যথাযোগ্য মর্যাদা না পাওয়ার বিষয়টা বিচিত্র কিছুই নয়।

তবুও আশার কথা ও বাস্তব সত্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা হবে উৎকৃষ্ট মানের। পার্থিব জগতের বিবিধ পুরস্কার, পদ, পদবী, পদোন্নতি যাবতীয় প্রাপ্য, এমনকি নোবেল পুরস্কারও তার কাছে নস্যিতুল্য। পক্ষান্তরে আল্লাহর ঘোষিত জান্নাতুল ফেরদৌস পাওয়ার বিষয়টা অন্যদের জন্য না হলেও কেবলমাত্র ইসলামে নিবেদিত ব্যক্তিদের জন্যই নির্ধারিত। সেক্ষেত্রে আল্লাহর ঘোষণা 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে পরকালে তারাই সফলকাম।' আর সফলকামীরাই আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র।

মরহুম আবদুল মান্নান তালিব সম্পর্কে আর অধিক বলার প্রয়োজন বোধ করি না। মানুষ মরণশীল তাঁকে আমরা ফিরে পাব না সত্য, কিন্তু মরেও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। কবির কথায় বলতে পারি,

'মরিয়াও মরা নয় যদি লোকে ঘোষে,
বাঁচিয়াও কি ফল হয় যদি লোকে দোষে।'

কবি আরও বলেছেন,

'সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন।'

সেহেতু আবদুল মান্নান তালিবের স্মৃতিগুলোই আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

আমাদেরও দায় রয়ে গেছে

মহিউদ্দিন আকবর

১৯৬৬ সালে স্কাউটের দেয়ালিকায় লেখা দিয়ে আমার জীবনে লেখালেখির সূচনা এবং ১৯৬৯ সালে মুকুল মেলায় 'ব্যাঙ' শীর্ষক ছড়া ছাপার অক্ষরে প্রকাশের ভেতর দিয়ে সামান্য সাহসের সঞ্চার। তারপর আর পেছনে তাকাইনি। রাজধানী ঢাকার এক শ্রেণির পোশাকী দানবের দৃষ্টিতে আমি তখনো মফস্বলের লেখক। নারায়ণগঞ্জ থেকে ডাকযোগে দৈনিক আজাদের 'মুকুলের মাহফিল', দৈনিক সংবাদের 'খেলাঘর', দৈনিক ইত্তেফাকের 'কচি কাঁচার আসর', দৈনিক পাকিস্তান (পরবর্তীতে দৈনিক বাংলা)'র 'সাতভাই চম্পা', দৈনিক পূর্বদেশের 'চাঁদের হাট' ইত্যাদিতে ডাকযোগে লেখা পাঠাই। বিভাগীয় সম্পাদকগণ পছন্দ হলে মাঝে মাঝে ছাপেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দৈনিক বাংলার বাণীর 'শাপলা কুঁড়ি'র আসর এবং দৈনিক সংগ্রামের 'শাহীন শিবিরে'ও ডাকযোগেই লেখা পাঠাই। এতেও দু'একটা লেখা ছাপা হতে থাকে। তখনও আমার লেখা হাঁটি হাঁটি পা পা করে কচি হাতের কাঁচা লেখার পর্যায়ে। তবে মনে মনে যেন ভাবতেই শুরু করেছি যে, আমি কবি-সাহিত্যিক হয়ে উঠছি। কিন্তু ঢাকার সাহিত্য সভায় যোগ দিতে গিয়ে এবং নামি-দামি লেখকদের সাথে দেখা করতে গেলে কতিপয় পোশাকী দানবের কাছে পাত্তাই পেতাম না। ওরা আমাকে মফস্বলের কবি বলে

www.pathagar.com

দুরদুর করে তাড়িয়েই দিত। একজন এমন কথাও বলেছেন, 'তোদের মতো মফস্বলের ছেলে কী এমন লিখবি সেটা আমার জানা আছে। তার চেয়ে এসব ছেড়ে পড়ালেখায় মন দে। ঢাকাতে এসে চাকরি-বাকরি পাবি।' সাথে আরও অসম্মানজনক অনেক কথা... । তার ভাবটা এমন যে, লেখালেখির জগৎ কেবল ঢাকায় বসবাসরত কবিদের জন্যেই। আমরা সেখানে অচ্ছুৎ!

কিন্তু আমি তখন ছোট্ট মানুষ হলেও আমার মহান ভাবগুরু বিশ্বকবি কাজী নজরুল ইসলামের বাণী, 'উন্নত মম শির' প্রাণের নিভৃত কোণে ধারণ করেই বার বার ঢাকায় লেখা পাঠাতাম এবং সাহিত্য সভাগুলোতে ছুটে আসতাম। তখন দানবের পাশাপাশি মহানুভব কিছু মানবেরও সন্ধান পেলাম। তাঁদের আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং স্নেহসিক্ত হয়ে বেড়ে উঠতে লাগলাম। তাঁরা হলেন, ড. কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, কবি শামসুর রাহমান (বাচ্চুভাই), কবি ফারুক মাহমুদ (দ্বিতীয় নজরুল), ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, কবি আবদুস সাত্তার, কবি আল মাহমুদ, কবি আহসান হাবিব, কবি বেলাল চৌধুরী, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, কবি আল মুজাহিদী, সাহিত্যিক বজলুর রহমান (ভাইয়া), ছড়াকার রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই), ছড়াকার রফিকুল হক (দাদুভাই), সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব (শাহবাজ ভাই), কবি আসাদ চৌধুরী, কার্টুনিস্ট শেখ তোফাজ্জল হোসেন, কবি আফজাল চৌধুরী, অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ প্রমুখ।

এই পিতৃতুল্য বড় ভাইদের মাঝে সরাসরি হাতে-কলমে পৃষ্ঠপোষকতা, আদেশ, উপদেশ ও অপার স্নেহ দিয়ে যাঁরা আমাকে সাহিত্য দরিয়ায় নাও ভাসাতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মাঝে প্রথিতযশা সাহিত্যিক, গবেষক, কবি, বহু ভাষাবিদ, অনুবাদক ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা আমার প্রাণপ্রিয় শাহবাজ ভাই অর্থাৎ আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের কাছে আমারও যে অপরিশোধ্য ঋণ রয়েছে, তা সামান্য দু'টি কথার মাঝে শেষ হতে পারে না। তিনি ডাকযোগে লেখা পেয়েই আমার লেখার স্থান করে দিতেন 'শাহীন শিবির' পাতায়। কেবল তা-ই নয়, তিনিই আমার জীবনে একমাত্র সম্পাদক, যিনি আমার একটা লেখাও ফেলে দেননি। প্রয়োজনে কেটে ছেঁটে নতুন করে লিখে সম্পাদনা করে ছেপেছেন। এমন মহানুভবতা, এমন উদার পৃষ্ঠপোষকতার ঋণ কেমন করে শোধ করবো জানি না। তাছাড়া সম্পাদক হিসেবে তাঁর যে দুঃসাহসিকতা ও অকুতোভয় দৃঢ়তার পরিচয় পেয়েছি– তা অতুলনীয়। কেননা, রক্তচক্ষুর ধমক অথবা চাকরি হারাবার ভয় বলতে তালিব ভাইয়ের মাঝে কিছু ছিল না। আমার যেসব কঠোর বক্তব্যধর্মী রাজনৈতিক ছড়া খোদ রাজনৈতিক মুখপত্র বা সংকলনেও ছাপতে সম্পাদকেরা সাহস করেননি, তিনি সেগুলো দুঃসাহসিকতার সাথে ছেপে দিয়েছেন।

আমি তখন ভাবতাম শাহবাজ ভাই সম্ভবত বিশাল দেহের অধিকারী প্রচণ্ড শক্তিশালী কোনো পাহলোয়ান ধরনের মানুষ! হয়তো এক আছাড় মেরে যে কোন লোকের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারেন! তাই তাঁকে একবার চোখের দেখা দেখতে মনটা খুব আঁকুপাঁকু করতে লাগল।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কলেজে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে একদিন (সোমবার ২৫ অক্টোবর ১৯৭৬) সোজা বাসযোগে ঢাকা চলে এলাম। কারণ সরকারি বন্ধের দিন অর্থাৎ রোববার যদি দৈনিক সংগ্রাম বন্ধ পাই (এটা আমার ধারণা কিংবা অজ্ঞতাই ছিল)। গুলিস্তান কামানের পাশে নেমে অনেক খুঁজে অবশেষে হাজির হলাম বংশালের সংগ্রাম অফিসে। সেখানে না বুঝেই ঢুকে পড়লাম সম্পাদক অধ্যাপক আখতার ফারুকের কক্ষে। হয়ত তিনি আমার পরিচয় জানার পর আমার ছোট্ট মনোভাবটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই স্ব-উদ্যোগেই আমাকে তালিব ভাইয়ের কাছে পাঠালেন। তালিব ভাইকে দেখে তো আমি থ! এই মানুষটিই এতোটা বীরত্বের অধিকারী! এতোটা নির্ভীক!! শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে আমার চোখ দু'টো অবনত হয়ে গেল। তবে মনে মনে আমি উদ্দীপ্ত হলাম। তখন আমার শরীর তো টিংটিঙে তালপাতার সিপাইয়েরই মতো। তাই মনে মনে ভাবলাম, যে তালিব ভাই সাধারণ শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে এতোটা নির্ভীক, তাঁর শিষ্য হয়ে আমারই বা কিসের ভয়? সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদী ও খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চাবুক হেনেই যাবো। বাংলাদেশের আর কেউ যদি তা না ছাপে তাতে কিচ্ছুটি আসে যায় না। অন্তত তালিব ভাই– আমার দুঃসাহসী অভিভাবক তো আছেন। তিনি তো নিশ্চয়ই ছাপবেন। তালিব ভাই আমাকে সস্নেহে তাঁর সামনে বসতে বললেন। পরিচয়পর্ব শেষে তিনি অনেক পরামর্শ ও উৎসাহব্যঞ্জক কথা বললেন। আমার লেখা ছাপা হয়েছে এমন দুটি সংখ্যা এবং সেদিনের এক কপি সংগ্রাম 'সৌজন্য সংখ্যা' উপহার দিয়ে আমাকে তাজ্জব করে দিলেন। তাজ্জব হলাম এজন্যেই যে, নারায়ণগঞ্জ তথা মফস্বলের (!) পুঁচকে লেখক মহিউদ্দিন আকবরের হাতে জীবনে এই প্রথম একটা ন্যাশনাল মেজর ডেইলি পত্রিকার সৌজন্য সংখ্যা একজন মহৎ হৃদয় সম্পাদক সাহিত্যিক তুলে দিলেন। সেদিন আমি কী যে আনন্দ অনুভব করেছিলাম, তা আর বলতে নেই। বিদায়ের সময় আমার কাঁধ চাপড়ে তিনি যে আশীর্বাদ করেছিলেন, তাঁর সেই হাতের ছোঁয়া আজও অনুভব করি।

আর তাঁর সেই আশীর্বাদের জন্যে আমি আরও আরও ঝলসে উঠে কলম যুদ্ধকে শাণিত করেছিলাম। অনিবার্য কারণেই মহিউদ্দিন আকবর নামের পাশাপাশি আল-জিহাদী ছদ্মনামে বেশ কিছু ছড়াও লিখে ফেলি। এ ব্যাপারেও তালিব ভাই আমাকে সাহায্য করেছেন। শাহীন শিবিরে তিনি যেসব আগুন ঝরা ছড়া কখনও গুচ্ছ আকারে আবার কখনও একক সংখ্যায় ছেপেছেন। হয়তো ভয় কাকে বলে, তা তিনি জানেনই না। আমার বিবেচনায় তালিব ভাই রীতিমত একজন বিদ্রোহী পুরুষ। কারণ কেবল সম্পাদনার ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর সংস্কৃতি বিষয়ক লেখাগুলোর মাঝেও বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমাদেরকে উজ্জীবনের বজ্রমন্ত্রে উজ্জীবিত করে। কিন্তু এই বজ্রকঠিন বিদ্রোহী মানুষটি সামাজিক জীবনে যে কতটা কোমল ও অমায়িক আচরণের অধিকারী, তা তাঁর সান্নিধ্যে আসা প্রত্যেকটি মানুষই জানেন। এমন মহানুভব, উদার ও সহানুভূতিশীল মানুষ স্বার্থবাদী সমাজের মাঝে খুবই কম সংখ্যক রয়েছেন। তাঁর বয়স

www.pathagar.com

যা-ই হোক না কেন, তালিব ভাইয়ের ভেতরটা নিষ্পাপ শিশুর মতোই পবিত্র ও মমত্বে পরিপূর্ণ। তাছাড়া তিনি একজন সৃষ্টিশীল মানুষ। প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর এই গুণটাকে বেশ মুন্সিয়ানার সাথে ব্যবহার করেছেন সারাটি জীবন। আর তাই দিয়ে টেনে টেনে বের করেছেন নবীনদের ভেতর থেকে বহুমুখী কাজ। আমিও আঁকাআঁকি ও ছড়া লেখাকে অবলম্বন করে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে স্বচ্ছন্দে হাঁটছিলাম। কিন্তু তালিব ভাই-ই উৎসাহ দিয়ে আমার ভেতর থেকে টেনে বের করেছেন গল্প, অ্যাডভেঞ্চার ও কিশোর থ্রিলার, যার কথা আমি আগে ভাবিনি বা ভাবতে পারিনি। আর তিনি লিখতে উৎসাহ যুগিয়েই নির্লিপ্ত হতেন না, তিনি সে লেখাগুলোকে ছেপেও উৎসাহিত করতেন। একবার তো টানা চার মাস পর্যন্ত আমার ধারাবাহিক এ্যাডভেঞ্চার 'সাক্সেসফুল অ্যাসাইনমেন্ট'ই ছাপলেন। চান্সে আমিও পাঠকমহলে একজন প্রিয় রহস্য গল্প লেখক হয়ে উঠলাম। আসলে কত দিক থেকে যে আমি তালিব ভাইয়ের স্নেহে সিক্ত হয়েছি, তা এই ছোট্ট কলেবরে লিখে শেষ করা যাবে না।

কেবল একটা ঘটনার উল্লেখ করেই আজকে কলম বন্ধ করবো। ১৯৮০ সাল। তখন আমি ফুলকুঁড়ি আসর ঢাকা মহানগরীর কৃষি, বিজ্ঞান ও শিল্প সম্পাদক। আমরা বার্ষিক নাটক হিসেবে তাঁর মানে তালিব ভাইয়ের লেখা নাটক 'কে রাজা' মঞ্চায়ন করেছি ধানমণ্ডি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাই স্কুল মিলনায়তনে। নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছিলো বন্ধু নূরুল কবির আর শিল্প নির্দেশক ছিলাম আমি। মঞ্চায়নের আগের দিন এবং মঞ্চায়নের দিন বিকেল পর্যন্ত মঞ্চসজ্জা করেছি। পুরো মঞ্চকেই একটা বনে পরিণত করেছি। তাই একটা বড় গাছের গুঁড়িও বানাতে হলো তালিব ভাইয়ের নাটকের রিকুইজিশন অনুযায়ী। ছালাকাটা চট, বাঁশের চটি আর রঙ দিয়ে গুঁড়িটা এমনভাবে বানালাম যে, দেখে মনে হলো, সত্যিই গাছের গুঁড়ি। আর তাতে বসতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে মাসুদ আলী ভাই অবাক হয়ে বললেন, 'আগে বলবে না, এটা নকল!'

এসব খবর তালিব ভাই জানার পর খুবই খুশি হয়েছিলেন। পরে নাটকের সাথে জড়িত সবার জন্য খুব করে দোয়া করেন। সেই সুবাদে বদরু ভাই তালিব ভাইয়ের পক্ষে আমাদেরকে মিষ্টিমুখ করান।

সাহিত্যাঙ্গনে শত শত বিশ্বাসী প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে এবং তাদেরকে পর্যায়ক্রমে ভালো, গুণ-মানসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক লেখক হিসেবে গড়ে তুলতে আবদুল মান্নান তালিব ভাই টানা দুই যুগেরও অধিক সময় ব্যয় করেছেন। আজকে তাঁরই হাতে গড়া অনেক লেখক কেবল নিজেকেই সমৃদ্ধ করেননি, তালিব ভাই যাদেরকে প্রতিভা বিকাশে সহযোগিতা করেছেন ও প্রেরণা যুগিয়েছেন, তাদের মাঝে অনেকেই সম্পাদক ও সাহিত্য সংগঠক হিসেবে নবীন প্রজন্মের লেখকদের নার্সিং করছেন। এটাও পরোক্ষভাবে তালিব ভাইয়ের অবদান বলেই আমি মনে করি। যুগপৎ তিনি গবেষণা, প্রকাশনা, অনুবাদ ও মৌলিক রচনাবলীর মাধ্যমে জাতির যে খিদমত করে গেছেন, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার যথাযথ মূল্যায়নের দাবি রাখে।

www.pathagar.com

এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের হলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যারা দায়িত্বশীল কর্তাব্যক্তি রয়েছেন, তাদেরকে উদ্যোগ গ্রহণে সচেতন অথবা বাধ্য করতে আমাদেরকে আজকে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে সম্মিলিত উদ্যোগ-প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

আমি মনে করি, আমাদের সমন্বিত প্রয়াসে যদি বিষয়টির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তার ফলে যদি প্রার্থিত ফলাফল লাভ করা যায়, তাহলে দেশ ও জাতির কল্যাণে এবং আমাদের মত খুদে লেখকদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান সামান্য হলেও তা থেকে আমরা কিছুটা ভারমুক্ত হতে পারবো।

www.pathagar.com

একটি নক্ষত্রের নীরব প্রস্থান
জিয়াউল হক

চলে গেলেন ইসলামী জ্ঞানের এক দিকপাল, একজন দেশবরেণ্য আলেম, সংগঠক, চিন্তাবিদ, গবেষক আর সাহিত্যিক। উপমহাদেশে হাতে গোণা যে ক'জন বিদ্বান ব্যক্তিত্ব অনেকটা গোপনে, নীরবে-নিভৃতে সারা বিশ্ব আর এর চটকদার প্রলোভনকে ভুলে কেবল আল কুরআন, হাদীস তথা ইসলাম চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন সাম্প্রতিককালে, আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব তাঁদের একজন। জীবনের সকল সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের যে কোন হাতছানিকে উপেক্ষা করে ইসলামী সংস্কৃতিকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে তুলে ধরার কঠিন প্রয়াসে নিশিদিন লিপ্ত ছিলেন এই কলমযোদ্ধা— কলম আর জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর ঈমানই ছিল যাঁর একমাত্র অস্ত্র।

দুনিয়ার দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না, তিনি সেদিকে কখনও নজরও দেননি, দিলে তিনি অনেক মণি-কাঞ্চন কামাতে পারতেন। যাঁর লেখা বাংলাদেশ ও ভারতে একই সাথে সমান জনপ্রিয়, যাঁর লেখা বাংলা, উর্দু আর হিন্দিতে একই সাথে পাঠকপ্রিয়তা পায়, সেই তিনি মণি-কাঞ্চনের পিছে ছোটেননি কখনই।

ছোটেননি যে, সেটা পরিষ্কার বোঝা যেত যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবন দেখেছেন, নিত্য অভাবের সাথে যাঁরা তাঁকে প্রতিদিনই লড়াই করতে দেখেছেন কিন্তু তার পরেও কোন প্রলোভনের মায়ায় তাঁকে পড়তে দেখেননি। ছিন্ন পাজামা আর পাঞ্জাবি হাজার যত্নেও তাঁর আর্থিক

www.pathagar.com

দৈন্য ঢেকে রাখতে পারেনি। তার পরেও তিনি কখনও পরাজিত হননি দরিদ্রতার কাছে। নীতি আর নৈতিকতার উচ্চমার্গ থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত হননি।

তাঁর নজরে ছিল ইসলামী শিক্ষা আর সংস্কৃতিকে কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, সে বিষয়টি। তিনি সব সময়ই ইসলামী সংস্কৃতির বিজয় চেয়েছেন। কেবল চেয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি সে লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে গেছেন। তাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যে সব সময়ই ছিল যুগের চাহিদাকে ইসলামের ধাঁচে ফেলে এর সমাধান বের করা। তিনি সারাটা জীবন সে লক্ষ্যেই লড়ে গেছেন। তাঁর চিন্তা-চেতনায় যে একটা ইজতিহাদি ধারা জাগরূক ছিল, সেটা এ জাতির খুব কম লোকই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর লেখনীই সে কথার সাক্ষ্য দেয়।

ক্ষণজন্মা এই মানুষটির সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়ের অনেক পূর্বেই তাঁর লেখনী আর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হয়ে উঠি। তিনি এমন একজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তি যে, তাঁর চিন্তাধারা, তাঁর দর্শন, তাঁর শিক্ষা, জ্ঞান-গরিমা আর জীবনবোধ আমাদের মতো অনেককেই পথ দেখিয়েছে। পথের দিশা দিয়েছে।

জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ বাম রাজনীতি বামাদর্শের সাথে কাটানোর সুবাদে একটা বিশেষ জীবনাদর্শকে সব সময়ে সযত্নে এড়িয়ে চলেছি। অচ্ছুৎ একটা কিছুর মতো করে। পড়ার অভ্যাস থাকার সুবাদে হাতের কাছে পাওয়া বই পড়লেও ঐ একটা বিশেষ আদর্শভিত্তিক বইকে এড়িয়ে চলতাম। প্রগতিশীল হবার সাধনা আর কি!

এরই মধ্যে সম্ভবত ১৯৯৬-এর দিকে প্রবাসে বসে তাঁর লেখা 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন' বইটা কেমন করে যেন হাতে পড়ে। সুদূর প্রবাসে বসে বইটা কেবল সময় কাটানোর মানসে হাতে নিয়ে পড়া শুরু করলেও অচিরেই তার গভীরে ঢুকতে বাধ্য হই। এর পরে বইটা বেশ কয়েকবার পড়েছি, পড়তে বাধ্য হয়েছি।

একই লেখকের বই আরও পড়েছি। এর পরে খুঁজে খুঁজে পড়েছি—'সত্যের তরবারী ঝলসায়', 'বাংলাদেশে ইসলাম', 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান'। এভাবে এক এক করে বেশ কতকগুলো বই যেমন পড়া হলো তেমনি তাঁর লেখা অনেক প্রবন্ধও পড়ে ফেললাম। এক দুর্নিবার আকর্ষণেই যেন চিন্তার আর চেতনার জগতে তাঁকে অন্যতম প্রিয় ব্যক্তিত্বে গ্রহণ করে নিলাম।

তার অনেক পরে, নিজেও তখন বলয় পরিবর্তন করে আল্লাহর অশেষ রহমতের ধারায় সিক্ত হতে ইসলামী আন্দোলনের ভাইদের সান্নিধ্যে সময় কাটানোর চেষ্টা করি। ইসলাম না জানার কারণে, সঠিকভাবে না বোঝার কারণে আন্দোলনের প্রত্যেক ভাইকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি, কিছু একটা শেখার চেষ্টাও করি। আন্দোলনের প্রতিটি বই, সাহিত্য হাতের কাছে যা পাই, তাই পড়ি। এই পড়া থেকেই এক সময় নিজেরই আগ্রহ জাগে কিছু একটা লেখার। এভাবেই এক এক করে বেশ কয়েকটা বইও লিখে ফেললাম, তা প্রকাশিতও হলো। আমার মতো অজ্ঞ মূর্খেরও বই বের হয়! দু'চার জন যাই হোক না কেন, কিছু মানুষ আবার সেই বই পড়েন,

www.pathagar.com

কেনেনও গাঁটের টাকা দিয়ে! অবাক বিস্ময়ে নিজের ভেতরেই যেন লুকিয়ে যাই। নত হই আল্লাহর রাব্বুল আলামিনের দরবারে।

সম্ভবত ২০০১ সালের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। আমার একটা বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ঢাকা থেকে। বইটার মুখবন্ধ কাকে দিয়ে লেখানো যায়? প্রশ্ন প্রকাশকের। আমিই বা চিনি কাকে? প্রবাস থেকে কার কথা বলব? শেষ পর্যন্ত প্রকাশক নিজেই বললেন এমন এক ব্যক্তির কথা, যাঁকে তাঁর লেখা পড়ে অনেক আগেই আমি আমার মন আর মননে, চিন্তা আর চেতনার জগতে অনেক উঁচুতে বসিয়েছি, সেই আবদুল মান্নান তালিবের কথা বললেন তিনি। তাঁর কাছে আমার বইটার পাণ্ডুলিপি দেবেন পড়ার জন্য, তাও বললেন।

ক'দিন পরেই আবার জানালেন তিনি পাণ্ডুলিপিখানা তাঁকে দিয়েছেন, পড়িয়েছেনও এবং আমাকে অবাক বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে জানালেন যে, আবদুল মান্নান তালিব আমার উক্ত বইয়ের মুখবন্ধ হিসেবে দু'কথা লিখেও দিয়েছেন।

এর পরে বইটা যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে। বাজারেও এসেছে। কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে, একবুক কুণ্ঠা আর দ্বিধা নিয়ে এর কিছুদিন পরে ছুটি কাটাতে দেশে থাকাবস্থায় গিয়েছিলাম তালিব সাহেবের সাথে দেখা করতে। ডাক্তারের গলিতে সেই বাড়ির তিনতলায় এক কোণার রুমে বিরাট পাহাড়সম উঁচু বই আর পাণ্ডুলিপির নীচে যেন এক রকম চাপা পড়ে আছেন রোগা পাতলা এক বৃদ্ধ। এক মনে বসে বসে কোন এক লেখার পাণ্ডুলিপি দেখছেন আর লাল নীল কলম দিয়ে জায়গায় জায়গায় দাগাচ্ছেন, মন্তব্য লিখছেন।

চোখে ভারি পাওয়ারওয়ালা মোটা কাচের চশমার ভেতর থেকে তিনি যখন চোখ তুলে তাকালেন, তখন আমার হৃৎকম্প শুরু হয়েছে। আমি জানি, ভারতীয় উপমহাদেশের একজন জীবিত এক জ্ঞানবৃক্ষের সামনে দাঁড়িয়েছি। সালাম দিয়ে দাঁড়ালাম বটে, কিন্তু কি বলব? এ চিন্তায় যখন কোন কূলকিনারাই ঠিক করে উঠতে পারিনি, ঠিক তখনই তিনি মিষ্টি হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন, মোসাফাহা করে বসতে বললেন। প্রথমদিনের সেই পরিচয় পর্বটা আজও যেন স্মৃতিতে ভাস্বর। আমার লেখালেখির কথা বললেন, শুনলেন। পরামর্শ দিলেন, আপ্যায়নও করলেন।

বিশাল এই জ্ঞানবৃক্ষের সান্নিধ্যে বসলে আর উঠতে মন চাইত না, সেটা সেদিনই প্রথম বুঝলাম। তার পরেও উঠে আসতে হয়েছে। সেদিনের সেই জড়তা, কুণ্ঠা তিনিই প্রথম ভেঙে দিয়েছিলেন। কখন কিভাবে সেই মুহতারাম মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব একান্ত অগোচরে আমার 'তালিব ভাই' হয়ে উঠলেন বয়স ও জ্ঞানের আকাশসম পার্থক্য থাকার পরেও, তা নিজেও জানি না। আমার মতো এক অখ্যাত লেখকের বই তিনি তুলে দিয়েছেন তাঁর কাছে আগত বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিকে। তাঁর উদ্যোগেই কোলকাতার মিযান পত্রিকা এই অধমের কয়েকটি লেখা তাদের বিভিন্ন সংখ্যায় ছাপিয়েছে। এভাবেই তিনি নবীন এই লেখককে উৎসাহ দিয়েছেন। প্রেরণা যুগিয়েছেন।

www.pathagar.com

এর পরে কতবার দেখা হয়েছে। দেশে গেলেই তাঁর সাথে দেখা করেছি। বাংলা সাহিত্য পরিষদের বৈঠকে ডেকেছেন, গেছি। তাঁর কাছে দেশবরেণ্য লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের কথা শুনেছি। তাঁর কাছে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইতিহাস শুনেছি। উপমহাদেশে ইসলামের আগমন, বিস্তার আর ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে তিনি ছিলেন যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ! এর গতিধারা কেমন ছিল? কেমন হতে হবে এবং কেমন হচ্ছে? কোন্ পথে যাচ্ছে? কোথায় কোন্ ধরনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, এসব যেন তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন। গেল মার্চ মাসেও তাঁর অফিসে বসে কথা হয়েছে বরাবরের মতোই। দুপুরে একত্রে বসে খেয়েছি। তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে আসাটা যে কোন লোকের পক্ষেই কষ্টকর। আমারও কষ্ট হয়েছে সেদিন উঠে আসতে।

তাঁর সাথে কথা বলেছি প্রবাস থেকেও। তিনি যখন অসুস্থ, শয্যাশায়ী, তখনও ফোনে কথা বললাম। নিজের শারীরিক সমস্যা ও তা উপশমের কথা যতটা না বললেন, তার চেয়েও বেশি বললেন লেখাপড়ার কথা, লেখালেখির কথা। গঠনমূলক সমালোচনা করলেন গেলবারে আমার প্রকাশিত বই নিয়ে, পরামর্শও দিলেন। আগামি লেখার বিষয়বস্তু নিয়েও দু'কথা বললেন, দীর্ঘদিন ধরে একটা গবেষণা প্রকল্প হাতে বন্দী রয়েছে, তিনি তা জানতেন, সে বিষয়ে কত দূর এগিয়েছি, তাও জানতে চাইলেন। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করার তাগাদাও দিলেন!

এই ছিলেন আবদুল মান্নান তালিব। এক বিজ্ঞ দুনিয়বিমুখ আলেম। বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান এক নিবেদিত গবেষক, ইসলামী সংস্কৃতির কলম যোদ্ধা— যাঁকে দেখলে, যাঁর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ বসলেই মনে হতো, না জানা কিছু একটা শিখলাম আজ। মনে হতো চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস আর দর্শনের জগতে যেন একটা আলোড়ন উঠেছে নিজেরই অজান্তে।

বাংলাদেশ, যেখানে ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির চর্চার আকাল চলছে, সেখানে তাঁর উপস্থিতিটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নেয়ামত। আমরা সেই নেয়ামতের কদর করতে পারিনি। এই না পারাটা আমাদের জন্য বিরাট লজ্জার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জাতি হিসেবে এটা আমাদের সামষ্টিক ব্যর্থতা তাও অস্বীকার করার কোন জো নেই। আল্লাহ আমাদের এই ব্যর্থতাকে ক্ষমা করে দিন সে আকুতি রইল তাঁর শাহী দরবারে।

আজ তিনি নেই। বাংলাদেশেরই কেবল নয়, উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যও এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁর এই মহান বান্দার সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতের কাফেলায় তাঁকে শামিল করে নিন, সে দোয়াই করি।

আমীন!

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য
ও মূল্যবোধের পথিকৃৎ
মোস্তফা আযম

২২ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তালিব ভাই জাগতিক সকল দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে পরম করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সংবাদটি আমার নিজ জেলা দিনাজপুরের নিভৃত এক পল্লী ইউনিয়নের সাপ্তাহিক বৈঠকে ঐদিন শুক্রবারের সোনার বাংলার ছাপা এক নিবন্ধে জানতে পারলাম। ক্রমেই অভিভাবকশূন্যতার হাহাকার আমাকে নিঃসঙ্গবোধে আচ্ছন্ন করে ফেললো। প্রখ্যাত নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন ভাইয়ের ইন্তেকালের সময়ও আমি ছিলাম ঢাকার বাইরে। খ্যাতিমান সাংবাদিক, কলামিস্ট ও দৈনিক সংগ্রামের সহকারী সম্পাদক সালাউদ্দিন জহুরীর মৃত্যু সংবাদও অবহিত হই ঢাকার বাইরে খুলনা থাকাবস্থায়। এমনিভাবে কবি বন্ধু গোলাম মোহাম্মদের ইন্তেকালের সময়ও ঢাকায় ছিলাম না। তখন ছিলাম রংপুরে। মল্লিক ভাইয়ের অসুস্থতার সংবাদ প্রতিদিনই নিচ্ছিলাম ঢাকায় থাকা অবস্থায়, যদিও তখন তিনি কোমায় ছিলেন দীর্ঘ তিন মাস। 'আজ যাই কাল যাই করে' আর যাওয়া হয়নি। সেদিন ১ রমজান। রমজানের ফযরের নামায শেষে একজন সংবাদ দিলেন মল্লিক ভাইকে আজ চিকিৎসকগণ মৃত ঘোষণা করেছেন। সংবাদদাতার উপর মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম। কেননা চাকরি করছিলাম তখন আমি তাঁরই অধীনে। সংবাদদাতাকেই প্রতিনিয়ত অনুরোধ করছিলাম ছুটির জন্য। তাঁরই আশ্বাসে শেষাবধি আর সাক্ষাৎ হয়নি। প্রতীক্ষা করছিলাম

www.pathagar.com

জানাযায় অংশগ্রহণ করবার সুযোগ অন্তত পাবো। কিন্তু না। সংবাদদাতা স্বয়ং তখনও নিজ মৃত্যু চিন্তায় অস্থির। হায় আমার তকদীর! আমার সাহিত্য পরিচিতির নেপথ্যে তাদের অবদান অপরিসীম। আর তা ছিলো আজকের আলোচিত ব্যক্তিত্ব আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের বাংলা সাহিত্য পরিষদকে ঘিরে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে আল্লামা বলার দুঃসাহস আমার হতো না। কেননা ধ্রুব তারকার নীরবে নিঃশব্দে এবং নিঃস্বার্থভাবে তীর্যক জ্যোতি ছড়াবার জন্যই পৃথিবীতে তাঁর আগমন বলেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন আর পছন্দও করতেন, অথচ তিনি বহুভাষাবিদ, পণ্ডিত, বাংলার পণ্ডিত, উর্দুতে পণ্ডিত, আরবিতে পণ্ডিত, ইংরেজি, ফারসি, হিন্দিতেও তেমনি সমানে সমান। ফলে বহু অনুবাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করে আজকে বাংলাদেশের ইসলামী জাগরণের আন্দোলনকে বেগবান করার মতো উল্লেখযোগ্য অবদান তাঁর রয়েছে। আমার পিতার নিকট আমি শুনেছিলাম ১৯৭৫-৭৬ সালে। তখন আমরা গেন্ডারিয়া ডিআইটি প্লটে ভাড়া ছিলাম। ঐ মহল্লাতেই দৈনিক সংগ্রামের সাবেক সম্পাদক আকতার ফারুক সাহেব ও মাওলানা মহীউদ্দীন খান সাহেবের নিজস্ব নিবাস ছিলো। ঢাকায় নতুন এসে ১৯৭০ সালে ৫৪ নাখালপাড়ার কেন্দ্রীয় অফিসে জনাব আখতার ফারুককে দেখেছিলাম প্রথম। ডিআইটি প্লটে পুনরায় তাঁকে চিনতে পেরে আমার পিতা ডাঃ ময়েজুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আব্বা! ইনি কে? আব্বা বলেন, আখতার ফারুক। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত তাঁর অনেক শিশুতোষ সাহিত্য আমি দেখেছি। কিছু পড়েছি। লেখককে দেখে আমার মধ্যে শিহরণ সৃষ্টি হয়। এভাবেই নানা রকম প্রশ্ন করতাম এ নিয়ে। বিরক্ত হতেন না তিনি। একদিন বললেন, জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত বোদ্ধা পণ্ডিতগণের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব ও মাওলানা আখতার ফারুক। প্রশ্ন করতাম, ওনারা মাওলানা ব্যবহার করেন না কেন? আব্বা বলতেন, প্রয়োজন মনে করেন না তাই। বুঝতাম না- কেন প্রয়োজন হয় আর কেন প্রয়োজন হয় না।

প্রথম দিকে মাওলানা আবদুর রহীমের অনুবাদকৃত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন পড়ার তাগিদ আসে পরিবার থেকে। অলংকারবহুল সাধু বাংলায় লেখা। যা কেবল উচ্চ শিক্ষিতরাই তখন বুঝতেন, মূল্যায়ন করতেন এবং প্রভাবিত হতেন। পরে যখন আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব ঐ তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ করেন তখন আব্বার কথা স্মরণ হয় যে, সত্যিই মাওলানা আবদুর রহীমের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো পণ্ডিত ও উচ্চমার্গের আলীম আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব। এক সময় তিনি দৈনিক সংগ্রামের বিভাগীয় সম্পাদকও ছিলেন। মগবাজারের ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোডস্থ ফালাহ ই-আম ট্রাস্ট বিল্ডিংয়ে দৈনিক সংগ্রাম অফিসেও অফিস টাইম মেইনটেইন করতে দেখেছি। পরে অজ্ঞাত কারণে সংগ্রাম থেকে অব্যাহতি নেন।

১৯৮৪ সালে সর্বপ্রথম আমার লেখা কবিতা সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় ছাপা হলে তখন থেকে আরও বেশি করে লেখার প্রতি যত্ন ও যথাযথ পরিপক্বতার জন্য মল্লিক ভাই (মরহুম কবি) আমাকে বিপরীত উচ্চারণ

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি সংসদ ও বাংলা সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য সভায় নিয়মিত লেখা পাঠের উপদেশ দেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ুয়া, সিলেটের বহু প্রতিভাবান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র কবি সোলায়মান আহসান এ সময় ঢাকায় আসেন মল্লিক ভাইয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে। আমার জন্য সোলায়মান আহসান ভাইকে বিশেষ যত্ন নিতে বলেন, বিশেষ করে আমার সাহিত্য বিষয়ে। ১৯৮৩ সালেই মার্শাল আর্টে আমি ব্ল্যাক বেল্ট সম্পূর্ণ করি। ফলে বখাটে ও ভবঘুরেপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম– মগবাজার, মালিবাগ, বাংলামটর, সূত্রাপুর ও জুরাইন এলাকায়। জীবনের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছিলাম এ সময়। এরপর কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম ও বুলবল সরোয়ারের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। আমার অগ্রজ হলেও জ্ঞানসমৃদ্ধ ছিলেন তাঁরা সকলেই। ক্রমেই আমার লেখা সম্ভাবনার আলো পেতে শুরু করলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমার লেখা ছাপতে থাকেন মল্লিক ভাই, সোলায়মান ভাই। মল্লিক ভাই 'মাসিক কলমে', সোলায়মান ভাই 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলায়'।

কবি বুলবুল সরোয়ারের অসাধারণ সমালোচনায় প্রভাবিত হয়ে যখন কবিতা অনুবাদ শুরু করি ইংরেজি থেকে ও উর্দু থেকে। এভাবে একদিন সাহসী হয়ে উঠলাম কেবলই অনুবাদে। এ সময় (১৯৮৫-৮৬) তালিব ভাইয়ের 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে। এ বইটিই আমার সাহিত্য চর্চার জীবনে প্রথম আদর্শিক দিকনির্দেশনামূলক গ্রন্থ। সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও বিশেষভাবে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে বিশেষভাবে জ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজন হয়— এ গ্রন্থ পাঠ ও অধ্যয়নের পরই আমি তা বুঝতে শিখি। টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, কীটস, শেলী, ব্রাউনিং, ম্যাক্সিম গোর্কী এ ধরনের ভিন্নধর্মী বিশ্বসাহিত্যেও যে ইসলামী মূল্যবোধের উপাদান লুকিয়ে থাকতে পারে পূর্বে তা কখনো কল্পনাও করতে পারিনি।

আল্লামা আবদুল মান্নান তালিবের বাংলা সাহিত্য পরিষদে এসেই আমি জানতে পেরেছি যে, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আদর্শগত দিক থেকে দু'টি ধারা বিশ্ব সাহিত্যে বিদ্যমান আছে— একটি হচ্ছে Art for art sake অন্যটি হচ্ছে Art for life sake. আমরা দ্বিতীয়টির পক্ষে।

১৯৮৬ সালের এপ্রিল কিংবা মে'র দিকে ৭১ নিউ এলিফ্যান্ট রোডের বিআইসি'র ২য় তলায় জোহরের নামাযের পর 'মাসিক কলমে' ছাপা মুহাম্মদ কবরি (কবরি দাস)-এর দোঁহা'র উর্দু থেকে অনূদিত কবিতা তালিব ভাইয়ের মনোযোগ আর্কষণ করলে তিনি তাঁর কক্ষে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি সাক্ষাৎ করলাম। ছালাম দিয়ে রুমে প্রবেশ করলাম। আমি ওনার সন্তানতুল্য হলেও আমাকে আপনি সম্বোধন করে বসতে বললেন। অতঃপর লেখাটি সামনে নিয়েই আলোচনা শুরু করলেন। বললেন, আপনি কি উর্দু পড়তে ও লিখতে জানেন? আমি বললাম, লিখতে-পড়তে শিখিনি। তবে শৈশব থেকে শুরু করে অদ্যাবধি উর্দুভাষীদের সাথে আছি, তাই কথোপকথন জানি ও বুঝতে পারি। উর্দু'র দোঁহাধির আবৃত্তি শুনতে চাইলে আমি মুখস্থই শুনিয়ে দিলাম তালিব ভাইকে—

www.pathagar.com

'সাঁইনে মাংআ হ্যায় দাতা/তুমরি ভরকে লানাজি/
প্যাহলি নেয়ামাত পানি লানা। বাহে নাদীকে পাছ্ না যানা/
কূয়া-বাওলা বাচাকে লানা/যরতো লানা পানি জি/

অতঃপর তালিব ভাই বললেন, আপনার বাচন ও উচ্চারণভঙ্গি সুন্দর। তবে আপনাকে এখন শুধু লিখন-পঠন জানতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ডিপার্টমেন্ট চালু আছে, ভর্তি হয়ে যান। বিশ্বমানের সাহিত্য অনুশীলনের বহু উপাদান ও বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে উর্দু সাহিত্যে, বিশেষত গজল, কাসিদা, শের, নজম। মির্জা গালীব, আল্লামা ইকবাল, হালি। দিওয়ান-ই গালীব, 'শেকওয়া ও জওয়াব-ই-শেকওয়া', 'আসরার-ই-খুদী' প্রভৃতি। তাঁর নির্দেশনার ফসল হিসাবে উর্দু-হিন্দি-পারসির প্রভাবে পড়েই পরবর্তীতে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো রচনা করি, যেগুলো আমার অভিজ্ঞতা প্রসূত ছিলো। কিন্তু কখনোই কোনভাবে এ আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম না আমি। এ আন্দোলনের বই-পুস্তকগুলোই শুধু পড়েছি জানার জন্য, যাচাইয়ের জন্য। আমি যার জন্য বলতে পেরেছিলাম যে, আহলে হাদীসের অনুরূপ সহীহ্ আমল যদি পূর্ণাঙ্গভাবে কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করার ইতিহাস পেশ করে থাকে তবে সেটি-ই হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। আর এটিই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত। আর নতুন করে এর যাত্রা শুরু হয়েছে ১৯৪১ সাল থেকে, বৃটিশশাসিত ঔপনিবেশিক ভারত থেকে। বলেছিলাম যে, ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছেন। তিনি তাঁর 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' কিংবা 'দাওয়াত ও জিহাদ' বই দু'টোর যে কোন একটিতে দ্বীন বিষয়ে সূরা মায়েদা থেকে ৩ নং আয়াত পেশ না করে সূরা কাফেরুন থেকে পেশ করেছেন। আর মওদূদী রাহমাহুল্লার সমালোচনা করে বিদ্রূপ করেছেন। সম্ভবত বাংলা সাহিত্য পরিষদে গালীবকে উদ্দেশ্য করে লেখা পঠিত কবিতার জের ধরেই তিনি আমাকে ডেকেছিলেন।

তালিব ভাই আমাদের লেখাগুলোর উপর তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টি রাখতেন। আমাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন। সেদিন তালিব ভাইয়ের মধ্যে একটা দীর্ঘ অবসাদ লক্ষ্য করেছিলাম। তিনি বললেন, পরিষদের ঐ সামান্য ভাতায় আপনার চলবে না। অতঃপর পার্ট-টাইম অন্য কিছু করারও পরার্মশ দিলেন। আমাদের সাহিত্য বিষয়ে তালিব ভাই উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমাদের লেখায় ইসলামী মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছেই। কোন পরিবর্তন নেই লেখায়। কোন অনুপ্রেরণা নেই ভাবে। কবি আল মাহমুদের উপর একটা বড় প্রত্যাশা ছিলো। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও একই হতাশা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর সম্ভব নয়। বুঝলাম, তিনি আমাকে কি ধরনের লেখা লিখতে বলছেন।

এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় আমরা একটি আদর্শিক মুসলমান সাহিত্যভাষা নির্মাণ করতে পারিনি— ব্যর্থ হয়েছি। বড়ই পরিতাপের বিষয়। ফলে আমি নিজে স্বতন্ত্র একটি মুসলিম বাংলা সাহিত্যভাষা সৃষ্টির প্রয়াসে বাংলা, বাংলা তৎসম-তদ্ভব, হিন্দি, উর্দু, পারসি ও আরবির মিশ্রণে মুসলমানদের একটি মৌলিক বাংলা সাহিত্যভাষা ও রীতির উপর

www.pathagar.com

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে আসছি, যেটি সাধারণত আরবি, পারসি, উর্দু কিংবা হিন্দি কাব্য-সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের পণ্ডিতগণ ব্যবহার করে থাকেন। এভাবে একটির পর একটি পরীক্ষামূলকভাবে ক্রমশ লিখে যাচ্ছি। আমাদের আদর্শিক ভাইয়েরা এখনও একটি স্বতন্ত্র (Secular poetic culture) বাংলা সাহিত্য ভাষায় তাদের কাব্য-সাহিত্যকে স্বতঃস্ফূর্ত সন্তরণ শিখিয়েই যাচ্ছেন। ইসলামী রেনেসাঁয় নতুন কোন বৃত্তায়নে সাহসী হচ্ছেন না কিংবা আস্থাশীল হচ্ছেন না। হয়তো তাদের খেয়ালই নেই যে, তাদেরও সাহিত্য সেবার একটি সংগ্রামী উদ্দেশ্য রয়েছে। তারা কেউ কেউ এককেজন কবি শামসুর রাহমানের মতো, বুদ্ধদেবের মতো, কেউ কেউ আবার অবিকল কবি আল মাহমুদের মতো। ইউরোপের ইয়েটস কিংবা ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের আলোচনা করলেও কাব্য সাধনায় এর পরিস্ফুটন ঘটে না মোটেও। একটা গোলক ধাঁধায় পড়ে সকলেই ঘূর্ণিপাক খাচ্ছেন যেন, অথচ বর্তমান বিশ্বসাহিত্য রীতির পরিবর্তনের স্বভাবের সাথে তাল মেলাতে হলে বাংলা বলতে বলতেই যেমন ইংরেজি হয়ে যাবে— তেমনি উপমহাদেশীয় উর্দু-হিন্দি কিংবা আরবি, পারসি ইত্যাদি ভাষায় কুরআন ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতিকে অবলম্বন করে আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে প্রস্ফুটিত হবে আবেগে ও প্রগাঢ় বিশ্বাসে। যে যাই বলুক। কবিতা বা কাব্য এখন মানুষের মুখনিঃসৃত ও আবেগপ্রসূত— বাস্তব ও ব্যবহারিক ধ্বনি শিল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপ বলতে বলতেই বক্তা যেমন শ্রোতাকে বোঝাতে না পারার নীরব বেদনায় ভিন্ন ভাষা কিংবা প্রবাদের আশ্রয় নেন ঠিক তেমনি। The art of a social sentiment with an oratorical pride that at the public meeting with the skilful speaking spontaneously but anti-poetic.

২০০৫ সালে আমাকে কবি গোলাম মোহাম্মদের স্থলাভিষিক্ত করতে বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক হিসাবে নির্বাচনের পূর্বে একটি বিশেষ সাক্ষাতের জন্য তালিব ভাই তাঁর শান্তিবাগের বাসভবনে আমাকে ডেকেছিলেন। সেখানে আহলে হাদীস আন্দোলনের বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলেন তিনি। মল্লিক ভাইয়ের মতোই একটা অবসাদ লক্ষ্য করলাম তাঁর চোখে-মুখে। বুলবুল সরওয়ারের উপরও মল্লিক ভাইয়ের এমনি একটি প্রত্যাশা ছিলো, তালিব ভাইয়ের যেমন ছিলো কবি আল মাহমুদের উপর। আমাদের কবি-সাহিত্যিকগণ আজিজ সুপার মার্কেটের বেপরোয়া লেখকদের মতো হয়ে যান হাতে কলম পেলেই। আদর্শের কথা স্মরণে থাকে না, মূল্যবোধের কথা স্মরণে থাকে না। কুরআন ও হাদীসের উপকরণসমূহের কথা খেয়াল থাকে না। কেবল বাংলা ভাষাভাষী হওয়ার কারণে বাঙালি হওয়ার দাবিটুকু ছাড়তে পারেন না। আবার অপরদিকে মুসলমান হওয়ার গৌরবটুকুও ফেলতে পারেন না। বলতে, মানতে ও বিশ্বাস করতে বরং কষ্ট হয় যে, বাংলা কেবলি একটি ভাষা— জাতির পরিচয় নয়, বরং মুসলমান একটি জাতির নাম। মুসলমানের থাকে অনেক ভাষা। থাকে অনেক ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। থাকে অনেক বর্ণ, অনেক আকৃতি। সাদা-কালো মিশ্র গৌড়।

www.pathagar.com

আমেরিকানরাও মুসলমান হতে পারে, আফ্রিকানরাও মুসলমান হতে পারে। হতে পারে প্রাচ্য দেশীয় মালয়েশীয়রাও, ইন্দোনেশীয়রাও। কিন্তু একজন চৈনিক কিংবা ইউরোপীয় কখনো একজন বাঙালি হতে পারে না, হওয়ার সুযোগও নেই। আমাদের জানা দরকার যে, আমাদের এখানে বাংগাল (বাঙালি) বলে যাকে দাবি করছেন তারাই ইউরোপের ডায়্যালেক্টিক্যাল মেটেরিয়ালিজমের (Dialectical Materialism) অনুসারী। তারা বুঝতে পারে না যে, এর থিসিস, এন্টি-থিসিস ও সিনথিসিসের (Thesis, Anti-thesis, Sinthesis) বৃত্তাবর্তন বাঙালি জাতির পৌত্তলিক পোড়া মাটির জড়-বিগ্রহ ছবি-মূর্তির ধারাকে বিপর্যস্ত করেছে অবলীলায়। সাঁওতাল, কোল, ভিল, কুকি, মগ, মার্মা, চাকমা, গারো, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি জাতি-উপজাতি থেকেই এই বাঙালি সংস্কৃতির উপাদান, উপকরণ ও বহুবিধ বিচিত্র সব অবাস্তর ও অবৈজ্ঞানিক উপজীব্য আহরণ করা। আজ থেকে তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে বর্বর ও বন্য গুহাবাসী মানুষের সাপ, ব্যাঙ, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণী শিকারই ছিলো যাদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন, তাদের এ আবর্তিত রূপই আজকের বাঙালি জাতি। এদেরই মূল গোষ্ঠীটি আজও পাহাড়ে-জঙ্গলে বিদ্যমান, আমরা যাদের দেখতে পাই উপজাতি হিসাবে (As a tribe)। যারা সেনাধ্যক্ষ দ্রোণাচার্য্যের ভাবশিষ্য তুখোড় তীরন্দাজ একলব্যকে সাঁওতাল উপজাতির স্থপতি হিসাবে জানেন, যার অপর নাম আরণ্যক। আমার গবেষণার এসব বিষয় নিয়ে তালিব ভাইয়ের সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল ২০১০ সনের রমজান মাসে। একটি অনুবাদ কর্মের দায়িত্ব প্রসঙ্গে তৌহিদুর রহমান ভাইয়ের ডাকে বাংলা সাহিত্য পরিষদ কার্যালয়ে গিয়ে।

আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব আমাদের ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলনের প্রধান অভিভাবক ছিলেন। অনেক গুণী ব্যক্তির বাংলা সাহিত্য পরিষদের অঙ্গনে জমায়েত করে আমাদের যথাযথভাবে গড়ে ওঠার জন্য যথাযথ দীক্ষার ব্যবস্থাপনা করেছিলেন তিনিই। তিনি তদীয় উন্নত গুণাবলীর পাশাপাশি একজন আন্তর্জাতিক মানের সংগঠন স্রষ্টাও ছিলেন। তিনিই আমাদের পথিকৃৎ। তিনিই আমাদের ইসলামী ও সাহিত্য মূল্যবোধের স্রষ্টা। আমাদের গৌরব। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

আমীন!

www.pathagar.com

আলোক সন্ধানী গবেষক
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

নিপুণ শিল্পীত ফলবাগানে পাকাফলের গন্ধে নয়, বিশাল ঝাউবনে ফলজবৃক্ষ খোঁজার অনুসন্ধিৎসু মন এবং বিজয়ের স্পৃহা নিয়ে যে ক'জন মহামনীষী নিজেকে মানব সেবায় বিলিন করেছেন আবদুল মান্নান তালিব তাঁদেরই অন্যতম। চাঁদহীন রাতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশকে তিনি পরিস্কার করে হাজার তারার আলোয় বিকশিত করার প্রয়াসে গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন গবেষণা ও লেখালেখির কাজে। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও তিনি উর্দূকে ব্যবহার করেছেন মাতৃভাষার মতোই। ফার্সি ও ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর ঈর্ষনীয় দক্ষতা ছিল। ফলে মৌলিক রচনা, অনুবাদ এবং শিশুপাঠ্যসহ সহজ-সরল রচনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে মানবীয় বোধ-বিশ্বাস, দেশপ্রেম এবং জাতিগঠনের মৌলিক নির্দেশনা। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন আলোসন্ধানী সফল গবেষক।

আবদুল মান্নান তালিব নামটির সাথে পরিচয় উনিশ'শ নব্বই সালের বেশ আগেই। নঈম সিদ্দিকী রচিত 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান' নামক সংক্ষিপ্ত অথচ অতীব প্রয়োজনীয় মৌলিক গ্রন্থের অনুবাদক হিসেবে তার নামটি হৃদয়ঙ্গম হয়েছে সে সময়ই। তাঁর সহজ সরল ও প্রাণবন্ত অনুবাদ তখনই তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা তৈরিতে ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে সম্ভবত তিরানব্বই সালে মগবাজারের আলফালাহ মিলনায়তনে সাহিত্য-সংস্কৃতির সাতদিনের একটি ওয়ার্কশপে তিনি এসেছিলেন আলোচক হিসেবে। তখনই মূলত তাঁর সাথে সরাসরি

www.pathagar.com

সুযোগ ঘটে। তারপর থেকেই যোগাযোগ, সাক্ষাৎ এবং -সংস্কৃতির নানা বিষয়ে কাছাকাছি হওয়া। বিশেষকরে বাংলাদেশ স্কৃতি কেন্দ্রে কবি মতিউর রহমান মল্লিক ভাইয়ের সাথে কাজ করার ময়ই তাঁর সম্পর্কে বেশি জানার সুযোগ ঘটে। স্বল্পভাষী নীরব গবেষক হিসেবে তিনি কাজ করে গেছেন অবিরাম। বাংলা সাহিত্য পরিষদের হাল ধরে গড়ে তুলেছেন একটি সাহিত্য সংস্কৃতির আকর প্রতিষ্ঠান। গভীর জলে অবস্থ'ানরত বড় বোয়াল মাছের মতোই তাঁর নড়াচড়া ছিল অদৃশ্য ও শব্দহীন। কথা বলার ক্ষেত্রে খানিকটা আড়ষ্ঠতা থাকলেও লেখনীর হাত ছিল ভীষণ সাবলিল গতি সম্পন্ন।

গবেষক আবদুল মান্নান তালিবের মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বাংলাদেশে ইসলাম' অন্যতম। প্রায় পৌনে তিনশত পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে বাংলায় ইসলাম আগমনের প্রাথমিক ইতিহাস থেকে শুরু করে এ অঞ্চলের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও তুলে আনার চেষ্টা করেছেন তিনি। বিশেষকরে প্রাচীন এ ভুখণ্ডে পৌত্তলিক ধর্মাচরণের কারণে পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের যাঁতাকলে সাধারণ মানুষ যেভাবে শতাব্দী থেকে শতাব্দী শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছিল পরবর্তীতে ইসলামের আগমনের প্রেক্ষিতে গণমানুষের মধ্যে যে মানবিকতাবোধ এবং সাম্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে আউলিয়া কিরামসহ ইসলাম প্রচারকদের যে উদারতার নজীর প্রকাশ পেয়েছিল তিনি তা আলোকপাত করেছেন দালীলিক গবেষণার মাধ্যমে। গ্রন্থটিতে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন পূর্বকথা শিরোনামে। প্রাচীন বাংলা এবং প্রাক-ইসলাম যুগ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন এ অঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী, আর্য-দ্রাবিড় দ্বন্দ্ব, হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের শাসনামলে বাংলা ও বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায় পর্বে ইসলাম প্রচারে বণিক, সুফি-আলিম এবং হযরত শাহ সুলতান বলখী (রহ.) থেকে শুরু করে শাইখ আলাউদ্দীন আলাউল হক পর্যন্ত চল্লিশের অধিক অলিয়ে কিরামের জীবন ও কর্মসহ বাংলায় ইসলাম প্রচারে তাঁদের অবদান আলোচনা করেছেন। 'ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রাজশক্তির ভূমিকা' এবং 'ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়' শীর্ষক অধ্যায়ে বাংলা বিজয়ী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী থেকে শুরু করে সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ এবং বিশিষ্ট সাধক নূর কুতুবুল আলম থেকে শুরু করে মাওলানা শাহ আবুদর রহীম শহীদ পর্যন্ত চল্লিশের অধিক অলী-উলামার দীনপ্রচারের প্রচেষ্টার বিবরণ ও বাংলার মুসলিম সুলতানগণের দীনি খেদমতের বিবরণ দিয়েছেন। 'সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা' অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম সমাজ ও তার বৈশিষ্ট্য, শাসনব্যবস্থায় ইসলামের বিধান প্রয়োগ, পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং সংস্কার প্রয়াসের বিবরণ চিত্রিত করেছেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের ইতিহাস জানার জন্যে এটি একটি অতীব গুরুত্বপুর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা, মুসলমানের প্রথম কাজ, ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান, আমল আখলাক, ইমাম ইবনে

www.pathagar.com

তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন, ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ, সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা: ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট, ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন, সত্যের তরবারী ঝলসায়, আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম প্রভৃতি তাঁর মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' এবং 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' একটি অপরিহার্য পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত ও সমাদৃত।

শিশুদের নিয়ে মেঠো বক্তাগণ নানাভাবে আলোচনা করলেও তাদের নিয়ে লেখালেখির খুব অভাব। বিশেষকরে শিশুদের আদর্শিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে পর্যাপ্ত গ্রন্থের অপ্রতুলতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয়। আলোকিত মানুষ গড়ার নিমিত্তে যে সব সাহিত্যে ছড়াছড়ি দেখছি তা কোনভাবেই বিশ্বাসী নাগরিক তৈরির উপযোগী সাহিত্য নয়। বিশ্বাসবহির্ভূত এসব শিশু সাহিত্যের ভীড়ে বিশ্বাসের আলোকে শিশুসাহিত্যের চরম অভাব সর্বজন স্বীকৃত। এ অভাব পূরণে সাহসের সাথে সততা আর একনিষ্ঠতা সহকারে এগিয়ে এসেছেন আবদুল মান্নান তালিব। তাঁর রচিত 'সহজ পড়া, এসো জীবন গড়ি, পড়তে পড়তে অনেক জানা, মজার গল্প, আমাদের প্রিয় নবী, কে রাজা, হাতিসেনা কুপোকাত, ছোটদের ইসলাম শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ শিশুকিশোরদেরকে বিশ্বাসী ধারায় গড়ে উঠতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। বর্তমান আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তাঁর প্রতিটি শিশুতোষগ্রন্থ আমাদের সন্তানদের পথচলায় বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। এসব গ্রন্থের ভাষা ও শব্দচয়নে তিনি যে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, তাতে পাঠবিমুখ শিশু-কিশোরদের কাছেও এ গ্রন্থগুলো অনেকটা উপভোগ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

সম্পাদনা কাজটি কোন মতেই সহজ নয়। কিন্তু আবদুল মান্নান তালিব যেন জন্মই নিয়েছেন জাত সম্পাদক হিসেবে। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে 'জিয়াউল ইসলাম' নামে সাময়িকপত্রের সম্পাদনায় হাতে খড়ি হবার পরে আর থেমে থাকেননি তিনি। সম্পাদনার এ যাত্রায় তিনি এ কাজে সম্পৃক্ত থেকেছেন আমৃত্যু। প্রায় তিন বছর লাহোরে উর্দু দৈনিক 'রোজনামা তাসনীম' এর সহসম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলে আসেন ঢাকায়। এখানে এসে সহসম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার। অতঃপর সাপ্তাহিক জাহানে নও, মাসিক পৃথিবী, সাপ্তাহিক মিযান, ত্রৈমাসিক ও মাসিক কলম, প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন যোগ্যতার সাথে। সেইসাথে দৈনিক সংগ্রামের কলামিষ্ট ও ফিচার এডিটর হিসেবে তাঁর সুনাম সর্বজন বিদিত। শুধু পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই নয়, গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সম্পাদনাতেও তাঁর অবদান স্মরণীয়। বিশেষকরে সহীহ্ আল বুখারীর ১ম ও ৩য় খন্ড, রিয়াদুস সালেহীন ১ম খন্ড, মুসলিম শরীফের মুকদ্দমা, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, নির্বাচিত গল্প, সত্য সমুজ্জ্বল, রসূলের যুগ নারী স্বাধীনতা প্রভৃতি তাঁর অনবদ্য সম্পাদিত গ্রন্থ।

আবদুল মান্নান তালিব অনুবাদ সাহিত্যেই সবচেয়ে বেশি সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ অনুবাদকগণের তালিকায় তিনি

www.pathagar.com

অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সফল ব্যক্তিত্ব। কুরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য এবং ইতিহাস ঐতিহ্যের অনুবাদে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের দাবীদার। আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদীর (রহ.) যুগান্তরকারী তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনকে তিনি সহজ-সরল বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে ইসলামপ্রিয় পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। সহীহ আল বুখারী এবং রিয়াদুস সালেহীনের অংশবিশেষেরও সফল অনুবাদক তিনি। সীরাতে সারওয়ারে আলম, খতমে নবুয়ত, পয়গামে মুহাম্মদী, ভারত যখন ভাঙলো, প্রত্যয়ের সূর্যোদয়, অপরাজিত নামক সীরাত এবং ইসলামের ইতিহাস-ঐহিত্যের অসাধারণ গ্রন্থসমূহের অনুবাদ তাঁর অসামান্য অবদান। এছাড়া রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা ৩য় খণ্ড, রাসায়েল-মাসায়েল ২য় ও ৩য় খণ্ড, ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ, ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন, ইসলামের দৃষ্টিতে বীমা, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি, ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাহেলিয়াত, ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী, চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী, মহররমের শিক্ষা, কুরবানীর শিক্ষা প্রভৃতি তাঁর অনুদিত সাহিত্য। ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসারে এসব গ্রন্থ অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

'পার্টটাইম সাহিত্য হয় না, সাহিত্যের জন্যে জীবনকে বিনিয়োগ করতে হয়' নব্বইয়ের দশকে ঢাকার একটি সাহিত্য আড্ডায় একথা শুনেছিলাম কবি আল মাহমুদ এর মুখে। আবদুল মান্নান তালিবকে নিয়ে দুকথা লিখতে গিয়ে কবির এ কথাটি বারবার মনে পড়ছে। কোন পিছুটানের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে গেলে কেউ সত্যিকার লেখক হয়ে উঠতে পারেন না। আর তাই হয়তো বা বড় বড় লেখক-কবিগণ ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে খানিকটা উদাসীন হয়ে থাকেন। একই প্রক্রিয়াতেই দুনিয়ার মোহ, সুখ স্বাচ্ছন্দ এবং বাসাবাড়ির কোন মায়াই আটকাতে পারেনি আবদুল মান্নান তালিবকেও। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন নিজের জন্য নয়, পুরোপুরি মানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্যেই। তাইতো হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তান অতঃপর বাংলাদেশের সবুজ জমিনে এসে তিনি কাটিয়ে দিলেন গোটা জীবন। 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে' কবির সেই কাঙ্খিত ছেলে হয়েই গড়ে উঠেছিলেন তিনি। আলোচনার টেবিলে তিনি যতটা সরব ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি সময় দিয়েছেন গবেষণা ও লেখালেখির কাজে। তাইতো তিনি এতো বেশি কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ২০১১ সালের ২২ সেপ্টেম্বরে ৭৬ বছর বয়সে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন আল্লাহর মেহমান হয়ে। আজ গবেষক তালিব এর চলে যাওয়া মানেই বিশ্বাসী ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির স্রোতে খানিকটা গতিহীনতার ইংগিত। তাঁর চলে যাওয়া মানেই একটি উজ্জ্বলতর নক্ষত্রের বিদায়। তবে তিনি যা করে গেছেন– আত্মবিস্মৃত এ জাতি তাঁকে স্মরণে রাখুক আর নাই রাখুক, মহান আল্লাহর দরবারে তিনি পাবেন মর্যাদার উচ্চশিখর; এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

একজন সফল অনুবাদক
নয়ন আহমেদ

আবদুল মান্নান তালিব। তিনি মাওলানা; ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ এক ঋদ্ধ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তিনি 'মাওলানা' শব্দটি ব্যবহার করতেন না। সম্ভবত বাহুল্য পছন্দ করতেন না তিনি। তাঁর নানান লেখা ও সাক্ষাৎকার পড়ে এটাই ধারণা হয়েছে আমার। এক ধরনের আবেগও অনুভব করেছি তাঁর জন্য। সৌজন্যবোধ, সহজতা, সারল্য তাঁকে আরো সুন্দর করেছে। তাঁর লেখাতেও রয়েছে তাঁর জীবনের মতো অনাড়ম্বর সৌন্দর্য। সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করেন তিনি। সহজ দিয়েই মন জয় করেন তিনি। এ ক্ষমতা তাঁর যেন সহজাত। অনেকেই সহজ ভাষায় কথা বলতে পারেন না, দুর্বোধ্যতায় আক্রান্ত হন। বক্তব্য হয়ে পড়ে অস্পষ্ট। আবদুল মান্নান তালিব কখনোই দুর্বোধ্যতাকে প্রশ্রয় দেননি। বক্তব্যকে আড়াল বা অস্পষ্ট করেননি। যা বলেছেন তাই প্রাসঙ্গিক হয়েছে, হৃদয়গ্রাহী হয়েছে; শিল্পমণ্ডিত হয়েছে। নিশ্চয়ই আবদুল মান্নান তালিবকে একজন অগ্রগণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আধুনিক আলেমরা কেমন হবেন? এর একটা সদুত্তর দেয়া যায়। ইসলামের জ্ঞান তাঁদের নখদর্পণে থাকবে, যুগের সমস্যা সমাধানে প্রখর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে তাঁদের। বিজ্ঞান-শিল্প-দর্শন-সাহিত্য সম্পর্কে অনবহিত থাকলে যুগের নেতৃত্ব দেয়া যায় না। আর ক্রমাগত অনুশীলন ও চর্চার যে ক্ষেত্র, বিশেষত ইসলাম চর্চার যে বিস্তৃত প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে তাতে এদেশের আলেম সমাজকে অংশগ্রহণ করতে হবে নিজেদের তাকিদেই। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, হাসানুল বান্না,

www.pathagar.com

সাইয়েদ কুতুব প্রমুখ মনীষী ইসলামের যে সমাজ-মনোবৈজ্ঞানিক ও জীবনমুখী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তাতে মুগ্ধ হয়েছেন অনেকেই। ইসলাম কেন এসেছে, তার কাজ কী, মানবজাতির অগ্রগতি কিসে– এর বিস্তৃত বিশ্লেষণ তাঁরা করতে সক্ষম হয়েছেন গভীর অধ্যয়নের জন্য। আবদুল মান্নান তালিবসহ অসংখ্য আলেম তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তাঁর লেখায় ইসলামের যে মর্মবাণী ফুটে উঠেছে তা যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনি শৈল্পিক। আবদুল মান্নান তালিব একজন উঁচুমানের সাহিত্যিক, দার্শনিক। তিনি একজন সফল অনুবাদক। অনুবাদ করেছেন বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিকবৃন্দের প্রচুর গ্রন্থ ও রচনা। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর 'তাফহীমুল কুরআন'। বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চার নতুন দিক খুলে দিয়েছে এ গ্রন্থটি। বলা হয়ে থাকে আধুনিক তাফসীরসমূহের মধ্যে এ গ্রন্থটি অগ্রগণ্য। কারণ কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট বা শানে নযুল, মহানবী স.-এর জীবন ও কর্মপদ্ধতি এবং কুরআনের উদ্দেশ্য– এসব বাঙ্ময় হয়েছে এ গ্রন্থটিতে। কুরআনের কেন্দ্রীয় বিষয় মানুষ। 'তাফহীমুল কুরআন' গ্রন্থে মানবজীবনের একটি অখণ্ড রূপকল্প অপূর্ব ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মান্নান তালিব এটি ১৯টি খণ্ডে অনুবাদ করেছেন। এর আগে এর অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম। তাঁর অনুবাদ ছিলো সাধু ভাষায়। এটি সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য ছিলো না। আবদুল মান্নান তালিবের ভাষা ঝরঝরে হওয়ায় এটি পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। সবার নিকট আদৃত হয়েছে। ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক সহজাত ধর্ম। আবদুল মান্নান তালিব মনে করেন সুন্দর-সহজ যুক্তি ও উপমার সাহায্যে ইসলাম প্রচার করতে হবে। সবাই পণ্ডিত হন না। সেজন্য সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছতে হলে তাদের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। যারা শিক্ষিত তারাও আবার সাহিত্য চর্চায় অভ্যস্ত নয়। এদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে হবে হৃদয়গ্রাহী ভাষায়। মিডিয়া, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া এই কাজটি করতে পারে। আর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতেও সর্বাধিক যুক্তি, সাবলীল ভাষা ও কুরআন-সুন্নাহর মর্মবাণীকে প্রাধান্য দিতে হবে।

আবদুল মান্নান তালিব বাংলা ভাষায় প্রধানত অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটি সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছেন। তাঁর কিছু মৌলিক সৃষ্টিও রয়েছে। এর মধ্যে– 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' অনন্য কীর্তি। আমি এই মহান দার্শনিক লেখকের মাগফিরাত কামনা করি। মহান আল্লাহ তাঁর খেদমতকে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্যের আলোকবর্তিকা

মাসুদুর রহমান খলিফা

আবদুল মান্নান তালিব বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্যের দীপ্তিময় এক আলোকবর্তিকা। তিনি উপমহাদেশের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অনুবাদক, সংগঠক ও গবেষক। কৃষ্ণচূড়ার একটি বৃন্ত মৃত্তিকা থেকে রস নিয়ে চোখ ধাঁধানো রং ছড়িয়ে দেয় আকাশে। সে রং চারপাশের সৌন্দর্য বাড়ায়। আবদুল মান্নান তালিব তেমনি বাংলাদেশের এক কৃষ্ণচূড়া। পৃথিবীর অবস্থান ক্ষুদ্র হলেও তাঁর সাহিত্যভাণ্ডার বাংলা সাহিত্যকে ইসলামের রঙে রাঙিয়েছে।

এই বহু ভাষাবিদ– বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু, সংস্কৃত, তুর্কি, ফারসি, হিন্দি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। শতাব্দী কাল ধরে জ্ঞানের অন্বেষায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পাকিস্তানের লাহোর, করাচি, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের ঢাকাতে শিক্ষা গ্রহণ শেষে সাংবাদিকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের খেদমতে বাংলাদেশে তাঁর হিজরত। সমাজকে বদলে দেয়ার সংগ্রামী সংগঠক, সত্যের এ সৈনিক প্রমাণ করেছেন, 'অসির চেয়ে মসী অধিক শক্তিশালী।'

সরাসরি আরবি ভাষা থেকে কুরআন ও হাদীস এবং উর্দু ও ফারসি ভাষা থেকে মহাকবি ইকবাল, আল্লামা মওদূদী, নঈম সিদ্দিকী, নসীম

www.pathagar.com

হিজাজীসহ খ্যাতিমান লেখকদের গ্রন্থ যেমন বাংলায় অনুবাদ করেছেন তেমনি জাতীয় কবি নজরুল ও রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের কবিতা উর্দুতে অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্য ও মানবতার কবিকে বিশ্ব দরবারে সমাসীন করেছেন।

বিশাল জ্ঞানবৃক্ষ ফলভারে বিনম্র, নির্বিরোধ, নিরহঙ্কার, সদালাপী, নিবেদিত- প্রাণ, প্রচারবিমুখ, মুত্তাকী এ মানুষটি নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন, আড়াল করে রাখতেন তাঁর জ্ঞানের বিশালতাকে। সেদিক থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যের আত্মগোপনকারী শেক্সপিয়র। দৃঢ় মনোবল, আদর্শে অবিচল পথের দিশারী মহাপ্রাণ সাহিত্য সাধনায় তিনি একজন অ্যারিস্টোটল। ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন, ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ, কুরআনের আলোকে আধুনিক যুগে সাহিত্যের জটিল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেন এ নীরব সাধক। কুরআন থেকে গবেষণা করে ইসলামী সাহিত্যের মূলনীতি, সাহিত্যে মূল্যবোধ ও উপাদান কুরআনিক বাক্য বিন্যাস কর্ম অর্থাৎ গদ্য-পদ্যের মিশেল করে দেন এ নীরব সাধক সাহিত্য দিগন্তের পথিকৃৎ।

বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিম শেকড়ের সন্ধান দিয়েছেন 'বাংলাদেশে ইসলাম' নামক উচ্চাঙ্গের গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। এটি তাঁর অনবদ্য একটি কাজ। নারী জাগরণ, নারীর আধুনিকায়নের জন্যে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' নামক অবিস্মরণীয় গ্রন্থের মাধ্যমে। সমসাময়িক সাহিত্যকে ইসলামীকরণের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ, সাহিত্য ও শিল্পকলাকে তৌহিদবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত করার আধ্যাত্মিক প্রাণপুরুষ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী সংগঠক, ইসলামী আন্দোলনের অগ্রনায়ক মরহুম আবদুল মান্নান তালিব প্রমাণ করেছেন, 'বিদ্বানের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়ে পবিত্র।'

ইসলামী অর্থনৈতিক আন্দোলনের সিপাহসালার, অর্থ চিন্তাবিদ আবদুল মান্নান তালিব তাঁর বিখ্যাত রচনা 'ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি' ও তার অনুবাদ গ্রন্থ 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং'-এর মাধ্যমে পুঁজিবাদ ও মার্কসবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। আগামী প্রজন্মের পথ প্রদর্শক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন প্রতিবাদী কণ্ঠ, নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে। দানেই ছিল তাঁর আনন্দ ও তৃপ্তি।

বৃক্ষ থেকে আমরা যেমন অক্সিজেন পাই, ছায়া পাই, পরিবেশের ভারসাম্য ফিরে পাই তেমনি বাংলা ভাষাভাষী মানুষও আবদুল মান্নান তালিবের কাছ থেকে পেয়েছে ইসলামের মহামূল্যবান সাহিত্যভাণ্ডার।

ধর্ম ও স্বাধীনতা যে হৃদয়ের মূলমন্ত্র, যে হৃদয় একটি নক্ষত্র, তা থেকে আলো ছড়ায়, বিচ্ছুরিত হয় জ্ঞানের স্বর্ণকণিকা। এমনি ধর্মবোধে উজ্জীবিত কিংবদন্তি অনুবাদ সাহিত্যের দিকপাল মরহুম আবদুল মান্নান তালিব। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পঠিত আল কুরআনের তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'-এর বাংলা অনুবাদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

www.pathagar.com

আদর্শিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির পথিকৃৎ

শহীদুল ইসলাম

২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ ইন্তেকাল করেছেন বরেণ্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, চিন্তাবিদ, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব (৭৬)। গোটা জীবন তিনি মুসলমানদের কল্যাণ ও ইসলামী জীবনাদর্শের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেছেন। আবদুল মান্নান নামের ভিড়ের মধ্যে লেখক সত্তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পিতৃপ্রদত্ত নাম আবদুল মান্নান-এর সাথে তিনি যুক্ত করেছিলেন 'তালিব'। যার অর্থ সন্ধানী, অন্বেষণকারী, তালাশকারী। নিজের ধর্ম, ঐতিহ্য, জাতীয় পরিচয় ও সত্যের সন্ধানে গোটা জীবন ব্যয় করে তিনি 'তালিব' নাম ধারণকে অর্থবহ ও সার্থক করেছিলেন। তাঁর গভীর অনুসন্ধানে আত্মবিস্মৃত বাঙালি মুসলমানরা পেয়েছে আত্মপরিচয়। তাঁর চিন্তা ও গবেষণায় উদ্ভাসিত হয়েছে অসংখ্য বাঙালি মুসলমানের জীবন। পূর্ণতা পেয়েছে অনেকের জীবনবোধ। তাঁর চিন্তা ও লেখনীর দ্বারা ইসলাম উপস্থাপিত হয়েছে সামগ্রিক জীবনাদর্শরূপে।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩৪ সালের ১৫ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন আবদুল মান্নান তালিব। ইসলামী জীবনাচার ছিল তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য। ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠলেও কৈশোর থেকেই তাঁর মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল প্রবল, ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি ম্যাট্রিক পাস

www.pathagar.com

করেন। এরপর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন ইসলামী জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে। পড়াশোনা করেন উত্তর প্রদেশের একটি মাদরাসায়। এক পর্যায়ে পাড়ি জমান পাকিস্তানে। লাহোরের বিখ্যাত মাদরাসা 'জামেয়া আশরাফিয়া' থেকে ১৯৫৭ সালে দাওরা-ই-হাদীসে সনদ লাভ করেন। লাহোরে পড়াকালীন তিনি বিখ্যাত আলেম মাওলানা ইদরিস কান্ধলভীর ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভ করেন। এই মনীষীর ইলম, দূরদর্শিতা, চিন্তা ও প্রজ্ঞা তাকে প্রভাবিত করে। ফলে সে বছরই লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক 'রোজনামা তাসনীম'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে লাহোর ত্যাগ করে ঢাকায় এসে 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। এরপর ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত 'ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী' ঢাকা-এর প্রধান গবেষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেন এবং ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মিযান' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে 'ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী'র প্রধান গবেষক পদে পুনর্বহাল হন এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত 'মাসিক কলম' ও ১৯৮১ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত 'মাসিক পৃথিবী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭৭-৮২ সাল পর্যন্ত দৈনিক সংগ্রাম-এর ছোটদের পাতা 'শাহীন শিবির'-এর পরিচালক ছিলেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত তিনি দৈনিক সংগ্রাম-এর কলামিস্ট ও ফিচার এডিটর ছিলেন। ১৯৮৭ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ'-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৯৯ থেকে 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ'-এর ভাইস-চেয়ারম্যান ও এ সংস্থার গবেষণা জার্নাল 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য। মাসিক কলম, মাসিক পৃথিবী, দৈনিক সংগ্রামের শাহীন শিবির ও ফিচার বিভাগ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা এবং ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি বহু লেখক, গবেষক ও সম্পাদক তৈরি করেছেন। তাঁর দক্ষ ও মায়াবী পরশে আনাড়ি হাতের রচনাও বলিষ্ঠ হয়ে উঠতো এবং নবীন ও তরুণ লেখক, সাংবাদিক ও সাহিত্যপ্রেমীরা রপ্ত করে নিতে পারতো লেখার কলা-কৌশল। প্রতিষ্ঠিত গবেষক ও কবি সাহিত্যিকদেরকেও তিনি আদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতেন। শুধু নবীনরাই যে তাঁর সান্নিধ্যে লেখক হয়ে উঠতেন তা নয়, প্রবীণ কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও গবেষকগণের মধ্যেও তিনি আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ড. এস এম লুৎফর রহমান, ড. আনিসুজ্জমান, ড. হাসানুজ্জমান চৌধুরী, ড. আবুল কালাম পাটওয়ারী, কবি আল মাহমুদ, কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ, কবি আল মুজাহিদী, কবি সাজজাদ হোসাইন খান, কবি ওমর আলী, ঔপন্যাসিক শফিউদ্দীন সরদার প্রমুখ তাঁর গুণমুগ্ধ। তাঁর আদর্শিক জীবনাচার ও কর্মনিষ্ঠায় তিনি সমসাময়িক

www.pathagar.com

ও প্রবীণদের কাছেও ছিলেন আদৃত। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা আখতার ফারুক, কবি ফররুখ আহমদ, কবি বেনজীর আহমদ, প্রফেসর আবদুল গফুর, গবেষক আবুল আসাদ, নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ, অভিনেতা উবায়দুল হক সরকার, কবি মতিউর রহমান মল্লিকসহ বহু বিদগ্ধজনদেরও একান্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন তিনি।

শুধু সাহিত্য সাংবাদিকতা নয়, শিল্প-সংস্কৃতিতেও তাঁর ভূমিকা ছিল পথ নির্দেশকের মতো। আদর্শ ও মূল্যবোধহীন সঙ্গীতাঙ্গনে ইসলামী আদর্শভিত্তিক সঙ্গীত চর্চায় তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। ফলে আজকের বাংলাদেশে আদর্শভিত্তিক সঙ্গীত চর্চার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। আদর্শভিত্তিক নাটক সিনেমা ডকুমেন্টারি তৈরির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক। তাঁর নির্দেশনায় বহু গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, অভিনেতা ও নির্দেশক অশ্লীলতা পরিহারে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত হয়েছেন।

আবদুল মান্নান তালিব বলতেন, 'ইসলাম যেমন একটি বিশ্বজনীন মতবাদ ও আদর্শ, ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতিও বিশ্বজনীন।' তিনি বলতেন, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলত জীবন চর্চার নাম, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলাম চর্চার সুযোগ রয়েছে। ইসলাম সব ধরনের সংকীর্ণতা ও সীমালঙ্ঘন থেকে মুক্ত। ফলে ইসলাম জীবনধর্মী সবকিছুকেই আত্মস্থ করতে পারে। শুধু ইসলামেরই আছে এই ব্যাপকতা।'

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি উর্দু, আরবি, ফারসি, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সাহিত্যের সব শাখায়ই তাঁর পারদর্শিতা ছিল ঈর্ষণীয়। তিনি যেমন মৌলিক গবেষণা করেছেন তদ্রূপ কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কলাম, শিশুতোষ রচনায়ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ইসলামী আকীদা, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, উপন্যাস, ইকবালের কবিতা, অর্থনীতিসহ নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক তিনি অনুবাদ করেছেন। তিনি কবি নজরুল ও ফররুখ আহমদের কবিতা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে উর্দুভাষীদের কাছে নজরুল ও ফররুখকে পরিচিত করেছেন। তাঁর বিদগ্ধ অনুবাদে মূল গ্রন্থকারের বক্তব্য আরো বাঙময় হয়ে ওঠেছে। সময়ের প্রেক্ষিতে ইসলামী দিকনির্দেশনা দিতে তিনি বহু নতুন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। মৌলিক রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১৭৬টি।

'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' (১৯৬২) তাঁর প্রথম প্রকাশিত বই। 'বাংলাদেশে ইসলাম' (১৯৭৯) তাঁর অসাধারণ গবেষণা গ্রন্থ। এ পুস্তকে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেছেন বাঙালি মুসলমানদের আত্মপরিচয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদেরকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত করতে তিনি রচনা করেন 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' (১৯৯৪) 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' এবং 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন' 'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম' শীর্ষক মৌলিক গ্রন্থ। তাঁর এই গ্রন্থগুলো কবি-

www.pathagar.com

সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদেরকে আদর্শাশ্রয়ী হতে উৎসাহিত করে। তাঁর অনূদিত নসীম হিজাজীর উপন্যাস এদেশের শিশু-কিশোরদেরকে ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়।

প্রকাশনা জগতে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে শিশুদের জন্য রচিত– এসো জীবন গড়ি, পড়তে পড়তে অনেক জানা, মা আমার মা, আমাদের প্রিয় নবী, মজার গল্প, কে রাজা, হাতিসেনা কুপোকাত, শিশু-কিশোরদের মানস গঠনে মূল্যবান সংযোজন। ব্যক্তি আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন একান্তই অনাড়ম্বর, সাদাসিধে, সদালাপী, বিনয়ী, নিরলস, পরিশ্রমী, প্রচারবিমুখ, উদার মনের একজন মানুষ। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও আলাপচারিতা সবাইকে কাছে টানতো। নিজের প্রাপ্যের ব্যাপারে তিনি ছিলেন উদাসীন কিন্তু অন্যের অধিকারের ব্যাপারে ছিলেন সতর্ক। তিনি ছিলেন স্বভাবজাত বিনয়ী কিন্তু আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে আপসহীন। ইসলামী আদর্শের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন কিন্তু তাঁর অবস্থান ছিল বৃত্তের বাইরে। কোনরূপ সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে সব ধরনের মানুষের আনাগোনা ছিল তাঁর কাছে। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন মর্দে মুমিনের প্রতিকৃতি, সেই সাথে সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের জন্যে ছিলেন আদর্শিক বাতিঘর। যুগ যুগ ধরে তাঁর চিন্তা ও কর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের পথের দিশা দেবে, অগণিত মানুষ লাভ করবে ইসলামের আলো। ক্ষণজন্মা এই মনীষীকে মহান আলাহ জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন!

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের শিশুসাহিত্য

রফিক মুহাম্মদ

আবদুল মান্নান তালিব (১৯৩৬-২০১১) একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে সুপরিচিত। এ পর্যন্ত মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থ, জীবনী, অনুবাদ ও শিশু সাহিত্য মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ১৭৮টি। তাঁর রচিত মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান (১৯৮৮), ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ (১৯৮৮), সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট (১৯৯১), এবং আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম (২০০১) বাংলা সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে : আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা (১৯৬৯), সহীহ আল বুখারী ১ম ও ৩য় খণ্ড (১৯৮২, ১৯৯৬), রিয়াদুস সালেহীন ১ম খণ্ড (১৯৮৫) ও রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড (১৯৯৫) বাংলা সাহিত্যে অনন্য সংযোজন বলা যায়। তাঁর অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে খতমে নবুওয়াত (১৯৬২), ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (১৯৬৫), চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান (১৯৬৮), যরবে কলীম (১৯৯৪) ও তাফহীমুল কুরআন ১ম থেকে ১৩তম খণ্ড ও ১৯ খণ্ড উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থগুলো বাংলা সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ এবং আলোকিত করেছে। সুসাহিত্যিক এই পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, উর্দু ও ফারসি এই ছয়টি ভাষায় বিশেষভাবে পারদর্শী।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূলত প্রাবন্ধিক ও গবেষক হিসেবে ঋদ্ধতার স্বর্ণশিখরে অবস্থান করেও তিনি শিশু-কিশোরদের জন্যও এক বিপুল ভাণ্ডার

www.pathagar.com

রচনা করেছেন। শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি মোট ১৬টি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর গবেষণা ও অনুবাদ সাহিত্য এতোটাই আলোকিত যে, তাঁর শিশুসাহিত্যের বিপুল সম্ভার অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। চাঁদের আলোতে অনেকটা জোনাকি পোকার মতো। শিশু-কিশোরদের মানস গঠনে আদর্শিক শিশুসাহিত্য রাখতে পারে অগ্রণী ভূমিকা। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর উত্থানের ফলে যে উপাদান শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করার জন্য উপস্থাপন করা হচ্ছে তা তাদেরকে করছে বিপথগামী এবং নৈতিক স্খলন ঘটাতেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে। মননশীল ও আদর্শিক শিশুসাহিত্যের এখন অভাব প্রকট। শিশু-কিশোরদের হাসি-খুশির উপাদান হিসেবে এখন যে উদ্ভট সাহিত্য রচিত হচ্ছে তা শিশু-কিশোরদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা তো দূরের কথা, এসব সাহিত্য তাদের মধ্যে কোনো আধুনিক সভ্য দেশের সচেতন ও উন্নত নাগরিক দায়িত্ব পালনের ন্যূনতম যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিবের শিশুসাহিত্য ব্যতিক্রম। ইসলামী ভাবাদর্শের ভিত্তিতে তিনি তাঁর শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার রচনা করেছেন। ইসলাম মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলতে চায়, তাকে যেভাবে আল্লাহর বান্দা, মানুষের সেবক ও দুনিয়ার পরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সেসব দিকে দৃষ্টি রেখেই আবদুল মান্নান তালিব সাজিয়েছেন তাঁর শিশুসাহিত্যকে। শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছেঃ এসো জীবন গড়ি ১ম ভাগ (১৯৭৫), এসো জীবন গড়ি ২য় ভাগ (১৯৭৫), ইসলামী শিক্ষা ১ম ভাগ (১৯৭৫), ইসলামী শিক্ষা ২য় ভাগ (১৯৭৬), আমাদের প্রিয় নবী (১৯৭৫), মজার গল্প (১৯৭৬), ছোটদের ইসলাম শিক্ষা ১ম ভাগ (১৯৮০), ছোটদের ইসলাম শিক্ষা ২য় ভাগ (১৯৮১), ছোটদের ইসলাম শিক্ষা ৩য় ভাগ (১৯৮২), সহজ পড়া (১৯৮২), কে রাজা? (১৯৮১), আদাবুল আরাবীয়া (১৯৮৪), হাতিসেনা কুপোকাত (১৯৯০), পড়তে পড়তে অনেক জানা (২০০০) ও মা আমার মা (২০০১)।

শিশুদের মন-মানস ও চরিত্রকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে ইসলামী আদর্শের কিছু বিষয় নিয়ে আবদুল মান্নান তালিব সাজিয়েছেন এসো জীবন গড়ি (১ম ভাগ) বইটি। এ বইয়ে মোট চৌদ্দটি বিষয়কে অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বইয়ের বিষয়গুলো হচ্ছেঃ আল্লাহর বান্দা, সালাম করা, কুরআনের প্রতি সম্মান, পিতা-মাতার সেবা, শিক্ষকদের প্রতি সম্মান, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, লজ্জা, সত্যবাদিতা, অভুক্তকে আহার করানো, ছোটদের প্রতি স্নেহ, প্রাণীর প্রতি মমতা, প্রতিবেশীর অধিকার, প্রতিশোধ না নেয়া এবং নিজের হাতে কাজ করা। প্রতিটি বিষয়ই ইসলামী আদর্শের ভাবালোকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে গল্পাকারে লেখক উপস্থাপন করেছেন, যা শিশু-কিশোরদের সহজেই মুগ্ধ করে। শিশুদের আদর্শিক মনন ও সুন্দর চরিত্র গঠনে এ ধরনের বই খুবই উপযোগী।

এসো জীবন গড়ি (২য় ভাগ) বইটিও ইসলামী আদর্শের ১৫টি বিষয় দিয়ে লেখক সাজিয়েছেন। এ বইয়ে আছে : আল্লাহর ভয়, অমায়িক ব্যবহার, জীবনের চেয়ে নামাজ বড়, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, উত্তম সবর, ওয়াদা পালন, মিতব্যয়িতা, স্পষ্টবাদিতা, ন্যায়বিচার, অনাড়ম্বর জীবন,

www.pathagar.com

সত্যের সংগ্রামে আগ্রহ, গোপনীয়তা রক্ষা করা, মেহনতের মজদুরী, আমানতদারী ও মেহমানদারী। প্রতিটি বিষয়ই লেখক গল্পাকারে উপস্থাপন করেছেন। তার প্রতিটি গল্পই ইসলামী আদর্শের আলোকে আলোকিত। আল্লাহর ভয় গল্পটিতে হযরত উমর রা.-এর শাসন আমলের এক দুধ বিক্রেতা মা ও মেয়ের কথোপকথনের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি অনঢ় বিশ্বাসের বিষয়টি অত্যন্ত নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এভাবে তিনি গ্রন্থের প্রতিটি বিষয়কেই চমৎকার গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন, যা শিশু কিশোরদের সহজেই আকৃষ্ট করে।

ছোটদের ইসলাম শিক্ষা ১ম ভাগ, ২য় ভাগ ও ৩য় ভাগ এ তিনটি গ্রন্থকে লেখক সাজিয়েছেন ইসলামের মৌলিক শিক্ষণীয় কিছু বিষয় দিয়ে। ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (১ম ভাগ) এ গ্রন্থটি লেখক চার-পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের উপযোগী করে রচনা করেছেন। শিশুদের মানসিক গঠনের প্রস্তুতিপর্ব এখান থেকেই শুরু। মানসিক বিকাশ গঠনের এই প্রস্তুতি পর্বে যদি শিশু মনের চিত্রপটে ঈমান ও আকিদার কোনো বিষয় ছায়াপাত করতে না পারে এবং সেই সাথে তার মনের গভীরে দাগ না কাটে তাহলে পরবর্তী সময়ে সে যখন একজন বুদ্ধিসচেতন মানুষে পরিণত হবে তখন তার প্রতিটি কাজে-কর্মে, চিন্তায়-ভাবনায়, ঈমান ও আকীদায় ইসলামী আদর্শের কোনো গভীর প্রভাব দেখা যাবে না। কাজেই এই বিকাশ পর্বেই শিশুদের সঠিক শিক্ষাদানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই আবদুল মান্নান তালিব শিশুদের জন্য লিখেছেন ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (১ম ভাগ) গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে শিশুদের জন্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে আল্লাহ, রসূল মুহাম্মদ (স.), কুরআন, হাদীস, আখেরাত, ফেরেশতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে কলেমা, ইসলামী আদব, বড়দের মেনে চলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়, আরবি অক্ষর ও বিভিন্ন শব্দও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ছোট কচি হৃদয়ের শিশুদের জন্য এ গ্রন্থটি খুবই উপযোগী।

ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (২য় ভাগ) গ্রন্থটি ছয় থেকে বারো বছর বয়সের শিশুদের জন্য রচিত। এ গ্রন্থে কলেমা, ঈমান, আল্লাহর পরিচিতি, ফেরেশতা, কিতাব, নবী ও রসূল, আখেরাত, ইসলামী আদব, পাক-পবিত্রতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা, নামাজ ইত্যাদি বিষয় রয়েছে। এছাড়া কুরআনের পাঁচটি দোয়া, হাদীস, সূরা আল-ফাতিহাসহ আরো কয়েকটি সূরা রয়েছে। ইসলামী আদর্শে শিশুদের মানস গঠনে এটিও সহায়ক গ্রন্থ।

ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (৩য় ভাগ) গ্রন্থটি বারো থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের কিশোরদের জন্য রচিত। এতে মোট ১৬টি বিষয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: আল্লাহ আমাদের প্রভু, রসূল আমাদের নেতা, কুরআন আমাদের কিতাব, শেষ বিচারের দিন, মুসলমানের কাজ, ইসলামী আদব, পাক-পরিচ্ছন্নতা, সালাত ও আল্লাহর নবীসহ পাঁচটি সূরা, পাঁচটি হাদীস ও কুরআনের কিছু দোয়া।

আমাদের প্রিয় নবী বইটি শিশু-কিশোরদের জন্য একটি চমৎকার গ্রন্থ। জীবন গঠনের জন্য প্রিয় নবীর জীবনের চাইতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ আর কিছুই হতে পারে না, অথচ বাংলা সাহিত্যে শিশু-কিশোরদের উপযোগী করে লেখা

www.pathagar.com

নবী জীবনের যথার্থই অভাব। আবদুল মান্নান তালিবের *আমাদের প্রিয় নবী* বইটি এ অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করেছে। লেখক প্রিয় নবীর জীবনীকে অত্যন্ত সহজ-সরল ও সুন্দর ভাষায় এ বইয়ে উপস্থাপন করেছেন।

পড়তে পড়তে অনেক জানা আবদুল মান্নান তালিবের লেখা শিশু-কিশোরদের জন্য আরো একটি চমৎকার বই। ঈমান, আকীদা ও বিশ্বাস এই তিনটি বিষয়কে শিশু-কিশোর উপযোগী করে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় লেখক এ বইয়ে উপস্থাপন করেছেন। *কে রাজা* এ বইয়ে শিশুদের জন্য চমৎকার একটি গল্প উপস্থাপন করেছেন আবদুল মান্নান তালিব। গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি নিপুণতার সাথে তুলে ধরেছেন। এ বইটি পাঠে শিশুরা যেমন আনন্দ পাবে তেমনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টিও অনুধাবন করতে পারবে। শিশুদের জন্য *কে রাজা* বইটি একটি চমৎকার গ্রন্থ।

মা আমার মা বইয়ে লেখক কুরআন ও রসূলের সুন্নাতের আলোকে কিছু সত্য ঘটনাকে গল্পাকারে মনোজ্ঞ বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন। সত্য ইস্পাতের চেয়ে মজবুত। তরবারির চেয়ে ধারালো। সত্যের গতি মানুষের তৈরি যে কোনো নভোযানকে হার মানায়। এ গ্রন্থের গল্পগুলো কুরআন-হাদীসের নানান ঘটনা থেকে নেয়া। সত্য ঘটনাকেই গল্পের আঙ্গিকে শিশু-কিশোর উপযোগী করে লেখক মুনশিয়ানার সাথে উপস্থাপন করেছেন। এ গল্পগুলো পাঠ করলে শিশু-কিশোরদের চরিত্র ইস্পাতের মতো মজবুত হয়ে গড়ে উঠতে পারে। *মা আমার মা* গ্রন্থে সত্য ঘটনার মোট ১০টি গল্প রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: খুবাইবের চেয়ে ভালো বন্দী দেখিনি, সত্যের সন্ধানে, রসূলের প্রিয় পাত্র তিনি, মুসলমানের আল্লাহ ভরসা, মা আমার মা, চৌকাঠ বদলাও, মাছের পেটে মানুষ, অসামান্য আলোক শিশু, বুদ্ধিমতী রাণী ও মহানুভব নবী।

মজার গল্প গ্রন্থটি আবদুল মান্নান তালিব রচিত আর একটি মজার বই। এ বইটিও ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন সত্য ঘটনার আলোকে সাজানো হয়েছে। গ্রন্থের প্রতিটি গল্পের বিষয়বস্তু ইসলামের ইতিহাসের নানান ঘটনা। চমৎকার ভাষায় প্রতিটি গল্প লেখক শিশু-কিশোরদের পাঠোপযোগী করে রচনা করেছেন। এ গ্রন্থে মোট ১১টি গল্প রয়েছে। এগুলো হচ্ছে: উজ্জ্বল সত্যের শিক্ষা, সামনে নতুন আশা, আবু জেহেলের হতাশা, কৃতজ্ঞ বান্দা, চাষী আল্লাহর অনুগত, রুজির মালিক আল্লাহ জেনো, মারা গেলেন কবি, গোলাম হল পুত্র, আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, হযরত লোকমানের নসীহত ও লা জওয়াব নমরুদ। সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত প্রতিটি গল্পই চমৎকার। শিশু-কিশোরদের সুন্দর মানস গঠনে গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সব মিলিয়ে বলা যায়, আবদুল মান্নান তালিবের সমস্ত শিশুসাহিত্য ইসলামী আদর্শের আলোতে উদ্ভাসিত। তাঁর এই সাহিত্য শিশু-কিশোরদের মানস ও চরিত্রকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। এক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিব নিঃসন্দেহে এক অনন্য ও অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন।

www.pathagar.com

একজন একাগ্রচিত্তের সম্পাদক
ওমর বিশ্বাস

আবদুল মান্নান তালিব একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। সাহিত্যের অনেক শাখায় তাঁর সাবলীল বিচরণ। মৌলিক রচনার পাশাপাশি প্রবন্ধ, অনুবাদ ও সম্পাদনায় তাঁর রয়েছে বলিষ্ঠ পদচারণা। নিরলস একাগ্রতা তাঁর সাহিত্যসাধনাকে প্রাণময় করে তোলে। একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক হিসেবেই তিনি নিজেকে মেলে ধরতে জীবন এবং মনকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন আবদুল মান্নান তালিব। তাঁর সাহিত্য চর্চা শিশু সাহিত্যকেও ঋদ্ধ করেছে। তিনি একজন কবিও। প্রকৃত অর্থেই কবি। তিনি জীবনের প্রাথমিক সাহিত্য চর্চার দিনগুলো কবিতা দিয়েই শুরু করেছিলেন। আর শিল্পের সব শাখায় প্রবাহিত কবি সম্বোধনেও তিনি কবি অর্থাৎ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকর্মের মাধ্যমেও তিনি একজন কবির চিন্তা-চেতনাকেই লালন করে গেছেন। তবে আমরা এখানে আবদুল মান্নান তালিবের মতো মানুষকে স্বল্প পরিসরে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি। তদুপরি তার বিশাল সৃষ্টিকর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার বহুমুখী ক্ষেত্রসমূহ তুলে ধরাই এখানে উদ্দেশ্য। তাঁর মতো একজন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের সম্পাদনার ক্ষেত্র সম্পর্কে এখানে অত্যন্ত সীমিত গণ্ডিতে তাঁর কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব একজন সাহিত্যিক। একজন গবেষক। একজন প্রাবন্ধিক। একজন শিশুসাহিত্যিক। একজন অনুবাদক। একজন একক ব্যক্তিসত্তার মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের এসব শাখাতেই তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর বিশাল সমৃদ্ধ জীবনের সাথে একজন সম্পাদক খ্যাতিও তাঁকে ইতোমধ্যেই বিশিষ্টতা দান করেছে। একজন মুক্ত চিন্তার মানুষ হিসেবে তিনি সম্পাদনাকে গ্রহণ করেছেন। একজন যোগ্য সম্পাদকের ভূমিকায় নেমে তিনি উদার থেকেছেন। তিনি চিন্তা-ভাবনাকে বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য করে নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি ব্যক্তিকে প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন সম্পাদনা নীতি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্যই এসব বিষয়কে তিনি তাঁর বিশ্বাস আর মূল্যবোধের সাথে আপস করতে দেননি। তিনি চিন্তা-চেতনায় শাশ্বত ঐতিহ্যকেই লালন করেছেন। কিন্তু আধুনিকতা থেকে কখনো দূরে যাননি। বৈরী পরিবেশের স্রোতে তিনি কখনো গা ভাসিয়ে দেননি।

আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদক হিসেবে অনেক কাজই করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা (১৯৬৯), সহীহ আল বুখারী ১ম খণ্ড (১৯৮২), সহীহ আল বুখারী ৩য় খণ্ড (১৯৯৬), রিয়াদুস সালেহীন ১ম খণ্ড ১৯৮৫), মুসলিম শরীফের মুকদ্দমা (১৯৮৬), নির্বাচিত গল্প (১৯৮৫), সত্য সমুজ্জ্বল (১৯৮১), রসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম, ২য় ও ৪র্থ খণ্ড (১৯৯৫-২০০৪) বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ সংযোজন। গ্রন্থ সম্পাদনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িকীর বিভিন্ন বিভাগের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। নিয়মিতভাবে মৌলিক লেখালেখি আর অনুবাদ ও গবেষণার পাশাপাশি সম্পাদনা করে যাওয়া নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তাঁর মতো ব্যক্তিপ্রতিভার কাছেই এ সব কাজ সাবলীলভাবে সুন্দর হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন সুস্থির, ধৈর্যশীল, ব্যক্তিপ্রতিভার অধিকারী। তাঁর একাগ্রতাই তাঁকে আলাদা বিশিষ্টতা এনে দেয়।

আবদুল মান্নান তালিব ১৯৫২ সালে 'জিয়াউল ইসলাম' নামে একটি বার্ষিকী সাময়িকপত্র সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে তাঁর সম্পাদনা কাজ শুরু করেন। এটি প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম থেকে। আর আবদুল মান্নান তালিবের জন্ম ১৫ মার্চ ১৯৩৬ অর্থাৎ মাত্র ১৬ বছর বয়স থেকে তিনি সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। সেই যাত্রার পর থেকে তা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন। ২১ বছর বয়সে তিনি লাহোর থেকে প্রকাশিত রোজনামা তাসনীম পত্রিকার সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন। পত্রিকাটি উর্দুতে প্রকাশিত হতো। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, আবদুল মান্নান তালিব বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ও উর্দু এই ছয়টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একজন সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান অবশ্যই সম্পাদনাকে বিশেষ সহায়তা করে থাকে। উর্দু দৈনিক রোজনামা তাসনীমে ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত তিন বছর সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সেই থেকে

www.pathagar.com

জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি সম্পাদনার কাজ করে গেছেন অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে।

আবদুল মান্নান তালিবের প্রতিটি কাজই প্রতটি কাজের সহায়ক। তিনি কবি বলে কাব্য প্রতিভা তাঁর সাহিত্যকে উৎকর্ষ এনে দেয়। সাহিত্যপ্রচেষ্টা সম্পাদনায় অনুপ্রেরণা জোগায়। সম্পাদনা তাঁর সাংবাদিক রুচিকে পরিশীলিত করে। এমনিভাবে সাহিত্যের একটি শাখা অন্য শাকাকে ঋদ্ধ করে। তাঁর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা, সাধনা, ধ্যান, চিন্তা নিঃসন্দেহে তাঁকে অনেক উপরে নিয়ে গেছে। তাঁর আত্মমগ্ন প্রচেষ্টাকে কোনো প্রতিবন্ধকতাই দূরে ঠেলে রাখতে পারেনি। আমাদের সামনে আবদুল মান্নান তালিবের এই গুণগুলো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত তিনি 'দৈনিক ইত্তেহাদে'র সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেবার পর তিনি এই সাপ্তাহিকের সম্পাদক হন। এ পত্রিকার সাথে ১৯৬২-১৯৬৬, প্রায় পাঁচ বছর ধরে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৯-৭১ পর্যন্ত 'মাসিক পৃথিবী'র সম্পাদক ছিলেন। মাসিক পৃথিবী পত্রিকা সেই শুরু থেকে এ পর্যন্ত একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকা হিসেবে অবদান রেখে যাচ্ছে। মাসিক পৃথিবী শুরু থেকেই চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন ধারার পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮১-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মাসিক পৃথিবীর তিনি সম্পাদক ছিলেন। এর মাঝখানের সময়টাতে তিনি ১৯৭৩-১৯৭৫ পর্যন্ত 'সাপ্তাহিক মীযান' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত প্রথম ত্রৈমাসিক ও পরে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কলম'-এর সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭৭-১৯৮২ দুই মেয়াদে তিনি দৈনিক সংগ্রামের শাহীন শিবিরের সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়াও তিনি ১৯৮৩ সাল থেকে দৈনিক সংগ্রামের কলামিস্ট ও ফিচার এডিটর হিসেবে তাঁর একাগ্রতাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। সব মিলিয়ে আবদুল মান্নান তালিবের সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার ধারা অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল। তারপরে তিনি 'ইসলামী আইন ও বিচার' নামে একটি ইসলামী আইন বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা শেষ দিন পর্যন্ত সম্পাদনা করে গেছেন।

আবদুল মান্নান তালিবের সম্পাদনাকর্ম একটি শাখামাত্র। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে সম্পাদনাও একটি। এ কাজে তিনি সকল প্রতিবন্ধকতা উৎরে গেছেন। আপস করেননি কখনো। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, অন্তরে যা লালন করতেন, তাই তিনি করে গেছেন। এর বাস্তব উদাহরণ হলো রসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে নিজেকে তিনি যুক্ত করেছিলেন এই কারণে যে, তিনি এই ধরনের বিশ্বাস ও মতামত তাঁর চেতনায় লালন করতেন। তিনি সম্পাদক হিসেবে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। আবদুল মান্নান তালিব একজন সোজা-সরল মনের মানুষ ছিলেন। কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, অনুবাদক, শিশু সাহিত্যিক, সংগঠক ও মুক্তমনের

www.pathagar.com

অধিকারী। উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতেন তিনি। জ্ঞানের সাগরে ডুবে থাকা পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যকে গভীরভাবে জেনেছিলেন। সেই সাথে তিনি ইসলামকে জেনেছিলেন আরো গভীরভাবে। তিনি একজন আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন। রুচিশীল মানুষ ছিলেন। রুচিরোধ আর পরিমিতিবোধ তাঁকে এমন যোগ্য ও উপযুক্ত করেছিল যা আবদুল মান্নান তালিবকে একজন সফল সম্পাদকের মর্যাদা দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর ভাষাজ্ঞান। আগেই ছয়টি ভাষায় তাঁর পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আবদুল মান্নান তালিবের যোগ্যতাকে উপযুক্তভাবে মূল্যায়ন করা এই সংক্ষিপ্ত লেখায় অসম্ভব। ইসলামের ওপর তাঁর যে গভীর জ্ঞান তাতে ওই পর্যায়ের জ্ঞানী পণ্ডিতই তাঁকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন। তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। এখানে একটি শাখাকেন্দ্রিক আবদুল মান্নান তালিবকে ক্ষুদ্র পর্যায়ে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। আগামীতে এখান থেকেই উপযুক্ত মূল্যায়ন প্রচেষ্টা হয়তো অব্যাহত রাখার ঐকান্তিক প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

সাহিত্যের
এক নীরব কারিগর
আমিন আল আসাদ

তাঁকে তুলনা করা চলে সাবলীল অথচ স্বাভাবিক গতিতে প্রবহমান এক ঝর্নাধারার সাথে। আবদুল মান্নান তালিব এক সৃষ্টিশীল প্রতিভার নাম। এক প্রশান্ত সাগরের নাম, যে সাগরের জলরাশি জলোচ্ছ্বাসে ডোবায় না গ্রাম, অথচ জলের গভীরে যে অফুরন্ত জীবনী শক্তি তা থেকে উৎপন্ন হয় চেতনার ফল্গুধারা। বেড়ে ওঠে প্রেরণার সবুজ প্রান্তর। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠে মননের পলিভূমি। আবদুল মান্নান তালিব এমনই এক মনীষীর নাম। তিনি ছিলেন নীরব স্ফুলিংগ। তাঁর হৃদয়ের গভীরে লালিত আদর্শ ও নৈতিকতার দাবানলে পুড়ে ছাই হতো অনৈতিকতা ও অপকারের জঞ্জাল, উন্মিলিত হতো মানবিক মূল্যবোধ।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন সাহিত্যের এক নীরব কারিগর, নিবিষ্টচিত্ত গবেষক। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানসাধক এবং মনোযোগী পাঠক। অভীষ্ট জীবন দর্শন ও সত্যানুসন্ধানে তিনি নিরন্তর জ্ঞান চর্চা করে গেছেন। জ্ঞান সাধনার লক্ষ্যেই তিনি বেড়িয়েছেন পথে প্রান্তরে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাকিস্তানে, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে। লাহোরের উর্দু দৈনিক তাসনিম-এর মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু হলেও লেখালেখি শুরু হয় ছাত্রজীবন থেকেই। ১৯৬২ সালে তাঁর লেখা প্রথম বই 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে তাঁর কঁটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ, অনেকগুলো

www.pathagar.com

সম্পাদিত গ্রন্থ, ১৬টি শিশু-কিশোর সাহিত্য ও অর্ধশত অনুবাদ গ্রন্থসহ প্রায় দুই শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর অসংখ্য রচনা। তিনি কবিতাও লিখেছেন এবং ছিলেন বাংলা, উর্দু ও ফার্সী কবিতার নিবিষ্ট পাঠক। কিন্তু গবেষণার বিস্তীর্ণ ভূভাগেই তাঁর সাবলীল হাঁটাহাঁটি লক্ষণীয়। তিনি কি শুধু মাত্র সাহিত্য সাধক? তিনি সাহিত্যের সেবকও। তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠন ও সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের বিভিন্ন মহান কাজের নিমিত্তে গঠিত কমিটিসমূহের স্থায়ী অস্থায়ী সদস্য ছিলেন। তিনি একজন সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদানকারী। সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তিনি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর থেকে দেখেননি, দেখেছেন জীবনবোধ ও বিশ্বাসের সুবিশাল অংগন থেকে। তিনি ছিলেন সংস্কৃতিবান মানুষ। তাই জীবন ও সংস্কৃতির বিশালতাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন জীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগ হচ্ছে মানুষের ধর্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের আলোকে তথা এই বিশ্বাসের চালিকাশক্তির উপর নির্ভর করেই নির্ণীত হয় মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য। মানুষের মানবিক প্রতিষ্ঠা বা পূর্ণতাও এসব বিশ্বাসের আলোকেই হয়ে থাকে। এই আলোকেই গড়ে ওঠে তাঁর দেশপ্রেম। সমাজ ও জাতীয় কর্তব্যবোধ। আবদুল মান্নান তালিবের মাঝেও সেসব গড়ে উঠেছিলো নিজস্ব বোধ ও বিশ্বাসের আলোকে। তিনি শুধু একজন সাহিত্য গবেষক বা সাংবাদিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ধর্মীয় মূল্যবোধের অনন্য প্রতিনিধি। ছিলেন একজন স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি একজন ধীমান আধ্যাত্মিক পুরুষ। তবে তাঁর আধ্যাত্মিকতা ছিলো কুরআন-হাদীস ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক। তিনি ছিলেন একজন তফসির সাহিত্য বিশেষজ্ঞ। অনুবাদ করেছেন মাওলানা মওদূদী রহ.-এর তাফহীমুল কুরআন। ইসলামী দর্শনশাস্ত্রেরও তিনি ছিলেন একজন অভিনিবিষ্ট পাঠক।

আমাদের সমাজে ইসলামী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার মানুষ পাওয়া যায়। আবার একই ধারার মধ্যেও বিভিন্ন উপধারা লক্ষ্য করা যায়। আবার উপধারাগুলোর মধ্যেও বিভিন্ন মতানৈক্য থেকে শাখা ধারা তৈরি হয়েছে। এসব হতেই পারে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর সৃষ্টির দিকে তাকালে আমরা তাই দেখি। যেমন একই বাগানে আমরা নানান ফুল দেখি। এককে ফুলের এককে বৈশিষ্ট্য। ফুলেরা কিন্তু পরস্পর মারামারি বা ঝগড়া করে না। আমরা যদি আমাদের নিজেদের শরীরের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাই একজনের চেহারার সঙ্গে অন্যের চেহারার মিল নেই। চেহারার দিকে যদি মিলও থাকে তবে স্বভাবে মিল নেই। এতেও যদি মিল থাকে তবে আমরা যদি লক্ষ্য করি যে, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের প্রত্যেকের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মিল নেই। কাজেই বিষয়টি ইতিবাচক। কেননা, মৌলিকত্বে কোন সমস্যা নেই। সেজন্যেই তো আরবি প্রবাদ তৈরি হয়েছে এখতেলাফুল ওলামা রহমাতুল-বিজ্ঞজনের ভিন্ন মত রহমত স্বরূপ।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব সাহেবের ধর্মচিন্তার সাথে অন্যদের ধর্মচিন্তার পার্থক্যও থাকতে পারে, এমনকি তাঁর ঘরানার কারো কারো সাথেও তাঁর দ্বিমত হতে পারে। উদাহরণত বলতে পারি– শাহ আব্দুল হান্নান সাহেবের লেখা থেকে যা জেনেছি, এমন কি আমরা নিজেরাও ইসলামী জীবন জিজ্ঞাসা মানব সমাজের ক্রমবিবর্তন, মানবতা নৈতিকতা ও বিশ্ব সাহিত্য সংস্কৃতি বিশ্ব ইতিহাসের পাঠক হিসেবে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অথবা বিভিন্ন মুসলিম দেশের জনজীবন ও ধর্মচিন্তার মুক্ত পাঠক হিসেবেও জেনেছিলাম যে, প্রগতিশীল ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ'র 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' শীর্ষক নারী বিষয়ে ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মহান গবেষণা গ্রন্থটির বাংলার অনুবাদের পর কতিপয় বিরোধী মতের গুনগুনানির কথা। আমাদের উপমহাদেশে, বিশেষ করে আমাদের দেশে সুদূর অতীত থেকেই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে 'নারী' ও 'আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান' এ দুটি বিষয়কে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে কখনো সচেতনতাবশত কখনো বা অজ্ঞতাবশত, এমনকি যারা ইসলামের বিজ্ঞানমনস্ক ও স্বচ্ছ চিন্তাধারা লালন করার চেষ্টা করেন তাদেরকেও অনেক সময় আচ্ছন্নতা বা আড়ষ্টতাই পেয়ে বসে, বিশেষ করে নারী বিষয়ে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মিম্বর যাদের দখলে এবং যাদেরকে আমরা ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে সমাজে দেখি পোশাকে ও বাক-বক্তব্যে, তাদের অধিকাংশ এখনো 'নারী' ও 'বিজ্ঞান' বিষয়ে রুদ্ধ বা নেতিবাচক মন-মানসিকতা লালন করেন এবং এ মন-মানসিকতাকেই ইসলামের মানদণ্ড বলে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান।

অথচ কুরআন হাদীস ও মহান সাহাবীগণের জীবন ইতিহাস আমাদের সে কথা শেখায় না। এসব ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিব ও তাঁর সমমনা বন্ধুরা ছিলেন সম্পূর্ণ গোড়ামিমুক্ত। কেননা মানব জীবনের সমস্যা সমাধান না দিয়ে এর গতিরুদ্ধ করা ইসলামের কাজ নয়। এ ক্ষেত্রে মান্নান তালিব ছিলেন বেগবান ঝর্ণার মতো। সাবলীল স্রোতধারার মতো। তিনি অন্ধ তাকলিদ না করে ইজতেহাদে বিশ্বাস করতেন। তবে তিনি ভিন্ন মতকে শ্রদ্ধা করতেন। কোন বিষয়কে যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপন করতেন। সব মহলের চিন্তা-চেতনাকে আত্মস্থ করে নিরপেক্ষ গবেষণার ফসল তিনি উপহার দিতেন। তাঁর 'বাংলাদেশে ইসলাম' বইটি একটি পক্ষপাতমুক্ত গবেষণা গ্রন্থ। এ বইয়ে যেমন মুসলিম শাসকদের কথা উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে অলি-আওলিয়াদের ধর্মপ্রচারের কথা। উঠে এসেছে রাজনৈতিকভাবে ইসলাম বিকাশের কথা।

উপমহাদেশে ইংরেজবিরোধী সংগ্রামের সূচনায় উলামায়ে কেরামের ভূমিকাকে নিজস্বভাবে তিনি তুলে এনেছেন। আবার আধুনিক যুগে ইসলামের চ্যালেঞ্জকেও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবনকেও উপলব্ধি করেছেন। আবার ইরানের ইসলামী বিপ্লবকেও নিজস্ব দর্শনে দেখেছেন। তাঁর অনূদিত আল্লামা

www.pathagar.com

ইকবালের যরবে কলিম বাংলা ভাষায় ইকবাল গবেষণাকে এগিয়ে দেয়। এছাড়া তাঁর প্রচেষ্টা নজরুল ও ফররুখ গবেষণাকেও অগ্রসর করে। তিনি হাদীসশাস্ত্রের সম্পাদনা করেছেন। তাঁর রচিত শিশু-সাহিত্যেও শিশু-কিশোরদেরকে শিখিয়েছেন ইসলাম, জীবন-দর্শন, ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞান।

তিনি নিজে যেমন জ্ঞানসাধক ছিলেন তেমনি জ্ঞানীদের সান্নিধ্যও তিনি তালাশ করতেন। তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করার প্রচেষ্টাতে তিনি ছিলেন অকৃপণ। দেশের প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, গাবেষক ও রাজনীতিকদের সাথে ছিলো তাঁর প্রগাঢ় সম্পর্ক। তিনি মৃদুভাষী হলেও তাঁর কলমের সাবলীলতা ও প্রজ্ঞার আলোই তাঁকে জ্ঞানীদের সমন্বয়কারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এমনকি তরুণদের সাথেও তিনি মত বিনিময় করেছেন। এমন একটি মত বিনিময় অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্য পরিষদে। মনে পড়ে তখন সাহিত্যিক মরহুম জামেদ আলী ও মরহুম কবি আবদুল মান্নান সৈয়দও ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। এই মহান সাধকের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি আমরা হররোজ।

www.pathagar.com

একজন নীরব সাধক
খালিদ সাইফ

আবদুল মান্নান তালিব এক নীরব সাধক। সারা জীবন ব্যয় করেছেন সাহিত্য-শিল্প ও সংস্কৃতির সেবায়। পৃথিবী থেকে যেসব মনীষী কিছু পাওয়ার আশা না করে শুধু দিয়ে যান, তিনি সেই কাতারের মানুষ। সেজন্য তাঁর মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা দেড় শতের বেশি। কোলাহলের মধ্যে না থেকে কাজ করে গেছেন নিভৃতে, থেকেছেন একবারেই প্রচারবিমুখ। নিজে অন্তরালে থাকলেও যাদের মনে করতেন প্রতিভাবান, তাদের সামনে এগিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কখনও কৃপণতার পরিচয় দেননি। কল্যাণমুখী সাহিত্য-সংস্কৃতির বলয়ে তিনি বিশাল বটবৃক্ষের মতো; তাঁর সুশীতল ছায়ায় এসে জুড়িয়ে যায় ক্লান্ত-শ্রান্ত সংস্কৃতিকর্মীর উদ্বিগ্নে ভরা মন। সমসাময়িক সাহিত্যকে ইসলামীকরণের তিনি অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ। সাহিত্য ও শিল্পকলাকে তৌহিদবাদী চেতনায় সিক্ত করার তিনি পুরোধা তাত্ত্বিক। শিল্পমান অক্ষুণ্ন রেখে সাহিত্য-শিল্পকে কিভাবে আদর্শ প্রচারের বাহনে পরিণত করা যায় তা নিয়ে ভেবেছেন সারা জীবন। বামনদের সমাজে থেকেও তিনি ছুঁয়েছেন আকাশ। তাই তাঁকে বুঝতে, তাঁর অবদানের তাৎপর্য অনুধাবন করতে আরও অনেক বছর লেগে যাবে।

মৌলিক লেখার চেয়ে তিনি অনুবাদ করেছেন অনেক বেশি। একদিকে এটি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কল্যাণকর হলেও মানুষ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনেক বই তাঁর অনুবাদে পেলেও অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে মান্নান তালিবের নিজের। কমে গেছে মৌলিক

www.pathagar.com

লেখা। এটাকে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি মনে হয়। ক্ষতি এজন্য যে, তিনি যে বিষয় নিয়েই লিখতেন– যদি তা প্রবন্ধ হতো, তাহলে তিনি সমস্যার সমাধান করতেন কুরআন ও হাদীস থেকে। লেখা কিংবা চিন্তা শুধু নয়, জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন করেছেন কুরআনকে। তাই অনুবাদে অন্যের কথা তার মাধ্যমে জানা গেলেও, মনে হয়, নিজের কথা সব সময় বলতে পারেননি। তিনি যে সমাজে বাস করে গেলেন, সেই সমাজে ইসলামকে যেভাবে পেয়েছেন, সেই সমাজ পুনর্গঠনে ইসলামের ভূমিকা কেমন হতে পারে, এসবের অনুপুঙ্খ বিবরণ হয়তো আমরা পেতে পারতাম। কিন্তু আফসোস, তিনি এসব নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করলেও সেগুলোকে সব সময় লেখায় রূপ দিতে পারেননি। সেটা করতে পারলে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বলয়ে হয়তো পথ চলাটা আমাদের আরও পরিষ্কার হতো।

পৃথিবীতে আবদুল মান্নান তালিব (১৯৩৬-২০১১) যে সময় পর্বটা কাটিয়ে গেলেন সে সময়ে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে পুঁজিবাদ ও মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে। ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভাবনীয় জাগরণে মুসলমানরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়া শুরু করে। তাদের এই পশ্চাদপদতা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা দেয়। মুসলমানদের মধ্যে হীনম্মন্যতা ঢুকে পড়ে এবং নিজেদের তারা পশ্চিমাদের তুলনায় দুর্বল ভাবতে শুরু করে। শুরু হয় মানসিকভাবে পশ্চিমী হওয়ার গোপন-নীরব ও বেখেয়ালি অভিযান। ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা অস্পষ্ট হতে থাকে। এক সময় তারা কুরআন-হাদীসের কেন্দ্র থেকে হয়ে পড়ে বিচ্যুত। বাংলায় ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের পরাজয়ের পর দুশো বছরের ইংরেজ শাসন মুসলমানদের জীবনকে ভোগান্তির সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে দেয়। কিন্তু সব ক্ষতিরই একটা শেষও থাকে; কিছু নেতৃস্থানীয় মানুষ এ দুর্দশা দেখে পথ দেখাতে এগিয়ে এলেন। ধর্মীয় নানা সংস্কার হলো। প্রথমেই বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুললেন ফকির মজনু শাহ। শুরু হলো প্রতিবাদের দীর্ঘ পর্ব। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও প্রতিবাদ কখনও কখনও হাত ধরাধরি করে চলেছে। এলেন তিতুমীর, এলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। মুনশি মেহেরউল্লাহ পাদ্রীদের বিরুদ্ধে চালিয়ে গেলেন দুর্দান্ত বাহাস, রুখে দিলেন খৃস্টান মিশনারিদের গতি। ইসমাইল হোসেন সিরাজী সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে জাগানো শুরু করলেন বাংলার মানুষকে। ওদিকে সৈয়দ আমীর আলী ও নবাব আবদুল লতিফ চোখের নিদ্রা হারাম করে দিলেন মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে। তাঁদের সকলের চেষ্টায় বাংলার অধপতিত মুসলিম সমাজ এগিয়ে গিয়েছে ধীরে ধীরে। তবুও কিসের যেন অভাব, বিশাল একটা কিছু যেন নেই, অনেক বড় এক শূন্যতা।

এই শূন্যতা যাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছিল তাদের অন্যতম হলেন আবদুল মান্নান তালিব। কিসের শূন্যতা? শূন্যতা ইসলামী সাহিত্যের। দু'শো বছরের ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ সভ্যতা ছিল মুসলমানদের কেন্দ্রচ্যুত করার সময়পর্ব; কুরআন ও হাদীস থেকে কেন্দ্রচ্যুত করার পর্ব

www.pathagar.com

যার অনিবার্য ফল ইসলাম সম্পর্কে অস্পষ্ট ও ভুল ধারণা। ভাবলে অবাক হতে হয়, কত কত পরে বাংলায় অনূদিত হলো আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ তাফসীর। তারও কত পরে অনূদিত হলো বুখারী শরীফ, যে বুখারীর অনুবাদে আবদুল মান্নান তালিব পালন করেছেন অগ্রপথিকের ভূমিকা। আস্তে আস্তে মাওলানা আবদুর রহীম, মাওলানা আখতার ফারুক, নূর মোহাম্মদ আজমী, মহিউদ্দীন খান ও আবদুল মান্নান তালিবদের হাতে পুষ্ট হয়েছে বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার। এই ঐতিহাসিক পরম্পরার সাথে বিবেচনা না করলে মাওলানা আবদুল মান্নান তালিবকে ঠিক বোঝা যাবে না।

দীর্ঘদিনের পশ্চিমা সংঘর্ষের ফলে মুসলমানদের মধ্যে অসংখ্য ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে যার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই। তালিব সাহেব অন্যান্য চিন্তাবিদের সঙ্গে একত্রে কাজ করে অনেক কুধারণার মূলোৎপাটন করে গেছেন। তাঁর মৌলিক ও অনূদিত বই সম্ভবত অনেকদিন পর্যন্ত সমাজ থেকে তাগূতি চিন্তার পঙ্কিলতা দূর করতে সিপাহসালারের মতো ভূমিকা পালন করে যাবে। মানুষ লাভ করবে ইসলাম সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও নির্ভুল ধারণা।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন ইসলামী ঘরানার শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ। কিন্তু তিনি এ শিক্ষার সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। উপমহাদেশে প্রথাগত মাদরাসা শিক্ষার যে দু'টি ধারা প্রচলিত, সে ধারা থেকে শিক্ষা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে বোঝা সম্ভব নয়। মান্নান তালিব প্রথাগত ধারা থেকে শিক্ষা নিলেও প্রথার সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাই তিনি সংকীর্ণ অর্থে কোনো ইসলামী বিশেষজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু জ্ঞান সাধনা করতে করতে পরিণত হয়েছিলেন জ্ঞানের খনিতে যার সামান্য কিছু স্বাক্ষর দেখা গেছে তাঁর কোনো কোনো মৌলিক লেখায়। এমনই একটি বই হলো 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' (১৯৯৪)। এ বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ। এটি শুধু বই নয়, আমাদের মনে হয়, এটি একটি আন্দোলনের রূপরেখা। বাংলা ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে যে সমস্ত লক্ষ্যহীন ও ধর্মহীন সাহিত্য রচিত হয়েছে, সে সাহিত্যের অসারতাকে তিনি তুলে ধরলেন এ বইয়ের মাধ্যমে। সাথে সাথে রূপরেখা দিয়ে দিলেন আদর্শকে আশ্রয় করে কিভাবে রচিত হতে পারে সাহিত্য। দেখিয়ে দিলেন, রচিত সৃজনশীল রচনা কিভাবে পালন করে যেতে পারে একজন দায়ীর ভূমিকা। বাংলা ভাষায় এ ধরনের বই এর আগে লেখা হয়নি। এ বইটি শুধু তাই বই নয়, আদর্শবাদী সাহিত্যিক ও শিল্পীর জন্য এটি একটি ইশতেহার। আমাদের ধারণা, যারা আদর্শবাদী ও তৌহিদবাদী সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান, তাদের অবশ্যই এ বইটি পাঠ করা উচিৎ। এই একটি কাজের জন্যই সম্ভবত আবদুল মান্নান তালিব অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর অপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো 'বাংলাদেশে ইসলাম' (১৯৭৯) নামক গবেষণা গ্রন্থটি। এটি পণ্ডিত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর স্বীকৃতি লাভ করেছে। বইটির জনপ্রিয়তা বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক উদ্ধৃত টীকা-টিপ্পনী থেকেও ধরা পড়ে। এ বইতে তিনি

www.pathagar.com

বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম পরিচয়ের কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন, যা কলকাতাকেন্দ্রিক ঐতিহাসিকদের থেকে একেবারে ভিন্ন। তিনি এ বইতে দেখালেন, আজকের বাঙালিরা হযরত নূহ আ.-এর বিশ্বাসী বংশধরদের উত্তর-পুরুষ। তারা কখনই পৌত্তলিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেনি। নিজেদের স্বকীয়তাকে তারা সব সময় বজায় রেখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের মূল শেকড়ে ফিরে যায়। অবশ্য এ বর্ণনার আবিষ্কারক আবদুল মান্নান তালিব নন, তিনি এ বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন 'রিয়াজুস সালাতিন' নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার গোলাম হোসেন সলিম থেকে। এ বর্ণনাটির মাধ্যমে বাঙালির শেকড়ের খোঁজ বের হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, বাঙালির আত্মপরিচয়ের অন্যান্য উৎসের যে বর্ণনা ঐতিহাসিকরা দেন তার গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছে। এখন প্রশ্ন হলোঃ গোলাম হোসেন সলিম এ বর্ণনা কোথায় পেলেন? তিনি কি নিজে নিজে কল্পনা থেকে এ ইতিহাস লিখেছেন?

ইংরেজরা এদেশ দখল করার পূর্বে এদেশের শাসক ছিলেন মুসলমানরা। মুসলিম শাসন আমলে এখানকার জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভাষা ছিল আরবি, ফারসি ও তুর্কি। ইতিহাসও চর্চা চলত এই ভাষাগুলোতেই। আরব ইতিহাস চর্চার একটি ধারা হলো, তারা ইতিহাস লেখা শুরু করতেন হযরত আদম আ. থেকে। সুতরাং হযরত আদম আ.-এর পর হযরত নূহ আ.-এর বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া যায় আরবি ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে। সেগুলোতে বর্ণনা আছে মহাপ্লাবনের পর হযরত নূহ আ.-এর বংশধরেরা কিভাবে ও কারা পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেন। গোলাম হোসেন সলিম সে বর্ণনাই উপমহাদেশ ও বাংলা অঞ্চলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র এবং আবদুল মান্নান তালিব সেটি ব্যবহার করে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য এ ব্যবহার তালিব সাহেব একাই করেননি, অন্যান্য ঐতিহাসিকও এটাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখানকার মানুষ যে হযরত নূহ আ.-এর বংশধরদের উত্তর-পুরুষ এটি এখন এক ঐতিহাসিক সত্য।

মান্নান তালিব এ বইটি লেখা শুরু করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কয়েক বছরের মধ্যেই। তখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ঘোলাটে ও অবক্ষয়ে পূর্ণ। সব কিছু থেকে ইসলামকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার এক উৎসব যেন শুরু হয়েছিল! সে সময় মান্নান তালিব এ বইটি প্রকাশ করে এ সত্য জাতির সামনে প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, ইসলামের শেকড় এদেশের অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত– এর মূলোৎপাটনের শক্তি কোনো মানুষ বা রাষ্ট্রশক্তির নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইসলাম প্রচারকরা এদেশে এসেছেন, তাঁরা ইসলাম প্রচার করেছেন এবং তাঁদের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী শুনে দলে দলে অসহায়-নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা এদেশে এসে জনগণের কাতারে সরাসরি মিশে গেছেন। জনগণের সুখ-দুঃখকে করেছেন নিজেদের সুখ-দুঃখ। কখনও কখনও নির্যাতিতদের সঙ্গে নিয়ে অত্যাচারী ও নিপীড়কদের বিরুদ্ধে শুরু করেছেন প্রতিরোধের লড়াই। বাংলাদেশে ইসলামের আগমন নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে একদল

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকের এ রকম ভুল ধারণা ছিল যে, তারা ছিলেন সুফি মানুষ, তারা ইসলাম প্রচার করেছেন ঠিকই কিন্তু যুদ্ধ-লড়াই কিছুই করেননি। এ ধারার ঐতিহাসিকরা সত্য গোপন করেছেন; এদেশে ইসলাম প্রচারকারীরা সুফি ছিলেন ঠিকই কিন্তু সাথে সাথে সেনাপতি ও যোদ্ধাও ছিলেন।

খুলনার খানজাহান আলী র. ছিলেন একজন সেনাপতি ও শাসক, সিলেটের শাহজালাল র. স্বয়ং যুদ্ধ করে সিলেট জয় করেন, রংপুরে জাফর খাঁ গাজী ছিলেন একজন সেনাপতি, রাজশাহীর মখদুম শাহদৌলা র. যুদ্ধ করে রাজশাহী জয় করেন। বিক্রমপুরের বাবা আদম শহীদ র. ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের শাহদৌলা র. যুদ্ধ করে শহীদ হন। বগুড়ার মাহিসাওয়ার র. যুদ্ধ করেই অত্যাচারী রাজাকে পরাজিত করে বগুড়ায় ইসলামের ভিত মজবুত করেন। আবদুল মান্নান তালিব এসব ইতিহাসকে জাতির সামনে তুলে ধরে জাতির ক্রান্তিকালে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছেন।

যৌবনের প্রথমদিকে কবিতা লিখেছেন তিনি, অনুবাদ করেছেন অসংখ্য কবিতা। কিন্তু পরবর্তীতে কাব্যের জগৎ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে শুরু করেন গদ্য চর্চা। তাঁর অনুবাদ ও মৌলিক রচনাগুলো অনুপম গদ্য সৃষ্টির উদাহরণ হয়ে রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে আমাদের মতে ইসলাম বিশেষজ্ঞ গদ্যকারদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের পরই মাওলানা আবদুল মান্নান তালিবের স্থান। তাঁর গদ্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেগুলো নির্মেদ, ঝরঝরে, প্রাণবন্ত ও অত্যন্ত রুচিশীল। ক্রিয়া পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সচেতন। ক্রিয়া পদ ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি করে গদ্যকে তিনি তরল বানিয়ে ফেলেন না। তাঁর গদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রসাদ গুণ থাকলেও এবং সব শ্রেণীর পাঠক সে গদ্যে তৃপ্তি লাভ করলেও কখনও কখনও তিনি সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার করে গদ্যের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান' তাঁর একটি বিখ্যাত অনূদিত বই। বইটির শুরুতেই তিনি যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অনেক অল্প বয়স্ক পাঠকই এই গদ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন না। পরবর্তী সময়ে পাঠকদের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের ধারণার প্রমাণ পেয়েছি। অবশ্য পরে তাঁর গদ্য জনগণের কথার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

চিন্তাবিদ, লেখক, অনুবাদক, সংগঠকের পাশাপাশি তিনি ছিলেন অনেক উঁচু দরের একজন সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনায় 'পৃথিবী' পত্রিকাটি পরিণত হয়েছিল দেশের প্রধান ইসলামী গবেষণা পত্রিকায়। যখন 'পৃথিবী'র সম্পাদক ছিলেন ঐ সময়কার পত্রিকার সূচি দেখলে বোঝা যায়, লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে কত বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ এক অভিভাবক হারাল। এ ক্ষতি আমাদের কোনোদিন পূরণ হবার নয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

www.pathagar.com

তাঁর সাহিত্যে মূল্যবোধ ও ইসলাম

রহমাতুল্লাহ খন্দকার

আবদুল মান্নান তালিব জ্ঞানের জগতে এক বিশাল মহীরুহ। এ প্রকাণ্ড মহীরুহের শাখা-প্রশাখা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে বিস্তৃত। সমকালীন সাহিত্য, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, বিশেষ করে কুরআনের সাহিত্য-চিন্তাকে নান্দনিকভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস অসাধারণ। আবদুল মান্নান তালিব একজন মানবতাবাদী লেখক। এ কলমসৈনিক মহাসত্যকে ধরিত্রীর মাঝে প্রতিষ্ঠার জন্য লিখেছেন নিরন্তর। সত্যের মহিমায় হেরার রশ্মির আলোকে অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি মানবতার মুক্তির গান লিখে গেছেন জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি। পথহারা মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন এই মহান সিপাহসালার।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলিম কিন্তু ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে তারা পিছিয়ে রয়েছে যোজন-বিয়োজন দূরে। তারা মনেপ্রাণে ইসলামকে ভালোবাসলেও বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে বিজাতীয় ও নাস্তিক্যবাদী অপসংস্কৃতি। কিন্তু সংস্কৃতির মুক্তি ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। এ কারণে আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের উন্নতি ও প্রসারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা ভাষায় ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে কলমসৈনিক হিসেবে তাঁর অবদান অনন্য। ইসলামী মূল্যবোধ ও চিন্তাধারাকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে

www.pathagar.com

ধরার ক্ষেত্রে তাঁর সহজবোধ্য ও সৃজনশীল লেখনী শক্তির ভূমিকা সর্বমহলে নন্দিত হয়েছে ব্যাপকভাবে।

এ দেশের মুসলিম সমাজ ইসলামকে ভালোবাসে কিন্তু তারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো জানে না। প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে ইসলামকে শুধু নামায-রোজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। এ দেশের আলেম সমাজ ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করেন তার বেশির ভাগই হলো নামায-রোজার ফজিলত সংক্রান্ত। কিন্তু ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন বিধান। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা। ইসলামী জীবনদর্শনের বেশির ভাগ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষাভাষিগণ এ থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারছে না। সাধারণ উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ইসলামের উন্নততর দর্শনের সন্ধান না পাওয়ায় নাস্তিক্যবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, মার্কসবাদী নাস্তিক্যবাদ তার মূল ভূখণ্ডে পরাজিত হলেও এ দেশে এর চর্চা অব্যাহত রয়েছে। তা ছাড়া মুসলমানগণও শিরক ও বিদআতের প্রভাবের কারণে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাচ্ছে না। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভেজাল জ্ঞান না থাকায় তারা ইসলামকে মসজিদ-মাদরাসা ও খানকার ভিতরে সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। এ সুযোগে ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনকে অস্বীকার করে পৌত্তলিকতা ও পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষতায় আকৃষ্ট করে মুসলমানদের বিপথগামী করে তুলছে। মুসলমানরা সত্যের রাজপথ ছেড়ে অলিগলি দিয়ে পথ চলছে। তারা নিজেদের শৌর্য-বীর্য ভুলে স্বেচ্ছায় পথভ্রষ্টতার দাসত্ব বরণ করে নিচ্ছে। এসবের মূল কারণই হলো ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে হলে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নের বিকল্প নেই। কিন্তু এ দু'টোই আরবি ভাষায়। বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে হলে এগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। আবদুল মান্নান তালিব এ কঠিন বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

আবদুল মান্নান তালিবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাফসীর, হাদীসসহ অসংখ্য ইসলামী গ্রন্থ। কয়েক দশক আগেই এ দেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম চর্চার ক্ষেত্রে পাঠ করতো ইসলামের প্রাথমিক বিষয়ে রচিত নামায-রোজার মাসয়ালা-মাসায়েল সংক্রান্ত পুস্তিকা, নবীদের ও ওলি-আউলিয়ার জীবনী, পাঁচ অজিফা, মকসুদুল মু'মিনিন, মধুর মিলন ইত্যাদি পুস্তক। সে সময় ইসলামী আইন, দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, তাফসীর, উসুল ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করা ছাড়া বিকল্প ছিলো না। মাওলানা আবদুর রহীম, আবদুল মান্নান তালিবসহ কয়েকজন মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ বাংলা ভাষা ইসলামী সাহিত্যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে।

ইসলামী সাহিত্য নিছক ধর্মীয় সাহিত্য নয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি বিশেষের ধর্মাচরণের মধ্যে এ সাহিত্য সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী

www.pathagar.com

মূল্যবোধের আলোকে রচিত সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য। এর রয়েছে একটি বিশ্বজনীন রূপ। বিশ্ব-মানবতার জন্য এ মূল্যবোধগুলোর অবদান অপরিসীম। মানবতার কল্যাণ, সামাজিক সাম্য ও সুবিচার যেমন সকল যুগের সকল মানুষের আপন সম্পদ হতে পারে তেমনি ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবোধগুলোও সকল মানুষের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই তো আবদুল মান্নান তালিব মুসলিম সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্যের পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'মুসলিম সাহিত্য যেখানে কেবলমাত্র মুসলমানদের সৃষ্ট সাহিত্য সেখানে ইসলামী সাহিত্য মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার সৃষ্ট সাহিত্য। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়, কোনো অমুসলিমের হাতে সৃষ্ট হলেও তা ইসলামী সাহিত্য। কাজেই মুসলিম সাহিত্যের গণ্ডি একান্তই সীমাবদ্ধ। সে তুলনায় ইসলামী সাহিত্য অনেক বেশি ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী।'(আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, পৃ. ৩৮।)

সাম্রাজ্যবাদীরা তল্পিতল্পাসহ এ দেশ থেকে বিদায় গ্রহণ করার সময় তাদের অপসংস্কৃতি ও ইসলামবিরোধী আইনের কুপ্রভাব রেখে যায়। এ কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পেতে ইসলামী ধারার সুস্থ ও পরিশীলিত সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করতে হবে। এ উপলব্ধি থেকেই আবদুল মান্নান তালিব আজীবন ইসলামী সাহিত্য নিয়ে কাজ করে গেছেন। সাহিত্যকে তিনি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করতেন। সাহিত্যকে নবুওয়াতি ধারার স্রোতে প্রবাহিত করতে হবে এটা ছিল তাঁর আজীবন সাধনা। তিনি বলেছেন, 'সাহিত্য মানুষের জীবনের একটা প্রয়োজনীয় অংশ আর নবীরা এ অংশে কোনো অবদান রাখেননি একথা কেমন করে ভাবা যেতে পারে? নবীরা যেসব সহীফা ও কিতাব এনেছেন সেগুলোও সাহিত্যরসসমৃদ্ধ। নিছক কাঠখোট্টা আলোচনা কোনো কিতাবেই নেই। জীবনকে উপলব্ধি করে আলোচনাগুলো জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে জীবনরস সমৃদ্ধ করে। তবেই তা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। মানুষ তার সাহায্যে উন্নতি করে উন্নত জীবন সমাজ সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে এবং তার ভিত্তিতে মানুষ করছে সাহিত্য সাধনা।' (আবদুল মান্নান তালিব, বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা, ২৫ বছর পূর্তি স্মারক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ২০১০, পৃ. ৩৩২)

আবদুল মান্নান তালিব বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের উপর ইসলামের প্রভাব নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। সুসাহিত্য কিভাবে মানুষের জীবনকে সুন্দর ও পরিশীলিত করে সে সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। শিরক ও নাস্তিক্যবাদী সাহিত্য আমাদের কি ক্ষতি করেছে সে বিষয়েও সুস্পষ্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্য রচনা করছেন। মৃত্যুপূর্ব এক সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলা সাহিত্যে শিরক ও কুফুরির কুপ্রভাব সম্পর্কে বলেছেন, 'আমাদের সাহিত্যে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি যে বিরূপতা আসছে ইতিপূর্বে বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যে তার কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। হিন্দুদের তৈরি নতুন বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখকদের সংখ্যা ছিল তখন অনেক কম।

www.pathagar.com

তারপরও ওই কম সংখ্যক মুসলিম লেখকদের মধ্যে একটা একমুখিনতা গড়ে ওঠে। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব থেকে পুরাতন হিন্দু ঐতিহ্যবাদী সংশয়বাদ এবং নতুন মার্কসবাদী নাস্তিক্যবাদ আমাদের তরুণ লেখকদের মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই তারা আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলে থাকেন। এই গ্রুপ পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান-উত্তর বামপন্থী ধারার সৃষ্টি করে। এই ধারা আমাদের সাহিত্যকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' (আবদুল মান্নান তালিবের সাক্ষাৎকার : ওমর বিশ্বাস)

ইসলাম নিছক ধর্ম নয়। একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার সকল উপাদান ইসলামে রয়েছে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা যা জীবনের সকল ক্ষেত্র ও বিষয়ের যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছে। ইসলাম শুধু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এর প্রতিটি বিষয়ই অনুশীলনযোগ্যতার বিচারে কালোত্তীর্ণ। কিন্তু ইসলামের অপার সৌন্দর্য ও বিশালত্বকে তুলে ধরার প্রয়াস বাংলা ভাষায় খুবই অপ্রতুল। যাঁরা ইসলামের এই সৌন্দর্য, ব্যাপকত্ব ও বস্তুনিষ্ঠতাকে যৌক্তিক ও নান্দনিকভাবে উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছেন আবদুল মান্নান তালিব তাঁদের অন্যতম। স্বাধীন বাংলাদেশে মাওলানা আবদুর রহীম (র.)-এর পরে এ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এ জাতি যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে।

আবদুল মান্নান তালিব গোঁড়া ধার্মিকের চোখ দিয়ে ইসলামকে অবলোকন করেননি। আবার নাস্তিকতার কাঁচি দিয়ে কাটেননি বিশ্বাসের শেকড়। তিনি বিশ্বাসের আলোকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বাস্তবতার দোরগোড়ায়। বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করেছেন বিশ্বাসের মানদণ্ডে। বিশ্বাস ও বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই সম্পর্ক ব্যাখ্যায় আবদুল মান্নান তালিবের লেখনী বহুমাত্রিক। ইসলামের চিরন্তন সৌন্দর্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যকর্ম ইসলামবিদ্বেষী ছাড়া সকল মহলেই সমানভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

ইসলাম সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিবের চিন্তা-চেতনা উচ্চ মার্গীয়। ইসলামের প্রতিটি বিষয় নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, উসুলে হাদীস, ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও অগাধ জ্ঞান। তিনি স্বাধীনভাবে ইসলামের প্রতিটি বিষয়কে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রাখতেন। অনুবাদকর্মে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফারসি ও হিন্দিসহ বেশ ক'টি ভাষায় পারদর্শী হওয়াতে তিনি অনুবাদের ক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লব সাধন করেছিলেন । ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মৌলিক গবেষণার ব্যাপ্তির ন্যায় অনুবাদ সাহিত্যের পরিধিও বিশাল। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ইসলামকে বিভিন্ন এককে ও বিভাগে বিভক্ত করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বলেছেন, 'ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষের জীবনকে সে বিভিন্ন এককে ও বিভাগে বিভক্ত করে না। এখানে দ্বীন ও দুনিয়ার কোনো বিষয় সম্পর্কে বলা যাবে না যে, এটা দ্বীনি বিষয় এবং ওটা দুনিয়াবী বিষয়। বরং দুনিয়ার জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় দ্বীনের

www.pathagar.com

সাথে সম্পর্কিত। কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে : ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন– 'মানুষ ও জিনকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোনো কাজের জন্য এবং অন্য কোনো দায়িত্বে দুনিয়ায় পাঠাইনি।'...অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের প্রত্যেকটি কাজে যদি আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা হয়, তাহলে পরকালীন জীবনে সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। আর দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহাত্মক আচরণ করে আখিরাতের জীবনে ব্যর্থতা সুনিশ্চিত করা হয়।' (আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৩৪)

ইসলামী আইন দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'মাকাসিদে শরী'আহ' বা শরী'আহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। সর্বপ্রথম ইমাম গাযালি ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাকাসিদের বিষয়টি আলোচনায় তুলে আনেন। এরপর আন্দালুসিয়ার প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিশারদ ইমাম শাতিবি তাঁর 'মুওয়াফিকাত ফি উসুল আশ-শরী'আহ' গ্রন্থে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাকাসিদে শরী'আহকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে আল জুওয়ানি, আল ইজ্জ ইবনে আবদ আস-সালাম, ইবনে খালদুন, ইবনে কাইয়্যেম, ইবনে আশুর প্রমুখ ইসলামী চিন্তাবিদ শরী'আহর বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাকাসিদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন।

'মাকাসিদে শরী'আহর বিষয়টি ইসলামী আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিষয়টি মৌলিক হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় এর আলোচনা পর্যাপ্ত নয়। মাওলানা আব্দুর রহীম এ বিষয় নিয়ে তাঁর 'ইসলামী শরীয়তের উৎস' নামক গ্রন্থে আলোচনা শুরু করেছিলেন। আবদুল মান্নান তালিব বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম কর্তৃক রচিত এতদসংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটি 'ইসলামী শরী'আহর লক্ষ্য : শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় লাভের উপায়' শিরোনামে অনুবাদ করেন। অনুবাদটি 'ইসলামী আইন ও বিচার' নামক জার্নালের ২০০৭ সালের এপ্রিল-জুন সংখ্যায় প্রকাশ পায়।

আবদুল মান্নান তালিব ইসলাম ও সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। তিনি সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের তুলনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় ছিলেন অগ্রগণ্য। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনা ও মতামত প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তাঁর চিন্তা-দর্শনের কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগ হচ্ছে, 'হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের সময় শেষ হবার পর শেষনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের জামানা যখন থেকে শুরু হচ্ছে তখন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত।' (আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৫)।

www.pathagar.com

ইবাদাত

'শুধুমাত্র মানসিকভাবে বিনত হওয়া বা শুধুমাত্র বাহ্যিক শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনত হওয়াকে ইবাদত বলা যাবে না। বরং একদিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনত হওয়া এবং অন্যদিকে মানসিকভাবে বিনত হওয়া উভয়ের একত্র সমাবেশের নামই ইবাদাত।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯)

বিবর্তন

'মানুষ কোনো দিন অসভ্য ছিল না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে মানুষ একটি সভ্য জীব। হতে পারে পরবর্তীকালে সভ্যতার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে সে আরো সুসভ্য হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই সভ্যতার সমস্ত মৌল উপাদান তার কাছে ছিল। তারপর সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। মানুষের সভ্যতা মানুষের অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম রুচি ও বৃত্তির সাথে জড়িত। আর এ রুচি ও বৃত্তির প্রথম দিন থেকেই মানুষের মধ্যে কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪)

গুরুবাদ

'মুশরিকী সমাজে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, যাজক ইত্যাদি একটি ধর্মীয় শ্রেণী গড়ে উঠেছে। ধর্মকর্ম তাঁরাই পরিচালনা করেন। তাঁরাই ধর্মগুরু। ইসলামে এই ধরনের কোনো গুরুবাদ বা ধর্মীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব নেই। জ্ঞানকে বলা হয় ইলম এবং যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে তাকে বলা হয় আলেম। আর এই জ্ঞান অর্জন করা নারী-পুরুষ সকল মুসলমানের জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছে। কাজেই জ্ঞান অর্জনকারী প্রত্যেক মুসলমানই একজন আলেম।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭)

চরিত্র

'চরিত্র বলতে আমরা মানুষের অভ্যন্তরের নৈতিক গুণাবলীকেই বুঝি। এ গুণগুলো শুধু মানুষের থাকে, পশুর বা অন্যান্য মানবেতর জীবের থাকে না। এ নৈতিক গুণাবলীই মানুষ ও পশুর মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪)

বাংলা ভাষা

'আমরা মুসলমানরা এদেশে বাস করছি এক হাজার বছর থেকে এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষরা হাজার হাজার বছর থেকে এদেশে বাস করে এসেছেন, অথচ বাংলা ভাষায় আমাদের ঐতিহ্য অনুসারী শব্দের প্রসার ঘটেছে সে তুলনায় অনেক কম। এর মূলে রয়েছে ফোর্ট উইলিয়ামী ষড়যন্ত্র। যেমন আমি এখানে শুধুমাত্র একটি শব্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। বাংলা ভাষায় 'প্রসূতি' শব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু প্রসূতির রক্তস্রাবের একটি সময় আছে। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় 'নিফাস'। বাংলা অভিধানে এর ব্যবহার নেই। কারণ আমাদের পার্শ্ববর্তী হিন্দু গোষ্ঠী বাংলা ভাষার অভিধান নিয়ন্ত্রক এবং ফোর্ট উইলিয়ামী ষড়যন্ত্রের সুবাদে বাংলা ভাষাকে মৃত সংস্কৃতের বাঁদী বানিয়ে রাখায় বদ্ধপরিকর।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪)

www.pathagar.com

প্রেম ও ভালোবাসা

'প্রেম ও ভালোবাসা একটা স্বাভাবিক বৃত্তি ঠিকই কিন্তু মূলত এর অবস্থান মানুষের মনে, বিশেষ করে দু'টি মানব ও মানবীর প্রেম মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এমনকি তার সামাজিক জীবনেরও একটি সংগোপন বিষয়। আমাদের প্রাচ্য সমাজে একে জনসমক্ষে প্রচার কারার রীতি নেই। এটা পাশ্চাত্য সমাজেরই একটা কাণ্ড। তাদের সমাজে প্রেম হচ্ছে বিয়ের রিহার্সাল এবং এটা সেখানে সম্পূর্ণরূপে একটা দেহগত যৌন ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫)

প্রাথমিক শিক্ষা

'যেখানে শতকরা আশি-নব্বই ভাগ ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডির বাইরে আসার সম্ভাবনা নেই, সেখানে তাদের উপর ইংরেজির মতো একটি বিদেশী ভাষার বোঝা চাপিয়ে তাদের পাঠ্য সময়ের অর্ধাংশ এর পেছনে ব্যয় করা শুধু অর্থহীন পণ্ডশ্রমই নয়, বরং জাতীয় অর্থ, সময় ও মেধার অপচয়ও। কাজেই প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি উঠিয়ে দেয়া উচিত। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করাই যার লক্ষ্য তাকে ঐ পাঁচ বছর অনর্থক ইংরেজি পড়ানো এক ধরনের গোলামী মনোবৃত্তিরই পরিচয় দেবে। এটা স্বাধীনতার ভাবধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ তাকে কেন ইংরেজি শেখানো হচ্ছে। এক সময় আমরা ইংরেজের গোলাম ছিলাম, শুধুমাত্র একথাটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া ছাড়া এর পেছনে আর কি মহৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে?' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩)

আবদুল মান্নান তালিব মানবতাবাদী ও বাস্তববাদী লেখক। সত্য-সুন্দর-কল্যাণের জন্য তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। তিনি লিখতেন সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। নিছক শিল্প বা সাহিত্যের খাতিরে তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হননি। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের চিন্তার পরিবর্তন, চেয়েছিলেন সমাজকে আমূল পরিবর্তন করে দিতে। এ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন ইসলামের সাথে মানুষের সম্পর্কের পুনঃ স্থাপন। তাই তিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এ লক্ষ্যেই কাজ করে গেছেন। তাঁর এ খেদমত থেকে জাতি উপকৃত হবে দীর্ঘদিন। তাঁর সকল প্রচেষ্টা কবুল হোক!

www.pathagar.com

সোনালি জামানার স্বপ্নদ্রষ্টা
তমসুর হোসেন

বহু বর্ণিল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব আবদুল মান্নান তালিব, যাঁর রয়েছে নিরলস সৃজনশীল জীবনচিত্র, সাহিত্যকে যিনি রূপান্তরিত করেছেন জীবনের ঘনিষ্ঠ স্বজনে। সৃষ্টির আদি বৈভরের বিপুল আনন্দকে সাহিত্যের অনুষঙ্গ বানানোর উদ্দেশ্যে তিনি আজীবন কলম চালনা করেছেন। তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ নিভৃত সাধক। তাঁর হৃদয় ছিল অসীমের প্রাণরসে তন্ময়। কবিতার অপ্রসন্ন প্রহেলিকা ও দিকপ্লাবী ধোঁয়াশায় তিনি তৃপ্ত হতে পারেননি। নিজেকে তিনি আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হননি অনুকরণপ্রিয় সাহিত্য সাধনা ও সাংবাদিকতার গতানুগতিক স্বার্থান্ধ পরিবেশনায়। পত্রিকা সম্পাদনার নির্জীব অহমিকায় মিথ্যা তথ্যের তলাহীন পেপার বাস্কেটে তিনি নিজকে খুশী রাখতে আদৌ সম্মত ছিলেন না। তাঁর পরিব্রাজক মানস তাঁকে টেনে আনে রৌদ্রকরোজ্জ্বল সৃজন ব্যঞ্জনায়। বিভ্রান্ত মতাদর্শের শৈল্পিক পরিবেশনায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। মুসলিম জাতির আদর্শিক বুনিয়াদ গুঁড়িয়ে দিয়ে ধর্মহীন বানানোর সর্বব্যাপী চক্রান্তে তার খোদাপ্রেমী হৃদয় কেঁদে ওঠে।

সারা জীবন তিনি কলম চালিয়েছেন ইসলামের প্রচার বিকাশের সাধনায়, যার উজ্জ্বল প্রভায় বাংলাভাষী মুসলমানদের শতাব্দীর কালঘুম ভেংগে যায়। তিনি তাঁর লেখনীতে ইসলামকে তুলে ধরেন সর্বাত্মক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে। বিগত আটশ' বছর ধরে মুসলিম সাহিত্যে অত্যন্ত যত্নভরে লালিত হচ্ছিল একটি পরিচ্ছন্ন ইসলামী চেতনা। কিন্তু পাকিস্তান জন্মের আগে এক শ্রেণীর লেখক সে ধারায় সন্দেহের বিষ ছড়িয়ে দেয়। তাদের সামগ্রিক লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে আল্লাহর অস্তিত্ব ও

www.pathagar.com

ইসলামী জীবনাদর্শের অসারতা। দার্শনিক যুক্তির দুর্গন্ধময় জঞ্জালে তারা সাহিত্যের শুভ্র ভাণ্ডার নোংরা ও পংকিল করে তোলে। আধুনিক শিক্ষিত উদ্যমী তরুণ লেখকরা এসব বস্তুবাদী চিন্তাধারায় দারুণভাবে প্রভাবিত হতে শুরু করে। এভাবে মার্কসীয় দর্শন ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংশয়বাদ একালে সাহিত্য বিকাশের একটি আধুনিক স্টাইলে পরিণত হয়। এই সাহিত্যিকরাই পরবর্তীতে পাকিস্তান-উত্তর কট্টর বামপন্থী ধারার প্রবর্তন করে। আর এই নাস্তিক-মুশরিকি সাহিত্যদর্শন বিপুল পারঙ্গমতায় দুরারোগ্য ব্যাধির মতো শিক্ষিত সমাজকে নির্জীব করতে থাকে। যে প্রাণহীন বস্তুবাদী দর্শন তার জন্ম রাজ্যে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা মুসলমানদের মনন সাম্রাজ্যে নিজ আসন সুদৃঢ় করতে থাকে। এ নাজুক অবস্থায় যাঁরা উপমহাদেশের মুসলমানদের সাক্ষাৎ ভরাডুবি থেকে উদ্ধার করতে আসেন, আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন তাঁদেরই অগ্রবর্তী নিশানবরদার। মধ্যযুগীয় মুসলিম সাহিত্যিকদের বীরত্বপূর্ণ আখ্যানকাব্য, নজরুলের বিদ্রোহ-উদ্দীপনা ও ফররুখের অনন্য কাব্যিক সমুদ্রযাত্রা তাঁকে এক ধ্যানময় জ্ঞানতাপসে পরিণত করে। উপমহাদেশের তিনটি সংঘাতপূর্ণ দেশ ও তার মুসলমানদের আদর্শিক বিচ্যুতি তাঁকে ভাবনার অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করে।

তিনি জন্মেছিলেন ১৯৩৬ সালের ১৫ মার্চে ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে। ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অথচ এইচএসসি পাস করেন দীর্ঘ ১৬ বছর পরে ঢাকা বোর্ড থেকে ১৯৬৬ সালে। অবশ্য তার আগে হাদীসশাস্ত্রে পড়াশুনা করার জন্য লাহোরে পাড়ি জমান তিনি। সেখানে জামেয়া আশরাফিয়াতে দাওরা-ই-হাদিস সমাপ্ত করেন। দেশ বিভাগ ও নানারূপ ভাংগাগড়ায় তাঁর লেখাপড়ার ছেদ পড়লেও অদম্য আগ্রহ ও বিরামহীন প্রচেষ্টায় তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দূ, ফারসি ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। লাহোরে থাকাকালীন সময়ে বিখ্যাত আলেম মাওলানা ইদরিস কান্ধলভীর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই মহান ব্যক্তির চিন্তাধারা তাঁকে ইসলামের নিগূঢ় সৌন্দর্যের সন্ধানে ব্রতী হবার অনুপ্রেরণা যোগায়। তাঁর সুপ্ত লেখকসত্তা তাঁকে লাহোরের বহুল প্রচারিত উর্দু দৈনিক 'তাসনীম'-এর সহ-সম্পাদক হওয়ার জন্য সাহসী করে তোলে। এরপর তিনি 'দৈনিক ইত্তেহাদ', 'সাপ্তাহিক জাহানে নও', কলকাতার 'সাপ্তাহিক মিযান', 'মাসিক কলম', 'মাসিক পৃথিবী', দৈনিক সংগ্রামের ফিচার বিভাগ, 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', 'ত্রৈমাসিক ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা' সম্পাদনা করেন। এসব পত্রিকায় কাজ করার মধ্য দিয়ে তাঁর মধ্যে স্বাবলম্বী সৃজন মানস জন্মলাভ করে, যার ফলশ্রুতিতে তিনি সর্বমুখী অপ্রতিরোধ্য প্রতিভায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন।

মৌলিক রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা মিলে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের কলেবর ঈর্ষার উদ্রেক করে। মাত্র ৭৬ বছর অস্থির ঝঞ্ঝামুখর জীবনে তিনি ১৭৬ খানা বিরল গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা', 'বাংলাদেশে ইসলাম', 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও অবদান,'

www.pathagar.com

'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট', 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন', 'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক নাসিম হিজাজীর ইতিহাস-ঐতিহ্যকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলো তিনি অনুবাদ করেন আন্তরিকতার সাথে। তাঁর শিশু কিশোর রচনা 'এসো জীবন গড়ি', 'পড়তে পড়তে অনেক জানা,' 'মা আমার মা', 'আমাদের প্রিয়নবী', 'মজার গল্প', 'কে রাজা', 'হাতিসেনা কুপোকাত' শিশুদের সৃষ্টিশীল মানস গঠনে অপরিসীম অবদান রাখে। কবিতা, প্রবন্ধ, তাফসীর, হাদীস, ইসলামী আকীদা, ফিকহ্, উসুলে ফিকহ্, উপন্যাস, চিন্তামূলক প্রবন্ধ, ইকবালের কবিতা, অর্থনীতিসহ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি নজরুল ও ফররুখকে উর্দুভাষী মানুষের কাছে পরিচিত করেছেন সার্থক অনুবাদকর্মের মাধ্যমে। তিনিই সেই বিদগ্ধ সাহিত্যিক যিনি শেকওয়ার কবি ইকবালকে আত্মস্থ করেছেন তার মূল উদ্দীপনায়। তাঁর শব্দগত প্রাঞ্জলতা, কাব্যিক দরদ ও অনুপ্রেরণার ক্ষুরধার তরংগউদ্ভাস ধারণ করেছেন হৃদয়ের ছন্দ মাধুর্যে।

তিনি লক্ষ্য করেছেন অত্যন্ত বেদনার সাথে একটি বিষয়, এদেশের আলিম সমাজ সাহিত্যবিমুখ। তারা বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করলেও সাহিত্যের ময়দানে পদচারণা করতে মোটেই রাজি নন, যার ফলে শিক্ষিত মানুষের চেতনায় ইসলামী মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেবার এই শক্তিশালী হাতিয়ার ব্যবহারের যোগ্যতা তারা অর্জন করতে পারেননি। ইসলামী জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যকে নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করে ভাষার কৌশল ও প্রকাশভংগির স্বপ্নময় বাচনবিন্যাসে তাকে ছড়িয়ে দেয়ার আগ্রহ তাদের মধ্যে ছিল দারুণভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু আবদুল মান্নান তালিব সার্থকভাবে ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে গভীর নিষ্ঠার সাথে আত্মস্থ করেছেন। তারপর নানান রূপ ও বৈচিত্র্যে তা তুলে ধরেছেন জ্ঞানপিপাসু জনতার সম্মুখে। ইসলামকে তার সতেজ ও প্রাণবন্ত উজ্জ্বলতায় ছড়িয়ে দেবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সহজেই সন্ধানী বিবেককে আকৃষ্ট করে, যার কারণে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অগণিত পাঠকের হৃদয়ে স্থান লাভ করেন এক সুসাহিত্যিক এবং মননশীল দার্শনিক হিসেবে তাঁর সারা জীবনের প্রচেষ্টায় তিনি একটি আদর্শবাদী বিশুদ্ধ সাহিত্যিক গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বাম মতাদর্শের অনেক লেখককে তিনি টেনে এনেছেন ইসলামী আদর্শের সঞ্জীবনী ছায়ায়। কুয়াশাঢাকা প্রচ্ছন্ন পর্বতচূড়ায় তিনি জ্বালিয়ে গেছেন হৃদয়ের একমুঠো শুভ্র আলো যার উষ্ণতা লেগে বিহংগের অবশ ডানায় ফিরে এসেছে সবেগ গতিমাধুর্য। জড়তার ধুলো ঝেড়ে আলোর পাখিরা যে সোনালি সকালের সন্ধান করে আবদুল মান্নান তালিব তাঁর কুহেলী শীতল অনড় কপাটে করে গেছেন সবল আঘাত। সেদিন হয়ত বেশি দূরে নয় যেদিন মুক্ত আলোয় গীত হবে প্রত্যয়দীপ্ত প্রাণের সংগীত। ইবলিশের অভিশপ্ত ডানা সেদিন পুড়ে যাবে জাহান্নামের জ্বলন্ত অংগারে।

ইসলামের শাশ্বত বিধানের প্রতি আবদুল মান্নান তালিবের ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি বলতেন, 'ইসলাম যেমন বিশ্বজনীন মতবাদ, ইসলামী

www.pathagar.com

সাহিত্য-সংস্কৃতিও তেমন বিশ্বজনীন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলত জীবন চর্চার নাম। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম চর্চার সুযোগ আছে। সব ধরনের সংকীর্ণতা ও সীমালংঘন থেকে ইসলাম মুক্ত। ফলে ইসলাম জীবনধর্মী সব কিছুকেই নিজের করে নিতে পারে, যে ক্ষমতা অন্য কোন ধর্মের নেই। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ইসলামকে শুধুমাত্র ধর্ম মনে করা যাবে না। ইসলাম একটা আদর্শ। একটা সার্বিক জীবনব্যবস্থা। আমরা যে সাহিত্য চর্চা করি তা জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সেজন্য আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জীবনধারা সব কিছুকে বিচূর্ণ করে সাহিত্যের উপাদানে পরিণত করতে হবে। আধুনিকতাকেও মেজে ঘষে টেনে আনতে হবে সাহিত্যের প্রাণসত্তায়। আর আধুনিকতা হলো কাল ও পরিবেশে জীবনের বর্ণিল বিকাশ।' তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে যে কালচার গড়ে উঠেছে তা ইসলামী ভাবধারা বিবর্জিত। এ কালচারে মিশে আছে সেকুলার, বাম, পাশ্চাত্যবাদ, হিন্দুয়ানী এবং লৌকিক ভাবধারা। এ বাহ্যিকতাসর্বস্ব বিভ্রান্ত চিন্তাধারায় আমাদের সাহিত্য নির্মাণের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের তালাশ করতে হবে বিশুদ্ধ ইসলামী সাহিত্য স্রোত। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের ঢাকা কেন্দ্রিক বিকশিত সাহিত্য ঘরানার সৃষ্টি হচ্ছে, কলকাতায় যা ছিল কোণঠাসা এবং ক্ষীণকণ্ঠ। এভাবে মুসলমান সমাজের নিজস্ব কালচারসমৃদ্ধ একটি বেগবান মনন বিকাশের গতিধারার জন্ম হয়েছে। কালচার তো কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। নদীর চলমানতায় যে গতিছন্দের সৃষ্টি হয় তাই কালচারের উপমা। আমাদের জীবন ইসলামের সুমহান আদর্শে পরিচালিত হলে বসন্ত কুসুমের মতো পরিব্যাপ্ত হবে কালচারের সুগন্ধ। তিনি দুঃখ করে বলেন, আমরা আমাদের কালচারের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারিনি। এর ভেতরের মাহাত্ম্য এবং গৌরব অন্যের কাছে তুলে ধরতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, বরং সমস্ত প্রকারের দুর্ব্যবহার আমরা করেছি তার সাথে।'

আবদুল মান্নান তালিব আজ আমাদের মাঝে নেই। বিগত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ ইং তিনি ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারের শান্তির নীড়ে চলে গেছেন। তিনি ছিলেন সদালাপী, বিনয়ী ও স্বল্পভাষী। তাঁর হৃদয় ছিল বিস্তীর্ণ ও গভীর। পৈতৃক আবাস, আবাল্য চেনা পরিবেশ ছেড়ে তিনি এই ব-দ্বীপের উর্বর মাটিতে লেখনীর শোনিতধারায় ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নিরবচ্ছিন্ন কলম সাধক। ভাবের তরংগে ভেসে তিনি রাতের তন্ময়তায় মিশিয়ে গেছেন তাহাজ্জুদের ধ্যান। গাছের পাতায় শিশিরের তসবী টিপে তিনি আল্লাহর করুণাধারায় ভরেছেন বগলের শূন্য পকেট। স্রোতময় নদীর ভংগুর কাছাড়ে বসে তিনি অশ্রুসিক্ত সময়কে শুনিয়েছেন সান্ত্বনার অনেক কাব্য। অনেক বিষয় ঝরা পাতায় তিনি সুন্দর হরফে লিখে গেছেন সোনালি জামানার স্বপ্ন। প্রতিটি রাতের স্বচ্ছ কাগজে তিনি ঘুমজড়ানো চোখে ইবাদতের মতো সুখময় কবিতার চিত্রকল্প এঁকে গেছেন। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তিনি অনেক অদৃশ্য বার্তা ছড়িয়ে গেছেন প্রাণের সুগন্ধি মেখে। সত্যের অগ্রবর্তী সৈনিকরা হয়ত তা তালাশ করে অন্ধকার রাতের বিবিক্ত তমসায় পথ খুঁজে নিতে পারবে।

www.pathagar.com

সময়ের
এক সাহসী যোদ্ধা
মোহছেনা পারভীন

সুন্দর সব সময় সুন্দর। তার সাথে সত্য যুক্ত হলে আমরা তাকে বলি সত্য ও সুন্দর। সত্য ও সুন্দরের অনুশীলন বা চর্চা তারাই করেন যারা সত্যকে সত্য হিসেবে চেনেন। সুন্দরকে সুন্দর করে চেনেন। আমি বলবো এমন এক সুন্দর মনের মানুষ আবদুল মান্নান তালিবের কথা। যাঁর চোখে-মুখে, চিন্তা-চেতনায় ছিল বিশ্বাসের ছায়া। তিনি বিশ্বাস করতেন সুন্দর সমাজ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধের কথা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে একদিন সার্বিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে এ বিশ্বাসেই তিনি ছিলেন বিশ্বাসী আর এ বিশ্বাসবোধ থেকেই লিখেছেন নিরলস। সমাজকে দিয়েছেন সত্য ও সুন্দরের পাঠ।

সাহিত্য শুধু মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হবে একথা তিনি মানতে নারাজ। সাহিত্যে থাকবে এমন এক জীবনবোধ যা মানুষকে জীবনসত্তার পর্যায় থেকে উন্নীত করবে মানব সত্তায়। তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপাখি সহজেই পশুপাখি, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবেই মানুষ আর এ জন্য দরকার মানুষের জন্য একটি যথার্থ গাইড লাইন, যার মাধ্যমে পাওয়া যাবে সুন্দর ও আদর্শিক জীবনের দিকনির্দেশনা।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব তাঁর লেখা, 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' গ্রন্থে লেখকের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'লেখক কোন বিচ্ছিন্ন জনবিরল দ্বীপের বাসিন্দা নয়। তিনি জনাকীর্ণ মনুষ্য সমাজে বাস করেন। তাঁর অনুভূতি আর দশটা মানুষের মতোই। তাঁর জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোও কোন বিশেষত্বের অধিকারী নয়। লেখক চাইলেও নিজেকে সমাজ থেকে আলাদা করতে পারেন না। কারণ মানুষ ও মানুষের সমাজ নিয়েই তার কারবার। তিনি না কোন ব্রহ্মচারী, সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন সংসারবিরাগী নন। জংগলে বসবাস করা তাঁর ধর্ম নয়। তিনি মানুষের সমাজে মানুষের মধ্যে বসবাস করেন। তিনি সুফী-দরবেশের ন্যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন যাপন করেন না। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে তাঁর মিশতে হয় এবং সবার হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের খবর তাঁকে রাখতে হয়। তিনি একজন সমাজসচেতন মানুষ, বরং তিনি মানুষের সমাজের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অংশ। একজন কবি, একজন কথাশিল্পী, একজন প্রাবন্ধিক ও একজন নাট্যকার মানুষের সমাজের একটি চোখ, যে চোখের দৃষ্টি শুধু অন্তরভেদী নয়, অনেক ক্ষেত্রে অন্তরগ্রাসীও।' কবি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'কবি শুধু কল্পনার রাজ্যে বিরাজ করেন না, হৃদয় রাজ্যেও তার অধিষ্ঠান অপ্রতিহত। যুক্তিকে তিনি স্বীকার করেন, গ্রহণ করেন, তবে তার ব্যবহার করেন হৃদয় দিয়ে। তবু তিনি একজন সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী ও আত্মকেন্দ্রিক সুফী নন। তিনি একজন সৎ, কল্যাণকামী, হৃদয়বান মানুষ। নিজেকে যেমন তিনি চেনেন, তেমনি চেনেন অন্যকেও। নিজের জন্য যেমন তিনি চিন্তিত তেমন চিন্তিত অন্যের জন্যেও।'

কথাশিল্পী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'একজন কথাশিল্পী মানুষের মধ্য দিয়ে, সমাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে অনুভব করেন। সমাজটা তার কাছে উন্মুক্ত আকাশের মতো। মানুষেরা তার মধ্যে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ আবার ধূমকেতুও। সকলের গতিপথের সাথে তিনি পরিচিত। সমাজ চলে, তার সাথে তিনি নিজেও চলেন। তিনি চলেন তার সাথে সমাজও চলে। কথাশিল্পী একজন চিত্রকর। তার বিশাল ক্যানভাসে ফুটে উঠে মানুষের ও তার সমাজের বিচিত্র ছবি।'

নাট্যকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'কবি বাস করেন ব্যক্তির মনের রাজ্যে আর নাট্যকার বাস করেন সমাজের মনের রাজ্যে, কবি ও কথাশিল্পী যে কথা মুখ ফুটে বলতে পারেন না, নাট্যকার তা চিত্রের মতো এঁকে দেন হৃদয়পটে। মানুষের ও তার সমাজের একেবারে অন্তরের কথা, আবেগ, অনুভূতি ও তাদের আসল রূপকে শিল্পায়িত করেন নাট্যকার অভিনব কায়দায়। সমাজকে বাদ দিয়ে নাটকের কোন অস্তিত্বই নেই।' আর প্রবন্ধকার সম্পর্কে আমাদের সার্থক প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান তালিব বলেছেন, 'মননশীল প্রবন্ধ সব শিল্পের রাজা। মননশীল প্রবন্ধকার ওস্তাদ শিল্পী। তার হাতে একদিকে থাকে যুক্তি এবং অন্যদিকে আবেগ। একদিকে দেহ অন্যদিকে হৃদয়। তিনি তুলি দিয়ে ছবি আঁকেন ছবির মতো করে। তিনি যা বলতে চান

www.pathagar.com

তা বলেন, যা ঝুঝাতে চান তা বুঝান। দিনকে সত্যিকার দিনে এবং রাতকে প্রকৃত রাতে পরিণত করেন। কবি, কথাশিল্পী ও নাট্যকার দেশ ও সমাজকে গড়ে তোলার জন্য যে গান গাইতে চান মননশীল প্রবন্ধকার সে গান রচনা করেন এবং তাতে সুর সংযোজনও করেন।'

হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্য। সেই অনুভূতিগুলো কখনো উদ্দেশ্যবিহীন নয়। সাহিত্যের সাথে সমাজের নিবিড় সম্পর্ক। সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব একাধারে এক মৌলিক প্রতিভাধর সাহিত্য গবেষক, তাত্ত্বিক ও ধর্ম বিষয়ক পণ্ডিত বিশ্লেষক, 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'কোন জাতি যখন ইসলামকে তার জীবনের বিধান হিসেবে গ্রহণ করে তখন সে কেবল নিজের জীবনকে সেই অনুযায়ী ঢেলে সাজায় না, বরং সেই বিধানের সাথে তার চিন্তাগত ও আবেগময় সম্পর্ক এবং মানব জাতির প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি তাকে আল্লাহর এই অফুরন্ত অনুগ্রহটি অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।'

ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'ইসলামী সাহিত্য কোনো নিছক ধর্মীয় সাহিত্য নয়। মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য গড়ে উঠে। সেগুলো যেমন ব্যাপক ও বিশ্বজনীন, ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপ্তিও তেমনি বিশ্বজনীন। ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার আর একটা দিক হচ্ছে সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য এর সুস্পষ্ট আবেদন রয়েছে। ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবোধগুলো যে কোন সাহিত্যের আদর্শ হতে পারে।'

আবদুল মান্নান তালিব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাই সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' ও 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা অভাবনীয়। একজন সত্যিকার সাহিত্যিক সমাজকে, সমাজের মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে না। একজন দায়িত্বশীল সাহিত্যিকের কাজ হবে সমাজের মানুষকে অত্যন্ত কৌশলে ভুল পথ থেকে উদ্ধার করে সুপথে ফিরিয়ে আনা। আর এ কাজটি করেছেন সাহসের সাথে সমাজের সাহসী যোদ্ধা আবদুল মান্নান তালিব। তিনি তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন সর্বত্র। সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করেছেন। দিগভ্রান্ত যুবসমাজকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে। গতানুগতিক সাহিত্যের বাইরে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির এ অন্তরঙ্গ প্রয়াস সমাজের প্রতি তাঁর দায়িত্বশীলতার প্রমাণ।

ইসলাম জীবন ও যৌবনকে একটি মূল্যবান সম্পদ মনে করে এ জন্য যে, এটি আল্লাহর একটি আমানত। আর যখনি আমাদের যুব সমাজ মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে বিভিন্ন অনাচারে লিপ্ত হয়, সেই আমানতের খেয়ানত করে তখনই সমাজে দেখা দেয় বিপর্যয়। আর সাহিত্যের সাথে যেহেতু সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় তাই আদর্শ ও লক্ষ্যাভিসারী সাহিত্যিককে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে অন্ধকারে নিমজ্জিত যুবসমাজকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। প্রত্যেক কবি-

www.pathagar.com

সাহিত্যিকের লেখায় একটি বিষয় স্পষ্ট— সবাই তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন। মনে করেছেন তারুণ্যই শক্তি। এই তরুণেরা একদিন সুন্দর প্রভাতের সূচনা করবে। এ স্বপ্ন থেকেই আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন আমৃত্যু।

তিনি সঠিক সময়ে লেখনীর মাধ্যমে একটি সুন্দর আগামীর জন্য যে যুদ্ধ করেছেন আমার বিশ্বাস এই সাহসী যোদ্ধার এই স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে। তাঁর এই পথ অনুসরণ করে দৃপ্তপদে এগিয়ে যাবে আরো অগণিত কলম যোদ্ধা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর সব নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতবাসী করুন এটাই আমার একান্ত চাওয়া।

www.pathagar.com

স্মৃতির তরঙ্গে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্মৃতির তরঙ্গে
তালিব ভাই
আল মাহমুদ

জনাব আবদুল মান্নান তালিব আমার কাছে একজন বিনম্র মানুষ হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বারবার আমার সান্নিধ্যে এসেই আমাকে অন্তরঙ্গ করে নিয়েছিলেন। তিনি একজন চারণ কবির মতো পরিচিতদের মধ্যে বিরাজ করতেন। মানুষকে আকৃষ্ট করার এক ধরনের ক্ষমতা তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছিলো। কথা বলতেন একটু থেমে থেমে। হাসতেন অত্যন্ত বিনম্র স্বভাবের প্রতিভাবান মানুষের মতো। আমার জীবনেও তাঁর কিছু স্মৃতি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমি অনেকটা হতবাক হয়ে তাঁর বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করি এবং তাঁকে একজন আত্মীয় মানুষের মতো ধারণা করি। অনেক কথাই মনে পড়ছে। তিনি যার সাথে পরিচয় সূত্রে একবার আবদ্ধ হতেন তার কাছে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করে একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিতেন। আমার সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো এভাবেই এবং তাঁকে মনে রাখার মতো অনেক ঘটনাই আমার জীবনকে অভিভূত করে রেখেছে।

তিনি প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যেরই লোক ছিলেন। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণাও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ছিলো। আগামী দিনের স্বপ্ন দেখতেন, ভবিষ্যতের সমাজ-সংসারের একজন লেখক কিভাবে নিজেকে মানিয়ে চলবেন– এ ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা আমাকে বলেছিলেন। আমি সেসব স্মরণে রেখেছি। আমার মনে হয়েছে কবি হিসেবে আমাকে তিনি গ্রাহ্য

www.pathagar.com

করেছিলেন এবং এই সাথে তাঁর আন্তরিক ভালোবাসাও আমি পেয়েছিলাম।

তাঁর মতো ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষের এখনও বড়ই প্রয়োজন। কিন্তু তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। রোগ-শোক, দুঃখ, মৃত্যু এসব মানুষের জীবনেরই ঘাত-প্রতিঘাত। সবার জন্যই বরাদ্দ আছে। সকল মানুষকেই এর মধ্য দিয়েই হেঁটে আয়ুষ্কাল পার হয়ে যেতে হয়।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কিছু বিষয়ে ঋণী আছি। এর মধ্যে একটি বিষয় হলো আন্তরিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পরিশ্রম। তিনি হেঁটেই চলে আসতেন, ঘন ঘন আসতেন এবং এভাবেই মনে মনে একটা প্রীতিবন্ধন তৈরি হয়ে যেতো।

আমি তাঁর জন্য অপেক্ষা করতাম এবং তিনি আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে ঠিকই এসে ঠিক সময় আমার পাশে বসতেন। এতে আমি অনুপ্রাণিত বোধ করতাম এবং লেখায় আনন্দ সৃষ্টি হতো। এমনিতে লেখকের মনে নানা বিশৃঙ্খলা তরঙ্গিত থাকে। একটি প্রসন্ন অবস্থার জন্য আবদুল মান্নান তালিবের মতো বিশ্বাসী মানুষ একান্ত দরকার হয়। আমি আমার কিছু অভাব তাঁর উপস্থিতিতে পূরণ করে নিতে পেরেছিলাম, এজন্য আজ তাঁর অনুপস্থিতিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আজ মনে হয় তাঁর এ সময়টায় অনুপস্থিতি আমাদের জন্য অনুতাপের বিষয় হয়েছে। তিনি ছিলেন লেখকের, কবি-সাহিত্যিকের অনুপ্রেরণার মতো যাঁকে দেখলে হৃদয়-মন প্রসন্ন হয়ে উঠতো। আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন তেমন একজন মানুষ। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যেতো না কত বিচিত্র বিষয়ে তাঁর নিয়মিত অধ্যয়ন ছিলো। গভীর মনোযোগে ও আন্তরিকতায় তিনি গবেষকের মতো চিন্তা-স্থিরতায় সুস্থির ছিলেন। আমার যতটুকু মনে পড়ছে তাঁর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আমারও সামান্য উপস্থিতি আমি অনুভব করতাম। আমি যে একজন কবি— এটা তিনি খুবই মনোযোগ সহকারে উপলব্ধি করেছিলেন। কিছু মানুষের কাছে আমার কিছু ঋণ আছে। আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন সেরকম একজন ব্যক্তি। আমরা অনেক সময় একান্তে বসে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি। গভীর মনোযোগ সহকারে আমার কথা তিনি শ্রবণ করেছিলেন। আমি তাঁকে কবির স্বপ্ন হিসাবে কিছু প্রসঙ্গ আলাপন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি শুনতেন এবং বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। এই তাকিয়ে থাকার কয়েকটি মুহূর্ত এখনও আমার স্মৃতিকে উজ্জীবিত রেখেছে।

তাঁর সাথে আমার জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে। এমন আন্তরিক মানুষ আমি আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাই না। তাঁকে নিয়ে অনেক স্মৃতিই আমার মনে পড়ছে। একটা কবিতা লেখার কারণে অনেকেই আমার প্রতি নাখোশ হয়েছিলেন। পত্রিকা থেকে তখন আমার চাকরিটা চলে গেল। একেবারে একা। তখন একদিন রাতের আঁধারে তালিব ভাই তৌহিদকে সাথে নিয়ে আমার গুলশানের বাসায় হাজির। আমি তালিব ভাইকে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। নিশ্চয় ঐ কবিতার জন্য ভালো মন্দ কিছু শুনিয়ে দেবেন। চুপচাপ বসে আছি। সহসা তালিব ভাই কথা তুললেন।

www.pathagar.com

'আল মাহমুদ ভাই, জীবন চলার পথে ভুল হতেই পারে, তাই বলে জীবন তো আর থেমে থাকে না। কি লিখেছেন একদম ভুলে যান। মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলুন। কিছুই হয়নি।' আমি তো হতবাক! এর নাম তালিব ভাই! মানুষের প্রতি যাঁর ভালোবাসা ছিল আকাশ ছোঁয়া। যাকে বলে লেখক বান্ধব। আমি সেদিন চোখের অশ্রু ঝরিয়ে বলেছিলাম, তালিব ভাই, আর কখনো এমন হবে না। আমার এই কবিতা কোন দিনও কোন কাব্যগ্রন্থে স্থান পাবে না। এলোমেলোভাবে আজ অনেক কথায় মনে পড়ছে। 'কাবিলের বোন' এই বইয়ের জন্য সর্বাধিক রয়ালটি আমি তালিব ভাইয়ের হাত থেকেই পেয়েছি। একসাথে এত বেশি টাকা সে সময় আমাকে অন্য কোন প্রকাশক দেয়নি। তাঁর ঋণ কখনও শোধ হবার নয়।

www.pathagar.com

মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব সম্পর্কে আমার অনুভূতি

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর বাংলাদেশে মুসলিম চেতনার এক নবযুগের সূচনা হয়। ঐ সময়ে একজন বিশিষ্ট কলমসৈনিক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন আবদুল মান্নান তালিব। পাশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার এক ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। শিশুকাল থেকেই তিনি ইসলামী চিন্তা-চেতনার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ প্রচারবিমুখ, বহু ভাষাবিদ আবদুল মান্নান তালিব তাঁর নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে চাইতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী, কোনো কিছু জানতে চাইলে তিনি খুব সংক্ষেপে বলতেন। বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য আন্দোলনের একজন নেতৃপুরুষের ভূমিকা পালন করেও তিনি কথা কম বলতেন। তাঁর কলম ছিল ক্ষুরধার, বিশেষত ইসলামী যে কোনো বিষয়ে লিখতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন।

আরবি, উর্দু ও ফারসি ভাষায়ও তাঁর প্রচুর দক্ষতা ছিল যেজন্য বিভিন্ন মূল্যবান বই অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি ক্লান্ত হতেন না। শতাব্দীর বিখ্যাত একটি বই আল্লামা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর 'খুতবাতে মাদ্রাজ' বাংলায় প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি সমসাময়িক অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লেখা ও অনুবাদ করা আরও

www.pathagar.com

অনেক মূল্যবান বই প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর সমসাময়িক কালে অনন্য বলা যায়।

মাওলানা তালিব ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি সমসাময়িক বহু লেখক ও লেখালেখিতে আগ্রহী তরুণকে সংগঠিত করে তাদের চলার পথ সুগম করেছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী মাওলানা তালিবের নিকট লেখক ও লেখালেখিতে আগ্রহী তরুণদের ভিড় সব সময় লেগে থাকত। তিনি সবাইকে সমভাবে স্নেহ দিতেন। তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ বাতলে দিতেন। এক কথায় মাওলানা তালিবের মধ্যে একজন বিজ্ঞ আলিমে দ্বীনের চরিত্র পরিপূর্ণরূপে ফুটে উঠেছিল। সদা হাসি মুখে মাওলানা তালিব সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতেন। সমসাময়িক আলেমদের সাথেও তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক ছিল। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিও তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন। পদ ও পদবী দখল করা নয়, বরং আদর্শের প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য থাকত।

মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব বর্তমানে এমন এক জগতের অধিবাসী যেখানে কারও তারিফ বা নিন্দাবাদ তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর নামটি সব সময়ই প্রশংসার সাথে উচ্চারিত হবে।

www.pathagar.com

মরহুম আবদুল মান্নান তালিব

রাজিয়া মজিদ

মরহুম আবদুল মান্নান তালিবের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন—

'কত না খুঁজে ফেরা তোমাকে পথে প্রান্তরে,
কভু পাই না তোমার বিরল সন্ধান,
তোমার আদল শুধু তোমাতেই মিলে।
জীবনের অলি গলি আলোকিত চিত্ত বিকাশে
ফেলেছে স্নিগ্ধ বারি সবার শিরে শিরে।
তোমার মহৎ আদল শুধু তোমাতেই মিলে।'

আবদুল মান্নান তালিবের অনুসন্ধান আমি কার কাছ থেকে প্রথম পেয়েছিলাম আজ আর তা মনে নেই। যার কাছ থেকেই পাই না কেন, তার কাছ থেকে আবদুল মান্নান তালিবের ঠিকানা নিয়ে দৌড়ালাম তাঁর বাসায়। সৌম্য শান্ত এক ভদ্রলোক। বয়স খুব একটা বেশি নয়। সে অনেক দিন আগের কথা।

যা হোক, এরপর প্রায় দেড় যুগ পরে তাঁর বাসায় আবার গিয়েছিলাম আমার উপন্যাসের একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে। সন-তারিখ আজ ঠিক মনে করতে পারছিনে। প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনার পর আমার ঢাউস উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি তাঁর হাতে গছিয়ে দিয়ে বললাম, এই বইটা ছাপাতে সাহায্য করুন।

তিনি অনেকক্ষণ পাণ্ডুলিপিটির পৃষ্ঠা উলট পালট করে দেখে স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন, বুঝতে পারছি এটা একটা উৎকৃষ্ট উপন্যাস। কিন্তু বোন, বর্তমান অবস্থায় বইটা ছাপানোর মতো সামর্থ আমার নেই।

www.pathagar.com

কেন? আমাকে নিরাশ করবেন না। অনেক আশা করে এসেছি।

একটু চুপ করে থেকে তিনি ম্লান কণ্ঠে বললেন, আমার স্ত্রীর খুব অসুখ। তাঁর চিকিৎসার পেছনে আমাকে সর্বস্ব ঢালতে হচ্ছে।

আমি হতাশ হয়ে চুপ করে রইলাম।

আপনার এত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। আমি একজন প্রকাশকের নাম বলে দিচ্ছি। তিনি তরুণ, উদ্যমী, উৎসাহী ও কৌতূহলী। আমার কথা বললে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন। এই বলে তিনি প্রীতি প্রকাশনের মালিক আসাদ বিন হাফিজের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিলেন।

আমি সালাম জানিয়ে চলে এলাম।

সেই দিনই আমি আসাদকে ফোন করলাম। আসাদও বেলা তিনটার সময় আমার বাসায় এসে হাজির। বুঝলাম ভদ্রলোক কতটা আন্তরিক!

'যুদ্ধ ও ভালোবাসা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে তিনি বললেন, বৃহৎ কলেবরের উপন্যাসের এই পাণ্ডুলিপিটি পড়তে ও সিদ্ধান্ত নিতে আমার একটা মাস সময় লাগবে, রাজী?

আমি বললাম, রাজী।

কি বিস্ময়কর ব্যাপার! আসাদ পরের দিনই আমাকে ফোন করলো। যা বললো, তা আমার মনকে এক আনন্দ অনুভবে ভরে দিল। রাজিয়া আপা, আপনার 'যুদ্ধ ও ভালোবাসা'র পাণ্ডুলিপির কৌতূহলী হয়ে রাত দশটার খাওয়া দাওয়া এবং নামাজ আদায়ের পর শুয়ে পৃষ্ঠা উলটাতে লাগলাম। কি আশ্চর্য ব্যাপার! একজন মহিলা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টরের এমন বর্ণনা, জীবন্ত, হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শীভাবে দিতে পারে যা আমার কাছে অভাবনীয় ছিল। এটা আমার কল্পনার অতীত, সমগ্র পাণ্ডুলিপির কাহিনীর অভিনবত্ব, সাবলীল বর্ণনা ও ট্রাজিক ভালবাসার অমরত্ব। ভোর পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিটি পড়লাম, শেষ করলাম। রাজিয়া আপা, এই বই ছাপানোর সমস্ত দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম, আপনার এক পয়সাও লাগবে না। আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠলো। আমি আসাদকে ধন্যবাদ জানিয়ে, দেখা করার অনুরোধ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। তাই 'যুদ্ধ ও ভালোবাসা' বইটি আলোর মুখ দেখার জন্য প্রথম অবদান আবদুল মান্নান তালিবের। দ্বিতীয় অবদান আসাদ বিন হাফিজের।

এই বইটির কাহিনী নিয়ে অনেকেই পরিষ্কার পানি ঘোলা করেছে, যাদের মন মানবিক নয়, কূপমণ্ডুকের মতো সংকীর্ণ, অনুদার এবং হিংসা ও বিদ্বেষে জর্জরিত তারা কি না বলতে পারে!

কিন্তু একজন লেখক হিসাবে আমার মন মানবিক, উদার ও দেশের সীমানার মধ্যে এবং তা ছাড়িয়ে সম্প্রসারিত এক আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগিতে পরিপূর্ণ।

বলছিলাম আবদুল মান্নান তালিবের কথা। তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের শুধু পরিচালক ছিলেন না, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন। তাঁর পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য পরিষদ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব, সত্যনিষ্ঠা ও চরিত্রের বলিষ্ঠতায় বহু

www.pathagar.com

গুণীজন বাংলা সাহিত্য পরিষদের মেম্বার ও উৎসাহদাতা। এঁদের মধ্যে সংবাদপত্র পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কুশলী প্রফেসর আবদুল গফুর, শিক্ষাবিদ ও কবি সৈয়দ আলী আহসান, নাট্যকার মরহুম আসকার ইবনে শাইখ, প্রফেসর ড. কাজী দীন মুহম্মদ, আবদুল মান্নান সৈয়দসহ আরো অনেকে। বহু তরুণ লেখক এই পরিষদের সাথে জড়িত। আরো অনেক তরুণ এই পরিষদে যোগ দেবেন বলে আমি আশা করি। অবশ্য অনেক তরুণ, মধ্যবয়সী ও বয়স্ক কবি, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এখনো বাংলা সাহিত্য পরিষদের হাল ধরে আছেন। তাঁদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ।

আবদুল মান্নান তালিব গবেষক, অনুবাদক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলো পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর তথ্য পরিবেশন, মৌলিক চিন্তাধারা, সুস্থ সাবলীল ভাষা, পরিবেশনের কৌশল সবই উঁচুদরের এবং তাঁর পারদর্শিতার পরিচয়। বিভিন্ন সাহিত্যিক-কবিদের লেখা নিয়ে সংকলন বের করার মধ্যেও তাঁর আগ্রহ ও দক্ষতার পরিচয় মেলে। সাহিত্য ক্ষেত্রে যেখানে তিনি হাত দিয়েছেন সেখানেই সোনা ফলেছে।

লেখক ও চিন্তাবিদ হিসাবে আবদুল মান্নান তালিব পুরোনো ও নতুনদের চিন্তাধারার সমন্বয়কারী। সবচেয়ে বিস্ময়কর তাঁর ইসলামী চিন্তাধারার স্বতস্ফূর্ততা। এখানে তিনি ধর্মপরায়ণ। আবেগনিঃসৃত আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পিত প্রকৃত মোমিন মুসলমান। সব মিলিয়ে আবদুল মান্নান তালিব একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্যমোদী। আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধেয় ও কৃতজ্ঞ। বাংলা সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি যেন সব সময় জড়িয়ে থাকে সেজন্য আমি নিম্নোক্ত সুপারিশ করছি : তাঁর নামে একটা গোল্ড মেডেল প্রচলন করে বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় একজন প্রকৃত গুণী লেখক, সাংবাদিক, সংগঠক যিনিই উপযুক্ত হোন, তাঁর হাতে তা তুলে দেয়া। আবদুল মান্নান তালিব সম্পর্কে রচনা প্রতিযোগিতার আহ্বান করা এবং শ্রেষ্ঠ লেখককে পুরস্কৃত করা। তাঁর লেখাসমূহের একটা স্টল অথবা আলমারি বাংলা সাহিত্য পরিষদের আফিসে রক্ষণাবেক্ষণ করা। সর্বশেষ, ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ না হলে তাঁর একটা ওয়েল পেইন্টিং ছবি অফিসে টানিয়ে রাখা এবং বাংলা সাহিত্য পরিষদে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সভ্য হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা।

আমি আমার ছ'বছরের পঙ্গু ও অসহায় জীবনের একটা আনন্দধারা দিনের কথা উল্লেখ করে আমার কথা শেষ করছি। ২০১০ সালের একটা আলো প্রদীপ্ত দিন। ফোনে খবর পেলাম, যেহেতু আমি বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের বিশাল ও আড়ম্বরপূর্ণ দিবসে আমার পুরস্কার আনতে যেতে পারিনি সেজন্য সাহিত্য পরিষদের পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা আমার বাসায় আসছেন আমার হাতে পুরস্কার তুলে দিতে। আমি আনন্দে এবং কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কতজন আসবেন?

দশজন।

www.pathagar.com

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভদ্রলোক ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বললেন, টেনশনের কারণ নেই। সব ম্যানেজড হয়ে যাবে।

উত্তর এত অস্পষ্ট ছিল যে, আমি ভয়মুক্ত হতে পারলাম না। হায়, এই অসুস্থ শায়িত জীবনের অক্ষমতা নিয়ে কেমন করে আতিথেয়তার দায়িত্ব ভালভাবে পালন করবো? নির্দিষ্ট সময়ে সবাই এলেন। অনেক দিন পরে আবদুল মান্নান তালিবকে দেখে আমার খুশির অন্ত নেই। তিনিই এই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি আমার হাতে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দিলেন। একজন সম্মাননাপত্র পাঠ করলেন। একটি সুদৃশ্য ক্রেস্ট তুলে দিলেন অন্য একজন। দশটি বৃহদাকার বই দিলেন। বাংলা সাহিত্য পরিষদের একটা ব্যাজ দিলেন। তারপরে যে খাবারগুলো দিয়ে টেবিল ভর্তি করতে লাগলেন তা দেখে আমি লজ্জায় বাঁচি না। এক বোয়েম হরলিক্স, বিস্কিট, তিন রকমের মিষ্টির প্যাকেট, নানা রকম ফল-ফলাদি, আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি। আমার তরফ থেকে আমার বড় ভাই আবদুর রউফ সিদ্দিকী ফরিদপুর থেকে যে সুস্বাদু চমচম এনেছিলেন তাই আর ঘরে বানানো মাংসের কাবাব আর এক রকমের ফল দিয়ে আমি মেহমানদের আপ্যায়িত করলাম।

কি আনন্দ, উৎফুল্লতা আর হৈ চৈ খাবার টেবিলে! কিন্তু আবদুল মান্নান তালিব সংযমী ও স্বল্পবাক। এর পরে ফটো তোলার হিড়িক।

আমার বড় ভাইও এই আনন্দে শরিক হয়েছিলেন। সাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু রাজনীতি, দেশের পরিবেশ নিয়ে কেউ একটা কথাও উচ্চারণ করলেন না। সবার মুখে কুলুপ আঁটা। আমিও এটাই চেয়েছিলাম। দিনের আলো ম্লান হয়ে আসছে। ওঁরাও বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত।

আমার মনও বিষণ্ন হচ্ছে। জীবনে আমি অনেক পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু এত সম্মান, সমাদর, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কোনদিন পাইনি।

আমি ভেবেছিলাম, আমি একটু সুস্থ হলে আবার এঁদের ডাকবো, আবার আমার ঘর, আমার জীবন সুন্দর, সংযত ও শোভনীয় আনন্দ উল্লাসে ভরে উঠবে। আবার সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যত রূপরেখা নতুন প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারবো।

কিন্তু সেই আনন্দ রূপকারের মধ্যমণি আবদুল মান্নান তালিব আজ বেঁচে নেই। কিন্তু আশা রাখি, কেউ না কেউ এই শূন্য স্থান পূরণ করবেন।

আবদুল মান্নান তালিবের জন্য আমার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন,

'তোমার কর্মের চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তোমার জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার।'

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব স্মরণে
শফীউদ্দীন সরদার

আবদুল মান্নান তালিব। এক অবিস্মরণীয় নাম। এমন একটি নাম যা বিস্মরণে যাওয়ার জো নেই। বচনে, আচরণে, জ্ঞানে ও গুণে সবাইকে মুগ্ধ করা মানুষ। তাঁর দূরদৃষ্টি, অন্তরদৃষ্টি, অনুভূতি ও উপলব্ধি এতই গভীর যে, সব সময়ই তাঁকে আমার ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বলে মনে হয়েছে।

আমি ঢাকায় থাকি না। থাকি ঢাকা থেকে বহু দূরে মফঃস্বল শহর নাটোরে। বছরে দুই তিনবার ঢাকাতে আসি আর এতই তাঁর আকর্ষণ যে, ঢাকায় এলেই সব কাজের আগে তাঁর সাথে দেখা করতে ছুটে যাই। দেখা করা আর কুশলাকুশল বিনিময় করা তো আছেই, এ ছাড়া যখনই কোন সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক অবস্থার নিদারুণ অবনতিতে ও অশনি সংকেতে হতাশ হয়ে তাঁর কাছে এসবের পরিণতি জানতে চেয়েছি তখনই তিনি প্রগাঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেছেন, ‘ইন্নাল্লাহা মা-আস্ সওয়াবিরিন।’ ধৈর্য ধারণ করুন আর আল্লাহ তায়ালার স্মরণ নিন। যা ঘটার তা ঘটবেই। ঘটন-অঘটন সব কিছু তাঁরই ইংগিতে হয়। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার শরণাপন্ন হন আর এসব মুসিবত থেকে নাজাতের জন্যে তাঁর করুণা প্রার্থনা করুন। না-উম্মিদ হবেন না। তিনিই তো আমাদের একমাত্র ভরসা।

তাঁর আল্লাহপ্রীতি আর আল্লাহভীতি দেখে আমি বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছি। তাঁর আল্লাহ প্রেম দেখলে, আল্লাহ প্রেমিক না হয়ে আর পারা যায় না।

যেহেতু আমি ঢাকায় থাকিনে, দূরে থাকি আর বছরে মাত্র দুই তিনবার ঢাকায় আসি, সেহেতু আবদুল মান্নান তালিব সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক বেশি

www.pathagar.com

কিছু আমার জানা নেই। এসব হয়ত বিশদভাবে জানেন তাঁর সহকর্মী তৌহিদুর রহমানের মতো তাঁর নিকটতম ব্যক্তিবর্গ। তাঁকে আমি বেশি জানি একজন হৃদয়বান ব্যক্তি হিসাবে। তাঁর প্রতি আমার যত টান তা প্রায় সবই আমার প্রতি তাঁর প্রীতির কারণে। তাঁর মুহব্বতের কারণে। তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও দর্শনের দিক দিয়ে এবং তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থের দিক দিয়ে চিন্তা করলে তাঁর প্রতি আকর্ষণ অন্যান্য মানুষের মতো আমারও যে প্রবল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে আবদুল মান্নান তালিবের স্নেহ ও প্রীতি আমাকে সর্বাধিক আকর্ষণ করে। তাঁর দরদের কথা আমার ভোলার অবকাশ নেই।

আমার আজও মনে পড়ে, আমি যখন দীর্ঘদিন স্কয়ার হাসপাতালে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়েছিলাম, তখন আমার গ্রন্থের প্রকাশক এই আবদুল মান্নান তালিব আমাকে দেখতে আর সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে তাঁর সহকর্মী তৌহিদুর রহমান সাহেব ও অন্য আরো দুইতিন জনকে সংগে নিয়ে স্কয়ার হাসপাতালে গিয়েছিলেন। আর না চাইতেই বিশ হাজার টাকা আমার চিকিৎসার জন্যে দিয়ে এসেছিলেন। আমার গ্রন্থের প্রকাশকদের মধ্যে আরো দু' একজন আমাকে দেখতে সেখানে গিয়েছিলেন-এটা ঠিক, কিন্তু আবদুল মান্নান তালিবই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাকে দেখতে স্কয়ার হাসপাতালে যান এবং টাকা দিয়ে আসেন।

শুধু কি এটুকুই? তিনি ছিলেন আমার লেখার অন্যতম প্রধান সমঝদার। আমার লেখা তাঁর খুবই পছন্দ ছিল। আমার একটা লেখা 'আমার ছেলেবেলার ঈদ' অধ্যাপক আবদুল গফুর সাহেব ইনকিলাব পত্রিকায় ছেপেছিলেন। সেই লেখাটা আবদুল মান্নান তালিবের এতই ভাল লেগেছিল যে, তিনি আমাকে সে সম্বন্ধে তো অনেক প্রশংসা করেছিলেনই, সেই সাথে সে লেখাটা বাংলা সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক পত্রিকাতেও ছেপেছিলেন।

এছাড়া আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত আমার প্রায় সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার 'গৌড় থেকে সোনার গাঁ' উপন্যাসটি পড়ে তিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, সবার কাছে তিনি আমার এই উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, বিশেষ করে তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের তাঁর সহকর্মী ও সাহিত্যের একজন বড় সমঝদার তৌহিদুর রহমানকে বলেছিলেন, আমার 'গৌড় থেকে সোনার গাঁ' উপন্যাসটি একটি অনন্য ও অদ্বিতীয় উপন্যাস। এত আকর্ষণীয় ও বিস্ময়কর উপন্যাস তিনি খুব কমই পড়েছেন। তৌহিদুর রহমান সাহেবকেও তিনি উপন্যাসটি পড়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন আর এসব কথা তৌহিদুর রহমানের মুখেই আমার শোনা।

অধিক কি বলবো! বাংলা সাহিত্য পরিষদের পঁচিশ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে গুণীজন সম্বর্ধনার তালিকায় বিশেষ করে এই আবদুল মান্নান তালিব আর তৌহিদুর রহমান সাহেবের প্রীতির জন্যেই আমার নামটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অন্তত এটিই আমার ধারণা।

এবার আবদুল মান্নান তালিব সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক বিষয়ের দিকে আসি। প্রথমেই বলবো, তৌহিদুর রহমান সাহেব বলেছেন 'একই সাথে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, আইন, ইতিহাস, সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য,

www.pathagar.com

কবিতা, ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিত্ব দুনিয়াতে খুব কমই আছেন।' তৌহিদুর রহমানের এ কথার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত। যদিও এসব তথ্য আমার পুরোপুরি জানা নেই, তবু আবদুল মান্নান তালিবের সান্নিধ্যে যতটুকু এসেছি, তাতে তাঁর মধ্যে এসব গুণের আভাসই আমি বার বার পেয়েছি।

এক্ষণে 'আবদুল মান্নান তালিবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' শীর্ষক একটি বিবরণ আমার হস্তগত হয়েছে। এতে যা জানতে পারছি তাতে আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হচ্ছি। এতে দেখতে পাচ্ছি তাঁর মৌলিক রচনাবলীর বিশাল এক তালিকা। সে তালিকায় দেখছি তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ ১১ খানা, সম্পাদিত গ্রন্থ ৮ খানা, শিশু কিশোর সাহিত্য ১৫ খানা, অনুবাদ সাহিত্য বই ৪১ খানা। এ সব দেখে আমি স্তম্ভিত হচ্ছি। তাঁর সাহিত্যকর্ম যে এত ব্যাপক এটা আমার কল্পনাতেও ছিল না। এই বিবরণ আমার হাতে না এলে এ সব আমি জানতেও পারতাম না। তাঁর সাহিত্যকর্ম অনেক এমন একটা ধারণার মধ্যেই আমার জ্ঞান সীমিত থাকতো।

এই বিবরণে আরো দেখতে পাচ্ছি একাধারে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, উর্দু ও ফারসি ভাষার উপরও তাঁর দখল ছিল অসাধারণ।

এই মহাজ্ঞানী মহাজন আজ আমাদের মধ্যে নেই। এই মহান ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনা করাসহ আমি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

www.pathagar.com

আমার স্মৃতিতে
আবদুল মান্নান তালিব

খোন্দকার মুহম্মদ ইউসুফ

কোন সমাজের ইতিহাস হচ্ছে সে সমাজের প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিদের ইতিহাস। কথাটি অতীব সত্য। সমাজ যেসব প্রতিভাবান আদর্শ ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সামনের দিকে ধাবিত হয় তাদের জীবন-চরিতের ভেতর দিয়ে আমরা সে সমাজকে বুঝতে পারি। জীবনকে মহান ও সুন্দর করে গড়তে হলে তাদের জীবনী আলোচনা ও গবেষণা করার কোন বিকল্প নেই। মহত্ত্ব ও প্রতিভা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনযুদ্ধে সফল, সুন্দর ও মহৎ করে তোলার জন্য আমরা মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করে থাকি, তাদের পথ, মত ও আদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করে আমরা লাভবান হই।

সমাজ একটি ব্যাপক বিষয়, এর ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে। এ স্তরগুলোর পরিমণ্ডলেই মানব জীবন পরিচালিত। মানুষ সামাজিক জীব। দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে সমাজবদ্ধ অবস্থায়ই বেঁচে থাকতে হয়। সামাজিক আইন বা অনুশাসন মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। এর মাঝে সত্য ও সুন্দর বিরাজমান। এটা সমাজে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর অনুসরণের উপরই সমাজে শান্তি ও শৃংখলা নির্ভরশীল। সমাজ সমৃদ্ধ এই দুনিয়াতে যত স্তরের সমাজ বা সমাজ ব্যবস্থাই থাকুক, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই একমাত্র মানব কল্যাণধর্মী সমাজ ব্যবস্থা। মানুষ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আর মাখলুকাতের বাধ্য গোষ্ঠীকে নামকরণ করা হয়েছে মুসলমানরূপে। আর

www.pathagar.com

তাই মুসলমানদের জন্য একমাত্র ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই প্রযোজ্য। এ সমাজের ভিত্তি কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। ভিত্তিমূলগুলো অন্তরে বিশ্বাস ও জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য এ দায়িত্ব পালন করাটা সবার জন্য সম্ভব নয়। এ কাজ একজন দ্বীনদার অগাধ জ্ঞানের অধিকারী আলেমে দ্বীন, প্রজ্ঞাবান, গবেষক, উদ্যোগী ও সহনশীল ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আজকের এই স্মরণীয় মুহূর্তে যে মহৎ ব্যক্তি সম্পর্কে আলোকপাত করছি তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আমার একান্ত শ্রদ্ধেয় মরহুম মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব। উচ্চ শিক্ষিত এই আলেম ব্যক্তি একাধারে ছিলেন একজন কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, অনুবাদক, সম্পাদক, সাংবাদিক, সংগঠক, ইসলামী চিন্তাধারার প্রাজ্ঞ বিশ্লেষক ও সফল শিশুসাহিত্যিক। স্মারণিক মুহূর্তে তাঁকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিম্নে আমার মনে পড়া কতকগুলো অনুভূতি বিবৃত করছি।

আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানের জন্য ঢাকায় এলে ১৯৬২ সালের শেষের দিকে একদিন আমার পরিচয় হয় শ্রদ্ধেয় তালিব ভাইয়ের সাথে ঢাকার কারকুনবাড়ী লেনস্থ ওরিয়েন্টাল প্রেস সংলগ্ন 'জাহানে নও' অফিসে। শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত জীবন গড়ার তাগিদেই যে কর্মসংস্থানের প্রয়োজন তা তাঁর অফিসের টেবিলের সম্মুখে বসে আলাপচারিতার সময় বিস্তারিত জানতে পেরে আমাকে আশ্বস্ত করেন এবং পরে আমাকে নিজের পাশেই রাখার বন্দোবস্ত করেন। এভাবে ওরিয়েন্টাল প্রেস ও জাহানে নও-এর সংস্পর্শে থেকেই যেন অন্ধকার ছেড়ে সমাগত আলোকচ্ছটা নজরে ভেসে ওঠে। পরে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ-এর ঢাকা শাখায় যোগদান করলে তিনি তাতে খুশী মনে সমর্থন দেননি। কিন্তু পরবর্তীতে সেখান থেকে সরকারি এক চাকুরিতে যোগদান করলে তা জানতে পেরে তিনি তাতে দ্বিগুণ খুশী হন। দোয়ায় সিক্ত করে মাঝে মধ্যে তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে আহ্বান জানান। একজন অভিজ্ঞ জ্ঞানী-গুণী আলেম ও আদর্শবান পণ্ডিত ব্যক্তির সাহচর্য থেকে কেউ কি অবহেলায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে? তাই নিছক আহ্বান উপলক্ষে নয়, স্বপ্রণোদিত হয়েই সুবিধা ভেদে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ইতস্তত করিনি। ঢাকায় যতদিন একাকী জীবন কাটিয়েছি ততদিন তো তাঁর সাহচর্য ছিল একরূপ নিয়মিতই। পরবর্তীতে বাসায় নিয়মিত লেখা শুরু করলে সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনে তাঁর কাছে ধরনা দিয়েছি। আমার এমন কোন লেখা ছিল না যা তাঁর দৃষ্টির অগোচরে প্রকাশ পেয়েছে। শিরোনাম থেকে শুরু করে আঙ্গিকের ভাব-ভাষা, তত্ত্ব-তথ্য, সংযোজনা, ভুল-ত্রুটিসহ আনুষঙ্গিক দিকগুলো তাঁর স্পর্শ সাধনেই সাধিত হয়েছে।

অতীব আন্তরিক, অশেষ অমায়িক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিটির কাছে সম্ভাব্য এমন কোন ব্যাপার ছিল না, যা আমার জন্য উন্মুক্ত বা অবারিত ছিল না। মনে পড়ে একবার ফুরফুরার শয্যাশায়ী মেজ হুজুর পীর কেবলার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় কলকাতার কোনখানে

www.pathagar.com

অবস্থানের জন্য আভাস দিলে তিনি একখানা হাতচিঠি দিয়ে যাবতীয় করণীয় বাতলিয়ে দিলেন। সুখের বিষয়, ফুরফুরা ঘুরে এসে কলকাতার যথাস্থানের যথার্থ ব্যক্তির হাতে তা পৌঁছালে সবাই যেন ঘনিষ্ঠজন তালিব সাহেবকেই পেলেন মনে করে আমাকে আদর-আপ্যায়ন করলেন। উল্লেখ্য যে, সেখান থেকেই সেদিন মরহুম তালিব সাহেবের পারিবারিক পরিচয় সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলাম। কলকাতার এখানে সেখানে এক সপ্তাহ নিরাপদে কাটিয়ে ইসলামিক বুক সেন্টার সংলগ্ন আস্তানা ছেড়ে আসার সময় মরহুম তালিব ভাইয়ের স্পর্শিত আমার প্রথম বই 'ইসলাম জীবনের আলো' সংগ্রহের আহ্বান জানিয়ে পরিচালক সাহেবের দেয়া কয়েকটি সৌজন্য কপি নিয়ে স্বদেশে চলে আসি।

মনে পড়ে উদার, নিস্বার্থ ব্যক্তিটির কথা। একবার তাঁর মীরপুরের বাড়ি বিক্রি করার সময় অন্যত্র তা দেখাশুনা, দামদস্তুর শেষে কারো সাথে চুক্তি হওয়ার আগে আমাকে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক খুঁটিনাটি উল্লেখপূর্বক অন্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে হস্তান্তর করার কথা বলেছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে তা নেয়া সম্ভব হয়নি।

পরিচয়ের সময় থেকে যেভাবে তিনি আমাকে অন্তরে ঠাঁই দিয়েছিলেন, সেভাবে সব সময় বা সব ক্ষেত্রেই আমাকে অনুভব করতেন। কর্মক্ষেত্রের বাইরে আমার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার পরিমাপে কখনও কোন সুযোগ এলে যথারীতি তা করে দিয়েছেন। মনে পড়ে, দু'বার দু'টি প্রকল্প ঠিক করে আমার উপর ভারার্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় মাঝপথে এসে থামতে হয়েছিল। এতে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তবে তাতে তাঁর কোন ক্ষতি কিংবা কোন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়নি বলেই ছাড়াটা সহজ হয়েছিল। কোন কোন অনুষ্ঠান কিংবা কোন ঘনিষ্ঠজনদের বাসায় তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছে। আর এসব সুযোগ কাজে লাগিয়েছি নিজস্ব কোন সমস্যার সমাধান কল্পে। এতেও তিনি কখনও বিরক্ত বোধ করেননি, বরং এক ফাঁকে তা সেরে দিয়েছেন। তখন অপারগ হলে পরবর্তী সময় বেঁধে দিয়ে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অধিকাংশ কাজ তথ্যমূলক। সে কাজে আনন্দ পেতেন বলেই শত ব্যস্ততার মাঝেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলম ধরেছেন। ভাষা সংক্রান্ত আমার এক লেখার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তা তাঁর সম্পাদিত বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ছাপার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সানন্দে তা গ্রহণ করি। এই প্রবন্ধটি প্রকাশনাই ছিল তাঁর সাথে আমার লেখনী জগতের শেষ সম্পর্ক।

মুসলিম মৌলিক বিষয়াবলী বাংলা ভাষায় রূপান্তর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ পণ্ডিত। তাঁর ইসলামী সমাজকেন্দ্রিক চিন্তা-চেতনা, সাহিত্য সাধনা সত্যিই আমাদেরকে চমৎকৃত করেছে। তাঁর মতো সহজ, সরল, নিরলস, নিরহংকার ও পরহেজগার ব্যক্তি বর্তমান সমাজে বড়ই অভাব। তাঁর মহান চারিত্রিক গুণাবলী অন্য সবার মতো আমিও প্রত্যক্ষ করতে পেরে মুগ্ধ হয়েছি। মনে করি, এমন একজন সর্বগুণের অধিকারী ব্যক্তির মৃত্যুতে মুসলিম সমাজে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হবে কিনা সন্দেহ। তিনি যে একজন

www.pathagar.com

আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তা তাঁর সাথে নামাজে এক্তেদার মাধ্যমে অনুভব করতে পারি। এককভাবে কিংবা ছোটখাট জামাতে যে অবস্থায়ই শামিল হয়েছি রুকু ও সিজদায় একমাত্র হাফেজ্জী হুজুর ছাড়া আর কাউকে এমন দেখিনি। তিনি অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাঁর বাসায়ই হোক কিংবা কোন অফিসে, কাউকে কখনও খালি মুখে ফিরতে হয়নি। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন বিনয়ী, স্বল্পভাষী, স্বল্পভোগী, অল্পেতুষ্ট, দৃঢ়চেতা ও মুক্তমনের মানুষ।

দুঃখের বিষয়, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে স্বাস্থ্যগত ও যোগাযোগের বিড়ম্বনায় আমার আর দেখা হয়নি। হঠাৎ একদিন 'আমার দেশ' পত্রিকার শোক সংবাদের কলামটি সব কিছু স্তব্ধ করে দেয়। এটা আমার জীবনের একটি নির্মম দিক। এজন্য নিজেকে চিরদিনের জন্য পরাজিত ভাবব। সবশেষে এই স্মারণিক মুহূর্তে মরহুম মাওলানা আবদুল মান্নান তালিবকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর তিরোহিত জীবনের মাগফিরাত কামনাসহ সুখ-শান্তিময় সর্বশ্রেষ্ঠ বেহেশত জান্নাতুল ফিরদাউস আরজ করছি।

www.pathagar.com

আমার শুভাকাঙ্ক্ষী 'তালিব ভাই'

মোহাম্মদ সা'দাত আলী

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই বলতে গেলে তিনি আমাকে লেখালেখিতে নিয়মিত প্রাণিত করতেন। শুধু বলতেন, সমাজের জন্য লিখে যান, চিন্তার সুস্থ বিকাশ ইনশাআল্লাহ ঘটবেই। তিনি আমার লেখা অনেক প্রবন্ধ কিংবা অনুবাদ অথবা অন্যান্য লেখা ছেপেছেন তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায়। তখন মাসিক 'নতুন কলম' ও মাসিক 'পৃথিবী'তে লিখি। আমার লেখা পেলে কখনও নিয়মিত অথবা কখনও সামান্য বিরতিতে ছাপতেন। এভাবেই লেখায় নিয়মিত হই। তাঁর হাতে আমার অনেক লেখা সম্পাদিত হয়েছে, বিশেষ করে 'বিশ্বসাহিত্যে নোবেল বিজয়ী' তাঁর সম্পাদনাতেই নিয়মিত বেরুতো। পরের দিকে পত্রিকাটি দেখতেন বন্ধু মতিউর রহমান মল্লিক। মল্লিক ভাই চলে গেছেন গত বছর, তালিব ভাই চলে গেলেন আজ। আমিও একদিন চলে যাব। এখন হৃদ রোগের মোকাবেলায় চিকিৎসকের অধীন ওষুধ সেবনে ব্যস্ত। আল্লাহ যেন আমাকে ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করেন। আমীন!

আবদুল মান্নান তালিব ইন্তিকাল করেন বৃহস্পতিবারে। খুব দামি একটি দিন। যখন দাফন সম্পন্ন হবে ততক্ষণে শুক্রবার এসে যাবে। মুরব্বিদের কাছে শুনেছি, বৃহস্পতি ও শুক্রবার কারও মৃত্যু হলে 'আলা' দরোজা লাভ করেন। হে আল্লাহ, তালিব ভাইয়ের জন্য আপনি উঁচু দরোজা মঞ্জুর করুন। আমীন!

www.pathagar.com

তালিব ভাই আমার বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা খুব পছন্দ করতেন, বিশেষ করে যতদূর মনে পড়ে, আশির দশকে হবে, সৃজন প্রকাশনী সংস্থার ব্যানারে প্রকাশিত তাঁর 'হাতিসেনা কুপোকাত' গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত একটি গল্পের সমালোচনায় কিছু ঐতিহাসিক অসঙ্গতি ধরিয়ে দিলে, যদিও ছোট ভাই আনোয়ার (পরিচিতজনের কাছে 'পাগলা' বলে খ্যাত) ক্ষিপ্ত হয়েছিল, কিন্তু তালিব ভাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এরপর তাঁর সকল বই আমাকে পাঠিয়ে দিতেন যেন পড়ে একটু আলোচনা করি। ১৬.৯.২০১১ তারিখে সংগ্রাম সাহিত্য পাতায় তালিব ভাইয়ের পাশাপাশি আমার উপরও একটি লেখা প্রকাশিত হয়। আমি আজ সেজন্য তৃপ্ত ও গর্বিত, তালিব ভাইয়ের পাশে আমার অবস্থান! তার দু'দিন পর মল্লিক ভাইকে স্বপ্নে দেখি। তালিব ভাই ও মতিউর রহমান মল্লিক ছিলেন দরাজদিল, মতনিরপেক্ষ, পাক্কা মুসলমান, অসম্ভব ঈর্ষামুক্ত ও পরোপকারের চিন্তায় মশগুল। আমার বয়োকনিষ্ঠ বন্ধু ডাক্তার বুলবুলও তালিব ভাই ও মল্লিকের গুণমুগ্ধ শিষ্য।

আজ এই দিনে দু'জনের আত্মার মুক্তির জন্য স্রষ্টা সমীপে দোয়া করছি। হে সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমাদের সকলের সকল দোষত্রুটি ক্ষমা করুন।

আমীন!

www.pathagar.com

স্মৃতিতে ভাস্বর তুমি
ফজলুল কাদির

এমনটিই শুনেছি : হরিণ তার নিজের নাভিতে জন্ম নেয়া কস্তুরীর গন্ধে বিমোহিত হয়ে কোথা থেকে গন্ধ আসছে বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ায়। হরিণ না বুঝুক অন্যরা তার গন্ধ পায় অনায়াসে। 'আপনাতে আপনি বিভোর' হয়ে তিনি অস্থির না হলেও অন্যদের মতো তাঁর সাহিত্য-কস্তুরীর সুগন্ধ আমরা তখন পেতে শুরু করেছি।

তখন আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগে কাজ করি। ততদিনে অনেক লেখক-কবির সঙ্গে পরিচিতি পর্ব শেষ হয়েছে। কারণ তাঁদের আনাগোনা আমাদের কাছে বেশি! সেটা এ কারণে, কোনো লেখক, কবি বা গবেষকের কোনো পাণ্ডুলিপি প্রকাশনার জন্য নির্বাচিত হলে তার প্রকাশের দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাতো। সে সুবাদে তাঁরা আসতেন প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে।

তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে আবদুল মান্নান তালিব সাহেবের নাম উচ্চারিত হতে শুনে কান খাড়া করলাম। তাঁর নাম আলোচনার মধ্যে প্রায়ই এসে যেত। সাহিত্যাঙ্গনে তিনি যে একজন কেউকেটা হবেন, ততদিনে সেটা ভেবে নিয়েছি। নিশ্চয়ই কুরআন-হাদীসের গবেষণা কর্মে তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যে এমন কিছু অবদান রয়েছে যার সুনামের সুবাস কস্তুরীর মতোই সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে।

বছর, মাস বা দিন-তারিখ, এমন কি কোন্ মাহেন্দ্র ক্ষণটিতে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ তার কিছুই আমার স্মরণের কোণটায় বন্দী করে রাখতে পারিনি।

www.pathagar.com

একজন মধ্যম উচ্চতার মানুষ, সে তুলনায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নন। মাথায় চমৎকার কুঞ্চিত ঘন কৃষ্ণ কেশদাম। অনুচ্চ স্বরে কথা বলায় অভ্যস্ত। কথার পুনরাবৃত্তি কম। শতভাগ মনোযোগ না দিলে তাঁর কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা যে কারুর পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। সূত্র ধরতে না পারলে পরবর্তী কথায় অনর্থক মাথা নাড়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

কথাবার্তায় ঋজু। কোনো কথা গুরুত্ববহ হলে জোর দিয়ে সেটুকু বলেন। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে তাঁর অনায়াসলব্ধ স্বচ্ছন্দ গতি লক্ষ্য করার মতো। জ্ঞানের 'ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' থাকলে যেখানে যেটুকু প্রয়োজন, তা অবলীলায় বেরিয়ে আসে তা থেকে। সে রত্নের সমুদ্রে তরী বাওয়া যে কারুর পক্ষেই বেশ কঠিন!

প্রকাশনার কাজে নানাভাবে ব্যস্ত থাকার কারণে ফাউন্ডেশনে তাঁর আসা-যাওয়ার খবরটি হয়ত রাখতে পারিনি। হয়ত এসেছেন। নির্দিষ্ট কাজটুকু সেরে চলে গেছেন। এমনও হতে পারে, ব্যস্ততা দেখেছেন, কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে এমন আশংকায় এদিকে আর পা বাড়াননি। হাফেজ মইনুল ইসলাম (মরহুম), কবি ও কার্টুনিস্ট শেখ তোফাজ্জল হোসেন বা আমাকে নিরিবিলি দেখলে আসতেন। তোফাজ্জল ভাইয়ের আলাপচারিতায় রসিকতা থাকলেও তার মধ্যে সশ্রদ্ধ ভাব থাকত। 'আসুন, কোথায় ছিলেন তালিব ভাই'-এর বেশি ছিল না।

যতদূর মনে পড়ে এরপর তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবধানটা বিরাটই হবে। এক যুগেরও বেশি। পল্টন থেকে একেবারে কাছেই গবেষণা পত্রিকা মাসিক 'পৃথিবী' ও 'কলম'-এর অফিসে যাওয়া হয়নি কখনও। কবি ও প্রখ্যাত ছড়াকার সাজজাদ হোসাইন খানও সেখানে তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন।

এরপর মগবাজারে ডাক্তারের গলিতে বাংলা সাহিত্য পরিষদের অফিস তখন। নিয়মিত সেখানে তখন সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হতো। শাহেদ আলী ভাই, গফুর ভাই (ফিচার সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব), সানাউল্লাহ নূরী ভাই, কবি আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শাহাবুদ্দীন আহমদ ও আরো অনেকেই নিয়মিত সেখানে যেতেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ সাহিত্যের প্রশিক্ষক হিসেবে বাংলা সাহিত্য পরিষদে ক্লাস নিতেন। সেখানে কার্যব্যপদেশে মগবাজারে একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াতে সময় ও সুযোগ দু'টোই মিলে গেল। আমার একজন সহকর্মীর মাধ্যমে কবি ও লেখক জনাব তৌহিদুর রহমান-এর সঙ্গে পরিচিত হলে তিনি হঠাৎ করে বাংলা সাহিত্য পরিষদে একদিন ডাকলেন। অফিসে এলে তালিব ভাইয়ের চেম্বারেই ডেকে নিয়ে গেলেন তৌহিদ ভাই। ভাবলাম, বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালকের চেম্বার! সুসজ্জিত তো নিশ্চয়ই। ঢুকে দেখেই যা আমাকে হতবাক করল, তা হলো একেবারেই সাদামাটা একটা রুম। যেটাতে বসেন, সেটা একটা কাঠের চেয়ার। মেহমানদের বসবার জন্যেও কাঠের চেয়ার। নিজেই তিনি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট! সম্ভবত একটা সাধারণ তোয়ালে তাঁর পেছনের দিকে। কাজের ফাঁকে বিশ্রামের জন্য একটা আরাম কেদারাও নেই। সামনে কাঠের একটা টেবিল। তার দু'পাশেই বই আর পত্র-পত্রিকা

www.pathagar.com

স্তূপীকৃত। পেছনে ও পাশে দু'তিনটি আলমারিতে বই ঠাসা। মেঝেতেও স্থানাভাবে বই এমনভাবে রাখা। রুমটি একেবারে নিরাভরণ ও নিরাড়ম্বর। এমনটিই তাঁর সাদাসিধে অন্তরের প্রতিচ্ছবি কিনা।

এতকাল পরে দেখা! কিন্তু চেহারায় তেমন কোন পরিবর্তনের ছাপ নেই। সেই ঘন কৃষ্ণ কেশদাম! প্রায় তেমনই আছে। মুখের সেই স্মিত হাসিটি মিলিয়ে যায়নি। তৌহিদ ভাইয়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার হয়ত প্রয়োজন ছিল না। হেসে উঠে দাঁড়িয়ে মুসাফাহা করে বসলেন চেয়ারে। বললেন, বসুন।

সবকিছুর মধ্যে একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ল। তাঁর কথায় স্পষ্টতা নেই। কথা বলতে গিয়ে আটকে যান মাঝে মাঝে। অনুচ্চ স্বরে কথা বলার অভ্যাসটা আছে এখনও আগের মতোই। কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। তবে এখন কথা একটু থেমে থেমে বলেন। পুনরাবৃত্তি করেন খুব কম। Preoccupied মন নিয়ে কথা বলেন। তার ফাঁকে কোনো কথা বলার সুযোগ থাকে না! শুনে যেতে হয় এবং তা অবশ্যই শোনার মতো। এতে শ্রোতার কোনো আফসোস থাকে না এ কারণে যে, যে তথ্য ও ইতিহাসনির্ভর কথাবার্তা বলেন, তা অনেকেরই জানা নেই। ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি যে কোনো বিষয়ে এমন স্বচ্ছ ও বিস্তৃত ধারণা এবং এমন সুষমামণ্ডিত পাণ্ডিত্যের পরিচয় খুব কম ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায়। আমি আগের মতোই মুখোমুখি হয়েছি তাঁর। জ্ঞানের মহাসমুদ্রের কল্লোল তাঁর কথায়। কান পেতে শুনতে হয়। বুঝতে হয়। জ্ঞানের গভীরতায় এখন তিনি আরও প্রশান্ত।

বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনায়াস বিচরণে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য দেখে সত্যি অবাক না হয়ে পারা যায় না। উঠি বলে উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়েছি। আচ্ছা, আর একটু শুনে যাই। এমনটি হয়েছে বহুবার। আকর্ষণটা এমনই ছিল। অফিস থেকে 'এই আসি' বলে মৌখিকভাবে ছুটি নিয়ে সে সময় কোনোদিন রক্ষা করতে পারিনি।

মাঝে মাঝে গিয়ে দেখতাম, নিবিষ্ট মনে বিশাল এক পাণ্ডুলিপির উপর প্রায় উপুড় হয়ে কলম চালাচ্ছেন, সম্পাদনা করছেন। তাঁর ব্যস্ততা দেখে ফিরে যেতেই হেসে বলে উঠতেন, আরে! যাচ্ছেন কোথায়? বসুন।

আপনাকে এ সময় বিরক্ত করতে আসা ঠিক হয়নি। নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন!

হ্যাঁ, ঠিক তাই। 'ইসলামী আইন ও বিচারে'র পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে কাজ করছি।

একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তাঁর মধ্যে কখনও কূপমণ্ডুকতা ছিল না। ইসলামকে তিনি শুধু ধর্ম হিসেবে দেখেননি, মৃত্যুর কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'ইসলাম যে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, জীবন থেকে আলাদা কোন বিষয় নয়, বরং জীবনের সমস্ত বিষয়গুলোই ইসলামী সাহিত্যের অঙ্গ।' বলা বাহুল্য এ দর্শনই ছিল তাঁর জীবন দর্শন এবং তা শুধু কথায় নয়, তাঁর রচনায় সৃষ্টিশীলতার সাথে যে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন, তা তাঁর সাহিত্যকে করেছে চিরায়ত।

www.pathagar.com

ছয়-সাতটি ভাষায় দক্ষতা ছিল তাঁর। ফলে বাংলা ও উর্দু পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। সহীহ আল-বুখারী (৪র্থ খণ্ড), রিয়াদুস সালেহীন, আবু দাউদ (৭ম খণ্ড) মুসলিম শরীফের অনুবাদ ও সম্পাদনা ছাড়াও 'ইসলামী দৃষ্টিতে জীবনবীমা' ও 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' ইত্যাদির মতো কঠিন বিষয় নিয়ে কাজ করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রজ্ঞারই পরিচয় দেয়। তাঁর লেখার বিষয়ও ছিল বিচিত্রগামী। তাঁর শিশু কিশোরদের নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। লেখার কলেবর বৃদ্ধি পাবে বলে সেগুলোর উল্লেখ করা হলো না। একজন সার্থক অনুবাদক, গবেষক, কবি ও শিশু সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এক কথায় তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই সব্যসাচী।

জাতি তথা সমাজ জীবনকে নিয়েই তাঁর সাহিত্য আবর্তিত। জাতি হিসেবে মুসলিম সমাজের এক স্বতন্ত্র দিকের নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেছেন, 'আচার-আচরণে, চলাফেরা, উঠাবসায়, কথাবার্তায়, আহারে-বিহারে ও দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে শব্দাবলীর ব্যবহার, সামাজিকতা ও অনুষ্ঠানাদি পালনে ও জীবনবোধ নিয়ে আমাদের একটি স্বতন্ত্র জাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করেও মুসলিমরা তাদের আপন পৃথক সত্তা কখনই বিলীন করে দেয়নি। এই ধর্মীয় সত্তাই আমাদের মূল্যবোধের উৎস। এ কারণে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আমরা গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি করতে পেরেছি।'

জাতি হিসেবে মৌলিক স্বাতন্ত্র্যের একটা ভিন্ন উপলব্ধি ঘটালেন তিনি আমাদের মধ্যে। এ মতাদর্শ তাঁর কথায় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'কেবল রাজকার্য পরিচালনায় নয়, আমাদের আকীদা, বিশ্বাসে ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজকর্মে তৌহিদী বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপনে খোদা, ইলাহ, মাবুদ, রব, মালিক, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি শব্দরূপ গ্রহণ করেছে। উপবাস ও অনশন ব্রত রূপ নিয়েছে রোজা বা সিয়াম শব্দে। তীর্থযাত্রার পরিবর্তে হজ্জ পালন শব্দের প্রচলন হয়েছে। দান-খয়রাত, সদকা, জাকাত ইত্যাদি শব্দাবলী মুসলমানদের অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ পরিচিতি বহন করছে।'

যাঁরা ইসলামী চিন্তাবিদ, তাঁরা সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী– এমন খুব কমই দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিতব্য বার্ষিক সংকলনের জন্যে তৌহিদ ভাইয়ের কাছে 'হৃদয়ঘটিত' নামে একটা গল্প জমা দিলাম। তৌহিদ ভাইকে আগে থেকেই বলে রাখলাম, সম্ভবত গল্পটা সংকলনে নাও ছাপা হতে পারে। কারণ এতে দৈহিক স্পর্শের কথা আছে, অথচ গল্পে তা বাস্তব কারণেই এসেছে।

তৌহিদ ভাই বললেন, গল্পটা জমা দিন আগে। লেখার চূড়ান্ত নির্বাচন তো তালিব ভাইয়ের হাতে! দ্বিধা-সংশয় নিয়ে জমা দিলাম গল্প। ভাবলাম, লেখা তো ছাপা হবেই না, মাঝখান থেকে তালিব ভাইয়ের সমালোচনা শুনতে হতে পারে। এ ধরনের লেখা না লেখার জন্যে অনুৎসাহিত করতে পারেন। তৌহিদ ভাই হেসে বললেন, প্রথম বিবেচিত হয়েছে আপনার গল্পটিই।

www.pathagar.com

এবার আমার সত্যিই অবাক হওয়ার পালা! কারণ এমন ধরনের লেখা যে তালিব ভাইয়ের হাতে ছাড়পত্র পেয়ে প্রকাশিত হবে এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমার যতদূর মনে হয়, জীবন বাঁচানোর ওজর হিসেবে তিনি এ সম্পর্ককে অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন। (হৃদয়ঘটিত, বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা)।

আসলে তালিব ভাই ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন সংস্কারমুক্ত মনের মানুষ। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামসম্মত চিন্তা-চেতনার দিক থেকে ছিলেন আধুনিক। আমি আরও একটু বাড়িয়ে বলতে চাই, তিনি ছিলেন অত্যাধুনিক। মুক্ত মনের মানুষ তাঁকে বলতেই হবে। 'মন্ত্রী সাহেব' নামে একটা ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলাম। সেটা ছিল মন্ত্রীদের নিয়ে কট্টর সমালোচনা। একাধিক পত্রিকায় সেটা ছাপার জন্যে দিলে সম্পাদকরা কবিতটি প্রকাশে অসম্মতি জানান। কী ভেবে বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার জন্য জমা দিলাম। যথারীতি তা ছাপা হলো। সম্পাদক হিসেবে এমন সাহসী সচেতন নির্ভীক মনোভাব কারুর মধ্যে আমি দেখিনি।

গতানুগতিক চিন্তার ঘেরাটোপের মধ্যে আড়ালে তিনি কখনই থাকেননি। নিত্য নতুন চিন্তা-চেতনা নিয়ে সে ঘেরাটোপের বাইরে চলে আসতেন। আলাপ-আলোচনার অন্তরঙ্গতার মধ্য দিয়েই তাঁর জ্ঞানের দুয়ারগুলো খুলে যেত। আমিও দেখতাম তাঁর ভাণ্ডারে 'বিবিধ রতন'। যে কেউ যে কোনো ধরনের, যার যা প্রয়োজন, জ্ঞানের নুড়ি কুড়িয়ে নিতে পারে সেখান থেকে।

কুরআন-হাদীস থেকে আহরিত উদ্ভাসিত মরমী চিন্তা, গবেষণা, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা তাহজীব-তামাদ্দুন চর্চাপ্রসূত স্বচ্ছ প্রতীতি ও মাসলা-মাসায়েলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফয়সলা– কী নেই তাঁর ভাণ্ডারে!

যে কোন সংজ্ঞায় ফেলে যে কোনোভাবে বিশ্লেষণ করলেও তাঁকে কোনো অবস্থাতেই বিতর্কিত করা যাবে না। পংকিল মতবাদ তথা সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে শুদ্ধ মনের মানুষ তিনি। প্রকৃত অর্থেই একজন মুক্ত বুদ্ধির মানুষ, একজন আলোকিত মানুষ!

তাঁর সম্বন্ধে একটা ভাবনা আমার মধ্যে ঘুরপাক খেত। একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দোল খেতাম। এই যে তাঁর কাছে বসে আলোচনা শুনছি, এই যে জ্ঞানের মণিমুক্তাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছেন, তা তো একদিন কালের আবর্তে হারিয়ে যাবে। তাহলে এগুলো ধরে রাখার উপায় কি? এ চিন্তা মাথায় রেখেই একদিন তালিব ভাইকে বলেই ফেললাম, তালিব ভাই, আপনি autobiography লিখুন। আপনার লেখা আত্মজীবনী থেকে অনেক অজানা বিষয় জানতে পারব। সঙ্গে সঙ্গে তৌহিদ ভাইও সমর্থন দিলেন।

আমি বললাম, আমি আপনার সামনে টেবিলে বসেই আপনি যা বলবেন, লিখে নেব। তৌহিদ ভাই টেপ রেকর্ডারের কথা উল্লেখ করলেন। দু'জনেই বললাম, পরে এটা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে।

সম্মতি-অসম্মতি কিছুই বোঝা গেল না। হ্যাঁ-না কোন কিছুই বললেন না তিনি। এ ভুলটা অনেকেই করেছেন। শেরে বাংলা এ.কে.

www.pathagar.com

ফজলুল হক তাঁর autobiography লেখা শুরু করেছিলেন অনবদ্য ইংরেজিতে, তার দু' একটা অধ্যায় পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল। আমি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তখন তা পড়েছি। শুরুতেই শেষ হলো— আর লিখলেন না শেরে বাংলা। আমি বলব, একটা অনুদ্ঘাটিত ইতিহাসের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল চিরতরে। বাংলাদেশীরা ইতিহাসের ইতিহাস জানতে পারল না। অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে গেল। হোসেন শাহেদ সোহরাওয়ার্দী সম্বন্ধে একই কথা। আরও অনেকেই যাঁরা ছিলেন ইতিহাসের নায়ক, তাঁরাও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করেছেন। তালিব ভাইয়ের বেলায়ও তাই হলো। আমার মতে এটা হলো, ইচ্ছে করেই যেন নিজের ইতিহাসের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। সে দরজা খুলবে কে?

তৌহিদ ভাই একদিন বললেন, যাবেন?

বললাম, কোথায়?

তালিব ভাইয়ের বাসায়।

চলুন বলে উঠে বসলাম রিকসায়। তালিব ভাই অফিসে আসতে পারেননি বলে অফিসের কিছু জরুরি কাজ বাসায় বসে করে দিলেন। জরুরি কাজ সেরে আলাপ-সালাপের পর উঠতে যাব এমন সময় এসে গেল ট্রে-ভর্তি নাস্তা। এত কিছু এর মধ্যে তৈরি হয়েছে আমাদের জন্যে! সম্ভবত ট্রেতে একসঙ্গে আনা সম্ভব হয়নি বলে পরে দু'হাতে করে তস্তুরীভরা নাস্তা এলো। তালিব ভাই বললেন, নিন। খেতে থাকুন। আমরা খেলাম। কিন্তু নিজে কিছুই খেলেন না।

অসুস্থতার কথা শুনে তৌহিদ ভাইয়ের সঙ্গে আবার গেলাম তাঁর বাসায়। কষ্ট করে উঠে এলেন। যথেষ্ট দুর্বল। খাওয়া-দাওয়া তেমন করতে পারেন না। গলার স্বর ক্ষীণতর। কথা শেষে উঠতে যাব। তালিব ভাই বললেন, বসুন।

এমন সময় তাঁর ছেলে নাস্তা নিয়ে হাজির। এবার অন্য সবের মধ্যে আছে কাঁঠাল। একটা বড় প্লেটে একটা প্রমাণ সাইজের কাঁঠালের প্রায় অর্ধেকটাই ভেঙ্গে আনা হয়েছে।

তৌহিদ ভাই বললেন, কাঁঠালের সময় তো শেষ! কাঁঠাল পেলেন কোথায়?

পাওয়া গেল আর কি? এই ধরনের একটা কথা বললেন তালিব ভাই।

ভাবলাম দু'একটা কোয়া খাব আর কি?

সরস কাঁঠালের সুমিষ্ট কোয়া। আর একটা খাই, আর খাব না করতে করতে দু'জনে মিলে সাবাড় করে দিলাম সব। দু'জনের জন্যে যে নাস্তা আনা হয়েছে, তাতে চারজন পেট পুরে খেতে পারে।

অতিথিবৎসল হিসেবে তাঁকে ডিঙিয়ে যাবার মতো তেমন কাউকে আমি দেখিনি।

বাসা থেকে রিকসায় যাওয়া-আসা করতেন তিনি অফিসে। জনশ্রুতি আছে, রিকসাওয়ালার সাথে ভাড়া নিয়ে তিনি দর কষাকষি করতেন না কখনও। ভাড়া যা চাইত, তাতেই তিনি সম্মতি দিয়ে স্মিত

www.pathagar.com

হেসেই রিকসায় উঠে বসতেন। বেশি চাইলেও হয়ত আপত্তি করতেন না। অথচ ভাড়া ঠিক না করে আমরা রিকসায় কখনই উঠিনে, এমন কি ভাড়া কম দেওয়ার প্রবণতা আমাদের মধ্যে কাজ করে। ব্যবধানটা তাঁর সঙ্গে আমাদের এখানেই!

আমার ও তৌহিদ ভাইয়ের মধ্যে আলোচনার একটাই বিষয়বস্তু হতো এবং খুবই গুরুত্ব নিয়ে তা আমরা আলোচনা করতাম। এর রূঢ় বাস্তবতার দিকটা ভেবে স্বীকারোক্তিমূলক উক্তিটা এটাই হতো: তালিব ভাইয়ের স্থানটা পূরণ করার মতো কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না! খোদা না খাস্তা উনি চলে গেলে আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে যে vacuum সৃষ্টি হবে তা পূরণের মতো সব্যসাচী কোথায়? এক কথায় তাঁর মতো একজন versatile genius এমন সফল জ্ঞানতাপস পাওয়া দুষ্কর!

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে vacuum যে সৃষ্টি হবে তা আমরা আন্দাজ বা কল্পনাও করতে পারিনি। একদিন তালিব ভাইয়ের শারীরিক অবস্থা এখন কেমন জিজ্ঞেস করতেই তৌহিদ ভাই বললেন, তালিব ভাই হাসপাতালে।

হাসপাতালে?

হ্যাঁ। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এখন অনেকটা ভাল।

শুনে আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু উৎকণ্ঠা গেল না।

অফিস থেকে বাসায় এসে এনটিভির টেলপে প্রচারিত সংবাদে দেখি তালিব ভাই আর নেই।

তৌহিদ ভাই কথায় কথায় তাঁর সম্পর্কে এক অভাবনীয় কথা বললেন, তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে তিনি নিজেই ভবিষ্যত বাণী করে গিয়েছিলেন। যেদিন বলেছিলেন, ঠিক তার বারো দিন পরে তিনি চলে গেলেন।

এ আশ্চর্য আধ্যাত্মিক রহস্যময় অজানা জগতের খবর আমরা রাখব কি করে? আত্মশুদ্ধির এক চরম উৎকর্ষের সাধনা সবার অন্তরালে অগোচরে যা তিনি করেছিলেন, সে নিভৃতচারীর অসাধারণত্বের সন্ধান আমরা কখনই পাইনি। দৃষ্টি স্থূল আমাদের। তবে সে জগতের বাইরে থেকে সাধারণ মানুষ হিসেবে এটুকুই বলতে পারি, এমনতর সাধনালব্ধ অসামান্য অলৌকিক অস্তিত্বের ঘোষণা শুধু তাঁর মতো তাত্ত্বিক পুরুষই দিতে পারেন।

সব দিকে তিনি তাঁর মসী শাণিত তরবারির মতো ক্লান্তিহীন শ্রান্তি হীনভাবে চালনা করে এসেছেন। সাহিত্যাঙ্গনে আগাছা নির্মূলে আজীবন নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন এবং ইসলামের রোশনিতে তা উদ্দীপ্ত হয়েছে। তবে তাঁর উত্তরসূরি নিশানবরদারকে তো আমরা দেখছিনে!

রসূলুল্লাহ সা.-এর সময় গজওয়া (ধর্মযুদ্ধ) হতো। রসূলুল্লাহ সা. যখন নিজে গজওয়ায় যেতেন না, তখন তিনি অন্যদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাতেন। তাঁর অধীনে আরও কয়েকজনকে নিশানবরদার করে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা করিয়ে দিতেন। যুদ্ধে প্রথম সেনাপতি শহীদ অথবা জখম হলে তাঁর জখমী হাত, এমন কি নিশান ধরা কর্তিত হাত থেকে দ্বিতীয় জন নিশান

www.pathagar.com

নিজের হাতে নিয়ে অসমসাহসী ও অকুতোভয় হয়ে সমরাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি শহীদ হলে অপরজন নিশানবরদার হতেন। সেনাপতির চেয়ে সৈনাপত্যের কঠিন দায়িত্ব পালন সেখানে প্রাধান্য পেত। এমনিভাবে তাঁরা ইসলামে চিরন্তন সুমহান প্রেরণায় উজ্জীবিত হতেন এবং অসত্য ও জুলুমের বিরুদ্ধে আপসহীন এক অদম্য ঈমানী জোশ তাঁদের স্পন্দিত দেহমনে এমনভাবে আলোড়িত হতো যে, চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন।

পদানুবর্তী সাহিত্য ও পরজীবী অপসংস্কৃতি আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বকীয়তাকে ধীরে ধীরে কুরে কুরে গ্রাস করে ফেলছে। তার এই রাহুগ্রাসকবলিত আগাছা নির্মূলে সৎ সাহিত্যের তীক্ষ্ণধার তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসবেন এমন আছেন কোন্ সেনাপতি? সে নিশানবরদার হবেন কে?

কোথায় তিনি?

না, আপাতত তেমন কাউকে আর দেখছিনে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার
অতন্দ্র সৈনিক
মোহাম্মদ মোরশেদ আলী

সুসাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন দেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র সৈনিক। তাঁর ইন্তেকালের দু'দিন আগে তাঁর বাসায় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি বিছানায় শায়িত ছিলেন। আমি তাঁর কানের কাছে যেয়ে বললাম, আমাদের জন্য কিছু নসিহত করুন। তিনি প্রথমত বললেন, 'আমার জন্য দোয়া করবেন যেন ভালভাবে যেতে পারি।' এরপর বললেন, 'স্বাধীনতা শেষ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করুন। স্বাধীনতার জন্য লিখুন।' তাঁর এই কথা আমার নিকট এক বিরাট আমানতস্বরূপ। এজন্য দেশবাসীর কাছে তা প্রকাশ না করে পারলাম না। তিনি কর্ম জীবনে লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। খুব সম্ভবত আধিপত্যবাদী ভারতের কাছে বর্তমান সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে তিনি এমন মন্তব্য করে থাকতে পারেন। ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া, ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ সম্পর্কে যথার্থ পদক্ষেপ না নেওয়া, ভারতের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনে সরকারের সীমাহীন নীরবতা পালন খুবই দুঃখজনক, এমনকি কিছু দিন আগে বাংলাদেশে ভারতবিরোধীদের নাম উল্লেখ করতে যেয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আমাদের দেশের প্রধান একটি ইসলামী সংগঠনের নাম উল্লেখ করা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নগ্ন হস্তক্ষেপের শামিল। তবে কি বর্তমান সরকার আধিপত্যবাদী শক্তির নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের

www.pathagar.com

প্রতি মিথ্য মামলা দিয়ে এ সংগঠনকে ধ্বংস করতে চাইছেন? আমরা শতকরা একশ' ভাগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কৃত মামলাসমূহের অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবি করছি। যে কোন দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটলে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। গণতন্ত্রই স্বাধীনতার প্রাণ-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখে। দেশে সরকার কর্তৃক ইসলামী দলগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকার চরমভাবে খর্ব করার ঘটনাও আবদুল মান্নান তালিবকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন একজন আদর্শ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠক। যে কোন আন্দোলনের মতো সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্যও আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। বাংলা সাহিত্য পরিষদের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে তিনি তাঁর এ চেতনাকে যথার্থভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, '৪৭-পূর্ব যুগে কলকাতার 'মোহমেডান লিটারারী সোসাইটি' এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ নির্মাণে যে ভূমিকা পালন করেছে, আবদুল মান্নান তালিবের গড়া বাংলা সাহিত্য পরিষদ সে ভূমিকা বলিষ্ঠভাবে পালন করবে। তিনি আজ না বেঁচে থাকলেও তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য লেখক ও সাংস্কৃতিক কর্মী তৈরির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন। এজন্য তিনি 'শিহাব শিল্পীগোষ্ঠী' গঠন করেন এবং 'স্টেশন মাস্টার' নামে একটি ভিডিও নাটক নির্মাণে যথার্থ ভূমিকা রাখেন। শিহাব শব্দের অর্থ হলো 'স্ফুলিঙ্গ'। তিনি আশা প্রকাশ করেন ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ ইনশাল্লাহ দেশে ও বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে।

আমি তাঁর ইন্তেকালের দু'দিন আগে তাঁকে এ প্রশ্নও করেছিলাম, কি করে ঈমান মজবুত রাখা যায়। তিনি বলেছিলেন, বেশি করে কুরআন পড়ুন, বিশেষ করে তাফ্হীমুল কুরআন। তাঁর এ নসিহত ইসলামের সাংস্কৃতিক কর্মী থেকে শুরু করে সব ধরনের কর্মী ও দায়িত্বশীলের জন্য অনুসরণীয়। আমরা মহান আল্লার কাছে তাঁর রূহের মাগফিরাত ও তাঁর রেখে যাওয়া ইসলামী সাহিত্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

www.pathagar.com

তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কিছু স্মৃতি

অধ্যক্ষ মাওলানা আ.ন.ম. আবদুশ শাকুর

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূলগণের আগমনের সিলসিলাহ বন্ধ হয়েছে সর্বশেষ নবী ও রসূল হযরত মুহাম্মদ স.-এর আগমনের মাধ্যমে। হাদীস পাকে এসেছে, দুনিয়ায় মানব জাতিকে হেদায়াতের পথে আনার জন্য নবী ও রসূল আগমনের সিলসিলাহ বন্ধ হলেও প্রতি শতকের শিরোভাগে এক বা একাধিক মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক দুনিয়াতে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন, যাঁদের কাজ হলো, ইসলামের নামে ইসলামে প্রচলিত অনৈসলামী, শিরক ও বিদ্‌আতি কার্যকলাপ চিহ্নিত করা, যাতে করে মানুষ জানতে পারে, 'কোন্‌টা ইসলাম আর কোন্‌টা ইসলাম নয়।'

এজন্য প্রতি শতকে যাঁরা তাজদীদের বা সংস্কারের কাজে নিয়োজিত থাকেন তাঁরা তাঁদের অনুসারীদের নিয়ে একটি School of Thought গড়ে তোলেন। ইমাম আযম র., ইমাম মালেক র., ইমাম শাফেয়ী র., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র., ইমাম ইবনে তায়মিয়া রহ., ইমাম গাজ্জালী রহ., ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ.-সহ তাজদীদকারী সকল ইমামই তাঁদের অনুসারীদের নিয়ে এক একটি School of Thought গড়ে তোলেন, যাতে করে তাঁদের সংস্কারের কাজগুলো তাঁদের অনুসারীরা এগিয়ে নিয়ে যায়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের মুজাদ্দিদ, আওলাদে রসূল সা. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহ. একজন 'মুজতাহিদে মুত্বলাক' ও

www.pathagar.com

'মুজাদ্দিদে জামান' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ইসলামী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী রাজনীতির বিষয়ে ইজতিহাদ ও রাজনীতি চর্চার সংস্কার, নতুন নবুওয়াত দাবিকারীদের বিরুদ্ধে 'খতমে নবুওয়াত' বিষয়ে ইজতিহাদ ও কঠোর বিরোধিতার মাধ্যমে তা রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নতুন নবুওয়াত দাবিকারীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা, নতুন নবুওয়াতের ধারণা রদ করা— এজন্য তাঁকে ফাঁসির মুখোমুখী হতে হয়েছিল। 'মুনকেরীনে হাদীস' বা হাদীস অস্বীকারকারীদের মতবাদকে রদ ও রহিতকরণ, জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ— এসবের পর্যালোচনা-সমালোচনা করে এসব বিজাতীয় মতবাদ উৎপাটন করে তার দুর্বলতা তুলে ধরে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করা, বিজাতীয় বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা এবং তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা ও কার্যকর করার ব্যবস্থা করা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বিষয়ে ইজতিহাদ ও সুদবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থার ধারণা উপস্থাপনাসহ এবং এসব বিষয় বাস্তবায়নের জন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামীকরণ নিয়ে একটি যুগান্তকারী ধারণা পেশ করে সর্বত্র ইসলামায়নের ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শরীয়তের শাসন ব্যবস্থা কায়েমের অর্থাৎ কুরআনী শাসন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনে তাঁর চিন্তাধারা ও তৎভিত্তিতে ইসলামী আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার জন্যে একটি School of Thought গড়ে তোলেন। বিশ্বের দেশে দেশে তাঁর অনুসারী আলেমে দ্বীন ও ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটি School of Thought.

বাংলাদেশে মাওলানা মওদূদীর রহ. উক্ত আন্দোলনের পতাকাবাহী আলেমে দ্বীনগণকে নিয়ে যে School of Thought গড়ে ওঠে, তার অন্যতম জ্যোতিষ্ক হলেন আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব। তিনি মাওলানা সাইয়েদ মওদূদীর রহ. যোগ্য উত্তরসূরি একজন আলেমে দ্বীন ও ইসলামী চিন্তাবিদ। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। তাফহীমুল কুরআন, সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ বহু হাদীস গ্রন্থ ও বহু ইসলামী গ্রন্থ অনুবাদ করে এবং প্রকাশিত-অপ্রকাশিত বহু গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে তিনি ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এক উচ্চতম পজিশন করে নিয়েছেন। প্রচারবিমুখ এই মহান সাধকের জীবনই কেটেছে ইসলামী সাহিত্য রচনা, অনুবাদ ও গবেষণার ক্ষেত্রে নীরব সাধনায়। আমি আমার কয়েকটি স্মৃতি এখানে পেশ করছি।

মাওলানা মওদূদীর রহ. 'তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য' প্রসঙ্গে

কুরআনের শাসন সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা না পাবার কারণে এই দেশের আলেমে দ্বীনগণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। ফলে তারা দীনহীন আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছেন ও হচ্ছেন। এর ফলে তারা সরকারি-বেসরকারি বা ক্বওমী

www.pathagar.com

ধারার মাদরাসার সিলেবাসটুকু বাদে কর্মজীবনে আরও ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করতে পারেন না। ফলে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা ও তাদের মুহতারাম উস্তাদগণের প্রভাব অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তদুপরি এদেশের আলেম সমাজ ব্যাপকভাবে ভারতের দেওবন্দ দারুল উলুম মাদরাসার চিন্তাধারায় প্রভাবিত হবার কারণে এবং ইসলাম ও মুসলিম শাসনবিরোধী ইংরেজ শাসনের নির্যাতন ও চাপে রাজনীতিবিমুখ হয়ে পড়েছিলেন। সে কারণেই ইসলামী রাজনীতি বা কুরআনের শাসন কায়েমের আন্দোলন কি তা তারা বুঝতে সক্ষম হননি। বিশ্বে ইসলামী শাসন ও মুসলিম শাসনের পরে দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসন ও তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা থেকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ধারণাও লোপ পেয়ে যায়। এ দীর্ঘ সময় বিধর্মীয় শাসনের পর এমতাবস্থায় উনবিংশ ও বিংশ শতকের মুজাদ্দিদ আওলাদে রসূল মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর রহ. আগমন ঘটে। বিজাতীয় শাসনের পরিবর্তে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী তাঁর আহ্বানে ইসলামী আন্দোলন তৎভিত্তি স্বরূপ কুরআন পাকের তাফসীরকে 'আহকামুল কুরআন' বা 'একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান' হিসেবে উপস্থাপন করাটা এক ব্যাপক ইসলামী বিপ্লবের সূচনা কর্ম ছিল। মাওলানা মওদূদীর রহ. এই প্রভাবশালী তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে আহকামুল কুরআনের ব্যাখ্যা ও ইসলামী রাজনীতি চর্চার বিষয়টি বিগত শতকে রাজনীতিবিমুখ আলেম সমাজের একাংশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি। ফলে তাঁরা ব্যাপকভাবে এই তাফসীরের সমালোচনায় লিপ্ত হন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁরা এই তাফসীর পড়ে দেখার পরিবর্তে বেহুদা সমালোচনায় রত থেকে অন্যকেও পড়তে নিষেধ করেন এবং প্রচার করেন যে, এটা মাওলানা মওদূদীর রহ. মনগড়া তাফসীর বা 'তাফসীর বির রায়'! এ অবস্থা দেখে মানুষের ভুল ধারণা দূরীকরণার্থে আমি মাওলানা মওদূদীর রহ. তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' নিয়ে আশির দশকে ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় 'তাফসীর করার মূলনীতি ও তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য' শিরোনামে গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। ঐ প্রবন্ধগুলো ধারাবাহিকভাবে ঢাকার 'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ নিয়ে ঐ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করে আমি তা দেখাবার জন্য আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব স্যারের কাছে যাই। তিনি সানন্দে, খুবই উৎসাহ সহকারে এই গবেষণা কর্মটি গ্রহণ করে নিরীক্ষণ করে দেন এবং আমার অনুরোধে ১৩.০১.১৯৯০ তারিখে একটি সারগর্ভ ও মূল্যবান ভূমিকাও লিখে দেন। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

'মানুষকে দুনিয়ায় সৃষ্টি করার পর তার হেদায়াত দানের ব্যবস্থা আল্লাহ নিজেই করেছেন। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জনবসতিতে নবী পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে নবীগণ এনেছেন সহীফা, পুস্তিকা বা কিতাব, বড় বড় গ্রন্থ। শেষ কিতাব কুরআন মজীদ। তাহলে বুঝা

www.pathagar.com

যাচ্ছে, কুরআন মজীদ উম্মতে মুসলিমার জন্য হেদায়াত গ্রন্থ। শুধু ঘরে বসে আদবের সাথে এ কিতাবটি পড়ে সওয়াব কামাবার জন্য একে পাঠানো হয়নি, বরং মুসলমানরা এই কিতাব থেকে তাদের জীবনের পথনির্দেশ লাভ করবে। মুসলমান তাদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র এই কিতাবের নির্দেশ অনুসারে গড়ে তুলবে অর্থাৎ এটি একটি ব্যবহারিক কিতাব। এটি পড়া, এর অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা, এর চর্চা করা, এর অর্থ নিয়ে গভীর তাত্ত্বিক গবেষণা করার প্রয়োজন রয়েছে। এ সব কিছু হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। নিজেই নিজের মনের মতো একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে তাকে কেন্দ্র করে কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার মধ্যে তাত্ত্বিক গবেষণা করার কোন অবকাশই নেই। তাই কুরআনের অর্থ গ্রহণ এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি শুরু থেকেই চলে আসছে। সাহাবা, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও পরবর্তী মুসলিম মনীষীগণ এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। আজো এ পদ্ধতি সর্বজনগৃহীত। কুরআন থেকে কুরআনের অর্থ গ্রহণ করা, সুন্নাতে রসূল থেকে কুরআনের অর্থ গ্রহণ করা, সাহাবা ও তাবেঈগণের 'আসার' তথা বক্তব্য থেকে কুরআনের অর্থ গ্রহণ করা এবং সর্বশেষ কোনো শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ তিনটি সূত্রের অনুপস্থিতিতে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে শব্দের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করা, মোটামুটি এই ছিল কুরআনের অর্থ গ্রহণ করার সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি। এ পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নিজের মনগড়া কোনো অর্থ করার রীতি কুরআনের ব্যাপারে স্বীকৃত নয়।

'কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহ. এই রীতিরই অনুসরণ করেছেন। তাঁর বহুল পরিচিত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন এক্ষেত্রে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রচলিত পদ্ধতিতে কুরআনের শব্দ ও আয়াতগুলোর অর্থ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি এমনভাবে করেছেন যার ফলে এটি একটি জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও সচল গ্রন্থ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে তখন যাঁরা এর মহান অনুসারী ছিলেন তাঁদের সামনে যখন এর আয়াতগুলো নাযিল হচ্ছিল, তাঁরা যেমন জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন, একটি চিরন্তন সত্যের লক্ষ্যে জীবনকে ধাবিত করার প্রেরণা লাভ করেছিলেন, তাফহীমুল কুরআনের পাঠকের সামনেও ঠিক তেমনি চিত্র ফুটে ওঠে, তার মধ্যে তখন শুধু একজন পাঠকের নয়, একজন কর্মীর প্রাণময়তা সক্রিয় হয়ে ওঠে, এই ধরনের প্রাণময়তা সৃষ্টি করার জন্যে তিনি প্রেক্ষাপট পরিবেশ ও ইতিহাসকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। মোটকথা কুরআন নাযিলের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ ছিল তাফহীমুল কুরআন সেই উদ্দেশ্য সাধনে এবং সেই লক্ষে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এখানেই এই তাফসীর গ্রন্থটির সার্থকতা। এ কারণে চলতি শতকে দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের যেসব তাফসীর হয়েছে তাফহীমুল কুরআন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

www.pathagar.com

'তাফহীমের রচয়িতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী রহ. দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের উপমহাদেশের নির্দিষ্ট কিছু আলেমের বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। দুঃখের সাথে বলতে হয়, মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর নিজের রায় ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কোথাও অস্পষ্টতার আশ্রয় নেননি। এছাড়াও তাঁর দাবি হচ্ছে, কোনো নতুন রায় সাধন করার ক্ষেত্রে কোথাও তিনি একাকী নন, তাঁর সাথে হয় কোনো সাহাবীর অথবা অন্ততপক্ষে কোনো তাবেঈর মতের আনুকূল্য রয়েছে। এ ছাড়াও সমালোচকদের যুক্তিসম্মত ও ন্যায়সংগত প্রশ্নগুলোর জবাবও তিনি দিয়েছেন।

'কুরআন তাফসীরের মূলনীতি ও তাফহীমুল কুরআনের বৈশিষ্ট্য' গ্রন্থের আলোচনাও মাওলানা মওদূদীর রহ. কুরআনি জ্ঞান এবং তাঁর কুরআন বুঝাবার পদ্ধতি যে আল্লাহ ও রসুলের স. উদ্দেশ্যের অনুসারী তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। ইসলামী জ্ঞান, সাধনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাফহীমুল কুরআন যে একটি অনন্য অবদান এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে যে কোনো পাঠকই তা অনুধাবন করতে পারবেন। এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করে মাওলানা আ.ন.ম. আবদুশ শাকুর বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের কাছে কুরআনের একটি অনন্য ও হৃদয়গ্রাহী তাফসীর গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এটি মিল্লাতের একটি ইল্‌মী ও দ্বীনী খিদমত হিসেবে গণ্য হবে।' (আবদুল মান্নান তালিব, শান্তিবাগ, ঢাকা, তাং-১৩.০১.৯০ ইং)।

বইটি চট্টগ্রাম থেকে জানুয়ারি ১৯৯০ ইং সনে প্রথম প্রকাশিত হয়ে এ জাতীয় বিতর্কের অবসানে অবদান রেখেছিল। এই বইয়ের ভূমিকা নিতে গিয়ে আল্লামা তালিব স্যারের সাথে আমার পরিচয় ও হৃদ্যতা হয়। আমার মতো একজন নগণ্য ব্যক্তির প্রতি তাঁর এই স্নেহ-মমতার বিষয়টিকে আমি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।

মাওলানা মওদূদীর 'লন্ডনের ভাষণ' প্রসঙ্গে

প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর আগের কথা। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তখন ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের মুজাদ্দিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহ.-এর 'লন্ডনের ভাষণ' নামক পুস্তিকাটি নিয়ে এখানকার অনেক আলেমে দ্বীন বিশেষভাবে সমালোচনামুখর ছিলেন। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে ও বক্তৃতায় এই পুস্তিকাটির বিভিন্ন বাক্য উদ্ধৃত করে মাওলানা মওদূদীর রহ. কঠোর সমালোচনা করতেন, এমনকি তিনি রসূলের স. বংশধর হওয়া সত্ত্বেও মাওলানা মওদুদী রহ.-কে এজন্য নবী- ওলী বিদ্বেষী হিসেবে দোষারোপও করতেন। 'লন্ডনের ভাষণ' পুস্তিকাটি লন্ডনের একটি পত্রিকায় মাওলানা মওদূদী রহ.-এর একটি ভাষণরূপে সংক্ষিপ্তাকারে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। তিনি এ ভাষণে ইহুদী ও খ্রিস্ট ধর্মীয়দের উদ্দেশ্যে নাজিলকৃত কুরআনের আয়াতসমূহ তুলে ধরে তাদের ধর্মীয় ভুল ধারণাগুলো উপস্থাপন করে সে বিষয়ে ইসলামের দিকনির্দেশনা কি তা তুলে ধরেন, যাতে করে তারা তাদের ভুল ধারণাগুলো শুধরে নিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আসতে পারে। এটা ছিল

www.pathagar.com

তাঁর দাওয়াতী কাজ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক আখতার ফারুক বাংলায় এই ভাষণটি অনুবাদ করেন। ঐ ভাষণটিই পত্রিকা থেকে বাংলায় অনূদিত হয়ে 'লন্ডনের ভাষণ' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা থেকে অনুবাদের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত ঐ ভাষণটি কুরআন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে না জানা কোন পাঠক যদি পড়েন, তখন তার মনে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণত খটকা লেগে যায়, অথচ যে বাক্যটি নিয়ে পাঠকের মনে খটকা লাগছে তা কিন্তু মাওলানা মওদূদী রহ.-এর কোন বক্তব্য নয়। তা ছিল কুরআনেরই বিভিন্ন আয়াতের অনুবাদমাত্র, যা মাওলানা মওদূদী রহ. 'ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপ', লন্ডনে প্রেরিত তাঁর লিখিত ভাষণে উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। মূল ঘটনা হল ১৯৭৬ সালে লন্ডনের বিখ্যাত 'বার্মিংহাম প্যালেসে' তিন মাসব্যাপী 'আর্ন্তজাতিক ইসলামিক কনফারেন্স ও প্রদর্শনীর' আয়োজন করা হয়। বিশ্বের বড় বড় ইসলামী স্কলাররা তাতে যোগ দেন, বক্তব্য দেন, প্রবন্ধ, গবেষণা উপস্থাপন করেন। তখন মাওলানা মওদূদী রহ. অসুস্থ ছিলেন, তিনি পাকিস্তানের লাহোরে নিজ বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। দাওয়াত থাকা সত্ত্বেও তিনি অসুস্থতার কারণে লন্ডনের ঐ ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি। তিনি তাঁর ভাষণটি লিখে লন্ডনের ঐ সম্মেলনে প্রেরণ করেন। তখন বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের অগ্রনায়ক মুহতরাম অধ্যাপক গোলাম আযম লন্ডনে ছিলেন। মাওলানা মওদূদীর রহ. লিখিত ভাষণটি ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৬ ইং তিনি ঐ সম্মেলনে পড়ে শোনান।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐ বিতর্ক দেখে আমি মাওলানা মওদূদীর রহ. মূল ভাষণটি তালাশ করতে থাকি। এক সময় ঐ ভাষণটির উর্দু নোস্‌খাটি যা ইউরোপ সফরে প্রদত্ত মাওলানা মওদূদীর রহ. বিভিন্ন ভাষণের সংকলন গ্রন্থ 'খোত্ববাতে ইউরোপ' নামক গ্রন্থটি আমার বন্ধু চিকদাইর, রাউজান, চট্টগ্রামনিবাসী মাওলানা মাহবুবুল আলম থেকে পেয়ে যাই। মূল ভাষণটির নাম 'ইসলাম কিছ চীজ্ কা আলম বরদার হ্যায়?' অর্থাৎ 'ইসলাম কি চায়?' ঐ উর্দু সংকলনটি পেয়ে আমি তার যথাযথ অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। মাওলানা মওদূদীর রহ. ভাষণটির বক্তব্যের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহও উদ্ধৃত করি এবং ঐ আয়াতসমূহের তরজমা ও উদ্ধৃত হাদীসের অংশগুলোর তরজমাও পেশ করি। কারণ মাওলানা মওদূদী রহ. তাঁর ঐ ভাষণটির প্রতিটি বাক্যই কুরআনের আয়াত ও হাদীসে রসূলের ভিত্তিতেই উপস্থাপন করেন। ঐ ভাষণটির সম্পাদিত রূপটি ১০৮ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থে পরিণত হয়। ঐ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিটি নিয়েই আমি আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব স্যারের শান্তিবাগের বাসায় যাই। তাঁকে এই পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে একটি ভূমিকা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ করি। তিনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আমার ঐ পাণ্ডুলিপিটি নিরীক্ষণ করে দেন এবং একটি সুন্দর ও জ্ঞানগর্ভ ভূমিকাও লিখে দেন। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'নিজের ধর্মকে প্রত্যেকেই সঠিক মনে করে। এ জন্য অবশ্যি তার কাছে কিছু যুক্তি-প্রমাণ আছে। যুক্তি-প্রমাণ না থাকলে নিজের ধর্মের উপর টিকে থাকতে

www.pathagar.com

পারতো না। তবে অন্যের যুক্তি-প্রমাণগুলো সামনে এলে নিজেরটা যাচাই করার সুযোগ পায়। ইসলাম এদিক দিয়ে এক অনন্য ধর্ম, মতবাদ ও দীন। ইসলাম এসেছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য। তাই সে তার যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্যগুলো সবার জন্য সমানভাবে গ্রহণীয় করে তুলেছে। এটা একমাত্র ইসলামের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো ধর্ম নিজেকে সমগ্র মানবতার জন্য গ্রহণীয় বলে দাবিও করেনি এবং এভাবে নিজের যুক্তি-প্রমাণগুলোও তৈরি করেনি। ইসলামের এ যুক্তি-প্রমাণগুলো যুগোপযোগী করে মানুষের সামনে তুলে ধরাই ইসলামের আহবায়কের অন্যতম দায়িত্ব।

'বিশ শতকে মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে গেছেন। 'মওলানা মওদূদীর লন্ডনের ভাষণ' বইটি তারই একটি চমৎকার নমুনা। ১৯৭৬ সালে লন্ডনে অমুসলিমদের দেশে ইসলামের প্রতি বৈরী এক পরিবেশে অমুসলিমদের সামনে তাদের জন্য গ্রহণীয় করে তিনি ইসলামের এ দাওয়াতটি পেশ করেন। এখানে ইসলামের যে মর্মবাণী ও গভীর তত্ত্ব তিনি তুলে ধরেছেন তা ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস তথা আল্লাহ ও রসূলের সরবরাহ করা জ্ঞানভাণ্ডার থেকেই গ্রহণ করেছেন। মুসলিম দেশে ইসলামের জন্য অনুকূল পরিবেশে মুসলিম পাঠকের কাছে এই জ্ঞানভাণ্ডারের গুরুত্ব রয়েছে। 'ওয়া আদ্নাহুম ঈমানাওঁ ওয়া আলা রাব্বেহীম ইয়াতাওয়াক্কালূন'– এটা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা আল্লাহর উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারে।

'অনুবাদক ও সম্পাদক মওলানা আ.ন.ম. আবদুশ শাকুর মওলানা মওদূদীর আলোচনাটিকে মুসলিম পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার জন্য মূল বক্তব্যের সাথে সাথে কুরআন ও হাদীসের তথ্যসূত্রগুলোও পরিবেশন করেছেন। এর ফলে বইটির মূল্য ও উপযোগিতা কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। ইতিপূর্বে মূল ভাষণটি 'লন্ডনের ভাষণ' নামে প্রকাশিত হয়ে অমুসলিমদের জন্য যে আত্মিক খোরাক যুগিয়েছে বর্তমানে কুরআন ও হাদীসের তথ্যসমৃদ্ধ এর বর্ধিত রূপ 'মওলানা মওদূদীর লন্ডনের ভাষণ (ইসলাম কি চায়)' বইটিও মুসলিমদের জন্য একই পর্যায়ে আত্মিক ও মানসিক খোরাক যোগাতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।' (আবদুল মান্নান তালিব, শান্তিবাগ, ঢাকা, তাং-২০.০৯.৯০ ইং)।

বইটি বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মাহবুবুল হক স্যারের শতদল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে ২১ অক্টোবর ১৯৯০ প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশের পরে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ভাষণ নিয়ে বিতর্ক অনেকটা কমে যায়। এ বইটির নিরীক্ষণ নিয়েই তাঁর সাথে আমার দেখা ও জানাশোনা। আল্লামা তালিব স্যারের এই স্নেহ ও প্রীতির জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ।

'গল্পমালা' প্রকাশ প্রসঙ্গে

তিনি আমাকে বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকার সাধারণ সদস্য করে নেন। আমি আমার লিখিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিনে প্রকাশিত

www.pathagar.com

বিভিন্ন গল্প সংগ্রহ করে 'গল্পমালা' নাম দিয়ে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে প্রকাশের জন্য 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে' তাঁরই নিকট জমা দিয়েছিলাম। তিনি ঐ বই প্রকাশের জন্য সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন এবং আমাকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত আমি সময়ের অভাবে আর যোগাযোগ করতে পারিনি। ফলে এই বই আর প্রকাশিত হয়নি। ঐ পাণ্ডুলিপিটি বাংলা সাহিত্য পরিষদেই রক্ষিত আছে। আমার অসহযোগিতার কারণে তা প্রকাশিত হতে পারেনি। এ জন্য আমি লজ্জিত। এর পরেও তিনি আশ্বাস দেন, যখনই সম্ভব হবে তখনই এই 'গল্পমালা' প্রকাশিত হবে। আমার প্রতি তাঁর এই অপত্য স্নেহের জন্য আমি শ্রদ্ধাবনত।

ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য

তিনি ছিলেন অসাধারণ জ্ঞানী ও পণ্ডিত। বাংলা, উর্দু, হিন্দি, আরবি, ফারসি, ইংরেজিসহ সাত আটটি ভাষা তাঁর আয়ত্তে ছিল। ঢাকায় এলেই সময় পেলে তাঁর সান্নিধ্যে যেতাম এবং কিছু সময় কাটাতাম। একদিন সন্ধ্যায় কাজ সেরে বাংলা সাহিত্য পরিষদের পূর্ব ঠিকানার অফিসে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। মাগরিবের সময়। তালিব স্যার নামাজে ইমামতি করতে বললেন। বললাম, 'আমি মুসাফির।' তিনি বললেন, 'মাগরিবের নামাজে কসর নেই।' ইমামতি করলাম। নামাজ শেষে দেখলাম বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ পাশের কক্ষে বসে বসে লিখছেন। আশেপাশে অনেকেই চুপচাপ বসে ছিলেন। সবাই মান্নান সৈয়দ স্যারকে অত্যন্ত সম্মান দেখাচ্ছেন। আমিও স্যারকে সালাম করে পরিচিত হবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন।

যা হোক, আমি তালিব স্যারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম। কিছু বই খরিদ করলাম, চলে এলাম। কিছুদিন পর ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকের সাপ্তাহিক সাহিত্য পাতায় অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হলো। কুরআন পাকের আমপারার কয়েকটি সূরার কাব্যরূপ। কবিতাগুলো পড়ে আমি কেঁদেছিলাম। কবিতার শব্দ চয়ন, বাক্য, ছন্দ, ভাব, ভাষা দেখে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, কুরআন যদি বাংলা ভাষায় নাজিল হত, তাহলে কি এ রকমই হতো? এ কবিতাগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে এ ধরনের দুর্দান্ত প্রতিভাকে প্রভাবিত করে কুরআনের দিকে টেনে আনার কাজটুকু তালিব স্যারের সাহচর্যের কারণেই সম্ভব হয়েছে। আজ তাঁরা দু'জনেই আমাদেরকে এতীম করে চলে গেছেন মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে। মহান আল্লাহ তা'আলা উভয়কে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমীন!

ইসলামী চিন্তা-চেতনার আধুনিক সংস্কারক

তালিব স্যার, মাওলানা মওদূদী রহ.'র বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন ও সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইবনে মাযাসহ বহু

www.pathagar.com

হাদীস গ্রন্থ সহজ সাবলীল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনুবাদ কর্মগুলোর মধ্যে আরেকটি আরবি কিতাবও ছিল। 'তাহরীরুল মারআ ফী আসরির রিসালাহ' (১৯৯২)। 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' নামক গবেষণামূলক বিশাল কিতাবটি। আমি তালিব স্যারকে দেখতে গিয়ে তাঁর নিকট সব সময়ের মতোই জানতে চাইলাম, 'এখন আপনার কি লেখা চলছে?' তিনি বললেন, 'তাহরীরুল মারআ ফী আসরির রিসালাহ (১৯৯২)' বা 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' নামক মিশরের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুজতাহিদ আল্লামা আবদুল হালিম আবু শুক্কাহর লিখিত গবেষণামূলক কিতাবটির কাজ করছি। জানতে চাইলাম, 'এর খণ্ডগুলো সবই কি প্রকাশিত হয়েছে?' তখন শুধু ৩য় খণ্ড (১৯৯৪), ১ম খণ্ড (১৯৯৫) ও ২য় খণ্ড (২০০২) প্রকাশিত হয়েছে এবং ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের পথে। IIFSO তা প্রকাশ করে। তিনি দুঃখ করে বললেন, 'দুঃখ হয়, আমাদের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বাকি খণ্ডগুলো প্রকাশে ভিন্ন মত প্রকাশ করছেন। ফলে বাকি খণ্ডগুলো প্রকাশে দেরি হতে পারে। কারণ তাঁরা মনে করছেন এই গ্রন্থ পড়ে আমাদের সমাজের নারীরা অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি করতে পারে, তাই।' আমি বললাম, 'আল্লাহর রসূল স. নারীদেরকে যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য আদেশ করেছেন ও সুযোগ রেখেছেন, তা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের আছে কি?' তিনি বললেন, 'এ কথা তাঁদের বোঝাবে কে? তাঁরা তো আমাদের ইমামগণের এক দলকে সমর্থন করেই বসে আছেন। একটি আধুনিক ইসলামী দলের নেতারা যদি এ রকম চিন্তাধারা পোষণ করেন তাহলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে তখন কি অবস্থা হবে ভাবুন তো?' তাঁর এই চিন্তা-চেতনা ভবিষ্যতে জাতিকে সত্যিই পথ প্রদর্শন করে অগ্রবর্তী করবে। এতে বোঝা যায় তিনি কত বড় সংস্কারমূলক চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক ছিলেন।

আরবি সাহিত্যের মহাউৎকর্ষের যুগে এক প্রভাবশালী কাব্যময় আরবি গদ্য ভাষায় কুরআন পাক নাজিল হয়। তাই ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কুরআন পাকের ঐ প্রভাবশালী ভাষাও একটি মুযেজা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কুরআনের প্রচার-প্রসারের জন্য অন্য ভাষায় এর অনুবাদও গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাংলা ভাষা চর্চার জন্য আল্লামা তালিব স্যার অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তিনি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত উপন্যাসও সাবলীল বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর অন্যতম হলো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাকিস্তানের উর্দুভাষী ঔপন্যাসিক নাসিম হিজাযীর 'প্রত্যয়ের সূর্যোদয়' (২০০০), 'ভারত যখন ভাঙলো' (২০০২), 'অপরাজিত' (২০০৩)-সহ আরও বেশ ক'টি উপন্যাস। বাংলা সাহিত্য চর্চায় মূল্যবোধ ও তাঁর উপাদান বর্ণনা করে তিনি লেখেন 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান (১৯৮৪)' সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর অন্যতম গবেষণা হলো 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' (১৯৯১)-সহ আরও কতিপয় গ্রন্থ।

www.pathagar.com

আমি অনেক পড়াশুনা করে কোন কোন বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করতাম। আমি আমার বিষয়টি উপস্থাপন করতেই তালিব স্যার যে আলোচনা শুরু করতেন তা শুনে মনে হত আমার চিন্তা-চেতনা যেখানে শেষ তালিব স্যার সেখান থেকেই শুরু করেছেন। তিনি অনেক এগিয়ে। তিনি আমাকে আধুনিক বাংলা ভাষা শেখার জন্য কলকাতার 'দেশ' পত্রিকা পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন। কারণ লিখতে হলে ভাষার বিশুদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব স.-কে মক্কায় যে যুগে প্রেরণ করেন সে সময় ছিল আরবি ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। নবী স. এসে সে যুগে মোহনীয়রূপে কুরআনের ভাষাকে পেয়েছেন এবং তাঁর কথা ও ভাষা ছিল সর্বযুগের জন্য সহজ, সরল, আকর্ষণীয়— যা একান্ত অনুকরণীয়। তালিব স্যার ছিলেন মহানবী স.-এরই ইলমের সুযোগ্য ওয়ারিশ। তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আরও অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহ বলা যায়, যা সাহিত্যপ্রেমীদের অনুকরণীয়। তিনি একাধারে মহান আলেমে দ্বীন, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুজতাহিদ বা গবেষক, অনুবাদক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, শিশু সাহিত্যিক, সম্পাদক, প্রবন্ধকার, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক, বহু ভাষাবিদ, হাদীসের ভাষ্যকার, সুবক্তা, সংগঠক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং এছাড়া সাহিত্য-সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনার জগতে অনেক দিক ও বিভাগে তাঁর সাবলীল বিচরণ ছিল। তাঁর চিন্তা-চেতনা ছিল ইসলামের ভিত্তিতে ব্যাপ্ত, যা আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর ভাষা সহজ সরল সাবলীল, আকর্ষণীয় ও মোহনীয়, চিন্তাধারা প্রভাবশালী ও জ্ঞানসমৃদ্ধ। কারও চিন্তা-চেতনাকে সহজে ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারে ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। তাই নির্মোহ ধ্যানী এই ব্যক্তিত্ব– জ্ঞান বিস্তারে ব্যাপক প্রভাবশালী হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করেছেন। তাঁর রচিত ও অনূদিত প্রকাশিত অপ্রকাশিত প্রায় শতাধিক গ্রন্থ তাঁর জীবনে চিন্তার সংস্কারে জ্ঞান বিস্তার ও সাধনার ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান, যা জাতিকে অনেক দিন ধরে পথের দিশা দিতে থাকবে।

আমরা যারা 'ইসলামের মোড়কে সবকিছু গঠিত হোক' এভাবে চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসীদের জন্য খুবই দুঃখের বিষয় যে, মহান সাহিত্যিক, গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিথযশা শিক্ষাবিদ ও ইসলামী সাহিত্যাকাশের আলোকিত জ্যোতিষ্কদের ও লেখকদের মধ্যে আব্বাস আলী খান, মাওলানা আবদুর রহীমসহ অনেকের সাথে আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব স্যারকেও আমরা হারিয়েছি। 'মউতুল আলেমে মউতুল আলম।' আমাদের কাঙ্ক্ষিত চিন্তাধারার আকাশে এ রকম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আর কই? সত্যিই এক্ষেত্রে আমরা এখন দীনহীন হয়ে পড়েছি যেন! হে আল্লাহ, আমাদের সহায়তা করুন। নতুন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব যেন ইসলামী চিন্তা-চেতনার আকাশে ভাস্বর হয়।

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন : ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা

কবি শাহ মুহাম্মদ ছগীর, কবি সৈয়দ সুলতান, মহাকবি আলাওল, কবি আমীর হামযা, সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন, কবি শাহাদৎ হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি ফররুখ আহমদ তৎপরবর্তী সময়ে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে একরকম দৈন্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে বাংলা সাহিত্য চর্চা থেকে ইসলাম ও ইসলামী জীবন ও মুসলিম সংস্কৃতি বাদ পড়তে বসেছিল প্রায়। এর মূল কারণ হলো এই ধারায় লেখক, চিন্তাবিদ, কবি-সাহিত্যিকের অভাব। আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব এই শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের ধারায় তিনি নিজে অনেক ইসলামী গবেষণা পত্রিকা সম্পাদনা, ইসলামী সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা, ইসলামী সাহিত্য চর্চা, ইসলামী ভাবধারার উপন্যাস অনুবাদ নিজে করেছেন এবং সাথে সাথে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য বহু সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগঠন সৃষ্টিতে উদ্যোগ-উৎসাহ যুগিয়েছেন। নতুন লেখকদের রচিত কাব্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, গবেষণা প্রকাশ ও প্রচারে সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদেরকে সাহিত্য বিরচনায় উৎসাহ দিয়েছেন। ফলে দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রবাহ সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন, যে কারণে এখন এই ধারায় বহু লেখক সৃষ্টি হয়েছে। বহু কবিতার বই, প্রবন্ধ সংকলন, উপন্যাস, গল্প, নাটক, গবেষণা গ্রন্থ ও রস রচনা এখন সাহিত্যাঙ্গনে বিরাজমান। এক কথায় বলা যায়, তিনি এ ব্যাপারে Cultural reform movement করে Islamic Tradition প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক অবদান রাখেন।

এক নির্মোহ ব্যক্তিত্ব

তিনি জ্ঞান অর্জন, বিতরণ ও সাধনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থের পেছনে দৌড়ে তিনি সময় নষ্ট করেননি। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে, রূহানী তরবিয়ত চর্চা করে তিনি নিজেকে একজন নির্মোহ-তাকওয়াবান ব্যক্তি হিসেবে গঠন করেন। তাঁর মধ্যে মহাকবি আল্লামা ড. ইকবালের কাঙ্ক্ষিত মর্দে মুমিন ও ইনসানে কামিল-এর রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। দুনিয়াদারীর প্রতি তিনি এতই নির্মোহ ছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কেই যেন মহাকবি আল্লামা ড. ইকবালের সে কবিতাই মিলে যায়! তিনি বলেছিলেন,

'খুদীকো বুলন্দ কর এত্‌না- কে হার তাক্বদীর সে পাহেলে
খোদা বন্দে ছে খোদ পুছে- বাতা তেরা রেযা কেয়া হ্যায়'।

অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিত্বকে এমন উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাও, যেন তাকদীর লেখার প্রাক্কালে খোদা নিজেই বান্দার কাছে জানতে চান, বল তুমি রাজী কিসে?'— আল্লামা ইকবাল।

www.pathagar.com

পরিশেষ

গত কয়েক মাস আগে আমি তালিব স্যারকে দেখার জন্য বাংলা সাহিত্য পরিষদ অফিসে গিয়েছিলাম আমার ছোট ছেলে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইকবালসহ। ইচ্ছা ছিল তাঁর সাথে ছেলের পরিচয় করিয়ে দেব, যেন তাঁকে দেখে সেও লিখতে পড়তে উৎসাহিত হয়, দুর্ভাগ্য তা হয়নি। সেখান থেকে কিছু নতুন বই-পত্রও কিনেছি। কিছু প্রকাশিত পত্রিকা গিফটও পেয়েছি। কিন্তু আবদুল মান্নান তালিব স্যারকে দেখতে পাইনি। ঐদিন তিনি অফিসে আসেননি। অন্তরে খুবই অনুতাপ রয়ে গেল যে, সুদূর চট্টগ্রামে থাকার কারণে তাঁর সাথে শেষ দেখাটি আর হল না। তিনি চলে গেলেন। তাঁকে শয়ন করানো হয়েছে চিরন্তন শয্যায়। ইসলামী জ্ঞান-গবেষণা ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের যবনিকাপাত হলো। তাঁর সমস্ত সাধনাই ছিল আল্লাহকে নিবেদিত। তাই হয়তো আমাদের শ্রুতির অগোচরে ধ্বনিত হলো, 'ইয়া আইয়াতুহান্-নাফ্সুল মুতমায়িন্নাতু'র্যেয়ী ইলা রাব্বিকা রাজিয়াতাম্ মারজীয়াতান্। ফাদ্ খুলী ফী ইবাদী। ওয়াদ্খুলী জান্নাতী।'

'হে প্রশান্ত আত্মা। ফিরে চলো তোমার রবের দিকে এমন অবস্থায় যে, তুমি তোমার পরিণামের জন্য তুষ্ট এবং তুমি প্রিয়পাত্র তোমার রবের কাছে। অতএব আমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।' (আল ফজর, আয়াত-২৭-৩০)।

আমি তাঁর ইনতেকালের খবর শুনে ঘরে বসে কেঁদেছি। দোয়া করছি তাঁর বিদেহী আত্মার নাজাতের জন্যে, মহান আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন। তাঁর অবদানসমূহ কবুল করুন। তাঁর কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত করুন। তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করুন।

আমীন!

www.pathagar.com

সাধারণের মাঝে
তিনি ছিলেন অসাধারণ
এস এম আব্দুচ ছালাম আজাদ

আমি একজন সাধারণ মানুষের কথা বলছি। সাধারণ বলতে যা বুঝায় তা হলো যার মধ্যে কোন ধরনের অহংবোধ ও অহমিকা নেই। যার কথা বলার মাঝে কোন ধরনের মিশ্রণ নেই। পোশাক-পরিচ্ছদে নেই আড়ম্বরতা। যার সবকিছু একেবারে স্বাভাবিক ও সাদাসিধে তাকেই বলে সাধারণ। এমন একজন সাধারণ ও সাদাসিধে মানুষ ছিলেন আবদুল মান্নান তালিব।

যারা লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক তাদের অনেকের মধ্যে বড়াই আছে। অহংকার আছে। আছে নিজেকে অনেক বড় মনে করার খাসলত। অনেকে আবার দু'চারটি বই লিখে মনে করে অনেক বড় লেখক হয়ে গেছেন। দু'চার-দশটি কবিতা লিখে মনে করেন অনেক বড় কবি হয়েছেন। তার দরকার এখন সম্বর্ধনা, খ্যাত বা অখ্যাত কোন পুরস্কারের। এ মানের লেখকের সাথে সাক্ষাৎ করা মুশকিল। কথা বলা আরো মুশকিল। এমন লেখকের সংখ্যা ঢের আছে। এমন কবি-সাহিত্যিকের সংখ্যাও ঢের আছে। কিন্তু মুহতারাম আবদুল মান্নান তালিবের মতো অতি সাদাসিধে ও বিরল প্রতিভাধর অসাধারণ মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তিনি সাধারণের মধ্যে অসাধারণ বলেই খ্যাতি চাননি। চাননি কথা বলার আগে পারিশ্রমিক। চাননি উপহার-উপঢৌকন। চাননি অন্য কিছু। কারণ তিনি ছিলেন একটি মৌলিক আদর্শে বিশ্বাসী। যে আদর্শের তিনি বিশ্বাসী ছিলেন সে আদর্শের প্রচার

www.pathagar.com

ও প্রতিষ্ঠার নীরব মিশনারী। তাঁর মিশন ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । সেই স্বতন্ত্র মিশনই তাঁকে গড়ে তুলেছিল সাধারণের মধ্যে অসাধারণ করে।

ইলম বা অহির জ্ঞান মানুষকে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলে। অহির জ্ঞানের বিচ্ছুরিত আলো এত প্রখর ও শক্তিশালী, যা মানুষের ভেতর থেকে হাইওয়ানী খাসলত ও নফসানিয়াতকে বের করে দিয়ে তাঁকে ইনসানিয়াতের সুষমামণ্ডিত আবরণে আচ্ছাদিত করে। হাইওয়ানী খাসলত ও নফসানিয়াতের প্রভাব প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। রূহানিয়াতকে প্রভাবশালী করে দেয়। আর ইনসানিয়াতের উঁচুমার্গে পৌঁছে দেয়। যারা সহীহ ইলম বা অহির জ্ঞানের মাধ্যমে ইনসানিয়াতের উঁচুমার্গে পৌঁছে যায় এবং রূহানিয়াতের শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হয় তারাই তৌহিদী মিশনে কাজ করে সফল ও সার্থক হতে পারে। তারা উম্মাহকে দিতে পারে সঠিক পথের নির্দেশনা। তারাই হতে পারে একটি সফল বিপ্লবের কাণ্ডারি। বর্তমান বাংলাদেশে মৌলিক আদর্শে লালিত সাহিত্যাঙ্গনে কাজ করে যারা সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন, বিপ্লবী কাণ্ডারির ভূমিকা পালন করেছেন নীরবে নিভৃতে, তাদের মাঝে প্রথম সারির ভূমিকা যারা রেখেছেন তাদের একজন হলেন আবদুল মান্নান তালিব সাহেব। তিনি ছিলেন সাহিত্যাঙ্গনের বড় একজন সাধক পথিকৃৎ। একজন অনন্য দিকপাল।

সাধারণত নামাজ-কালাম ও গদবাঁধা জিকির-আজকারের মাধ্যমে প্রচলিত প্রথা অনুসারে মুমিন হওয়া যায়। বুজর্গও হওয়া যায়। কিন্তু ইলম বা অহির জ্ঞানের আলো ছাড়া আল্লাহর কালামের উপর হাত দেয়া যায় না। মুহাম্মদ স.-এর পবিত্র বাণীর উপর হাত দেয়া যায় না। আল্লাহর কালাম ও মুহাম্মদ স.-এর হাদীসকে অহির জ্ঞান ছাড়া বুঝাও সম্ভব নয়। আবদুল মান্নান তালিব সহী ইলম বা অহির জ্ঞানকে কতটুকু আত্মস্থ করেছিলেন এবং সেই জ্ঞানের দ্যুতি কত প্রখর ও প্রভাবশালী ছিল তা বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন ও বুখারীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের অনুবাদ পড়লে সহজে বুঝা যায়। তালিব সাহেব কত যত্ন ও নিপুণতার সাথে বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআন, সহী আল বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন, পয়গামে মুহাম্মদী, সীরাতে সরওয়ারে আলম ও রাসায়েল ও মাসায়েলসহ অনেক মৌলিক গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তাতেই অনুধাবন করা যায় তিনি কত অসাধারণ ইলম অর্জনকারী সত্যিকারের সাধক ছিলেন।

মৌলিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়ও তিনি অবদান রেখে গেছেন। তাঁর অবদান থেকে শিশুতোষ সাহিত্য বাদ পড়েনি। এদেশের শিরকমিশ্রিত ঈমানদার মুসলিম উম্মাহকে শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত করে শিরকমুক্ত সহীহ ঈমান ও ইসলামের পথে পরিচালিত করার জন্য মৌলিক সাহিত্য প্রণয়নে আবদুল মান্নান তালিবের বিরল অবদানকে স্বীকার করতেই হবে এবং জাতির প্রয়োজনেই তাঁকে স্মরণ করতে হবে।

পত্রিকা সম্পাদনার কাজটি দুরূহ। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা আরো দুরূহ। মৌলিক সাহিত্য বা ইসলামী সাহিত্যসম্বলিত পত্রিকার সম্পাদনা আরো বেশি দুরূহ। তালিব সাহেব সে দুরূহ কাজটিও করেছিলেন

www.pathagar.com

অনায়াসে। আল্লাহর বিশেষ রহমত ছাড়া এ কাজটি মোটেই সম্ভবপর ছিল না। তিনি মাসিক 'পৃথিবী'র মতো মননশীল, রুচিবোধসম্পন্ন ও গবেষণাধর্মী পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। মাসিক কলম-এর মতো উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এ ছাড়াও দৈনিক ইত্তেহাদ, সাপ্তাহিক মিযান, জাহানে নও-সহ বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনার মধ্য থেকে উর্দু পত্রিকাও বাদ যায়নি। দৈনিক সংগ্রামের কলামিস্ট হিসেবে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। ফিচার এডিটরের দায়িত্ব পালন করেছেন জীবনের শেষাবধি। এত বড় মাপের লোক হওয়া সত্ত্বেও তালিব সাহেবের মধ্যে কোন ধরনের অহংকার ছিল না। ছিল না বড় মানুষীর খাসলত। ছিল না অহমিকা। ছিল না কোন ধরনের বড়াই বুজুর্গী। দেখলে মনে হয় অতি সাধারণ একজন মানুষ। এই সাধারণ মানুষ হিসেবে সাদাসিধে জীবন যাপন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন ২০১১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর । তালিব সাহেবকে আর দেখা যাবে না বাংলা সাহিত্য পরিষদের অফিসে। মগবাজারের বইয়ের দোকানের সামনে কিংবা কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার অধিবেশনে। দেখা যাবে না সাহিত্যের আড্ডায়। কিন্তু মরহুমের রেখে যাওয়া কলমের আঁচড় শতাব্দীর পর শতাব্দী কথা বলবে। অনুপ্রেরণা যোগাবে। সত্যের পথে ডাকবে বিপথগামী মানুষদের। তাফসীর, হাদীস ও মৌলিক সাহিত্যের লাখো লাখো পাঠকের হৃদয় হতে উচ্চারিত হতে থাকবে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বে যারা ঈমান নিয়ে চলে গেছেন সে ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারের ব্যাপারে আমাদের দিলে কোনরূপ অসন্তোষ ও কলুষতা সৃষ্টি হতে দিও না। হে আমাদের রব, তুমি বড়ই স্নেহপরায়ণ ও মেহেরবান।' (সূরা হাশর-১০)

www.pathagar.com

একটি স্মরণ
ছায়াবৃক্ষের প্রয়াণ
এ. কে. এম. ফজলুল হক

বিশ্বাস ও দর্শনের জগতে অনেকটা ছায়াহীন প্রান্তরে ছুটতে ছুটতে যেন রৌদ্রতাপে অতিষ্ঠ দিশেহারা এক পথিক ছিলাম আমি! একটু ছায়া একটু আশ্রয় আমার যখন খুব প্রয়োজন সম্ভবত ঠিক তখনই অনেক চেষ্টায় আবদুল মান্নান তালিব নামের একটি প্রশান্ত, স্থিতিশীল বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় আমি একটু আশ্রয় পেলাম। একটু শ্বাস টেনে নেবার সুযোগ পেলাম। যদিও আমি তাঁর সামগ্রিক সৃষ্টির ভেতর প্রবেশের তেমন সুযোগ পাইনি, তবে এ দুরূহ অবিশ্বাসে ভরা পৃথিবীকে নতুনভাবে ভাবতে ও চিনতে শুরু করলাম।

অধর্ম, সুদ, ঘুষ ও দুর্নীতির করাল গ্রাসে এ পৃথিবীতে জনপদ যখন পচা শবের মতো দুর্গন্ধময়, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যখন শূন্যের কোঠায় ধেয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারাবার কালে হঠাৎ করে তাঁর সাথে আমার পরিচয় হওয়া মানে বিশ্বাসের ক্ষীণ সুতাটাকে আবার হাতে পাওয়া। কর্মক্ষেত্রের ব্যবধানের কারণে তাঁর থেকে অনেক দূরবর্তী অবস্থানেই আমার বেশির ভাগ সময় কেটেছে। তবে গত দশকে পরিচয়ের পর কয়েকবার সামনাসামনি কথা হয়েছে। মাঝে মাঝে চিঠির লেনদেন হয়েছে।

আবদুল মান্নান তালিবের সাথে পরিচিত হওয়া মানে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচিত হওয়া। দার্শনিক দৃষ্টিতে পরিচিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গিতে, চিন্তা-চৈতন্যে বিপ্লব ঘটে যাওয়া। তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গিতে

www.pathagar.com

সামান্য জড়তা থাকলেও তাঁর দর্শনে কোন জড়তা ছিল না। তিনি যখন কথা বলতেন অন্তরমূল থেকে ভেবেচিন্তে কথা বলতেন। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর সাথে বসা মানে সাহিত্যরসে নিজেকে সিক্ত করে দেয়া, অন্তর চত্বরে সাহিত্যপ্রিয়তার বীজ রোপণ করা। এখন এ রোপিত বীজ কতটা বিশাল শক্তিশালী বৃক্ষ হবে সেটা সেই ব্যক্তির কর্মকুশলতা ও কর্মপ্রয়াসের ব্যাপার। আজ আমার অন্তরমূলে সাহিত্যরস সৃষ্টির যে স্পৃহা ও আগ্রহ নিরলস গতি পেয়েছে, শিকড় মেলেছে এজন্য তাঁরই সহযোগিতা ও উৎসাহ সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে।

আজ আমার সেই সুশীতল ছায়াবৃক্ষটি প্রয়াত। জীবন্ত বস্তুর জন্য মৃত্যু একটি অনিবার্য বিধান। সেই মতে আবদুল মান্নান তালিব নামের মহান ছায়াবৃক্ষটিও চিরায়ত নিয়মের অধীন। চিরবিদায় নিয়ে তিনি পরপারে চলে গেছেন। জানি না আল্লাহ পাক তাঁর শূন্যতা কিভাবে পূরণ করবেন। আমাদের স্থূল বিবেচনায় তা অপূরণীয়ই থাকবে হয়তো।

আজ আবদুল মান্নান তালিব শুধুই স্মৃতি। এ স্মৃতি বার বার অশ্রুতে সিক্ত হবার মতো স্মৃতি! এ স্মৃতি স্বাভাবিক সান্ত্বনার চেয়ে অভাব বোধটাকেই বড় করে তোলে! কারণ যে ছায়াবৃক্ষের অবস্থান শুধু দাঁড়িয়ে থাকা নয়, জীবন ধারণ ও জীবন যাপন শুধু নয়, বরং জীবনের সহজতা ও শাশ্বত কল্যাণকে জীবনের বিস্তারে প্রতিস্থাপনের দার্শনিক প্রয়াস চালানো, সেটাই ছিল আবদুল মান্নান তালিব নামের মহান বৃক্ষটির নিরলস নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা তাঁকে দেখবে তারাই ও নিভৃতচারীর কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হবে!

অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে আমার সাথে আবদুল মান্নান তালিবের যেটুকু স্মৃতি সেটুকু সাগর ঊর্মির মতো ঘটনার পর ঘটনাকে আঘাত করে আমার মানস পটে ভেসে আসছে। আমি তাঁর জড়িত কণ্ঠে অন্তরভেদী শব্দে গড়া বাক্যগুলোর অনুরণন নীরব প্রান্তরে বসে মনের কানে শুনতে পাচ্ছি।

আমি তাঁর বিশাল পুস্তক সংগ্রহশালা দেখেছি। তাঁর বাসায় চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে নীরবে তাঁকে দেখেছি। মনে হয়েছে স্বার্থপরতায় ব্যস্ত মানুষের মতো কোন ত্রস্ত ভাব তাঁর নেই। তিনি যেন কি একটা বিস্তার ঘটাবার নেশায় সাধনায় নিমগ্ন, ধ্যানী তন্ময় মানুষ! তাঁর মতো মড় মাপের মানুষের মূল্যায়ন দক্ষতার মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য আমি কতটুকুই বা বলতে পারি...!

উদাহরণ হিসেবে, এ ক্ষুদ্র আমাকেই আমি টেনে আনছি! আমি মফস্বল এলাকার এক মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক। সীমিত আয়ের মাধ্যমে অসীম অভাবকে কোন রকমে সামাল দিয়ে টিকে থাকার সংগ্রামই যখন আমার জীবনের প্রধান কাজ তখন অন্তরে দৃশ্যমান এ সমাজ সংসার নানা প্রশ্ন তুলেছে। কোনভাবে কিছু বলতে গোটা সত্তা আঁকুবাঁকু করছে। অবলম্বন হিসেবে সাহিত্যকে বেছে নিতে ইচ্ছে হলো। যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান না থাকার পরও নানা সীমাবদ্ধতা উপেক্ষা করে দু'টো পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ করে সেগুলো প্রকাশের উদ্যোগ বা চিন্তা মাথায় আসতেই একটু হাঁটাহাঁটি করে রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখী হই। লেখা ও প্রকাশের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শুধু জীবন যাপনের গণ্ডিতেই ঘুরপাক

www.pathagar.com

খাবার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু অন্তরলোকের দহন জ্বালা আমাকে থামতে দেয়নি। এক সময় অধ্যক্ষ মরহুম মিন্নাত আলীর উৎসাহে ও অধ্যক্ষ কাজী নজরুল ইসলাম খাদেমের পরামর্শে অবশেষে আবদুল মান্নান তালিবের কাছে পৌঁছা...! মরহুম কবি মতিউর রহমান মল্লিক আমাকে তাঁর কাছে পাঠান। বিকেলে তিনি যখন সাহিত্য পরিষদের অফিস বন্ধ করে বাসায় ফিরবেন ঠিক সেই সময়টাতে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে নিয়ে আবার অফিসে বসলেন। পাণ্ডুলিপিগুলো গ্রহণ করলেন এবং প্রশ্ন করলেন, 'বিশ্বসাহিত্য কতটুকু পড়েছেন?'

আমি প্রথমটায় থতমত খেয়ে আমার সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতা জানালাম এবং বললাম, পড়ার তেমন সুযোগ পাইনি, তবে সমাজ ও আশপাশ দেখে অনুভব, উপলব্ধিতে যে মনন এসেছে তা থেকেই এগুলো সৃষ্টি করেছি এবং আরও সৃষ্টি করতে চাই। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, এগুলো রেখে যান, দেখি পড়ে কি করা যায়।'

যা হোক, অবশেষে সেই দু'টো পাণ্ডুলিপি থেকে 'স্বপ্নের জন্য স্বপ্ন' নামের উপন্যাসটি তিনি প্রকাশের উদ্যোগ নেন এবং প্রকাশ করেন। এরপর মাঝে মাঝে এসে আরও কিছু পাণ্ডুলিপি আমি সাহিত্য পরিষদে জমা দিই। তিনি আমার 'রঙিন প্রেমের সঙিন জ্বালা' নামের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি পড়ে গঠনমূলক সমালোচনা লিখে আমার ঠিকানায় পাঠান। সেই থেকে সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে চিঠির আদান-প্রদান হতে থাকে। বেশির ভাগ চিঠি অবশ্য জনাব তৌহিদুর রহমানের মাধ্যমেই লেখা হতে থাকে।

২০০৮ সালে তিনি আমার উপন্যাস 'ইটপাথরের অরণ্যে' প্রকাশ করেন। এরপর তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি প্রায়ই বলতেন, আপনার উপন্যাসগুলো ব্যাপক আকারে প্রকাশের জন্য কোন প্রকাশক কি পাচ্ছেন না? যদি পেতেন ভাল হতো! আমি তখন মনে মনে শুধু বলেছি, আপনার মতো উদার অসীম দরদী মানুষ কি যত্রতত্র খুঁজে পাওয়া যায়? আপনাকে পেয়েছি, সেতো আমার ভাগ্য বলতে হবে, অন্তত এ সমাজে!

স্কুলে কাজ বেড়ে যাওয়ায় ২০০৮ সালের পর আমার সৃষ্টিকর্মটা একটু শ্লথ গতিতে চলতে থাকে। সাহিত্য পরিষদে আর খুব একটা আসা হয়নি। চিঠি লেখাও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য মাঝে মধ্যে মোবাইলে জনাব তৌহিদুর রহমানকে ডেকেছি এবং আবদুল মান্নান তালিবের খোঁজ-খবর নিয়েছি। ভেতরে ভেতরে একটা জেদি সত্তা আমার মধ্যে কাজ করছিল। আমি কঠিন কিছু সৃষ্টি করে সেটা নিয়ে এসে আবদুল মান্নান তালিবকে অবাক করে দেবার মানসে অত্যন্ত শ্লথভাবে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কলম চালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার দুর্ভাগ্য আমার সৃষ্টি শেষ হওয়ার আগেই তিনি চলে গেলেন। মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গির আকাল ঠেলে আমার সৃষ্টি আলোর মুখ দেখবে কিনা সেটা এখন এক প্রকার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমন সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকের দেখা আর পাব কিনা কে জানে!

ঐত মৃত্যুর কিছু দিন আগে আমি তৌহিদুর রহমান ভাইকে মোবাইল করে তাঁর অবস্থা জানতে চাই। তিনি বেশ ভাল বলে জানালেন। এত

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনবো ভাবিনি, যদিও মৃত্যু এক নিশ্চিত প্রক্রিয়া। সবই মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছের বাইরে এ বিশ্বলয়ে কারও ইচ্ছে থাকতে পারে না। তবে তাঁর মৃত্যু থেকে তাঁর বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তাটাই আমাদের কাছে আজ প্রকট হচ্ছে। তাঁর শূন্যতা আমাদের কাঁদাচ্ছে!

তাঁর কাজ ছিল নির্মাণমুখী ও লালনমুখী! আজকের মুসলিম সমাজ ধর্মীয় চৈতন্য-বৈকল্যে যখন অনেকটাই অবশ এবং নানা বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ ও সংমিশ্রণে স্বকীয় চৈতন্য-মননহারা তখন সে মুসলিম চেতনাকে রাহুমুক্ত করতে যে গুটি কয়েক মনীষী কলম চালিয়েছিলেন, কলমের জগৎকে নিয়ন্ত্রণ ও লালন করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি তাঁদেরই একজন। সৃষ্টি করা যত কঠিন তার চেয়ে অনেক কঠিন তা লালন, সংরক্ষণ ও সঞ্চালন করা। এর সবই তিনি করেছেন।

দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রাট ও সংস্কার এত নীরবে নিভৃতে বসে তিনি করেছেন যে, সেটা প্রবল প্রচুর প্রাণশক্তি ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। সেই প্রাণশক্তি প্রতিকূলতার মধ্যে স্থির দাঁড়িয়ে থাকার মতো সাবলীল হিম্মত তাঁর ছিল। ফলে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে চৈতন্য নির্মাণের মতো কঠিন কাজ করে গেছেন।

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজাতীয় ও অন্য ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য যখন সাহিত্যাঙ্গনে বিপুল লোকবল দরকার ঠিক তখন আমরা আবদুল মান্নান তালিবের মতো ক্ষণজন্মা বিরল প্রতিভার এ মনীষীকে হারালাম। তাই মৃত্যু অবধারিত জেনেও তাঁর স্মরণে বিলাপ করছি।

আজকে তাঁর সম্পর্কে লিখতে বসে বারবার মনে হচ্ছে আমরা জাতিগতভাবে কত দুর্বল আর হীনম্মন্য! আবদুল মান্নান তালিবের মতো বড় মাপের একজন মানুষের প্রয়াণকে ব্যাপক আকারে জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন করতে পারছি না, অথচ তাঁর চেয়ে অনেক তুচ্ছ ব্যক্তিত্বকে বিশেষণের বাটখারা দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কিংবদন্তিতে রূপ দান করার চেষ্টা করে এ জাতি...। কবে এ জাতির মূল্যবোধের উন্নতি হবে, তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

আমরা যারা তাঁকে চিনলাম, তাঁর পথে চলতে আগ্রহ বোধ করলাম, মরণপর্যন্ত আল্লাহ পাক আমাদের সে পথে চলার সুযোগ ও সামর্থ্য দান করুন এ প্রার্থনাই আল্লাহর দরবারে আজ একান্তভাবে করছি।

পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তাঁর জীবনের সব জানা-অজানা ভুলের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি এবং পরকালীন জীবনে বেহেস্তি কল্যাণ চাচ্ছি। আমীন!

www.pathagar.com

একটি নাম
একটি ইতিহাস
নাসির হেলাল

আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব একটি নাম, একটি ইতিহাস। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত আবদুল মান্নান তালিব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যিক ধারায় পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। অনুবাদ সাহিত্যে তিনি রেখেছেন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ছাপ। তিনি সারা জীবন যেমন নিরলসভাবে লিখে গেছেন, তেমনি কবি-সাহিত্যিকদের লালনও করে গেছেন।

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সংগঠক, অনুবাদক আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব ১৯৩৬ সালের ১৫ মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে তালেব আলী মোল্লা ও মেহেরুন্নেসা।

১৯৫০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিক এবং তার অনেক পরে ১৯৬৬ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচএসসি পাস করেন। অবশ্য মাঝখানের দীর্ঘ সময় তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। এ সময় তিনি লাহোরের বিখ্যাত মাদরাসা জামেয়া আশরাফিয়ার ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৭ সালে এখান থেকেই তিনি দাওরা-ই-হাদীস ডিগ্রি অর্জন করেন।

তালিব ভাইয়ের সাথে সরাসরি কবে পরিচয় হয় তা আজ আমার মনে নেই। তবে পরিচয়ের প্রথম দিকে তিনি আমাকে উর্দু শিখতে বলেছিলেন সে কথা আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'উর্দু শেখা তেমন কঠিন কিছু নয়। ৮-১০ দিন চেষ্টা করলে প্রাথমিক শেখাটা হয়ে যাবে, পরে চর্চা

www.pathagar.com

করলেই চলবে। আর উর্দু শিখতে পারলে তখন উর্দু সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের মধ্যে ঢোকা যাবে যা জীবনের জন্য, সাহিত্য সাধনার জন্য পরবর্তীতে বিশেষভাবে কাজে লাগবে।' তালিব ভাইয়ের উপদেশমতো ২-৪ দিন উর্দু শেখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এরপর যা তাই, সাধনা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি।

১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে তালিব ভাইয়ের সাহচর্যে আসি। ওই সময় আমি ঝিনাইদহের মহেশপুর হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক। ঢাকায় বেড়াতে এসে বাংলা সাহিত্য পরিষদে তাঁর সাথে দেখা করলাম। বেশ কিছুদিন ধরে ঢাকায় চলে আসার তাগিদ অনুভব করছিলাম। তালিব ভাইকে জানালাম, 'লেখালেখি করার জন্য ঢাকায় চলে আসতে চাই।' উনি আমার কাছ থেকে আদ্যোপান্ত সব জেনে ব্যবস্থাপক পদের জন্য বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক বরাবর একটি আবেদন লিখে জমা দিতে বললেন। আমি তখনো জানতাম না তিনি নিজেই পরিষদের পরিচালক। ওনার পরামর্শমতো আবেদনপত্র জমা দিলাম। পরদিন কবি গোলাম মোহাম্মদ (বর্তমানে মরহুম) পরিষদের চাবির গোছা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তালিব ভাই আগামীকাল থেকে আপনাকে বাসাপ অফিসে বসতে বলেছেন। এই নিন চাবি।

বিস্মিত আমি! বললাম, শুধু আবেদন করেই চাকুরি হয়ে গেল! কোন পরীক্ষা, টরীক্ষা দিতে হবে না অথবা কোন সাক্ষাৎকার? গোলাম মোহাম্মদ ভাই হেসে বললেন, 'সাক্ষাৎকার তো তালিব ভাই গতকালই নিয়েছেন। উনিই তো পরিষদের পরিচালক। ঢাকায় আসতে চাচ্ছিলেন– ব্যবস্থা তো হয়ে গেল। একজন লেখকের জন্য কোন সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরী হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আর আপনার পদটিও সম্মানজনক ব্যবস্থাপকের পদ।'

আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। আগেই বলেছি– আমি মহেশপুর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত ছিলাম। উপজেলা সদরের পাইলট হাইস্কুলের সিনিয়র শিক্ষকের পদ ছেড়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে শুধুমাত্র লেখালেখির জন্য সম্পূর্ণ বেসরকারী একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দেব কিনা! সিদ্ধান্তটি সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ হাওলা বলে পরদিন সাহিত্য পরিষদে যোগদান করলাম। একাধারে সাত বছর বাসাপ-এ কর্মরত ছিলাম; আর সাত বছর আবদুল মান্নান তালিবকে একান্তভাবে কাছে থেকে দেখেছি। এরপর পরিষদ থেকে চলে আসলেও তালিব ভাইয়ের সাথে সব সময়ই যোগাযোগ ছিল।

মানুষ ফেরেশতা নয়, দোষে-গুণে মানুষ। মাওলানা আবদুল মান্নান তালিবও একজন মানুষ। তাঁর মধ্যেও ছিল মানবীয় সব দোষ-গুণ। কিন্তু তবু বলবো, তিনি ছিলেন অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা। তাঁর চাল-চলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ, আমল-আখলাক, লেনদেন সব কিছুই ছিল আর দশজন মানুষ থেকে ভিন্ন। তিনি প্রচণ্ড খুশির খবর শুনেও আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন না। আবার ভয়াবহ দুঃখের সময়ও শোকে কাতর হয়ে পড়তেন না। সব সময় তাঁর মধ্যে অনড়–অটল একটা অবস্থা বিরাজ করতো। ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

একদিন তালিব ভাই ও আমি রিকশায় পাশাপাশি বসে কোথায় যেন যাচ্ছি। আলাপ-আলোচনা চলছে– এক পর্যায়ে তিনি বললেন, জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রেখে চলা দরকার। আবেগ ভাল কিন্তু বেশি আবেগ বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবাই ভাল– অতিমানব বা ফেরেশতা ভাবা ঠিক নয়। এমন ভাবলে ঠকতে হয়, বিপদে পড়তে হয়। ধরুন, আপনি কাউকে ফেরেশতাতুল্য চরিত্রের মানুষ মনে করলেন কিন্তু মানুষটি কোন এক সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন খারাপ কাজ বা অনৈতিক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ল যা আপনি ভাবতেও পারেন না। তখন কি করবেন? দেশ ছেড়ে চলে যাবেন? আত্মহত্যা করবেন? এর কোনটিই কি করা ঠিক হবে? হবে না। কারণ যার সম্বন্ধে এমন ধারণা আপনি করেছেন, তিনি একজন রক্ত-মাংসের মানুষ, তিনি একটি অন্যায় করতেই পারেন। আর তার সংশোধনের পথও রয়েছে। অপর দিকে কোন মানুষকে একেবারে খারাপ বা শয়তান ভাবাও ঠিক নয়। যে মানুষটিকে আপনি মানুষ নামের কলঙ্ক ভাবছেন, সৃষ্টির নিকৃষ্টতম সৃষ্টি ভাবছেন তারও অনেক ভাল গুণ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো সে আপনার আমার থেকে ভাল। তাই তাকে খারাপ না ভেবে তার ভাল গুণের প্রশংসা করলে হয়তো লোকটি ধীরে ধীরে বদ গুণগুলো ত্যাগ করে ভালোর দিকে আসতে পারে। এমনটাই ভাবা দরকার, করা দরকার।

তালিব ভাই অসম্ভব মিতবাক একজন মানুষ ছিলেন। হতে পারে মুখের জড়তার কারণে– যেহেতু তাঁর কথা একটু জড়িয়ে যেত সেজন্য তিনি কম কথা বলতেন, অথবা তিনি বুঝে শুনেই কম কথা বলতেন। তাঁর কণ্ঠও উচ্চ ছিল না। তিনি নিম্ন কণ্ঠেই কথা বলতেন। একান্ত কাছের লোক ছাড়া কারো সাথে বেশি কথা বলতেন না। কিন্তু তাঁর হাত ছিল অসাধারণ শক্তিশালী। অনেককেই বলতে শুনেছি, 'তালিব সাহেবের মুখে জড়তার কারণে যে কমতিটা রয়ে গেছে তা তাঁর হাতে এসে ভর করেছে, যে কারণে তাঁর লেখা এত ক্ষুরধার।'

ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিবিষ্টপ্রাণ একজন মুমীন। আমি নিজে একান্ত কাছে থেকে বিষয়টি লক্ষ করেছি। যেমন জরুরি কাজে আমরা কোথাও যাচ্ছি, হাতে সময়ও অনেক কম, পথে নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে, মসজিদ খুঁজে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবার কখনও তাঁর ইমামতিতেই নামাজ পড়ছি, কিন্তু এত ধীর স্থিরভাবে নামাজ পড়াচ্ছেন বা পড়ছেন যে, আমি পেরেশান হয়ে পড়ছি। ওদিকে হয়তো যে কাজে যাচ্ছি তার সময় যায় যায়, কিন্তু তালিব ভাই তাঁর মনের মত করে সালাত আদায়ে ব্যস্ত। অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার ছাড়া দুর্ব্যবহার করতে তাঁকে কখনো দেখিনি। বাসাপ-এর প্রকাশনা সংক্রান্ত অনেক কাজ এবং সাহিত্য সভা, সেমিনার, আলোচনা সভা, সিম্পোজিয়াম অনেক কাজ করতে হতো। তালিব ভাই এসব কাজ বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে বাস্তবে পরামর্শের সাথে সাথে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার তাকিদ দিতেন। কিন্তু কাজ হয়ে গেলে কোন ভুল হলে তিনি কখনোই রাগ করতেন না, বরং বলতেন, 'আমরা কাজটি সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করেছি, যা হয়নি তা আমাদের

www.pathagar.com

অযোগ্যতার জন্য হয়নি। এ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং ভবিষ্যতের কাজগুলো যাতে ভালো হয় সে চেষ্টা করতে হবে।'

বাংলা সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য সম্মেলন– পরিষদের কর্মী বাহিনীর জন্য সব থেকে বেশি কাজের সময়। জাতীয় পর্যায়ের প্রোগ্রাম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সবাই উদ্বিগ্ন। সবাই ছোটাছুটি করছে, সব দিককার কাজ ঠিকমত হচ্ছে তো, সময় এগিয়ে আসছে অথচ কাজের বেশির ভাগ বাকী, এত কম সময়ে বাকী কাজ কি আদৌ সমাপ্ত করা সম্ভব? কিন্তু তালিব ভাই পাহাড়ের মতো অনড় অটল। মাহবুব ভাই হয়তো বললেন, 'যে সময় আছে তাতে কি কাজ সব শেষ হবে?' উত্তরে তালিব শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, 'চিন্তা করবেন না তো, দেখবেন সময়ে সবই ঠিক ঠিক মতো হয়ে গেছে।' বাস্তবে দেখা গেল আশাতীত সফলতার সাথে সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ তালিব ভাইয়ের কথাই সত্য। আবদুল মান্নান তালিব একজন নির্লোভ, অল্পে তুষ্ট মানুষ ছিলেন। বাসাপ-এ থাকা অবস্থায় দেখেছি তিনি বাসাপ থেকে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করার জন্য কোন সম্মানী তো নিতেনই না, উপরন্তু বাসাপে আসা-যাওয়ার জন্য যাতায়াত খরচ পর্যন্ত নিতেন না। সম্মানী গ্রহণের ব্যাপারে পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের পক্ষ থেকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি উত্তর দেন, 'আখেরাতের নাযাতের জন্য এ খেদমতটুকু আমাকে করতে দিন।' পরে অবশ্য তাঁর সাংসারিক অভাব-অনটনের কথা বিবেচনা করে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিচালনা পরিষদ তাঁর জন্য একটি ভাতা নির্ধারণ করে দেন।

কিস্তি টুপি মাথায় দেয়া, পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত অত্যন্ত সাদাসিধে মনের আবদুল মান্নান তালিব অসাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। প্রকৃতই দরবেশ বা বুজুর্গ বলতে যা বোঝায়, আল্লাহর অলি বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন মানুষটির কথা মনে পড়লেই আমার সামনে একজন বেহেশতী মানুষের নূরানী চেহারা ভেসে ওঠে।

বাসাপ-এ যোগদানের পরপরই তালিব ভাই আমাকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকাটি ভাল করে পড়ার তাকিদ দেন। তিনি বলতেন, 'দেশ পত্রিকাটি একটি উঁচুমানের পত্রিকা। বাংলা ভাষায় এত ভাল পত্রিকা আর নেই।' আমি সেই থেকে দেশ পত্রিকার গ্রাহক।

গত ঈদুল ফিতরের কয়েকদিন আগে বাসাপ-এর কর্মকর্তা তৌহিদুর রহমানকে সাথে করে তালিব ভাইকে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর মাথার কাছে বসালেন। ওই অসুস্থ শরীরেও তিনি আমার ব্যক্তিগত খোঁজ-খবর নিলেন। এখন কি লিখছি, জানতে চাইলেন। সিরিজটি লেখা কেন বন্ধ করলাম- তার এক প্রকার কৈফিয়ত চাইলেন। অব্যাহতভাবে লেখা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। শেষমেশ তাঁর জন্য দোয়া চাইলেন।

ঈদের একদিন পর আমি ও তৌহিদ ভাই আবার গেলাম তাঁর শান্তিবাগের বাসায়। অনেক কথা হল। বেশি বেশি পড়ার কথা বললেন। এর কয়েকদিন পরেই তাঁর অবস্থার অবনতি হলে শাহজাহানপুর ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে দেখতে যাই। ওই দিন তিনি আমাকে কাছে ডেকে কুরআন শরীফ অর্থ বুঝে পড়ার জন্য বিশেষভাবে

www.pathagar.com

তাকিদ দিলেন। এর ২-৩ দিন পর আমি ও কবি কামরুজ্জামান তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গেলাম। ওই দিন সিএনসিতে তালিব ভাইয়ের রোগমুক্তির জন্য দোয়া অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান শেষ করে আমরা হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তাঁর জন্য দোয়ার অনুষ্ঠান করা হয়েছে শুনে তিনি খুশি হলেন। এদিন আমি তাঁর হাতে হাত রেখে ক্ষমা চাইলাম। তিনি বললেন, 'আমি সবাইকে অনেক আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি। আপনারাও আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।' সেই শেষ দেখা। এরপর ওয়ারলেস রেলগেট চাঁন মসজিদে তাঁর জানাযা পড়ে এক নজর মুখটি দেখলাম। মনে হল সত্যিই একজন জান্নাতবাসী শুয়ে আছেন।

বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাঁর সম্পাদনায় ১৯৫২ সালে 'জিয়াউল ইসলাম' নামে একটি বার্ষিক সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে তিনি তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে লাহোর থেকে প্রকাশিত উর্দু দৈনিক রোজনামা তাসনীম-এ সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত এ পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। পরে ওই ১৯৫৯ সালেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন এবং দৈনিক ইত্তেহাদ-এর সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। এরপর তিনি ১৯৬২ সালে সাপ্তাহিক জাহানে নও পত্রিকায় যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালে তিনি ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ঢাকার রিসার্চ স্কলার হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি মাসিক পৃথিবীর সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে আবার জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যান। এ সময়ে ১৯৭৩-৭৫ পর্যন্ত তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মীযান পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং আগের চাকরী অর্থাৎ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের 'রিসার্চ স্কলার' পদে যোগদান করেন। তিনি এ দায়িত্বে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন। পাশাপাশি তিনি সাহিত্য পত্রিকা ত্রৈমাসিক ও পরবর্তীতে মাসিক কলম পত্রিকার সম্পাদক-এর দায়িত্ব ১৯৭৭-৯৪ পর্যন্ত পালন করেন। অন্যদিকে ১৯৮১-৯৯ পর্যন্ত তিনি মাসিক পৃথিবী পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। তিনি দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার ছোটদের পাতা 'শাহীন শিবির' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭৭-৮২ পর্যন্ত। ১৯৮৩ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি দৈনিক সংগ্রামের কলামিস্ট ও ফিচার এডিটর ছিলেন। এছাড়া তিনি ১৯৮৭ সাল থেকে আমৃত্যু বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক ছিলেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অধিকারী আবদুল মান্নান তালিব অসাধারণ কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলো হলো— ১. অবরুদ্ধ জীবনের কথা (১৯৬২); ২. মুসলমানের প্রথম কাজ (১৯৭৫); ৩. বাংলাদেশে ইসলাম (১৯৭৯); ৪. ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান (১৯৮৪); ৫. আমল ও আখলাক (১৯৮৬) ৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন (১৯৮৭); ৭. ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ (১৯৮৮); ৮. সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট (১৯৯১); ৯. ইসলামী জীবন

www.pathagar.com

ও চিন্তার পুনরগঠন (১৯৯৪); ১০. সত্যের তরবারি ঝলসায় (২০০০); ১১. আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম (২০০১)।

তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলো হলো– ১২. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা (১৯৬৯); ১৩. সহীহ আল বুখারী (১ম খণ্ড ১৯৮২); ১৪. সহীহ আল বুখারী (৩য় খণ্ড, ১৯৯৬); ১৫. রিয়াদুস সালেহীন (১ম খণ্ড, ১৯৮৫); ১৬. নির্বাচিত গল্প (১৯৮৫); ১৭. সত্য সমুজ্জ্বল (১৯৮১); ১৮. রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা (১ম খণ্ড ১৯৯৫), ১৯. রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা (২য় খণ্ড ২০০০)

আবদুল মান্নান তালিব অসাধারণ কিছু শিশু সাহিত্য রচনা করেছেন– যা কিনা বাংলা ভাষাভাষি শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনের জন্য ভূমিকা রাখতে পারে। বইগুলোর শিরোনাম : ২০. সহজ পড়া (১৯৮২); ২১. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (১ম ভাগ, ১৯৮০); ২২. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (২য় ভাগ, ১৯৮২); ২৩. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (৩য় ভাগ, ১৯৮২); ২৪. ইসলাম শিক্ষা (১ম ভাগ, ১৯৭৬) ২৫. ইসলাম শিক্ষা (২য় ভাগ, ১৯৭৬); ২৬. এসো জীবন গড়ি (১ম ভাগ, ১৯৭৫); ২৭. এসো জীবন গড়ি (২য় ভাগ, ১৯৭৫); ২৮. পড়তে পড়তে অনেক জানা (২০০০); ২৯. মা আমার মা (২০০১); ৩০. আমাদের প্রিয় নবী (১৯৭৫); ৩১. মজার গল্প (১৯৭৬); ৩২. কে রাজা (১৯৮১); ৩৩. হাতিসেনা কুপোকাত (১৯৯০); ৩৪. আদাবুল আরবিয়া (১৯৮৪)।

এরপর রয়েছে অনুবাদ সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার, বিশেষ করে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) রচিত বিশ্বখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনের ১৪-১৮ খণ্ড বাদে ১-১৯ খণ্ডের বাকি সব খণ্ড তিনি অনুবাদ করেছেন, যা আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশ করেছে।

মান্নান তালিবের রচিত 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' ও 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' গ্রন্থ দু'টি ইসলামী সাহিত্য বা ঐতিহ্যিক সাহিত্য রচয়িতাদের জন্য গাইড বুক হিসেবে বিবেচিত। 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থটির প্রসঙ্গ কথায় লেখক নিজে বলেছেন, 'ইসলামী সাহিত্য যথার্থই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম যেমন একটি বিশ্বজনীন মতবাদ ও আদর্শ, তেমনি ইসলামী সাহিত্যও একটি বিশ্বজনীন সাহিত্য।'

আর একটু এগিয়ে তিনি বলেছেন, 'বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিকেই আমরা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। সাহিত্যে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলা সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যবস্থা যেমন সমগ্র মানবতার জন্য কল্যাণের বার্তাবহ তেমনি ইসলামী সাহিত্যও মানবতার আশা- আকাঙ্ক্ষা পূরণের যথার্থ ধারক। ইসলামী সাহিত্য মানুষের সমাজ কল্যাণ ও সফলতায় ভরে দেয়। বোধ হয় মানুষের প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য কল্যাণ ও সফলতা অর্জন। নিজের কল্যাণ ও ব্যর্থতা ডেকে আনার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই মানুষ কোনো কাজ করে না। আশা করি এ কথা সবাই স্বীকার করেন। কাজেই সাহিত্য ক্ষেত্রে অকল্যাণ ও ব্যর্থতার প্রতিষ্ঠাকে আমরা উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। সাহিত্য মানবতার জন্য, সাহিত্য জীবনের জন্য, সাহিত্য কল্যাণের জন্য, সাহিত্য

www.pathagar.com

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উৎখাতের জন্য। ইসলামী সাহিত্যের এটিই হচ্ছে মৌল পরিচয়।'

সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলত জীবন চর্চারই আর এক নাম। আর ইসলাম তার ব্যাপকতর পরিসরে এ জীবন চর্চার সুযোগ দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদ যেখানে এ জীবন চর্চার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতর করে রেখেছে। যার ফলে দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ, সীমা লংঘন করার প্রবণতা এবং অবশেষে পূর্ণ প্রত্যাখ্যান। সেখানে ইসলাম দেড় হাজার বছর ধরে জীবন চর্চা করে আসছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কোথাও বিদ্রোহ করতে হয়নি, বরং ইসলামী আদর্শ নতুন নতুন সংযোজনকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। কোথাও বিরুদ্ধবাদিতার প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়ায়নি।'

ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব আবদুল মান্নান তালিব তাঁর পাণ্ডিত্য, গভীর মনীষা দিয়ে রচনা করেছেন ইতিহাস ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী লেখাগুলো যা বাংলাভাষী পাঠককে আগামী দিনে পথের দিশা দেখাবে।

বিশাল হৃদয়ের অধিকারী, মহান ব্যক্তিত্ব, বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, উর্দু ও ফারসি ভাষার পণ্ডিত, আমাদের উস্তাদ, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব গত ২২ সেপ্টেম্বর বেলা ২টা ৪৫ মিনিটের সময় শান্তি বাগের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে স্টোমাকের ক্যান্সারে ভুগছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন।

www.pathagar.com

এক জোহ্‌রা সিতারা
আবদুল কুদ্দুস ফরিদী

আবদুল মান্নান তালিবকে দূর থেকেই শ্রদ্ধা ও ভয় করেছি। তাঁকে নিয়ে খুব একটা স্মৃতিও নেই আমার। তাঁর কাছে যাওয়া খুব একটা হয়ে উঠতো না। তবে বিরল তাঁর দেখা পেলে তাঁর সাথে আমার বেশ কথা জমে উঠতো। আমাদের প্রিয় মতিউর রহমান মল্লিক ভাই তাঁকে বলতেন আল্লামা। আমার তাঁকে একজন দার্শনিক ও প্রজ্ঞাবান তত্ত্ববিদ বলে মনে হতো। তাঁর সাথে আমার কথা হতো, নৃতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদ ও পানীয় প্রজাতি, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস, বিশেষ করে আসহাফে কাহাফ, মুসা আ. ও ফেরাউন, ইবরাহীম আ., নূহ আ., ইউসুফ আ. এবং ভূতত্ত্ব, দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞান ও মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে।

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আজকের মূর্তি-উপাসক সনাতনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে একজন নবী এসেছিলেন। তিনি নিজ হাতে মূর্তি ভেঙে এক আল্লাহর ইবাদত করতে তাঁর জাতিকে আহ্বান করায় তাঁকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। তিনি ইবরাহীম আ.। খ্রিস্টানরা তাঁকে আব্রাহাম বলে। হিন্দুরা তাঁর অনুসারীকে ব্রাহ্ম্য ও তাদের ধর্মগুরুকে তাই ব্রাহ্মণ বলে থাকে। ইব্রাহীমকে আগুনে ফেলার কারণে হিন্দুদের ভেতর সতীদাহ প্রথা চালু হয়েছে। ইব্রাহীম হজ্বের পোশাক পরে হজ্ব করেছিলেন, সে থেকে হিন্দুদের কারো বাবা-মা মারা গেলে তারা হজ্বের পোশাকের অনুরূপ পোশাক পরে থাকে। হিন্দুরা নামাজের সেজদার অনুরূপ

www.pathagar.com

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, কুরবানির অনুরূপ বলি দিয়ে থাকে, রোজার অনুরূপ উপবাস ব্রত পালন করে। সুতরাং হিন্দুদের নবী হচ্ছেন ইবরাহীম আ.। তবে আজকের হিন্দুরা তাদের নবীর শিক্ষা ও নবীকে পুরো মাত্রায় ভুলে গিয়েছে। এ বর্ণনা ও তত্ত্ব তালিব ভাইকে একদিন দিয়েছিলাম। তিনি হেসে উচ্ছ্বসিতভাবে আমার কথার সমর্থন দিয়ে বলেছিলেন, হয়তো দার্শনিক কনফুসিয়াস ও জরাথ্রুস্টও নবী ছিলেন, কিন্তু লোকেরা তাদের শিক্ষা ভুলে উল্টো পথে চলতে শুরু করেছে।

তালিব ভাই নৃতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে এমন কিছু কথা আমাকে বলেছেন, যা আমি কখনো কোনো বইতে পড়িনি। তালিব ভাইয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে আল্লামা রুমি, দার্শনিক ফারাবি, ইবনে সিনা, ইমাম গাজ্জালি, খৈয়াম, হাফিজ, সাদি, জামাল উদ্দিন আফগানি, আল্লামা ইকবালকে নিয়ে। সক্রেটিস, প্লেটো, রাসেল, হেগেল, কার্লমার্কস, ফ্রয়েড, এমনকি শেক্সপিয়র, মোপাসা, আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিন্স, গুরু নানক, কনফুসিয়াস, জরাথ্রুস্টকে নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। জিন্নাহ, মহাত্মা গান্ধী, শেরে বাংলা ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানকে নিয়েও তাঁর সাথে আমার কথা হয়েছে। মাওলানা মওদূদীর কথা বলতে গেলে তিনি নিজেকে যথেষ্ট গুছিয়ে ও সংযত করে নিতেন।

একবার এক দারসের অনুষ্ঠানে সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগব্যাং সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা শুনে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। তালিব ভাইয়ের মেধা-মননে বিশাল তত্ত্ববান ও বিচিত্র জ্ঞানের সমাহার ঘটেছিল।

আবদুল মান্নান তালিবকে নিয়ে বলতে গেলে তো কথা শেষ হবে না, তাই বেশি কথা না বলাই ভালো মনে করছি। শুধু এটুকু বলবো, তাঁর পড়াশোনা, মেধা, প্রজ্ঞা ও মনীষা দেখে আমি বিপুলভাবে বিস্মিত হয়েছি।

www.pathagar.com

সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক ও অনুবাদক

বেদুঈন মোস্তফা

আবদুল মান্নান তালিবকে আমি জানি সেই ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে। তখন আমি সবেমাত্র আগরদাড়ী সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়তে পড়তে সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে (সে সময় টাউন হাই স্কুল) এসে ভর্তি হয়েছি। বড় ভগ্নিপতি ঐ স্কুলের শিক্ষক জনাব ইউনুস আলীর বাড়িতে থাকি। পায়জামা পাঞ্জাবী আর মাথায় জিন্নাহ্ ক্যাপ পরে সেখান থেকে স্কুলে যাতায়াত করি। স্কুল থেকে একদিন বাড়ি ফেরার পথে হেকিমি দাওয়াখানার হেকিম সাহেবের ছেলে ঐ স্কুলের ছাত্র আমাদের সিনিয়র বাশার ভাই আমাকে দাওয়াখানায় ডাকলে সেখানে যেয়ে বসলাম। বিভিন্ন কথাবার্তার পর আমাকে একটা সংগঠনের দাওয়াত দিলে দাওয়াত কবুল করলাম। তারপর সংগঠনের বিভিন্ন কাজ-কর্মে আস্তে আস্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম। আর তখন থেকেই আবদুল মান্নান তালিবের সাথে আমার জানাশোনা। সংগঠনের একটি অপরিহার্য অংশ ছিলো ইসলামী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা পাঠ। প্রতিদিন কিছু না কিছু ইসলামী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে হতো। আর এই ইসলামী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা পাঠ করতে যেয়েই সাহিত্যিক, গবেষক, অনুবাদক ও সম্পাদক আবদুল মান্নান তালিবের সাথে আমার জানাশোনা। তাঁর লেখা পড়তে যেয়ে আশ্চর্য হতাম যে, একদিকে তিনি যেমন শিশু-কিশোরদের জন্য সহজ সরল ভাষায় সুন্দর সুন্দর বই লিখেছেন, অপরদিকে সাধারণ পাঠকের জন্য তাদের

www.pathagar.com

উপযোগী মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেছেন, আবার বোদ্ধা পাঠকদের ও গবেষকদের জন্য তাদের উপযোগী গুরুগম্ভীর গবেষণামূলক পুস্তকও রচনা করেছেন অর্থাৎ পাঠকদের কথা বিবেচনা করে তাদের মেধা ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী তিনি তাঁর লেখনি পরিচালনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' ও মাসিক 'পৃথিবী' একটি উৎকৃষ্ট মানের পত্রিকা। ভাষার গুরু গম্ভীর্য সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদনার গুণে সব শ্রেণীর পাঠকদের কাছে পত্রিকা দু'টি সমানভাবে সমাদৃত হয়েছিলো।

আবদুল মান্নান তালিবের সাথে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয় মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' অফিসে। আমি তখন আমার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'প্রগলভে'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বের করার জন্য লেখকদের দ্বারে দ্বারে লেখা সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। একদিন 'দৈনিক সংগ্রাম' অফিসে বসে সংগ্রামের শিশুদের পাতা 'নীল সবুজের হাট'-এর সম্পাদক শিশু সাহিত্যিক শরীফ আবদুল গোফরান ভাইয়ের সাথে তার কক্ষে বসে আমার পত্রিকার লেখা সংগ্রহের জন্য কথা বলছিলাম। উনি আমাকে বললেন, পাশেই 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' অফিস। ওখানে যান। আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের কাছে যেয়ে একটা লেখা চান। এ কথাটা শুনেই আমি শিহরিত হলাম।

লোকেশনটা জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ'-এর উদ্দেশে। তারিখটা ছিলো ১১ নভেম্বর, ২০১০। আমি আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় সাহিত্য পরিষদের অফিসে ঢুকলাম। সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের পর চেয়ার টেনে বসলাম। খুবই আন্তরিকভাবে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি আমার পরিচয় দিলাম। তারপর বললেন, 'আমার জন্মস্থান সাতক্ষীরার বিপরীতে ভারতের বসিরহাট মহকুমার মগরাহাট থানায়।' জানতে চাইলাম, 'সাতক্ষীরায় কখনো এসেছেন কিনা?' জানালেন, উনি সাতক্ষীরা দিয়ে কয়েকবার বর্ডার পার হয়ে ভারতে গেছেন।

পরে বসে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে আন্তরিকভাবে অনেক কথা হলো। কোথায় উঠেছি জানতে চাইলে বললাম, 'মগবাজার ওয়ারলেস গেটে মেয়ে জামাইয়ের বাড়ি উঠেছি।' পাশে বসা তৌহিদ ভাইয়ের সাথেও অনেক কথা হলো। চা, নাস্তা খাওয়ার পর আমার পত্রিকায় লেখা দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। আবদুল মান্নান তালিব ভাই ও তৌহিদ ভাই লেখা দেবেন বলে কথা দিলেন। বিদায় নেওয়ার সময় বললাম, 'ভাই, আপনার লেখা পড়ে এতদিন ধারণা ছিলো যে, আপনি শিশুর মতো সহজ সরল নতুবা গুরু গম্ভীর চেহারার একজন মুরুব্বী, বিশেষ করে আপনার সম্পাদিত পত্রিকা ও বই পড়ে শেষের চেহারাটা আমার মনে বিশেষভাবে গেঁথে গিয়েছিলো। উনি শুধু মুচকি হাসলেন।

এরপরও প্রায় মাস খানেক ঢাকায় ছিলাম। প্রায়ই সংগ্রাম অফিসে যেয়ে ইসমাঈল হোসেন দিনাজী ও শরীফ আবদুল গোফরান ভাইয়ের

www.pathagar.com

সাথে ও বাংলা সাহিত্য পরিষদের অফিসে যেয়ে আবদুল মান্নান তালিব ভাই ও তৌহিদ ভাইয়ের সাথে বসে গল্প করতাম। তালিব ভাই প্রায়ই আলাপ করতেন ইসলামী সাহিত্য কি? কেমন তার রূপরেখা আর কেমনভাবে আমাদের সাহিত্য রচনা করতে হবে। মুসলমানদের জন্য সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান উপদেশ লাভ করি।

ঢাকা থেকে সাতক্ষীরা আসার সময় তৌহিদ ভাই একটা লেখা দিলেন আর আবদুল মান্নান তালিব ভাই লেখা পাঠিয়ে দেবেন বলে আমার ঠিকানা নিলেন। সাতক্ষীরা এসে সময় মতো আমি লেখা পেয়েছিলাম।

পরবর্তী সময়ে আমি আবার ২৪ জুন, ২০১১ সালে ঢাকায় আমার মেয়ে জামাইয়ের বাড়ি যাই। ২৬ জুন অভ্যাস মতো সংগ্রাম অফিসে যেয়ে ইসমাঈল হোসেন দিনাজী ভাই ও শরীফ আবদুল গোফরান ভাইয়ের সাথে গল্প করি। পরে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ'-এ যাই। দেখি তৌহিদ ভাই একা একা বসে আছেন। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আমাকে যে দুঃসংবাদটি দিলেন সেটি শোনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। শুনলাম আবদুল মান্নান তালিব ভাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর মাঝে মাঝে বাংলা সাহিত্য পরিষদে যেয়ে তৌহিদ ভাইয়ের সাথে গল্প করে ও আবদুল মান্নান তালিব ভায়ের শারীরিক কুশলাদির খবর নিয়েছি।

১৩ জুলাই বাংলা সাহিত্য পরিষদের তৌহিদ ভাইয়ের কাছে শুনলাম আবদুল মান্নান তালিব ভাই ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল থেকে একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি এসেছেন। যদিও জানি এ রোগ নিরাময়যোগ্য নয়, তবু মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। মনে মনে প্রস্তুত হলাম দেখা করতে যাবো। তৌহিদ ভাইকে বললাম আমার সাথে যাওয়ার জন্য। তৌহিদ ভাই পরদিন আসতে বললেন।

পরের দিন ১৪ জুলাই সকাল সকাল তৈরি হয়ে যথাসময়ে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ'-এ গেলাম। সাহিত্য পরিষদ থেকে তালিব ভাইয়ের লেখা গবেষণামুলক বই 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' এবং উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীর লেখা আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের অনূদিত দু'টি বই 'ভারত যখন ভাঙলো', 'প্রত্যয়ের সূর্যোদয়' নিয়ে অফিসের বেলাল ভাইয়ের সাথে বাসায় গেলাম। কলিংবেল বাজাতেই দরজা খুলে আমাদের নিয়ে কক্ষে বসতে দিলেন। কক্ষের চারদিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বসার খাটের দুইধার দিয়ে ছাদ সমান উঁচু কাঠের আলমারিতে থরে থরে সাজানো দামী দামী দুষ্প্রাপ্য বই। মাথার কাছে একটা জানালা ও পায়ের দিকে কক্ষে ঢোকার একটা ছোট পথ। পর্দা দিয়ে আলাদা করা। চিন্তা করলাম, একজন মানুষ এমন জ্ঞানের রাজ্যে বসবাস না করলে তাঁর কলম থেকে কখনো এমন জ্ঞানগর্ভ লেখা ও চিন্তা ভাবনা বের হয় না। কথা সাহিত্যিক সরদার জয়েনুদ্দীন একবার সাতক্ষীরায় বই মেলা উদ্বোধন উপলক্ষে এসে আমাকে অটোগ্রাফ দিতে লিখেছিলেন, 'বই পড়ো! জ্ঞান তোমার

www.pathagar.com

ক্রীতদাসে পরিণত হবে। সে তোমার সকল বোঝা বয়ে বেড়াবে' কথাটি যে কতো সত্য এখানে এসে সেটা উপলব্ধি করলাম।

অসুস্থ জেনে বই তিনটিতে অটোগ্রাফ নিয়ে চলে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। কিছুতেই উঠতে দিলেন না। নাস্তা দিলেন। খেয়ে আবারও উঠতে চেষ্টা কলাম। বসতে বললেন। বেলাল ভাই চলে এলেন। তার পর বসে দু'জন সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং শব্দ ও বানানের ওপর অনেকক্ষণ আলাপ করলাম। অবশেষে চলে আসার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, সাতক্ষীরায় তাঁর সম্পাদিত 'ইসলামিক ল'রিসার্চ সেন্টার এ্যান্ড লিগাল এইড বাংলাদেশ' থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইসলামী আইন ও বিচার' পাওয়া যায় কিনা? বললাম, 'না।' আমাকে এপ্রিল-জুন সংখ্যা একটি পত্রিকার কপি অটোগ্রাফসহ দিলেন। সালাম বিনিময়ের পর বাসা থেকে বের হয়ে চলে এলাম। তখন কি জানতাম, এই দেখাই শেষ দেখা হবে। ঢাকায় ডাক্তার দেখিয়ে ৯ আগস্ট সাতক্ষীরায় চলে আসি।

১০ সেপ্টেম্বর অসুস্থ শরীর নিয়ে আবার ঢাকায় আসতে হলো। ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ২০ সেপ্টেম্বর 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে' তৌহিদ ভাইয়ের সাথে দেখা করতে গেলাম। বসে অনেকক্ষণ গল্প করলাম। আবদুল মান্নান তালিব ভাইয়ের শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলাম। দারুণ অসুস্থ শুনে ঠিক করলাম দুই একদিনের মধ্যে দেখা করতে যাবো। ঢাকায় থমথমে অবস্থা ও সরকার কর্তৃক বিরোধী দলের ওপর হামলার কারণে বাসা হতে ২/৩ দিন বের হইনি। ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে টিভি খুলে ব্রেকিং নিউজে দেখি আবদুল মান্নান তালিব ভাই ইন্তিকাল করেছেন। সাথে সাথে তৌহিদ ভাইয়ের কাছে মোবাইল করে সব কিছু শুনলাম। গতকাল তাঁর জানাযা ও দাফন করা হয়েছে তাও শুনলাম। এতো নিকটে থেকে তাঁর জানাযায় অংশ নিতে পারলাম না এ দুঃখ হয়তো জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না।

আমাদের সকলকে এখানে রেখে পরপারে মাওলার দরবারে চলে গেলেন এ যুগের মোজাদ্দেদ, শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, সুফি-সাধক, মৌলিক প্রতিভাধর ইসলামী গবেষক, তাত্ত্বিক, ধর্ম বিষয়ক পণ্ডিত, পীরে কালেম আবদুল মান্নান তালিব ভাই। এ জগতে আর কোনো দিন তাঁর সাথে দেখা হবে না। শোনা হবে না তাঁর মুখ থেকে ইসলামী সাহিত্যের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' গেলে তাঁর শূন্য চেয়ারে দেখা হবে না সফেদ পোশাকে বসা দরবেশ সাধক আবদুল মান্নান তালিবকে।

আবদুল মান্নান তালিব ভাই ছিলেন নিরহঙ্কার, বন্ধুবৎসল, নির্লোভ চরিত্রের একজন সাচ্চা মুমিন মুসলমান। তাঁর মতো অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান সমস্ত অর্থবিত্ত, বিলাস ব্যসন ফেলে রেখে ইসলামের জন্য এক কাপড়ে পথে বের হতে পারে এমন দৃষ্টান্ত এ যুগে বিরল। তিনি যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন শেষের দিকে বাড়ি আসার জন্য খুবই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, বলেন, 'আমি আর দশ বারো দিনের বেশি বাঁচব না, তোমরা আমাকে আর হাসপাতালে আটকে রেখো না। মরার আগেই আমাকে ইসলামী শরিয়া

www.pathagar.com

মতো পাক সাফের প্রয়োজন আছে।' কি আশ্চর্য! হাসপাতাল থেকে বাড়ি আসার পর ঠিক বারো দিনের মাথায় পরম মাওলার সান্নিধ্যে তিনি চলে যান।

একজন আবদুল মান্নান তালিব দুনিয়াতে একবার জন্ম নিয়ে ফুলে ফলে লতা পাতায় পৃথিবীকে ভরিয়ে দিয়ে চিরবিদায় নিয়ে আবার তাঁর শেষ মঞ্জিলে চলে যান। এমন ক্ষণজন্মা বিরল প্রতিভাধর পুরুষ বারবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন না। পৃথিবীর মানুষ যখন ধর্মের আদর্শ থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়, তখন তাদের আলোর পথ প্রদর্শন করতে যুগে যুগে আল্লাহ একদল মহামানব প্রেরণ করেন যাঁরা মানুষকে গোমরাহির পথ থেকে আলোর পথ প্রদর্শন করেন। পঙ্কিলতার আবর্ত থেকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন– এরূপ সত্য পথ প্রদর্শনকারীদের একজন হলেন আবদুল মান্নান তালিব যিনি ছিলেন এ যুগের একজন প্রকৃত মুজাদ্দিদ।

আবদুল মান্নান তালিব ১৯৩৬ সালের ১৫ মার্চ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মগরাহাট থানার অন্তর্গত অর্জুনপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম তালেব আলী ও মাতার নাম মরহুমা মেহেরুননেসা।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা জীবনে প্রথমে হাতে খড়ি। ১৯৫০ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিক পাস করেন। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকায় পিতার প্রবল ইচ্ছা ছিলো তিনি ডাক্তারী পাস করে এলাকার জনগণের খেদমত করবেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা যাঁকে দিয়ে ইসলামের প্রচার প্রসার করিয়ে তাঁর একজন প্রিয় বান্দা, যুগের মোজাদ্দিদে পরিণত করবেন তিনি কিভাবে ডাক্তার হবেন? তাই সংসারের সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করে মুসাফিরের ন্যায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরতে থাকেন। চলার পথে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁর ভবিষৎ জীবনের পথ ও কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলেন। তাই একদিন সোজা পাড়ি জমালেন পাকিস্তানে। লাহোরে এসে ভর্তি হলেন লাহোরের বিখ্যাত মাদ্রাসা জামেয়া আশরাফিয়ায়। এখান থেকে তিনি ১৯৫৭ সালে দাওরা-ই হাদিস ডিগ্রি অর্জন করেন। এ সময় তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামী গবেষক, যুগের মোজাদ্দিদ আল্লামা মওদূদী রহ.-এর সংস্পর্শে আসেন এবং ঠিক করে ফেলেন জীবনের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা।

১৯৫৭ সালে লাহোরে উর্দু দৈনিক 'রোজনামা তাসনীম'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিক জীবন শুরু করেন। অবশ্য এর আগে ১৯৫২ সালে পশ্চিম- বঙ্গের বীরভূম থেকে 'জিয়াউল ইসলাম' নামে একটি বার্ষিক সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। দৈনিক 'রোজনামা তাসনীম'-এ তিনি ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ঐ বছর ১৯৫৯ সালে ঢাকায় চলে আসেন এবং 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এর সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৬২ সালে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকায় যোগ দেন এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকার 'ইসলামিক রিসার্চ

www.pathagar.com

একাডেমি' ঢাকার রিসার্চ স্কলার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭২ সালে তিনি তাঁর জন্মভূমি ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যান। সেখানে তিনি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মিযান' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৫ সালে আবার ঢাকায় ফিরে আসেন এবং পূর্বের কর্মস্থল 'বাংলাদেশ ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার'-এর রিসার্চ স্কলার হিসেবে যোগদান করে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ইসলামী গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্বের পাশাপাশি ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা পরবর্তীকালে মাসিক 'কলম' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ১৯৮১সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত মাসিক 'পৃথিবী'র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে আমৃত্যু 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ'-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ'-এর মুখপত্র 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' ও মাসিক 'প্রতিশ্রুতি'র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী অর্থনীতি ও আইনের ওপর আবদুল মান্নান তালিবের ব্যাপক পড়াশোনা ছিলো, যার পরিপেক্ষিতে আমৃত্যু তিনি 'ইসলামিক 'ল' রিসার্চ সেন্টার এ্যান্ড লিগাল এইড বাংলাদেশ'-এর গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত পত্রিকা ও এর সম্পাদকীয় পাঠ করলে আইনশাস্ত্রের ওপর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় সহজেই উপলব্ধি করা যায়। উক্ত সম্পাদকীয়গুলো পত্রিকা থেকে আলাদাভাবে বইয়ের আকারে প্রকাশ করলে আমাদের আইনশাস্ত্রের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করি। উক্ত পত্রিকার অনেক ভালো ভালো প্রবন্ধের তিনিই ছিলেন অনুবাদক।

এমন এক সময় ছিলো যখন বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায়, কৃষ্টি-কালচারে পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে গণ্য ছিলো। পাক-ভারত উপমাহদেশে ইসলামের অভ্যুত্থানের পর থেকে বাঙালি জাতি ইসলামের সংস্পর্শে এসে নিজেদেরকে সভ্য জাতি হিসেবে গড়ে তোলে এবং এ ধারা ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এদেশে ইংরেজ আগমনের পর হিন্দুদের সাথে যোগসাজসে মুসলমানদের শিক্ষা, অর্থ ও চাকরি থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখে। তারা না পায় ধর্মীয় শিক্ষা না পায় পাশ্চাত্য শিক্ষা। আর শিক্ষার অভাবে সমাজের রন্ধে রন্ধে কুসংস্কারে ভরে গিয়েছিলো। হিন্দুদের মতো মুসলমানদের ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালানো, গাছতলায় ক্ষীর পায়েস দেওয়া ইত্যাদি বেদাতি কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এর মূল কারণ ছিলো ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের অভাব। ব্রিটিশদের কাছ থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎকালীন পাকিস্তানে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি উন্নাসিকতার কারণে কোনো মেধাবী ও সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা মাদ্রাসায় পড়তে যেতো না। অপেক্ষাকৃত কম মেধাসম্পন্ন ছাত্রদের অগতির গতি ছিলো ধর্মীয় শিক্ষা। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হতো আধুনিক বিজ্ঞানবহির্ভূত অসম্পূর্ণ ধর্মীয়

www.pathagar.com

শিক্ষা। এর ফলে তারা ধর্মীয় শিক্ষা শিখে কোনো সরকারি চাকরি পেতো না। ফলে সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি বিমুখ ছিলো। তারা কোনো রকমে একটু আরবি শিখে সমাজে এসে মিলাদ পড়ানো, ফতোয়া দেওয়া, বিবাহ পড়ানো ইত্যাদি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। ফলে তাদের দ্বারা সমাজের কোনো বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। আর তৎকালে আরবি ভাষার কোনো ভালো বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ ছিলো না। তখন আরবি শেখার আগে উর্দু শিখতে হতো। আরবি থেকে অনেক ভালো ভালো গ্রন্থ উর্দুতে অনূদিত হয়েছিলো, এমন কি মাদ্রাসায় কোরান-হাদিস পড়তে হলে উর্দুর মাধ্যমে পড়তে হতো এবং বুঝতে হতো। এই আরবি সাহিত্য বাংলা মাধ্যমে আমাদের বোধগম্য করার জন্য যে কয়জন অনুবাদকের কাছে আমরা চিরঋণী নিৎসন্দেহে আবদুল মান্নান তালিবের স্থান সবার অগ্রে।

আবদুল মান্নান তালিবের ভিতর সাহিত্যের বিকাশ ঘটে তাঁর ছাত্র জীবনে। ছাত্র জীবনে কবিতায় তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। সাথে সাথে তিনি উর্দু সাহিত্য থেকে অসংখ্য কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। আবার বাংলা সাহিত্য থেকেও অনেক কবিতা, বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের অনেক কবিতা উর্দুতে অনুবাদ করে উর্দু ভাষাভাষীদের মধ্যে তাঁদের ব্যাপক পরিচিতি আনায়ন করেন।

বাংলা সাহিত্যে আবদুল মান্নান তালিবের সবচেয়ে বড় অবদান হলো ইসলামী অনুবাদ সাহিত্য, যেটা তাঁকে চিরদিন অমর করে রাখবে। আমি মনে করি ইসলামী সাহিত্যে, বিশেষত ইসলামী অনুবাদ সাহিত্যে মাওলানা আবদুর রহীমের পরই তাঁর স্থান। ভাষার অলংকার, নির্মেদ, প্রাণবন্ত, রুচিশীল ও ঝরঝরে লেখা তাঁর রচনাশৈলীকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি আরবি, ফার্সি, উর্দুসহ ছয়টি ভাষা জানতেন। তিনি এ সমস্ত ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন বিশাল সাহিত্যের ভাণ্ডার, অনুবাদ করেছেন প্রায় শতাধিক গ্রন্থ। এর মধ্যে আধুনিক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত মরহুম আল্লামা মাওলানা মওদূদি রহ. লিখিত বিশ্ববিখ্যাত তাফসির 'তাহফীমুল কুরআন'-এর উর্দু থেকে বাংলায় অনূদিত সহজ সরল অনুবাদ (১৪-১৮ খণ্ড বাদে)। অনুবাদ করেছেন ডক্টর মোঃ ইকবালের 'যরবে কলমি', 'সীরাতে সরওয়ারে আলম', 'সহীহ আল-বুখারী', 'রিয়াদুস সালেহীন', 'রাসালেয় মাসালেয়', 'রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা' ইত্যাদি। আবার সহজ সরলভাবে শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন প্রায় ১৬টির মতো গ্রন্থ, যা কিনা শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনের জন্য মৌলিক ভূমিকা রাখতে পারে। শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলোঃ ছোটদের ইসলাম শিক্ষা ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, এসো জীবন গড়ি ১ম, ২য় খণ্ড, আমাদের প্রিয় নবী, মজার গল্প, ইসলাম শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ, কে রাজা, সহজ পড়া, হাতিসেনা কুপোকাত, আদাবুল আরাবিয়া, মা আমার মা ইত্যাদি।

আবদুল মান্নান তালিবের মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১২টির মতো। 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান', ও 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা :

www.pathagar.com

ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' গবেষণামূলক গ্রন্থ দু'টি ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের পথ প্রদর্শক হিসেবে গাইডের কাজ করবে।

তাঁর অন্যান্য রচনা যেমন : ১। অবরুদ্ধ জীবনের কথা, ২। মুসলমানের প্রথম কাজ, ৩। বাংলাদেশে ইসলাম, ৪। আমল আখলাক, ৫। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন, ৬। ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন, ৭। সত্যের তরবারী ঝলসায়, ৯। আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম ইত্যাদি।

আবদুল মান্নান তালিব আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর মৃত্যুতে ইসলামী সাহিত্যের অফুরন্ত ক্ষতি সাধিত হলো। তাঁর সাহিত্যকর্ম তাঁকে আমাদের মাঝে চিরজাগরূক করে রাখবে। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা যেনো তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করেন।

আমিন!

www.pathagar.com

যে স্মৃতি প্রেরণা যোগায়

মুহাম্মদ কামাল হোসাইন

মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে সৃষ্টি করছেন এবং সাথে সাথে তাকে খিলাফাত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স. পর্যন্ত অসংখ্য নবী ও রসূলকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নির্দেশিত পথে মানব জাতিকে চালানোর জন্য প্রেরণ করেছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে এ নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বিদায় হজ্বের ভাষণে বিশ্বনবী স. বলেন, আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। তা হলো আল কুরআন ও আল হাদীস, যতোদিন তোমরা এ দু'টোকে আঁকড়ে থাকবে ততোদিন পথভ্রষ্ট হবে না।

একদা রসূল স. সাহাবীদের বললেন, আমি তোমাদের মাঝে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনি আমার পরে আলেমগণ সাধারণ মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ। রসূল স. আরও বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সরাসরি এ পৃথিবী থেকে এলেম উঠিয়ে নেবেন না, বরং আলেমদের জন্য কবরের (মৃত্যুর) মাধ্যমে এলেমকে উঠিয়ে নেবেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম আবদুল মান্নান তালিবকে নিয়ে নিলেন, তিনি এমন একজন বিখ্যাত আলেম, বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, সুলেখক, সাহিত্যিক ছিলেন। যাঁর সম্পর্কে লিখতে গেলে আমার কলম স্তব্ধ হয়ে যায়। শরীর শিউরে ওঠে। কিন্তু যখন জানতে

www.pathagar.com

পারলাম তাঁকে নিয়ে স্মারক গ্রন্থ বের হচ্ছে, তাই বিবেকের তাড়নায় এ মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু না লিখলে নিজেকে অনেক বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। ২০০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন তাঁর নিজ বাড়ি শান্তি বাগের নূরজাহান ভিলায় ওঠার সৌভাগ্য হয়। কিন্তু আমি জানতাম না যে, এই বাড়িতেই এ মহান ব্যক্তি থাকেন।

তাঁর বাড়ি সংলগ্ন মসজিদটিই হচ্ছে মসজিদ-ই-নূর। তাই নিয়মিত তাঁর সাথে জামায়াতে নামায আদায়ের সৌভাগ্য হয়। কিন্তু ফজরের নামাযের আগে যখন বাড়ির গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় প্রতিদিন গেট খোলা পেতাম তখন মনে মনে ভাবতাম এ বাড়িতে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি আমাদের আগে গেট খুলে চলে যান। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর হঠাৎ একজন ছাত্র ভাইয়ের মুখ থেকে শুনতে পেলাম আবদুল মান্নান তালিব সাহেবের কথা। তার মুখ থেকে শুনে নিজের কাছে অবাক মনে হচ্ছিল। আমি তাকে একটু অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এ কি সেই আবদুল মান্নান তালিবের বাসা যিনি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' অনুবাদ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন আমার মনটা আনন্দে ভরে গেল। কারণ বাংলাদেশে যারা ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের সাথে ন্যূনতম সম্পৃক্ত তারা অবশ্যই ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী, চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, সত্যের তরবারী ঝলসায়, তাফহীমুল কুরআন-এ সকল বই পড়ে থাকবেন। যা হোক, বেশ কিছুদিন ধরে মনের মাঝে আগ্রহ জন্মেছে কিভাবে এ মহান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করা যায়। হঠাৎ একদিন কয়েকজন বন্ধুকে সাথে নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। রসূল স.-এর সাহাবীদের কথা মনে পড়ে গেল। এ মহান ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে নিজেকে গর্বিত মনে হলো। এর পর মাঝে মাঝে ওনার সাথে দেখা করতে যেতাম। একজন মানুষকে কিভাবে যে সহজেই আকৃষ্ট করা যায় সে গুণ তাঁর মাঝে খুঁজে পেলাম।

আমি ওনার ছেলের বয়সী হলেও কখনও আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন না। সব সময় আপনি বলতেন। সুযোগ হলেই ওনার কাছে ছুটে যেতাম কিছু জানার জন্য। ইসলামী আন্দোলনে যোগদান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি তাঁর জীবনী আমাদের খুলে বলতেন। মূলত ভারতের পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট গ্রামে ওনার জন্ম হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাবা-মায়ের ইচ্ছা ছিল ওনাকে মেডিকেলে পড়িয়ে ডাক্তার বানাবেন মানব সেবার জন্য। কিন্তু তৎকালীন মেট্রিক পাস করে তাঁর মনে ইলমে দ্বীন শেখার আগ্রহ জন্মাল। তাই তিনি ভারতের বিখ্যাত মাদ্রাসায় ভর্তি হলেন এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে ইলমে দ্বীনের পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। সেই থেকেই দ্বীনী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বিচরণ করেন। পরবর্তীতে অর্জিত জ্ঞানের তাড়নায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাফেলায় শরীক হওয়ার আগ্রহ জন্মে। বিখ্যাত আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আল মওদূদী রহ.-এর কথা শুনে তিনি নিজ

www.pathagar.com

জন্মভূমি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে কয়েক শ' মাইল অতিক্রম করে মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎ পান এবং ক্রমান্বয়ে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে আরও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিকে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং শুধু দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য বাবা-মা, ভাই-বোনসহ সকল আত্মীয়দের ত্যাগ করে বাংলাদেশে হিজরত করেন। বাবার কয়েক শত একর জমি ছিল ভারতে কিন্তু সেগুলো ত্যাগ করে তিনি এদেশে চলে আসেন দীন প্রতিষ্ঠার কাজের জন্য। তাঁকে একবার একটি ইফতার মাহফিলে দাওয়াত দিলাম। তিনি সেখানে এত সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য পেশ করলেন যা সকলের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও অমায়িক। সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। দুনিয়ার কোন লোভ কখনই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। অর্থ সম্পদকে তিনি তুচ্ছ মনে করতেন। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। হৃদয়টা ছিল অনেক প্রশস্ত। যে কেউ তাঁর কাছে সমস্যা নিয়ে এলে তিনি বিমুখ করতেন না, বরং সাধ্যমত সহযোগিতা করতেন। তাঁর একটি প্রমাণ হলো ঢাকা শহরে প্রতি বছর বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়। একবার ওনার বাড়িতে প্রতিটি ফ্লাটে ভাড়া বৃদ্ধি করা হলো, তখন আমি ওনার কাছে ছুটে গেলাম এবং বললাম, আমরা তো সবাই ছাত্র। আমাদের জন্য একটু কমালে ভালো হতো। তিনি বললেন, বাড়ির ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। আপনারা যেহেতু ছাত্র তাই অর্ধেক করে দিলাম। আমি তখন অবাক হয়ে গেলাম। কোন অভাবী তাঁর কাছে এলে নিজে কষ্টে আছে সেটা বুঝতে না দিয়ে বরং সাধ্যমত সাহায্য করতেন। ওনার সাথে যখনই সাক্ষাৎ হতো তখনই জিজ্ঞেস করতেন, আপনাদের দাওয়াতী কাজের অবস্থা কেমন? সব সময় যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত উদাহরণ দিতেন। বর্তমান বিশ্ব, ইসলামী আন্দোলন ও বাংলাদেশের অবস্থা সকল বিষয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দাওয়াতী কাজের কৌশল অবগত করতেন। একবার কিশোর কণ্ঠের একটি লেখা উনি আমাকে দেখালেন এবং বললেন, ছোটদের উপযোগী করে লিখতে হয়। কারণ ভাষা বেশি কঠিন হলে ছোটরা বুঝবে না।

তিনি ছিলেন জ্ঞানের একজন নির্ভীক সাধক। কখনো কারো প্রতি রাগ করতেন না, দুঃখকে সহজেই বরণ করে নিতে পারতেন। ২০১১ সালে তিনি যখন অসুস্থ, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে আমরা কয়েকজন ওনাকে দেখতে গেলাম। প্রচণ্ড অসুস্থ, যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। তার পরেও আমাদের দেখে প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের দাওয়াতী কাজের অবস্থা কেমন! আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ইসলামী আন্দোলনের কথা বললে উনি অসুস্থতার মাঝেও স্বস্তি ফিরে পেতেন। সর্বশেষ ওনার ইন্তেকালের আগের দিন বাসায় দেখতে গেলাম, তখন বিছানায় শুয়ে আছেন এবং হাতে সেলাইন লাগানো। আমাকে দেখে কাছে ডেকে বিছানার পাশে বসালেন এবং সর্বপ্রথম দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা এগুলো জানতে চাইলেন।

www.pathagar.com

সেখানে বিভিন্ন পত্রিকার প্রধান খবর ও সম্পাদকীয় পড়ে তাঁকে শোনাতে বললেন।

প্রায় এক ঘন্টা ওনার কাছে অবস্থন করলাম। এক পর্যায়ে দাওয়াতী কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওনার মেজো ছেলে জনাব আবদুল্লাহিল মাসুদ ভাই একবার এক সেট তাফহীমুল কুরআন ও কিছু ইসলামী সাহিত্য নিয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দীকীর কাছে গেলে তিনি মাসুদ ভাইয়ের সাথে এত সুন্দর আচরণ করেছেন– এ কথা বলে তালিব চাচা কেঁদে ফেললেন। চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে দাড়ি ভিজে গেল। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এ কেমন মানুষ যিনি মৃত্যুর সাথে লড়ছেন, আর সে মুহূর্তেও ইসলামী আন্দোলনকে নিয়ে ভাবছেন। আমাকে বললেন, আমরা যদি আরও আগে এই সমস্ত জ্ঞানী লোকদের ইসলামের প্রকৃত দাওয়াত দিতে পারতাম তাহলে ইসলামী আন্দোলন আরো এগিয়ে যেত। পরের দিন ২২ সেপ্টেম্বর বিকাল ৪টায় সময় জানতে পারলাম আবদুল মান্নান তালিব চাচা ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তখন কিছু সময় স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে কষ্ট হচ্ছে। এমন একজন মহান সাধকের বিদায় কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। যা হোক, ওনার গোসল শেষে প্রথম জানাযা নিজ বাড়ির সামনে মসজিদ-ই-নূর-এ অনুষ্ঠিত হল। সেখানে অসংখ্য লোকের ঢল নামলো তাঁর জানাযায়।

এরপর মগবাজার চাঁন মসজিদে দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হলো এবং সেখানেও হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে জানাযা শেষে যখন লোকদের কফিন দেখানোর জন্য উন্মুক্ত করা হলো আমি তাঁর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম ওনার মুখটা হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমার জীবনে এরকম কোন মৃত ব্যক্তিকে দেখিনি। সবশেষে আজিমপুর কবরস্থানে যাওয়ার পথে তাঁর গৃহশিক্ষক প্রশংসা করতে গিয়ে বললেন, আমার শিক্ষকতা জীবনের ১৮ বছরেও এত ভালো মানুষ আমি দেখিনি। কখনো পড়াতে না আসতে পারলে বা যথাসময়ে না এলেও কোনদিন আমাকে একটি কথাও বলেননি। বলেননি, আপনি নিয়মিত আসেন না কেন?

গৃহশিক্ষক আরও বললেন, ডিসেম্বর মাসে এক সপ্তাহ পড়ানোর পর পরীক্ষা শেষে স্কুল বন্ধ থাকে, তখন টিউশনি বন্ধ করে দিলেও তিনি পুরো মাসের বেতন দিয়ে দিতেন। আমি না নিতে চাইলে জোর করে হাতের মধ্যে দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, আপনি পরিবার নিয়ে চলবেন কিভাবে?

তিনি সব সময় কোমল ব্যবহার করতেন। তখন আমার রসূল স.-এর হাদীস মনে পড়ে গেল, যে কোন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যদি চারজন মুমিন ব্যক্তি তার ভাল হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় (সোবহানাল্লাহ)। এভাবে অসংখ্য লোক ওনার সুন্দর আচরণের প্রশংসা করলেন। তাই তো কবরে লাশ দাফনের সময় নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়েছিল এমন একজন গুণী ও জান্নাতী মানুষের সাহচর্য পেয়ে।

www.pathagar.com

এভাবে অসংখ্য স্মৃতি ও মূল্যবান কর্ম তিনি রেখে গেছেন। ইসলামী আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা– প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের করণীয় ও শিক্ষার বিষয়ে তিনি অবহিত করে গেছেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ইসলামের যথার্থ শিক্ষা তিনি রেখে গেছেন, যা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আসার সুযোগ করে দেবে।

পরিশেষে বলতে হয় আমাদের উচিত এমন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা। তাঁর রেখে যাওয়া কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া। তাহলে একদিন এদেশে কালেমার পতাকা পতপত করে উড়বে। কারণ যে জাতি তার মহান ব্যক্তিদের কদর ও সম্মান করে না সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং আমাদের সকলের উচিত তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলোকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া।

www.pathagar.com

সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলত জীবন চর্চারই আর এক নাম। আর ইসলাম তার ব্যাপকতর পরিসরে এ জীবন চর্চার সুযোগ দিয়েছে সবচেয়ে বেশি।

আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

জীবন কথা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

চলে গেলেন উপমহাদেশের বিদগ্ধ আলেম ও সুলেখক আবদুল মান্নান তালিব

আব্দুল হামীদ কাশেমী

আবদুল মান্নান তালিব সাহেব ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, গবেষক ও মশহুর আলেমে দ্বীন। আমার অগ্রজ সহোদর। আমার ৪ বছরের বড় ছিলেন মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব। ৭ ভাইয়ের মধ্যে পঞ্চম এবং ১২ ভাইবোনের মধ্যে নবম স্থানে তিনি অবস্থান করতেন। ১৯৩৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জনপুর গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম হাজী তালিব আলী ও মরহুমা মেহেরুন্নেসার ঘরে আজ থেকে ৭৬ বছর পূর্বে চোখ মেলে চান আবদুল মান্নান তালিব। আব্বার সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা থাকলেও বিশাল পরিবারে আলালের ঘরের দুলালের মতো প্রতিপালিত হননি। আব্বা ছিলেন খুব কড়া মেজাজের লোক। পরিবারের কেউ সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ভরসা রাখতো না, এমন কি আম্মাজানও। সর্বদা দহলিজে একজন গৃহশিক্ষক বরাদ্দ ছিল। বাংলাদেশের নোয়াখালি এলাকার অধিবাসী মরহুম মাস্টার হাবিবুল্লাহ ভুঁইয়া ছিলেন প্রথম শিক্ষাগুরু। বাংলা, ইংরেজি, এমনকি বিশুদ্ধ কুরআন শরীফও তাঁর কাছেই শিক্ষা লাভ করেন। ইনি দেশ বিভাগের পূর্বে মগরাহাট জুনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৯ সালে পাসপোর্ট আইন চালু হওয়ায় তিনি দেশে ফিরে যান। মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব ১৯৫০ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মগরাহাট মুসলিম হাই স্কুল থেকে সুনামের সঙ্গে ১ম বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্লাসে ১ম স্থান বরাবরই তাঁর রিজার্ভড ছিল। তাঁর ১

www.pathagar.com

বছরের বড় সহোদর ভাই মাওলানা ডাক্তার আব্দুল হান্নান রহ. তবলীগ জামাতের বিখ্যাত মুবাল্লিগ, তিনিও একই সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পড়াশুনায় আবদুল মান্নান তালিব বড় ভাইকে সর্বদা পিছনে রাখতেন। এর চেয়ে ২ বছরের বড় সহোদর ভাই তবলীগ জামাতের বিখ্যাত মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুল হাকিম কাশেমী ১৯৫০ সালে কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজ– বর্তমান আযাদ কলেজ থেকে আইএসসি পাস করে ঢাকায় এমবিএস পড়তে চলে যান। একই বছরে এরা দুই ভাই পাস করেন। তারপর এক চিল্লার নিয়তে নিজামুদ্দীন মারকাজে চলে যান। ওখান থেকে জামাতে পুনায় যান। নিজামুদ্দীনে ফিরে জানতে পারেন বড় ভাই আব্দুল হান্নান জামাতে মুরাদাবাদ গেছেন এবং সেখানে মাদ্রাসায় হালাহে দারাইনে হিফজে কুরআন বিভাগে ভর্তি হয়েছেন।

জানতে পেরে তাঁরও ইচ্ছা হলো আমি বাড়ি না ফিরে মাদ্রাসায় পড়বো। এই নিয়তে ইনি মুরাদাবাদে গমন করে মাদ্রাসা এমদাদিয়াতে ভর্তি হয়ে যান। আব্বাজানের ইচ্ছা ছিল সেজ ছেলে আব্দুল হাকিমকে ডাক্তার তৈরি করবেন, এজন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়তে পাঠান। আর এদের দু'জনের ১ জনকে ওকালতি পড়াবেন। কিন্তু দু'জনেই আব্বার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুনিয়ার লাইন ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জিন্দেগী পরকালের লাইন গ্রহণ করে ধন্য হন। এক ভাই হয়ে গেলেন মুহাদ্দিস, মুবাল্লিগ। আর এক ভাই হলেন দুই শতাধিক গ্রন্থের অমর লেখক ও গবেষক মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব রহ.। মুরাদাবাদে ২ বছর পড়ার পর বাড়ি ফিরে পূর্ববর্তী শিক্ষাজীবন শুরু করেন বীরভূমের সিউড়ীর মাদ্রাসা জিয়াউল ইসলামে ভর্তি হয়ে। এখানেই মাদ্রাসার বার্ষিক মুখপত্র জিয়াউল ইসলামে প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা। প্রবন্ধ লেখায় তাতেই হাতেখড়ি। এখান থেকেই পরবর্তী কালে দৈনিক ১০০ পৃষ্ঠা লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বড় ভাই হাফেজ আব্দুল হান্নান মুরাদাবাদ থেকে হেফজ শেষ করে জালালাবাদে মাওলানা লাইনে ভর্তি হন। ঐ সময় জালালাবাদ মাদ্রাসার একজন উস্তাদ কিছু ছাত্রসহ করাচির সিন্ধু প্রদেশে টুন্ডালাইয়ার শহরে দারুল উলুম মাদ্রাসায় গমন করেন। এঁরা দুই ভাই তাঁর সহগামী হয়ে করাচি গমন করেন ১৯৫৩ সালে। এখানকার শায়খুল হাদীস, এশিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিস, বুখারী শরীফের ৬ খণ্ডের ভাষ্যকার হযরত থানবী রহ.-এর ভাগ্নে ও খলিফা মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী রহ.-এর কাছে ভাইজান বুখারী শরীফ পাঠ করে ১ম স্থান অধিকার করেন।

অতঃপর লাহোরে চলে এসে সীরাতে মুস্তফা ও মা'আরিফুল কুরআনের লেখক এবং মিশকাত শরীফের আরবি ভাষ্যকার আততালীকুস্ সবীর গ্রন্থকার মাওলানা ইদরিস কান্ধলভীর সাহচর্যে পড়াশুনা করেন। এই সময় উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক এশিয়া'য় ধারাবাহিকভাবে বিশেষ আর্টিকেল লেখায় তিনি ব্রতী হন। ১৯৫৩-৬০ সাল অবধি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালে প্রখ্যাত আলেম ও গ্রন্থকার মাওলানা আবদুর রহীমের সান্নিধ্যে আসার ফলে বাংলা ভাষার জগতে অবাধ বিচরণের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানে তথা পূর্ব বাংলার ঢাকায় আগমন করে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকায় প্রথমে সাংবাদিক, পরে সম্পাদনার

www.pathagar.com

দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে 'মাসিক পৃথিবী' ও 'মাসিক কলম' একযোগে পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। পশ্চিম পাকিস্তানে থাকাকালীন তিনি উর্দুতে এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বাংলা ও উর্দু ভাষায় তিনি এমন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, ভাষান্তরে তাঁর সমকক্ষ মানুষ খুব কমই নজরে পড়ে। শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারীয়া সাহারানপুরী রহ. রচিত তবলীগ জামাতের সর্বশ্রেষ্ঠ তালিমের গ্রন্থ ফাজায়েলে আমাল বা তবলীগী নেসাব মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে এই জামাতের প্রধান হাতিয়ার ছিল আল্লামা হাফেজ মহিউদ্দিন রচিত আরবি গ্রন্থ রিয়াদুস সালেহীন এবং এর উর্দু তর্জমা। তবলীগে নেসাব মুদ্রিত হওয়ার পর এই কিতাব কেবল আরবি মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় স্থান পায়। কিন্তু এর ভাবাদর্শ এতই মনোমুগ্ধকর ও লোভনীয় ছিল যে মাওলানা মরহুম আবদুল মান্নান তালিব এর বঙ্গানুবাদ খুবই আকর্ষণীয় ভাষায় রূপান্তরিত করেন, তখন দু'খণ্ড কিতাবকে চার খণ্ডে মুদ্রিত (ব্যাখ্যাসহ) করতে হয়। মাওলানার অভিনব ভাষার জন্য কেবল আমেরিকায় বাঙালি অভিবাসীর মধ্যে তখন পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হয়। এমনিভাবে লক্ষ্ণৌ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মাওলানা সুলায়মান নদভীর কালজয়ী বক্তব্যের সংকলন 'খুতবাতে মাদ্রাজ'-এর বঙ্গানুবাদ 'পয়গামে মুহাম্মদী' বাংলা সাহিত্য জগতে অমর সৃষ্টি। 'বাংলাদেশে ইসলাম' বঙ্গে ইসলামী আগমনের প্রামাণ্য গবেষণামূলক সুবিশাল গ্রন্থ। সুবিখ্যাত বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ, সুলায়মান নদভীর বিশাল গ্রন্থ 'সিরাতুন নবী'র কয়েক খণ্ডের বঙ্গানুবাদ। কবি ইকবালের 'রুমুজে বেখুদী', 'বালে জিব্‌রীল', 'বাঙ্গে দারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বাংলা কাব্যে অনুবাদ তাঁর যোগ্যতার বিরাট দলিল।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম

১. ৬ খণ্ডে বুখারী শরীফ– বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা
২. ৪ খণ্ডে সীরাতুন নবী– বঙ্গানুবাদ
৩. ৪ খণ্ডে রিয়াদুস সালেহীন– বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনা
৪. ১ খণ্ডে খুতবাতে মাদ্রাজ– বঙ্গানুবাদ
৫. অবরুদ্ধ জীবনের কথা– গবেষণামূলক গ্রন্থ
৬) বাংলাদেশে ইসলাম– গবেষণামূলক গ্রন্থ
৭) রুমুজে বেখুদী (কাব্য)– বঙ্গানুবাদ
৮) বাঙ্গে দারা (কাব্য)– বঙ্গানুবাদ
৯) ২০টি ইসলামী শিশু সাহিত্য গ্রন্থ ইত্যাদি।

ইসলামী শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাংলা ভাষীদের জন্য যে অবদান তিনি রেখে গেছেন তার জন্য আখেরাতে তাঁকে আল্লাহ উত্তম বদলা দান করুন। আমীন! বর্তমানে স্ত্রী, তিন কন্যা ও উপযুক্ত ৬ পুত্র রেখে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ দুপুরে আল্লাহর পিয়ারা হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাঁর তিল তিল মাগফিরাত দান করে জান্নাতে উপযুক্ত স্থান দান করুন। শোকসন্তপ্ত পরিবারেও শান্তি দান করুন। আমীন!

www.pathagar.com

একজন আলোকিত মানুষ

আবদুল্লাহিল মাসুদ

আমার বাবা যাঁর জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাটের অর্জুনপুর গ্রামে। পারিবারিকভাবে আমার দাদা ছিলেন সম্ভ্রান্ত মুসলমান এবং আর্থিকভাবে অত্যন্ত সচ্ছল। জমি-জিরাত ও বিষয় সম্পত্তি ছিল অনেক। আমার বয়স তখন ছয় কি সাত হবে, নানার সাথে ১৯৭৪-এ যখন দাদার বাড়িতে বেড়াতে যাই তখন পরিত্যক্ত অবস্থায় চারদিকে পাকা দেওয়াল উপরে টিনশেড ভিতরে ইট সিমেন্ট দিয়ে পাকা আলাদা আলাদা গরুর খাবার ব্যবস্থা করা অনেক ডাবার মতো দেখতে পাই। এক সময় ঐ পরিত্যক্ত পাকা দালানের মধ্যে দেড় শতাধিক গরু থাকতো।

লেখাপড়াতে বাবা খুবই মেধাবী ছিলেন। দাদার স্বপ্ন ছিল তার এই ছেলেকে ডাক্তারী পড়াবেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বাবা চিন্তা করতেন ইসলামকে জানার জন্য মাদ্রাসা লাইনে লেখাপড়া করবেন। এ নিয়ে দাদার সাথে বাবার মন-কষাকষি চলতো। দাদা ডাক্তারী লাইনে পড়ানোর জন্য কোন ছাড় দিতে রাজী ছিলেন না। বাবাও মাদ্রাসা লাইনে পড়ার জন্য ছিলেন আপসহীন। সে কারণে সেই ছোটবেলাতেই সকল আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে বাবা বাড়ি থেকে চলে আসেন। ভর্তি হন মাদ্রাসায়। অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছেন। দিনের বেলা কাজ করতেন আর রাতের বেলা লেখাপড়া করতেন। ১৯৫৭ সালে লাহোরের বিখ্যাত মাদ্রাসা জামেয়া আশরাফিয়া থেকে দাওরা-ই-হাদিসে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেই সময় সারা বিশ্বে লাহোরের

www.pathagar.com

বিখ্যাত জামেয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসা ছিলো খুবই প্রসিদ্ধ। প্রথম জীবনে বাবা ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড অনুরাগী হয়ে পড়েন। ইসলামকে জানতে তাবলীগ জামাতে যোগদান করেন। তাবলীগ জামাতের সাথে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারে ঘুরে বেড়ান। আগেই বলেছি বাবা অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। লেখাপড়া করতেন প্রচুর। যে কোন ধরনের বই হাতের কাছে পেলে পড়ে ফেলতেন নিমেষেই। আমাদের বাসাতে ১০ হাজারের বেশি বই আব্বার সংগ্রহে ছিল। ত্রিপিটক, গীতা, বাইবেল থেকে শুরু করে ইংরেজি, আরবি, উর্দু, হিন্দি, ফার্সিসহ বিভিন্ন ভাষার বই ছিল তাঁর সংগ্রহশালায়। তিনি ৬টি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। দেশের প্রায় সকল নামকরা লেখকের বই তিনি সংগ্রহ করে পড়তেন। আমাদের বাসাতে এই বইগুলো এখনো আছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর শুধু ইসলামের টানে তিনি মাতৃভূমি ছেড়ে এপারে চলে আসেন। আপনারা জানেন দেশ বিভাগের সময় এক্সচেঞ্জের একটা সুযোগ ছিল। দাদার যে সম্পত্তি ছিল সেই সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার পর বাবার প্রাপ্ত অংশটুকু এপারে কোন হিন্দু পরিবারের সাথে বিনিময় করার জন্য দাদা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। বাবা তাতে সাড়া দেননি। বাবার অভিমত ছিল তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য হিজরত করেছেন। সম্পত্তির হাত বিনিময় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। মহান স্রষ্টার কাছে জবাবদিহিতার কথা বিবেচনা করে তিনি এ কাজটি করতে রাজী হননি।

এরকম আরো একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৮০ সালের কথা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাংবাদিকদের জন্য মীরপুরে আবাসিক প্লট প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একজন সাংবাদিক হিসেবে পত্রিকা অফিস থেকে প্লটের জন্য একটি আবেদনপত্র আব্বাও পেয়েছিলেন। কিন্তু আবেদন পত্রটি তিনি জমা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ আবেদনপত্রে একটি শর্ত ছিল যে, 'আবেদনকারী অথবা তার স্ত্রীর নামে ঢাকায় অথবা ঢাকার আশেপাশে কোন সম্পত্তি নেই' এই মর্মে আন্ডারটেকিং দিতে হবে। সেই সময় আমার নানা জীবিত। আমার মা নানা-নানীর একমাত্র সন্তান। স্বাভাবিক কারণেই শান্তিবাগের সোয়া দুই কাঠা প্লটের উপর দোতলা বাড়িটির মালিক আমার মা। নানা তখনই আমার মায়ের নামে বাড়িটি হেবা রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। বাবা ১৯৭৮ সালে মীরপুরের ১২ নম্বরে ৪ হাজার টাকায় একটা বাড়ি ক্রয় করেছিলেন। সেখানেই আমরা থাকতাম। বাবার সাংবাদিক বন্ধুরা প্লটের আবেদনপত্রটি জমা দিতে গড়িমসি করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঢাকায় আমার ও আমার স্ত্রীর নামে ২টি প্লট আছে। আমি কেন আবেদন করবো? আব্বার বন্ধুরা জবাব দিলেন, আমাদের অনেকেরই তো ঢাকায় প্লট আছে। আমরাও তো আবেদনপত্র জমা দিয়েছি। আপনি তো মীরপুরের বাড়িটি এখনো বরাদ্দ পাননি? তাছাড়া আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত, তারা এখনো শান্তিবাগের বাড়িটির মালিক।

তারপরও বাবা আবেদনপত্রটি জমা দেওয়া তো দূরের কথা, সেটা পূরণই করেননি। সাংবাদিকদের প্লট বরাদ্দের অনেক পরে আমরা মীরপুরের পৌনে দুই কাঠার জমিটি সরকারের কোষাগারে নির্দিষ্ট পরিমাণ

www.pathagar.com

অর্থ প্রদানের বিনিময়ে লীজ বরাদ্দ পাই। আব্বা ২০০১ সালেও বারিধারার পাঁচ কাঠার প্লটের আবেদন পত্রটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই একই কারণে।

জীবনের প্রথম দিকে আব্বা একজন কবি হিসেবে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। যদিও আমাদের জন্মের পর জ্ঞান হওয়া অবধি তাকে আমরা কবি হিসাবে পাইনি। তাঁর বন্ধুদের কাছে শুনেছি তিনি প্রচুর কবিতা লিখেছেন, সেগুলো সংগ্রহে থাকলে তিন-চারটা কবিতার বই বের করা যেতো। তবে তাঁর কয়েকটি কবিতা দেখেছি বিভিন্ন স্মারক গ্রন্থে। দু'একটি আমার মুখস্থ আছে। অনেক উদীয়মান তরুণ কবিকে দেখেছি আমাদের বাসায় আড্ডা দিতে। বাবার সাথে ছন্দ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে শুনেছি অনেকের। দেখেছি তারা তাদের রচিত কবিতাগুলো বাবার কাছ থেকে সংশোধন করে নিয়ে যেতেন।

কবি ফররুখ আহমদ, কবি বেনজির আহমদ, কবি আল মাহমুদ চাচা, কবি ও প্রাবন্ধিক মরহুম আবদুল মান্নান সৈয়দ, নজরুল গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ, লেখক বদরে আলম, কবি আফজাল চৌধুরী, ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান চাচা, কথাসাহিত্যিক শাহেদ আলী, ঔপন্যাসিক জামেদ আলী, কবি সাজজাদ হোসাইন খান, কবি আবদুল হাই শিকদার, কবি মতিউর রহমান মল্লিক, কবি গোলাম মোহাম্মদ, কবি বুলবুল সরওয়ার, কথাসাহিত্যিক মাহবুবুল হক চাচা, কবি আসাদ বিন হাফিজ, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি হাসান আলীম, লেখক তৌহিদুর রহমান, কবি শওকত মাহমুদ, কবি মুকুল চৌধুরী আরো অনেকেরই আব্বার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। সবার নাম এ মুহূর্তে মনে আসছে না। এঁদের সকলেরই যাতায়াত ছিল আমাদের বাসায়।

দেশের এক সময়ের জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা 'পৃথিবী'র সম্পাদনা কালে পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা কাব্য অনুবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হতো। বাবা 'পৃথিবী' পত্রিকার সম্পাদনা ছেড়ে দেয়ার পর কুরআনের কাব্য অনুবাদ সম্ভবত আর করেননি। তারপরও প্রায় পনেরো পারার মতো কুরআনের কাব্য অনুবাদ তিনি শেষ করেছিলেন বলে আমরা জানি। এখন চেষ্টা চলছে সেগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করার জন্য।

বাবা কোন সময়েই বৈষয়িক ছিলেন না। আমার আলোচনাতে সেটি কিঞ্চিত হলেও এসেছে। তিনি সারা জীবন লিখে গেছেন। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, অনুবাদ, সম্পাদনা, শিশু সাহিত্য, সাংবাদিকতা, গবেষণা এগুলো করেই জীবন কাটিয়েছেন। তাহাজ্জুদের নামাজের পর লেখালেখি শুরু করতেন, মাঝখানে ফজরের নামাজের বিরতি। তারপর সকাল ৯টা পর্যন্ত তা চলতো একটানা। এরপর বাইরে বের হতেন। সাংবাদিকতার কাজে পত্রিকা অফিসে যেতেন, বাংলা সাহিত্য পরিষদে বসতেন। তিনি প্রচুর বই লিখেছেন। মৌলিক প্রবন্ধ, শিশু সাহিত্য, অনুবাদ, গবেষণাসহ সব মিলিয়ে ১৭৬টির বেশি হবে তাঁর বইয়ের সংখ্যা। তবে বেশির ভাগ বইয়ের রয়েলিটি নেননি। সংসার জীবনে অভাব-অনটনই ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। তখন আমরা হিসাব করতাম ঐ সকল বইয়ের রয়্যালটি নিলে

www.pathagar.com

আমরা অনেক ভালো থাকতে পারতাম। তবে কোনদিন ঐ ব্যাপারে আমরা কেউই বাবার কাছে অনুযোগ করিনি কখনও।

বাবা সব সময় বলতেন, নবী-রসূলরা আল্লাহর এত নৈকট্যে ছিলেন, তাঁরা আল্লাহর সরাসরি প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁদের যদি অভাব-অনটন নিত্যসঙ্গী হয় তাহলে সেই আল্লাহর একজন সামান্য বান্দা হিসাবে আমার কেন অভাব-অনটন থাকবে না?

আমরা ও আমাদের প্রতিবেশীরা কখনো তাঁকে উঁচু গলায় কথা বলতে শুনিনি। বাবার মৃত্যুর পর এই বিষয়টি নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। মৃত্যুকে একটি স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে মনে করতেন। ১৯৯২-তে আম্মার লিভার সিরোসিস ধরা পড়ে। তাঁর মৃত্যুর ঘটনা আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর একটি। তখন আমি অনার্স ফাইনাল ইয়ারে। রাত ১০টার দিকে ডাক্তার বলে গেলেন, এখন থেকে যে কোন সময় আম্মা অনন্তকালের দিকে যাত্রা করবেন। রাত ১২টার দিকে শুরু হলো তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা। আমরা ভাই-বোনেরা আম্মার মাথার সামনে বসে কুরআন পড়ছি, বাবাও পড়ছেন। রাত আড়াইটা তিনটা নাগাদ আম্মা মহান স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। বাবা ধীর স্থিরভাবে হাসপাতাল থেকে মাকে বাসায় আনলেন, ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করলেন, মায়ের জানাজা পড়ালেন, আজিমপুরে মায়ের কবর দিলেন। তারপর নিত্যদিনের মতো স্বাভাবিক জীবন শুরু করলেন।

তিনি নিজের জীবনের শেষ দিকেও ছিলেন একদম ধীর স্থির, স্বাভাবিক। যখন জানতে পারলেন ক্যানসার ধরা পড়েছে, ফাইনাল স্টেজে! কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না আব্বার মধ্যে। হাসপাতালে ছিলেন প্রায় দেড় মাস। অনেক বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী তাঁর সাথে দেখা করেছেন। সবাই অবাক ও বিস্মিত হয়েছেন তাঁর সাথে কথা বলে। নিজের অসুখের ব্যাপারে একটি কথাও তাদের সাথে আলোচনা করতেন না। আলোচনা করেছেন দেশের রাজনীতি নিয়ে, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে, নিজের কষ্টের একটি কথাও বলেননি। মাঝে মাঝে তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ডাক্তার এসে স্যালাইন দিয়েছেন, সুস্থ হয়েই আবার সেই আলোচনার রেশ ধরেছেন! সবাই অবাক! অনেকে আমাকে বলেছে, কই, তোমার আব্বা তো সুস্থই আছেন! তিনি শেষ দিকে আর হাসপাতালে থাকতে চাননি। আমাদের ডেকে বললেন, আর হয়তো ১২দিন বাচঁবো, হাতে অনেক কাজ, তোমরা আমাকে বাসায় নিয়ে চলো। আমরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাসপাতালে রাখলাম আরও একদিন। তারপর বললেন, আর থাকবেন না, থাকলেনও না! বাসায় চলে এলেন।

২২ সেপ্টেম্বর বিএনপি-জামাতের ডাকে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল চলছিল। সকাল ১০টার দিকে বাইরে বেরুনোর আগে দোতলায় বাবার সাথে দেখা করলাম। বললেন, শরীরটা আজকে অন্যদিনের তুলনায় ভালো। খুশি হয়ে বের হলাম। দুপুর ১:৩০ মিনিটে দিলকুশায় ইসলামী ব্যাংকের ৮ম তলায় বসে ছিলাম। ভাইজানের ফোন পেলাম, বাবার শরীর খুব খারাপ, তাড়াতাড়ি বাসায় আয়। হরতালের জন্য সাথে গাড়ি ছিল না, রিকশা নিলাম। আবার ভাইজানের ফোন, তুই মতিঝিল ইসলামী ব্যাংক

www.pathagar.com

হাসপাতালে যা। একটা এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আয়। হরতালে রাস্তা ফাঁকা রিকশা পেয়েছিলাম সাথে সাথেই, কিন্তু মনে হয় সময় আর ফুরাচ্ছে না। একবার চিন্তা করলাম রিকশা থেকে নেমে দৌড়ে গেলে তাড়াতাড়ি যেতে পারবো। রিকশা তখন রাজারবাগ স্মৃতিসৌধের সামনে, তখন ভাইজানের ফোন, বাবা মনে হয় আর নেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এ্যাম্বুলেন্স লাগবে না, তুই তাড়াতাড়ি বাসায় আয়। তখন আমার মনে হলো আর বাসায় যেয়ে কি হবে? রিকশাওয়ালাকে বললাম, আর তাড়াহুড়ার দরকার নেই, তুমি তোমার মতো চালাও। যার জন্য তাড়াতাড়ি করলাম তিনি চলে গেছেন, এখন তুমি তোমার মতো চালাও। যে ১২ দিন বেঁচে থাকার কথা বলেছিলেন সেই ১২দিনের মাথায়ই তিনি মহান স্রষ্টার ডাক পেলেন। আমার মনে হয় এতদিন স্রষ্টার ডাকের অপেক্ষাতেই ছিলেন।

সারাটা জীবন কাটিয়েছেন সৃষ্টিকর্তার একজন নগণ্য বান্দা হিসাবে। দুনিয়াতে যে কাজের জন্য একজন বান্দাকে কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা প্রেরণের কারণ বর্ণনা করেছেন বাবা সেটি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এটি আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি। লোভ-লালসা, অহংকার, অর্থ-বিত্ত, প্রসংশা এগুলোর কোনটাই বাবার মধ্যে ছিল না। তাই তাঁর কোন শত্রুও ছিল না। তিনি একজন নিরহংকার খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সকল প্রশংসা আল্লাহর। অনেককে দেখেছি তাঁকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য, পদক, পুরস্কার প্রদানের জন্য ঘটা করে অনুষ্ঠান করবেন বলে তাঁর কাছে আসতেন আমন্ত্রণ জানাতে। তিনি বিনয়ের সাথে সব প্রত্যাখ্যান করতেন। তাদের বলতেন, প্রশংসা শুনলে মনে অহংকার সৃষ্টি হতে পারে। অহংকার করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতাও একমাত্র আল্লাহর। মানুষ হলো আল্লাহর বান্দা। এ দু'টো জিনিস বান্দার থাকতে পারে না। এ দু'টো জিনিসের ব্যাপারে বাবা সব সময় সচেতন ছিলেন। সেজন্য সংবর্ধনা ও পদক এড়িয়ে চলতেন।

দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠন আলোকিত মানুষদের খুঁজে বেড়ান। ইতিমধ্যে মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক আলোকিত মানুষদের তাঁরা পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সেদিকে আমি যাচ্ছি না। আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই আমার বাবা আজীবন একজন সমাজ সংস্কারকের কাজ করেছেন। ভাল মানুষ তৈরির জন্য ভালো সাহিত্য রচনা করেছেন, ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য গবেষণা করেছেন, গল্প লিখেছেন, সংগঠন তৈরি করেছেন। তার সারাটা জীবনই ছিল ভাল মানুষ তৈরির প্রচেষ্টা। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র ইসলামই পারে সকল অন্যায়, জুলুম, নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে সুশাসনের মাধ্যমে মানুষকে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে। খারাপ কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি কখনও। তিনি কখনই কোন মানুষকে ঘৃণা করেননি। ঘৃণা করেছেন তার খারাপ কাজগুলোকে। আগেই বলেছি আমাদের পারিবারিক জীবন কেটেছে অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। একজন ভদ্রলোক আসলেন, তিনি এখন মরহুম তাঁর নাম উচ্চারণ করে কাউকে বিব্রত করতে চাই না। তিনি বাবাকে আরবি টু বাংলা একটা ডিকশনারী লেখার কথা বললেন।

www.pathagar.com

বাবা সেটা তৈরি করে দিলেন। ভদ্রলোক ৫০০ টাকা দিয়ে ডিকশনারীটি নিয়ে গেলেন। তারপর আর তার দেখা নেই। প্রায় বছর খানেক পর বাবা বাংলাবাজারে গেছেন বই কিনতে, সেখানে বই নাড়াচাড়া করতে করতে একটি প্রিন্টেড আরবি টু বাংলা ডিকশনারী পেলেন। খুলে দেখলেন তাঁর লেখা সেই ডিকশনারীটি কিন্তু লেখকের নামের জায়গায় বাবার নামের পরিবর্তে ছাপা হয়েছে সেই ভদ্রলোকের নাম। এরকম আরো অনেক ঘটনা আছে! একটি বইয়ের মেক্সিমাম বাংলা অনুবাদ করা বাবার কিন্তু সেই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর শুধু একজনের নাম অনুবাদক হিসেবে ছাপা হয়েছে (যিনি সামান্য কয়েক পৃষ্ঠা অনুবাদ করেছিলেন) পুরো বইয়ের অনুবাদক হিসাবে। তিনি কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু সেই প্রতারকদের কিছু বলেননি, তারা লজ্জা পাবেন শুধু একথা ভেবেই।

সীমিত আয়ের মধ্যেও বাবা মানুষকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। কেউ কেউ নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দেওয়ার কথা বলে ধার নিয়ে গেছেন কিন্তু সময়মত ফেরত দিতে পারেননি। ফলে অনেক সময় বাবা অর্থ কষ্টে ভুগেছেন, কিন্তু তাদের প্রতি রাগান্বিত হননি, লজ্জা পাবেন ভেবে খোঁজও নেননি। এরকম অনেক ঘটনার মধ্যে দু'টি ঘটনার কথা বলছি। একজন দরিদ্র মাছ ব্যবসায়ী ব্যবসার জন্য বাবার কাছে নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের অঙ্গীকার করে অর্থ ধার নিয়েছিলো। নির্দিষ্ট সময়ের পরও টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বাবা প্রতিদিন অন্য পথ ঘুরে বাসায় আসতেন। কারণ লোকটি মালিবাগ মোড়ে মাছ নিয়ে বসতো। দেখা হলে লোকটি লজ্জা পেতে পারে শুধু এ কারণেই বাবা মগবাজারের অফিসে যেতেন এবং বাসায় আসতেন অন্য পথে, অনেক ঘুরে। বাবার মৃত্যুর পর আমার ছোট ভাইয়ের প্রাইভেট শিক্ষক অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, প্রতি মাসের ২ তারিখে স্যার আমাকে বেতন দিতেন। কখনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। নভেম্বর মাসে দুই মাসের বেতন এক সাথে দিলেন। আমি বললাম, স্যার, ডিসেম্বরের পুরো মাস তো স্কুল ছুটি থাকে। আমি তো পড়াবো না। স্যার বললেন, বেতন না পেলে খাবেন কি? এটা তো আপনার পেশা, পুরো মাস কি না খেয়ে থাকবেন? এরপর থেকে প্রতি বছর নভেম্বর মাসে ২ মাসের (ডিসেম্বরসহ) বেতন এক সাথে দিয়ে দিতেন।

একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক একাডেমি গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন আমৃত্যু। যেখানে প্রতিভাবান মেধাবী তরুণরা ইসলাম সর্ম্পকে জ্ঞানচর্চা করে দেশে সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে। বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সেই অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করবে। ঢাকার কেন্দ্রীয় স্থানে বহুতলবিশিষ্ট সেই একাডেমিটি গড়ে উঠবে। সেখানে দেশি-বিদেশি লেখকদের বিশাল বইয়ের সমারোহ থাকবে। থাকবে একটি বড় অডিটোরিয়াম। দুঃস্থ কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কেন্দ্র থাকবে, সেখান থেকে দুঃস্থদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। দরিদ্র লেখকদের বই প্রকাশ করা হবে ইত্যাদি, অর্থাৎ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা এখান থেকে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যাতে পালন করতে পারেন সে ব্যবস্থা করা। তিনি

www.pathagar.com

বিশ্বাস করতেন ইসলামী ভাবধারার প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার সে স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেছে। অনেকেই তাঁর এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত আর অগ্রসর হননি। তাঁর এ পরিকল্পনাটি নিয়ে দেশের একটি বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে ডেকে নিয়ে আলোচনা করেছেন কয়েকবার। ব্যস এ পর্যন্তই, অথচ তারা বিনোদনের জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় করছে। এমন অনেক ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল অংকের অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে যেখান থেকে প্রকৃত অর্থে মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হচ্ছে না।

তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত ছিলেন। বাংলা সাহিত্য পরিষদ, বিআইসি , আধুনিক প্রকাশনী, বিআইআইটি, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, মওদূদী রিসার্চ একাডেমি, ইসলামী গণশিক্ষা কার্যক্রম (ইগশিকা), আল-মানার অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা, জামেয়া-ই-কাশেমিয়া মাদ্রাসাসহ প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টাও ছিলেন। তিনি এপার বাংলা ও ওপার বাংলার ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর রচনাবলী ও কর্ম সদকায়ে জারীয়া হিসেবে পুণ্যের একাউন্টে কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

একজন প্রকৃত আলোকিত মানুষ ছিলেন আমার বাবা আবদুল মান্নান তালিব। এই আলোকিত মানুষদের আমরা যদি ভুলে যাই সেটি হবে আমাদের দৈন্য, আমাদের কৃপণতা, আমাদের কপটতা। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমি দেখেছি তাঁর কাছে আসতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে নিজের কাজ করে ফিরে যেতে। তাদের অনেকেরই কাছে একটি লেখার জন্য ধরনা দিতে হয়েছে মাসের পর মাস। কিন্তু তারা আমার বাবার ওপর লেখা দেননি। তাতে তিনি ছোট হননি। তিনি তো মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে ফিরে গেছেন তাঁর কাজ শেষ করে। বলতে পারি তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ সতর্ক থেকেছেন সব সময়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁকে তাঁর কর্মের সেরা পুরস্কারটাই যেন দেন। আমরা সব সময় সেই প্রার্থনা করি মহান স্রষ্টার কাছে। তবে এই সব কীর্তিমান মানুষের জীবনালোচনা যদি নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন না করি তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা কি শিখবে? আশা করি তাঁর সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব ও একান্তজনেরা বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখবেন।

আবদুল মান্নান তালিব ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। লেখকের অপ্রকাশিত ও প্রকাশিত বইগুলো প্রকাশের প্রক্রিয়া চলছে। এ ব্যাপারে আপনাদের দোয়া চাচ্ছি। মহান সৃষ্টিকর্তা যেন প্রচারবিমুখ, নিরহংকার মানুষটির অসমাপ্ত কাজগুলো তাঁর সহকর্মীদের মাধ্যমে সফলতার সাথে অগ্রসর রাখেন সেই প্রার্থনাও করছি।

আমীন!

www.pathagar.com

আমি গর্বিত

আয়েশা সুলতানা

বিশিষ্ট গবেষক, সৃজনশীল লেখক, অনুবাদক, সাহিত্য সংগঠক, সম্পাদক ও বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুল মান্নান তালিব, আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও আমার প্রিয় বাবা। তাঁর সন্তান হওয়ার সুবাদে খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখতে পেরেছি বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয়।

আব্বা তাঁর সারা জীবন ব্যয় করেছেন ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, গঠনমূলক লেখালেখি, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ও মৌলিক গবেষণাকর্মে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি জীবনের প্রতিটি অংশকে তিনি ইসলামী রূপরেখায় বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তা তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন তাঁর স্বর্ণাক্ষরে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম দিয়ে। তাঁর প্রকাশিত 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা', 'মুসলমানের প্রথম কাজ', 'বাংলাদেশে ইসলাম', 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান', 'ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন সাহিত্য', 'সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট', 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন', 'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ইসলাম'। এছাড়াও অনুবাদ গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'তাফহীমুল কুরআন', 'পয়গামে মোহাম্মদী', 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন', 'আত্মশুদ্ধি কিভাবে?', 'মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী', 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান', 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' গ্রন্থগুলো প্রধান।

ছেলেবেলায় আব্বার লেখা 'কে রাজা', 'হাতিসেনা কুপোকাত', 'সহজ পড়া', 'মজার গল্প', 'এসো জীবন গড়ি' ইত্যাদি বই বার বার পড়েছি। মুসলমানদের গৌরবান্বিত ইতিহাস ঐতিহ্য কোমলমতি শিশুদের মাঝে তুলে

www.pathagar.com

ধরে কুঁড়ি থেকেই তাদের সুন্দর সুকুমার ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে ছিল তাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। তাই বলে অন্যান্য সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ছিল না। দেশ-বিদেশের মজাদার সব বই তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে। বিভিন্ন বইমেলায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। পছন্দসই বই কিনে দেয়ার ব্যাপারে কখনও কোন কার্পণ্য করতেন না, তার যত মূল্যই হোক না কেন। প্রচুর উৎসাহ দিতেন বই পড়ার ব্যাপারে। সব সময় বলতেন, বেশি বেশি বই পড়। যত পড়বে তত জানবে এবং শিখবে। আর তা থেকে যা কিছু কল্যাণকর সেটুকুই গ্রহণ করবে, বাকিটা বর্জন করবে। আর ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যের সাথে পরিচয় হয়েছিল বলেই হয়তো অল্পস্বল্প লেখালেখির অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। সেগুলো নিয়ে ভয়ে ভয়ে আব্বার সামনে দাঁড়াতাম। আব্বা আবার তা থেকে কিছু লাইন কেটে ছেঁটে আরো নতুন কিছু লাইন সংযোজন করার কথা বুঝিয়ে দিতেন। আর পত্রিকার পাতায় যখন আমার লেখা ছাপা হতো আমার চেয়ে আব্বাই বেশি খুশি হয়ে উঠতেন। দ্বিগুণ উৎসাহ দিতেন। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও সমালোচনা করতেন লেখার ক্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে। সেসব মনে হলে আজও বেদনায় চোখ ভিজে ওঠে। আজ আর আব্বা নেই। সেরকম শুভাকাঙ্ক্ষীও কোথাও নেই।

মাত্র তের বছর বয়সে ইসলামের টানে ঘর ছেড়েছিলেন তিনি। মাকে বলেছিলেন, 'মা' তোমার তো সাত ছেলে, একজনকে না হয় আল্লাহর পথে কুরবানী করে দিলে। তোমার সাথে আমার আবার দেখা হবে কিয়ামতের মাঠে। কথাগুলো বলতে বলতে আব্বা কেঁদে ফেলেছিলেন সেদিন। তারপর শুরু হয়েছিল তের বছরের কিশোরের সংগ্রামী জীবন। মায়ের আঁচলের ছায়া উপেক্ষা করে ইসলামের আলো ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে জ্ঞান অন্বেষণের পথে নেমেছিলেন তিনি। খেয়ে না খেয়ে কায়ক্লেশে পার করেছিলেন জীবনের সিংহভাগ সময়। কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি কখনও। সত্যের পথ থেকে সরে দাঁড়াননি একচুলও। পর্বতের মতো কঠোরতা ও বিশালতা নিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে নীরব যুদ্ধ করে গেছেন ক্ষুরধার শব্দশৈলী দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। সুষ্ঠু সুন্দর সমাজ নির্মাণে নীরবে-নিভৃতে রেখেছেন বিভিন্ন অবদান। এই সত্য পথের পথিক খুবই সাদামাটা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আব্বাকে দেখেছি সাদা রঙের সাধারণ পোশাক পরতেন। তিল পরিমাণ বিলাসবহুল দ্রব্যকে সঙ্গী করেননি কখনো, বেশির ভাগ সময়ই যাতায়াত করতেন পায়ে হেঁটে। ভালো খাবারের প্রতিও তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। তবে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে যখন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতেন তখন অতুলনীয় গৌরব অনুভব করতাম নিজের মধ্যে। ছুটির দিনগুলোতে ও আব্বার অবসর সময়ে সাহিত্যমোদীদের আসর হতো আমাদের বৈঠকখানায়। কবি আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শাহাবুদ্দীন আহমদ, মতিউর রহমান মল্লিক, মাহবুবুর রহমান, নাসির হেলাল, হাসান আলীম ও অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকও আসতেন। তাদের চা-নাস্তা দিতে দিতে আমিও আড়াল থেকে শুনতাম কিয়দংশ। অত্যন্ত ভালো লাগতো তখন।

www.pathagar.com

আব্বা তাঁর নিজের সন্তানদের পক্ষ নিয়ে একটি কথাও বলেননি কখনও। আমার লেখা প্রথম ছোট গল্প গ্রন্থ 'এত কাছে এত দূরে' যখন আমি বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে ছাপানোর অনুরোধ করি, আব্বা বলেছিলেন, সেটা সম্ভব নয়। তাতে প্রমাণিত হবে পিতা তার কন্যাকে সুযোগ দিয়েছে। আমার নিজের যোগ্যতায় তা করতে হবে। তবে এর জন্য তোমার ব্যাপারে আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে। পরবর্তীতে যখন অন্য একটি প্রকাশনী থেকে আমার গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল আর লেখক পরিচিতিতে আমার পক্ষে লিখেছিলেন কবি আল মাহমুদ চাচা, সেদিন খুবই ভালো লেগেছিল। তবে তার চেয়েও বেশি খুশি হয়েছিলেন আব্বা। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই আমাকে খবরাখবর জানাতেন। বইটি কয় ফর্মা হবে, প্রচ্ছদ কী হবে, কে প্রচ্ছদ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতেন যে, ভালো কিছু লিখতে চাইলে বিশ্বের বড় বড় মনীষী ও লেখকদের বই পড়তে হবে। তাঁর চেহারার সেই আবেগ-উদ্দীপনা আমাকে অনেক বেশি আলোড়িত করতো। ভালো লেখার ব্যাপারে উৎসাহী করে তুলতেন। আজ আর কারো মুখ দেখেই সেই উৎসাহ খুঁজে পাই না।

পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার কিছু দিন আগেও আমার দিকে চেয়ে ভেজা চোখে বলেছিলেন, তুমি লেখালেখি বন্ধ করে দিয়েছ কেন? আল্লাহর দান প্রতিভা নষ্ট করে দিও না। প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও একদিন সফলতা আসবেই। এখন সে সব মনে হলে চারদিকে শুধু হা হা করা শূন্যতা দেখতে পাই।

অসুস্থ অবস্থায় আব্বা বলেছিলেন, আমি পৃথিবী হতে কিছু নিতে আসিনি, দিতে এসেছি মাত্র। আমার কারো কাছে কিছু চাওয়ার নেই, আমাকে দেবেন আল্লাহ্। তেজগাঁও কলেজের প্রভাষক ও লেখিকা হাফিজা খানম সেদিন আব্বাকে দেখতে এসে কেঁদে ফেলেছিলেন প্রায়। বলেছিলেন, সাহিত্য জগতের এক বিরাট পণ্ডিতকে হারাচ্ছি আমরা। এত জ্ঞান, যা ভাগ করে নেয়া যায় না। যদি তা সম্ভব হত তাহলে কিছু নিয়ে আল্লাহ্র কাছে শুকরিয়া আদায় করতাম। দেশ-বিদেশ থেকে যখন সাহিত্যমোদীরা আব্বাকে দেখতে আসছিলেন, চোখের পানি ফেলছিলেন, সেদিন প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও কোথাও এক চিলতে সুখ অনুভব করছিলাম। সত্যিই আমরা আমাদের প্রিয় বাবার জন্য গর্বিত।

আব্বা আজ আর নেই। তবে তাঁর অসংখ্য রচনা রেখে গেছেন আমাদের মাঝে। যেমন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি যা আজীবন তাঁকে পাঠকদের মাঝে জীবন্ত করে রাখবে। যুগের পর যুগ মানুষ তাঁকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কাছে এ প্রার্থনা করি, আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি খাস রহমত দান করুন! তাঁর গোনাহ্গুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিন যেভাবে সাদা কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিন, তা যেন জান্নাতের একটি অংশ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যেন আমার আব্বাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করেন। আমীন!

www.pathagar.com

যেমন দেখেছি নানাভাইকে
নুসরাত জামিলা

আজকে আমি যাঁকে নিয়ে লিখছি তাঁকে সবাই কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক, গবেষেক আরো অনেক নামে চেনেন ও জানেন। তাঁর সাহিত্য বা লেখাকে বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি তাঁকে আমার নানা আবদুল মান্নান তালিব হিসেবে যতটুকু চিনেছি বা জেনেছি তাই পাঠকের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করব। পাঠকরা আমার লেখার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলেই আশা করছি।

নানা ভাইয়ের কথা মনে করলে ছোটবেলার স্মৃতি বেশি মনে পড়ে যায়। ছোটবেলায় আমরা তাকে ঠাট্টা করে তালিব ভাই বলে ডাকতাম, তখন তিনি মুচকি মুচকি হাসতেন। দেখতাম অনেক মানুষ তাঁকে তালিব ভাই বলে ডাকতেন, তাই আমরাও ডাকতাম। আমরা তখন অনেক ছোট, সেজন্য 'তালিব ভাই'-এর মর্ম, অর্থ কিছুই বুঝতাম না। সে সময়ের কথা, তিনি যখন তাঁর লেখার রুমে সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে লিখতেন তখন প্রায়ই আমরা দুই ভাই-বোন তার টেবিলের নিচে ঢুকে বসে থাকতাম। যখনই তিনি লিখতে বসতেন তখনই আমি আর রাশেদ তাঁর পায়ে সুড়সুড়ি দিতাম। আর তখনই তিনি আচমকা দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবে প্রায়ই তাঁর সাথে কতো না দুষ্টুমি করেছি। দিনগুলো এখনও চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠছে। নানাভাইয়ের কথা বললে সাথে সাথে নানুর কথা এসে যায়। নানুকে খুব বেশি দিন আমরা পাইনি। আমার বয়স যখন ৮ বছর তখনই নানু আমাদের ছেড়ে চলে যান। নানু ছিলেন আমাদের দুই ভাই-বোনের সকল আবদার পূরণ করার মানুষ। নানু

www.pathagar.com

আদর করে আমাকে নুসু আর রাশেদকে রাসু বলে ডাকতেন। যখন আমরা চিটাগাং থেকে ঢাকায় নানা-নানুর কাছে বেড়াতে আসতাম তখন নানু আমাদের সব পছন্দের খাবার আগে থেকেই তৈরি করে রাখতেন। বিশেষ করে পায়েস, পিঠা, কেক, চকলেট, আইসক্রিম সব সময় ফ্রিজে থাকতো। তারপরও নানাভাইকে প্রতিদিনই অফিস থেকে আসার সময় আরো চকলেট নিয়ে আসতে বলতাম। নানাভাই সব সময় তা নিয়ে আসতেন। কোনোদিন না করেননি। নানু লিভার ক্যান্সারে মারা যান। ১৯৯২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। দিনটা এখনও চোখে ভাসে। নানুর লাশ নিয়ে রাত ৩টায় নানাভাই, আম্মু, আব্বু ও মামারা সবাই হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন। ৬ মাস ক্যান্সারে ভুগেছিলেন নানু। নানুর অসুস্থতার সময় নানাভাই সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন। তাঁর যতোটা সম্ভব সেবা করার চেষ্টা করেছেন। নানু যখন হাসপাতালের বিছানায় জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করছিলেন তখন আম্মুও সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন। তাঁকে খাওয়ানো, গোসল করানো সব আম্মু নিজ হাতে করতেন। নানুর অনেক বড় চুল ছিল। নানাভাই নানুর ভিজা চুল শুকানোর জন্য বার বার তাঁর চুল নেড়ে দিতেন। নানু মারা যাবার পর নানাভাই যে আসলেই কতোটা একা হয়ে যান সেটা আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি। একদিন যখন দেখলাম নানাভাই তাঁর লেখার রুমে সোফায় শুয়ে নীরবে চোখের পানি ফেলছেন তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে নানু নানাভাইয়ের জীবনের বিশাল একটা জায়গা জুড়ে ছিলেন। সেই শূন্যতা কোনো কিছু দিয়ে পূরণ করা সম্ভব ছিল না।

নানাভাই সব সময় পড়ার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ দিতেন। আমার মনে আছে আমরা যখন ভালো রেজাল্ট করতাম তখন তিনি অনেক খুশি হতেন এবং আরো ভালো করার জন্য উৎসাহ দিতেন। বই পড়ার মাধ্যমেই মানুষের মানসিক পরিবর্তন সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। নানাভাইকে দেখেই আমাদের বই পড়ার আগ্রহটা সৃষ্টি হয়। নানাভাই ছিলেন আমাদের জন্য অন্ধকারে আলোর মতো। তিনি যে কোনো সমস্যার সঠিক সমাধান আমাদেরকে দেবার চেষ্টা করতেন। বিশেষ করে আব্বু মারা যাবার পর নানাভাই যেভাবে আমাদের সাহস জুগিয়েছেন তা বলে বা ব্যাখ্যা করে বুঝানো সম্ভব নয়। আমার মনে আছে ১৯৯৮ সালের ২ মার্চ রাতের কথা, যে দিন আব্বু মারা গেলেন। আব্বুর লাশ দেখে আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, সত্যিই আব্বু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। নানাভাই সে সময় আম্মু এবং আমাদের দুই ভাই-বোনের সবচেয়ে বড় সাপোর্ট ছিলেন। সারা রাত নানাভাই আব্বুর লাশের পাশে বসে কুরআন পড়েছিলেন। আম্মুকে নানাভাই সব সময় বলতেন এতো চিন্তা করো না আল্লাহতায়ালা সব সময় তোমার সহায় হবেন। এছাড়া আমি যতদিন বেঁচে আছি সবসময় তোমাদের পাশে থাকবো। অবশ্যই বলতে হচ্ছে, তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন আমাদের আর্থিক, মানসিক ও অন্যান্য সব ধরনের সহায়তা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আমাদের অনেক বড় আশ্রয় ছিলেন নানাভাই।

তিনি অত্যন্ত রুটিন মাফিক জীবন-যাপন করতেন। তবে তিনি লিখতে

www.pathagar.com

বসলে আপন জগতেই যেন হারিয়ে যেতেন। অনেক সময় খাওয়া-দাওয়াও সময় মতো করতেন না। নানাভাইয়ের খাওয়া-দাওয়া খুব সাদাসিধে ছিল। বিভিন্ন রকম সবজি খেতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। নানুর হাতের গরম গরম ফোলা রুটি তাঁর খুব পছন্দ ছিল। আম্মুকে তিনি প্রায়ই বলতেন তেমন করে রুটি বানিয়ে দিতে। আম্মু তাওয়া থেকে গরম গরম ফোলা রুটি নামাতেন আর আমরা সেটা দৌড়ে যেয়ে নানাভাইকে দিয়ে আসতাম। প্রতি রাতে ঘুম থেকে উঠে তিনি তাহাজ্জুত নামাজ পড়তেন। সজ্ঞানে অসুস্থ অবস্থায়ও আমি তাঁকে সহজে কোনো নামাজ ক্বাযা করতে দেখিনি। তিনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন তাঁর ইবাদত-বন্দেগি ছিল অত্যন্ত নিয়মিত ও ধীরস্থির। অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তিনি। আরবি, ফার্সি, উর্দু, ইংরেজিসহ আরো বেশ কিছু ভাষায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। যে কেউ তাঁর সাথে কথা বললে তাঁর ভক্ত হয়ে যেতেন। অনেক বেশি আধুনিক চিন্তা-ধারার মানুষ ছিলেন তিনি। নানাভাই বলতেন, আধুনিকতা বলতে শুধু পোশাক-পরিচ্ছদের আধুনিকতা নয় বরং বেশি বেশি বই পড়ার মাধ্যমে নিজের চিন্তাধারার ইতিবাচক পরিবর্তনকে বোঝায়। তিনি আরো বলতেন, যার জ্ঞান যত বেশি সে তত বেশি আধুনিক। আমার মনে আছে যখন কুরআন, হাদিস বা যে কোনো বই পড়ে কোনো বিষয় আমার বোধগম্য হতো না তখন নানাভাই সেটা অনেক সময় নিয়ে সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল মানুষকে মুগ্ধ করার মতো। সব সময় তাঁর কাছাকাছি থেকেছি বলেই হয়তো তাঁকে এতোটুকু জানার সুযোগ হয়েছে।

জীবনের শেষ ছয়মাস যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন নানাভাইয়ের সেবা-যত্ন করার মাধ্যমে তাঁর আরো কাছে যাবার সুযোগ হয়েছিল। হাসপাতালের সেই দিনগুলো এখনো আমার মনে পড়ে। আমি আর রাশেদ দিনের বেশির ভাগ সময় নানাভাইয়ের সাথে হাসপাতালেই কাটিয়েছি। তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কতো না গল্প করেছি। সেই সময় তিনি নিজে নিজে পত্রিকা পড়তে পারতেন না। আমরা তাঁকে প্রতিদিন সকালে পত্রিকা পড়ে শুনাতাম। সব সময় তিনি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন। এতো মুমূর্ষু অবস্থায়ও আম্মু তাকে প্রতিদিন গোসল করাতেন। ইস্ত্রি করা কাপড় ছাড়া তিনি পরতেন না। রাশেদ তাঁর দাড়ি সেভ করে দিত, হাত-পায়ের নখ কেটে দিত। আমি তাঁকে প্রতিদিন ইনসুলিন দিয়ে দিতাম, খাবার খাইয়ে দিতাম। ক্যান্সার হয়েছে জেনেও সব সময় তিনি মানসিকভাবে শক্ত থাকার চেষ্টা করতেন। প্রতিদিন মামা-মামীরা সবাই নানাভাইকে হাসপাতালে দেখতে যেতেন, তাঁর সাথে সময় কাটাতেন। তাতে নানাভাইও বেশ খুশি হতেন। তিনি কিছু খেতে পারতেন না। তারপরও অনেকেই নানা রকম খাবার কিনে নিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। শরীর অসুস্থ থাকার কারণে মাঝে-মধ্যে রেগেও যেতেন। কিন্তু সেটাও সাময়িক সময়ের জন্য। অনেক দিন হাসপাতালে থাকার কারণে তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন ডাক্তারকে বললেন, আমাকে রিলিজ দিয়ে দিন। আমি জানি আমি আর ভালো হবো না। কিন্তু হাসপাতালের এই চার

www.pathagar.com

দেয়ালের মধ্যে আমি মরেও শান্তি পাব না। আমি আমার বাড়িতে আমার ফ্যামেলির সকলের সামনে মরতে চাই। সেদিন ডাক্তারের উপর তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন। ডাক্তারও বুঝে গিয়েছিলেন যে নানাভাইয়ের হাতে আর বেশি সময় নেই। এর দু'তিন দিন পরেই ডাক্তার তাঁকে রিলিজ দিয়ে দেন। বাসায় নিয়ে আসার পর তিনি আর মাত্র সাত দিন বেঁচে ছিলেন। ২০১১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি আমাদের সকলকে ছেড়ে চির বিদায় নিলেন। ঐ দিন সকাল থেকেই নানাভাইকে অন্যরকম লাগছিল। অন্যসব দিনের তুলনায় বেশ সুস্থ মনে হচ্ছিল। চেহারা থেকে মনে হচ্ছিল অদ্ভুত একটা আলো ঝরছে। প্রতিদিনের মতো রাশেদ সকালে পত্রিকা পড়ে শোনাচ্ছিল। ঐ দিন তিনি নিজেই রাশেদকে বললেন তাকে সেভ করিয়ে দিতে, হাত পায়ের নখ কেটে দিতে। আম্মুকে বললেন, ভালোভাবে গোসল করিয়ে দিতে। আমি তাঁকে ১২টার দিকে ইনসুলিন দিতে গেলাম। তাঁর আধঘণ্টা পর নিজেই খেতে চাইলেন। তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে তাঁকে খাইয়ে দিলাম। তিনি যোহরের নামাজ আদায় করলেন। তার একটু পর ডাবের পানি খেতে চাইলেন। ডাবের পানি খেতে গিয়ে হঠাৎ বললেন, তাঁর কেমন যেন শরীর খারাপ লাগছে। এ কথা বলতে না বলতেই তিনি ঢলে পড়লেন। ডাবের পানি মুখ থেকে পড়ে গেল। এর মধ্যেও তিনি আম্মুকে ডাকতে বললেন। ততোক্ষণে মামারাও সবাই চলে এসেছিলেন। আম্মু এসে এক চামচ জমজমের পানি মুখে দিলেন এবং তারপরই সব শেষ হয়ে গেল। তাঁর হৃদয় স্পন্দন ততোক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। যেন অন্ধকার নেমে এলো আমাদের সকলের চারপাশে। আমাদের নানা আবদুল মান্নান তালিব সব ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে। এখনও যখন তাঁর বইগুলো পড়ি তখন মনে হয় যেন তিনি জীবন্ত হয়ে আছেন তাঁর বইয়ের মাঝে। মনে হয় তাঁর লেখার টেবিল-চেয়ারে বসে যেন তিনি বইয়ের কথাগুলো বলে যাচ্ছেন। পৃথিবীর বুক থেকে আবদুল মান্নান তালিব চলে গেলেও তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য কোনো নিছক ধর্মীয় সাহিত্য নয়। মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য গড়ে উঠে। সেগুলো যেমন ব্যাপক ও বিশ্বজনীন, ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপ্তিও তেমনি বিশ্বজনীন। ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার আর একটা দিক হচ্ছে সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য এর সুস্পষ্ট আবেদন রয়েছে। ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবোধগুলো যে কোন সাহিত্যের আদর্শ হতে পারে।

আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

গ্রন্থালোচনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য ঃ মূল্যবোধ ও উপাদান
একটি অনন্য প্রবন্ধ গ্রন্থ
শাহাবুদ্দীন আহমদ

ইসলামী সাহিত্য বলে কি ভিন্ন কোন সাহিত্য আছে? কেমন সে সাহিত্য? কি তার স্বরূপ? সার্বজনীন সাহিত্য বা বিশ্বজনীন সাহিত্যের সঙ্গে তার কি পার্থক্য আছে? না সে সাহিত্যের চরিত্র বিশ্বজনীন বা সার্বজনীন সাহিত্যের অনুরূপ? ইসলামী সাহিত্য কি শুধু মুসলিম কবি-সাহিত্যিকেরা সৃষ্টি করেন, না সে সাহিত্য অমুসলিম সাহিত্যিকেরাও সৃষ্টি করেন? তেরটি উপশীর্ষে এর ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন লেখক– ১. জীবন ও জগতের সম্পর্ক, ২. স্রষ্টা কে?, ৩. জীবনের উদ্দেশ্য কি?, ৪. সাহিত্য কি?, ৫. সাহিত্যের উদ্দেশ্য, ৬. ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, ৭. ইসলামী সাহিত্য কি?, ৮. ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব, ৯. ইসলামী সাহিত্যে প্রেম প্রসঙ্গ, ১০. ইসলামী সাহিত্যে অশ্লীলতা, ১১. ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য, ১২. ইসলামী সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা, ১৩. ইসলামী সাহিত্যের নিদর্শন।

এ শিরোনামগুলো তুলে ধরেছেন জনাব আবদুল মান্নান তালিব ১২ পয়েন্ট পাইকার ডবল ডিমাই সাইজের ৪৮ পৃষ্ঠার মুদ্রিত একটি বৃহৎ প্রবন্ধে যার পুস্তক শিরোনাম 'ইসলামী সাহিত্য ঃ মূল্যবোধ ও উপাদান'। নিম্নলিখিত প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যামূলক জবাব দিয়েছেন। যেহেতু প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে তাই প্রবন্ধটির সারসংক্ষেপস্বরূপ একটি ভূমিকাও এ বইতে সংযুক্ত করেছেন লেখক। সেখানে তাঁর প্রধান দু'টি বক্তব্য এমনি—

www.pathagar.com

১. মুসলমানের লেখা যদি ইসলামের উদ্দেশ্যের বিপরীত হয় তাহলে জানি না কে তাকে ইসলামী সাহিত্য আখ্যা দেবার সাহস করবে?

২. কোনো বিষয়ে ইসলামের একটি আদর্শকে গ্রহণ করা আর ইসলামের সার্বিক মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতে কোনো বিষয় গড়ে তোলার মধ্যে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

পৃথিবীতে অনেক সাহিত্যমনীষী ধর্মকে সাহিত্য থেকে পৃথক করে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন যে, মধুসূদন খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও রামায়ণের কাহিনী নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করেছেন। তার মানে সাহিত্যের আনন্দলোক একটি ভিন্ন বিষয়। মধুসূদন একবার বলেছিলেন, যখন তুমি সাহিত্য করবে তখন ধর্মকে পাশে সরিয়ে রেখো, তা না হলে তুমি সাহিত্যের সৌন্দর্য রস পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে না? When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias.

নজরুল ইসলাম জনাব আনওয়ার হোসেনকে লেখা এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে– আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান– কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু কবি, মুসলমান কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি।'

আমি আপাতত শুধু এইটুকুই বলে রাখি যে, আমি শরীয়তের বাণী বলিনি– আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্ম লাভ করতে পারে না। তার প্রমাণ আরব দেশ। ইসলাম ধর্মের কড়াকড়ির পর থেকে আর সেথায় কবি জন্মান না। এটা সত্য।...'

এর আগে নজরুল ইসলাম ইবরাহীম খাঁর এক চিঠির উত্তরে ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নজরুলের সেই বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার আগে ইবরাহীম খাঁ নজরুলকে কি লিখেছিলেন সেটা আমাদের জানা উচিত। এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ আলোচনা করলে আমরা আবদুল মান্নান তালিবের 'ইসলামী সাহিত্য ঃ মূল্যবোধ ও উপাদান' বইটির অন্তর্নিহিত বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হব এবং তাঁর কথা কতটুকু গ্রহণযোগ্য বা অবশ্য গ্রহণযোগ্য সে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।

ইবরাহীম খাঁ নজরুলকে লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অজ্ঞ, সবচেয়ে বেশি আত্মভোলা, তোমারই ভাই এই মুসলমান। আর বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত, সবচেয়ে নিন্দিত, কু-লিখিত বিষয় ইসলাম। যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে ইসলামের সত্য সনাতন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র দান করবেন, যিনি 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে' ভাষা দেবেন, 'এই সব ভগ্ন শুষ্ক শ্রান্ত বুকে' আশা জাগিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্য স্বরূপ দেশের সম্মুখে তুলে ধরে মুসলিমের বুকে বল দেবেন। অ-মুসলিমের বুক হতে ইসলামের অশ্রদ্ধা দূর করতঃ হিন্দু-মুসলমান

www.pathagar.com

মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনিই হবেন বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হিতৈষী, তিনিই হবেন বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত। তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পার, তুমি সেই মহাগৌরবের আসন দখল করতে পার। তুমি এইরূপে তোমার কবি প্রতিভাকে, তোমার জীবনকে, তোমার মানবতাকে সহজতমরূপে সার্থক করতে পার।

আরো এক কথা। এই বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূতরূপে যে তুমি আসবে, সে কোন্ পথে? বিদ্রোহের পথে? আমার মনে হয়, না, তা নয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, Line of less resistance বা লঘুতম বাধার পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কিছু নাই; ইসলাম আধুনিকতম, উন্নততম ধর্ম, তবে যে বাঙ্গলার মুসলিমরা অনেক কুসংস্কারে পড়েছে, সে ইসলামের দোষ নয়, এই হতভাগারা ইসলামের সাথে ঐ কুসংস্কারগুলি পোষণ করছে। এখন এই কুসংস্কারগুলি দূর করতেই হবে কিন্তু সেগুলি যে ইসলামের অনুশাসন নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধ মত, এই বলে সেগুলির নিন্দা করতে হবে– ইসলামকে ইসলামের কোন অনুষ্ঠানকে নিন্দা করে নয়। ... তোমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা 'বিদ্রোহী' হয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন তোমার 'সুবেহ উম্মাদ' পড়ে আনন্দে গর্বে লাফিয়ে উঠেছিলেন, আর নাচতে নাচতে এসে আমার বলেছিলেন, নজরুল যদি এমনি ধারায় লিখত, তাহলে বাঙ্গলার আলিমরা যে তাকে মাথায় করে রাখত (যিনি বলেছিলেন তিনি একজন আলিম)। এ কথা কয়টি তোমার ভেবে দেখতে বলি। বাঙ্গলার মৌলানা কবির আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাঙ্গলার মুসলিমকে, বাঙ্গলার সাহিত্যকে ধন্য কর।

তাই আজ বড় আশায়, বড় ভরসায়, বড় সাহসে, বড় মিনতির স্বরে তোমায় বলছি, ভাই কাঙ্গাল মুসলিমের বড় সাধনার ধন তুমি, তুমি এই দিকে– পতিত মুসলিম সমাজের দিকে, এই অবহেলিত ইসলামের দিকে একবার চাও। তাদের ব্যথিত চিত্তের করুণ রাগিণী তোমার কণ্ঠে ভাষা লাভ করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলুক, তাদের সুপ্ত প্রাণের জড়তা তোমার আকুল আহ্বানের উন্মাদনায় চেতনাময়ী হউক, ইসলামের মহান উদার উচ্চ আদর্শ তোমার কবিতায় মুক্তি লাভ করুক, তোমার কাব্য সাধনা ইসলামের মহানুভবে চরম সার্থকতায় ধন্য হোক।'

বছর তিনেক পর নজরুল ইসলাম ইবরাহীম খাঁর এই করুণ আকুতিপূর্ণ চিঠির জবাব দেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, 'ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোন ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি, গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমিও স্বীকার করি, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি। আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে গানের সুর। উঠতে পারেও

www.pathagar.com

না। তাহলে তা কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে, উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়।...'

এরপর নজরুল বলেছেন, 'যাঁরা মনে করেন– আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি, তারা অনর্থক এ ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার, মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে– তাকে ইসলাম বলে না মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান? এ ভুল যারা করেন, তারা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া করে।'

আনোয়ার হোসেনকে লেখা চিঠি এবং ইবরাহীম খাঁকে লেখা চিঠিতে তিনি একটি কথার পুনরুক্তি করেছেন তা হল মুসলমান সমাজ তাঁর কাব্যের মর্মবাণীকে উপলব্ধি করতে না পেরে তাঁকে ভুল বুঝেছে। সে মর্মবাণী কি? সে হল– 'ইসলামের প্রাণশক্তি, গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।'

বস্তুত নজরুলের যে 'বিদ্রোহী' কবিতাটিকে লক্ষ্য করে ইবরাহীম খাঁ বলেছিলেন সেটা ইসলামের বিরুদ্ধতা, তার শেষের স্তবকের আগের স্ত বকে এই কথাগুলি ছিল:

মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না!

এই উক্তি ইসলামের বিরুদ্ধ আদর্শের উক্তি নয়। সেজন্যেই নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'যারা মনে করেন– আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি তারা অনর্থক এ ভুল করেন।'

আবদুল মান্নান তালিব যখন বলেন, 'সাহিত্য মানবতার জন্য, সাহিত্য জীবনের জন্য, সাহিত্য কল্যাণের জন্য, সাহিত্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের উৎখাতের জন্য। ইসলামী সাহিত্যের এটাই মৌল পরিচয়।'

তখন মনে হয় নজরুল সম্বন্ধে ইবরাহীম খাঁর অভিযোগ সত্য ছিল না। সত্যই মুসলিম সমাজ নজরুলকে ভুল বুঝেছিল।

বলা বাহুল্য, আবদুল মান্নান তালিব একথা পর্যন্ত বলেছেন, 'ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় কোনো অমুসলিমের হাতে সৃষ্টি হলেও তা ইসলামী সাহিত্য।'

তাঁর মতে 'মুসলিম সাহিত্য যেখানে কেবলমাত্র মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য সেখানে ইসলামী সাহিত্য মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সবার সৃষ্ট সাহিত্য।' এখানে কি একটা স্ববিরোধী উক্তির প্রকাশ ঘটেছে? তা হল ইসলামকে যিনি সঠিকভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই মুসলমান। অতএব তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য কি ইসলামী আদর্শবিরোধী সাহিত্য হবে? একজন প্রকৃত মুসলিম কি সত্য সত্যই ইসলামের আদর্শবিরোধী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন?

অবশ্য তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইসলামী আদর্শযুক্ত সাহিত্য ভিন্ন সাহিত্য, তা সার্বজনীন মানবতার সাহিত্য– ভিন্নধর্মীর লেখাতেও সে সাহিত্য থাকতে পারে। উদাহরণ হিসাবে তিনি টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ,

www.pathagar.com

গ্যেটে, ইলিয়ট ও বার্নার্ডশ'র যে সাহিত্যাংশ কল্যাণমুখী তাকে তিনি ইসলামী মানবতাবাদী সাহিত্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'এ দৃষ্টিতে টলস্টয়, গ্যেটে, ইলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ, বার্নার্ডশ প্রমুখ কবি ও কথাশিল্পীরা মুসলিম না হলেও তাদের সাহিত্যকর্মের একাংশের সাথে ইসলামী সাহিত্য একাত্মতা ঘোষণা করতে দ্বিধা করে না।'

অন্য দিকে একজন মুসলিম নামধারী সাহিত্যিকের সাহিত্যে ঐ গুণ নাও থাকতে পারে এবং তা ইসলামী সাহিত্য হিসাবে গৃহীত নাও হতে পারে।

বলা বাহুল্য তাঁর গ্রন্থে তিনি ইসলামী আদর্শের সাহিত্যের ব্যাখ্যায় কঠোর বয়নশীল শৃঙ্খলাধর্মী মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার সাথে সাথে একটি নিরপেক্ষ উদার অসংকীর্ণ মনোভাবেরও পরিচয় দিয়েছেন যাতে প্রবন্ধটি একটি মৌলিক চিন্তার পরিচয়বাহী হয়েছে বলে আমার ধারণা।

এই প্রবন্ধে আরবি ও ফারসি কবিদের কথা উল্লেখ করে এবং কবি ও কাব্য সম্পর্কে আল কুরআন ও রসূলুল্লাহ স.-এর ধারণা উদ্ধৃত করে এবং সেই প্রেক্ষিতে ইসলামী সাহিত্যাদর্শ নিরীক্ষা করে তিনি তাঁর গভীর সাহিত্যপাঠ ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং প্রবন্ধটিকে সুধীবৃন্দের উপভোগ্য করে তুলেছেন। এটা আবদুল মান্নান তালিবের একটি মৌলিক সৃষ্টি। অনন্য এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্য পরিষদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে।

www.pathagar.com

একটি দিকনির্দেশক গ্রন্থ
বুলবুল ইসলাম

ইসলাম শুধু মানবগোষ্ঠীরই ধর্ম নয়, ইসলাম সৃষ্টির তথা প্রকৃতিরই স্বভাবধর্ম। স্বভাবধর্ম বলেই ইসলাম মানগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবন থেকে নিস্কৃতি দিতে পেরেছে এবং প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ইসলাম আহ্‌বান জানিয়েছে : স্রষ্টার অস্তিত্ব আর তার নিদর্শন সর্বত্র খুঁজতে। আল্লাহ বিজ্ঞানময়। আর তাই সন্ধানী মানবগোষ্ঠী চারদিকে খোঁজে পরম ও চরম সত্য আল্লাহকে। সমর্পিত হয় সে তাঁরই কাছে, যাঁর ইচ্ছের ফলশ্রুতিতে এসেছে পৃথিবীতে, আবার ফিরে যাবে তাঁরই কাছে।

মানবগোষ্ঠী আদি পুরুষ হযরত আদম আ. থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ স. অবধি যে প্রত্যয়ঋদ্ধ জীবনবিধান মানুষের জন্যে প্রচারিত হয়েছে, নিতান্তই মূর্খ কিংবা অভিশপ্ত না হলে তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

মুহাম্মদ স.-এর আবির্ভাব কি শুধুই মানবগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বিধান আর পারলৌকিক মুক্তির বাণী শোনানোর জন্যেই ঘটেছিলো? এ জিজ্ঞাসার উত্তর নেতিবাচক বলেই বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। মুহাম্মদ স.-কে মহান আল্লাহ 'রাহমাতাল্লিল আলামীন' অর্থাৎ 'সমগ্র সৃষ্টির প্রতি কল্যাণস্বরূপ' অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন। লক্ষণীয়, আল্লাহ তাঁকে শুধু তাঁর উম্মত তথা মুসলমান কিংবা কোনো একটি বিশেষ গ্রহ, উপগ্রহ বা দেশ অথবা মহাদেশের জন্যে প্রেরিত 'কল্যাণস্বরূপ' বলে অভিহিত করেননি। সুতরাং এ অভিধার গুরুত্ব, সার্থকতা ও ব্যাপ্তি নিয়ে বিশদ আলোচনা না করেও বলা যায়, মুহাম্মদ স.-এর আবির্ভাবে পৃথিবী বলে

www.pathagar.com

আখ্যায়িত গ্রহলোকে মহাবিপ্লব সাধিত হয়েছে। মুহাম্মদ স.-এর আগমন অন্তত এ গ্রহবাসীর যুগযুগান্তরের রাত্রিদিনের তপস্যারই অমিতাভ জান্নাতি ফলশ্রুতি।

এ গ্রহলোকের চিরকাঙ্ক্ষিত খোদায়ী কল্যাণ মুহাম্মাদ স. কোনো অভিনব ধর্ম প্রবর্তন করেননি। মূলতই তিনি ইসলামের প্রবর্তক নন, বরং মুহাম্মদ স. হলেন সৃষ্টির একমাত্র স্বভাবধর্ম, যাকে মানবগোষ্ঠীর এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টিরও চিরচলমান পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলা যায়, তারই সর্বশেষ প্রচারক। সংযোজন হলো, মুহাম্মাদ স. এসে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ ক'রে দিয়েছি এবং আমার কল্যাণ (নিয়ামত) তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি।' (সূরা আল মায়েদা : ৩)

উল্লিখিত আয়াত থেকে একদিকে যেমন প্রমাণিত হয় মুহাম্মাদ স.-এর মাধ্যমে ইসলাম পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে, তেমনি অপরদিকে প্রমাণিত হয় মানবগোষ্ঠীর জন্যে দ্বীন হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন।

দূর অতীতে মুসলমানেরা যে সারা বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনন-মনীষা ও প্রজ্ঞার ভুবনে বিপ্লব এনেছিলেন, (আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা যে বিপ্লবের অন্যতম গোলাপী ফসল) তা কেমন করে সম্ভব হয়েছিলো? এ জিজ্ঞাসার জবাবে এক কথায় বলা যায়, কুরআন আর সুন্নাহকে আত্মস্থ করেই সে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো। বলা বাহুল্য ইসলামে যদি সত্য-সুন্দর-কল্যাণের তৃষ্ণাই না থাকতো, তবে প্রাণহীন অনুষ্ঠানসর্বস্বতার কংক্রিটে তা চাপা পড়তো, দিগ্বিজয় সম্ভব হয়ে উঠতো না।

মানব সভ্যতার সৃজন-লালন-বিকাশে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সভ্যতার মানস-শরীর সাহিত্যের রক্তেই গঠিত। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাস্কর্যশোভন বর্ণ বিভূতি পবিত্র কুরআন আর হাদীস শরীফে সবাক চিত্রের মতোই মহাকালের রূপালি পর্দায় দীপ্তশ্রী হয়ে আছে।

সভ্যতা যেখানে যতোক্ষণ পর্যন্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত সেখানে ততোক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম তার বিরোধিতা করে না, 'সভ্যতা' বলতে যদি বেশ্যাবৃত্তি, জুয়া, মদ্যপান, ঔপনিবেশিক ছলচাতুরী করে মানুষের স্বাধীনতা হরণ এবং মানুষের মন-মননকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধকরণ বোঝায়, তা হলে অবশ্যি ইসলাম সেখানে জেহাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

তাই, ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে আমরা যখন হযরত মুহাম্মদ স.-এর ইসলাম প্রচার যুগে ফিরে যাই, তখন দেখি–, সত্য-সুন্দর-কল্যাণ অভিসারী কবিতা ও সাহিত্য চর্চার জন্যে তিনি, নিখিল মানবের সেই মুক্তিদাতা, মুহাম্মাদ স. উৎসাহ যুগিয়েছেন। তথাকথিত সুন্দরের পূজারীদের 'Art for Art's sake কিংবা ম্যাথু আর্নলডের 'Criticism of life' সংজ্ঞাভুক্ত সাহিত্য চর্চা ইসলামে নেই। পরম সত্তার কাছে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত মানুষের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য যেখানে স্রষ্টার উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ, সেখানে সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যও একই অভিসারে মুক্তি খুঁজে পাবে, এটিই তো স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

সম্প্রতি প্রকাশিত আবদুল মান্নান তালিবের 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থখানিতে মুসলিম বিশ্বের একটি ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। আবদুল মান্নান তালিব আমাদের মননশীল সাহিত্যাঙ্গনে একটি উল্লেখযোগ্য সৃজনমুখর ব্যক্তিত্ব। গভীর মনীষার প্রোজ্জ্বল দীপ্তি তাঁর প্রতিটি লেখায় জ্বলজ্বল করে। আলোচ্য গ্রন্থেও আবদুল মান্নান তালিব তাঁর স্বকীয়তা ও মনীষাদীপ্তি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

আগেই বলেছি, 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান'-এ মুসলিম বিশ্বের একটি ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে; আমার এ বক্তব্য একটু বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। যে তাওহীদের আলোকে ইসলাম সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব বিপ্লব আর প্রাণবন্যার সৃষ্টি করেছে, সেই তাওহীদপন্থী জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর সর্বত্র। বর্তমান বিশ্বে অর্ধশতাধিক মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। কিন্তু পরিতাপ আর বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই বিশাল বিপুল তাওহীদি জনগোষ্ঠী তাদের চিন্তা-চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনে তাওহীদ ও তাওহীদি জীবনের প্রতিফলনের অভিব্যক্তি তুলনামূলকভাবে ঘটিয়েছে খুবই কম। এতোই কম যে, তাদের প্রকাশ-বিকাশ ও কার্যক্রমকে ইউরোপীয় জীবনদর্শন তথা পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শন ও কমিউনিস্টদের দর্শন থেকে আলাদা করলে একটি দীর্ঘশ্বাস মনের অজান্তেই বেরিয়ে আসে। আবদুল মান্নান তালিবের আলোচ্য গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না থাকলেও তীর্যক আলোকপাত রয়েছে। লেখকের 'প্রসঙ্গ কথা'য় আমাদের বক্তব্যের সমর্থন ও প্রতিফলন রয়েছে, 'মুসলমানরা বিপুল সাহিত্য সম্ভার গড়ে তুলেছেন। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বড় বড় মুসলিম সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য ইসলামী সাহিত্যের জন্য বিপুল প্রেরণার উৎস। তাঁদের মধ্য থেকে যাঁরা ইসলামী মতাদর্শকে নিজেদের সাহিত্য কর্মের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁরাই আমাদের আদর্শ।'

বিগত আট ন'শো বছর থেকে বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে মুসলমানদের পদচারণা। বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে মুসলমানদের সৃষ্টিসম্ভারও কম নয়। কিন্তু তাদের রচনার একটি বিরাট অংশ ভিন্ন মতবাদআশ্রিত, বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মুসলিম সাহিত্যিকদের বৃহত্তর অংশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলামবিরোধী মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন।

আবদুল মান্নান তালিবের 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত এ বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ-প্রয়াসী গ্রন্থ। 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থের আলোচনাগুলোকে তেরোটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। পর্বগুলো হলো : (১) জীবন ও জগতের সম্পর্ক, (২) স্রষ্টা কে?, (৩) জীবনের উদ্দেশ্য কি?, (৪) সাহিত্য কি?, (৫) সাহিত্যের উদ্দেশ্য, (৬) ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, (৭) ইসলামী সাহিত্য কি?, (৮) ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব, (৯) ইসলামী সাহিত্যে প্রেম প্রসংগ, (১০) ইসলামী সাহিত্য ও অশ্লীলতা, (১১) ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য, (১২) ইসলামী সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা ও (১৩) ইসলামী সাহিত্যের নিদর্শন।

উল্লিখিত পর্বমালার বিষয়বস্তু থেকেই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য, আদর্শ, গভীরতা ও সর্বোপরি অপরিহার্যতা অনুধাবন করা যায়। মুসলমানের সৃষ্ট

www.pathagar.com

হলেই তা যে ইসলামী সাহিত্য হবে, এমন কোনো কথা নেই, বরং ইসলামের পরিপন্থীও হতে পারে। হক ও বাতিলের সমন্বয়ে এক শঙ্করসাহিত্য সৃষ্টির উদাহরণ আমাদের বাংলা সাহিত্যে রেখেছেন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকেরাই। নজরুল সাহিত্যকেই উদাহরণ হিসেবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি। নজরুল বাংলা সাহিত্যেরই শুধু নন, বিশ্বসাহিত্যেরও এক অনন্যসাধারণ কবিপুরুষ, এ কথা শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেও বলা যায়, নজরুল সৃষ্টিসম্ভারের একটি বৃহত্তর অংশ জুড়ে রয়েছে ইসলাম তথা তাওহীদের পরিপন্থী বিষয়মালার সংযোজন। আর সেসব বিষয়মালা নিয়ে সৃষ্ট নজরুল সাহিত্যকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি, কিন্তু নিজের বলে গ্রহণ করতে পারিনে। তেমনই গ্রহণ করতে পারিনে মুসলিম কবিদের লেখা বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন ও ভজনমালাকেও।

লেখক মুসলিম সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে বা থাকতে পারে, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। অবশ্য এ আলোচনা আরো জোরালো ও বিশদভাবে হওয়া দরকার ছিলো। কারণ 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থখানি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি মূল্যবান দলিল ও সংযোজনরূপে আমাদের মননশীল সাহিত্যে অভিনন্দিত হবার স্পর্ধা রাখে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ইসলামী জীবনদর্শনের আলোকে কোনো কিছু লেখা হলেই এক শ্রেণীর তথাকথিত প্রগতিশীল তাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে আখ্যায়িত করেন অথবা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। 'বন্দে মাতরম' রচয়িতা, চরম মুসলিম-বিদ্বেষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাদের কাছে 'ঋষি' ও 'সাহিত্যসম্রাট' বলে অভিনন্দিত, তাদের কাছে ইকবাল কিংবা ফররুখ আহমদ যদি অবজ্ঞার পাত্রই হন, তা হলে সে সব 'প্রগতিশীল'দের করুণা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। চরম সত্যের অভিসারী ইসলামে যারা বিশ্বাসী, তারা কখনো আত্মঘাতী মতবাদ দ্বারা আক্রান্ত কিংবা প্রভাবিত হতে পারে না। ইসলামে গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, একদেশদর্শিতা আর অবমূল্যায়ন-অবজ্ঞার স্থান নেই। তবু তাওহীদি জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ হাতের কাছে কাউসার ফেলে বাইরে থেকে সুরা আমদানী করেছেন, করছেন। এ গ্রন্থখানি তাদের চৈতন্যোদয়ে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। লেখক আমাদের সুদীর্ঘকালের একটি অভাব পূরণ করেছেন।

'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থের প্রতিটি ছত্রে একটি মহৎ বেদনাবোধ যেমন হাহাকার আর্তনাদ করে উঠেছে, তেমনই উচ্চকিত হয়েছে সম্ভাবনাআশ্রয়ী বিপুল প্রত্যাশা। বাংলাভাষীকে লেখক একটি ক্ষুদ্র অথচ অনন্য রচনা উপহার দিলেন। 'ক্ষুদ্র' আমি সচেতনভাবেই বলেছি। কারণ লেখক তাঁর বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর করতে গিয়ে পাঠককে প্রচুর জিজ্ঞাসার মাঝে ফেলে দিয়েছেন। আমরা আবদুল মান্নান তালিব থেকে এমন বঞ্চনা আশা করিনি। হ্যাঁ, 'বঞ্চনা'ই বটে! আলোচ্য গ্রন্থের 'ইসলামী সাহিত্য কি?', 'ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব' ও 'ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য' শিরোনামের রচনাগুলো যেমন আরো ব্যাপক ও তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারতো, তেমনই 'ইসলামী সাহিত্যে বিশ্বজনীনতা' শিরোনামের রচনাটি হতে পারতো আরো মননঋদ্ধ।

www.pathagar.com

'ইসলামী সাহিত্যের নিদর্শন' শিরোনামের অত্যন্ত মূল্যবান রচনাটি আমাদের একদিকে যেমন ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় 'হেরার রাজতোরণে'র স্বরূপ দেখিয়েছে, তেমনই অপরদিকে করেছে অধিকতর নিরাশ। বাংলা-আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায় রচিত ইসলামী সাহিত্যের প্রতি সামান্য আলোকপাত করেই লেখক রচনার ইতি টেনেছেন। কিন্তু আমরা লেখকের কাছে সমগ্র বিশ্বের সকল ভাষার ইসলামী সাহিত্যের কিছু নিদর্শনও রচনাটিতে আশা করেছিলাম। লেখকের প্রতি আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ থাকবে, এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যেনো তিনি আমাদের উপহার দেন।

'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা সহজেই চোখে পড়ে। ইসলামের আলোকে সাহিত্য ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত আলোচনায় আরো কিছু শিরোনামের, যেমন (১) ইসলাম ও সৌন্দর্য চর্চা, (২) ইসলাম ও কাব্য চর্চা, (৩) কবি, কবিতা ও ইসলাম, (৪) ইসলাম ও প্রকৃতি বা নিসর্গপ্রীতি, (৫) ইসলাম ও রোমান্টিসিজম, (৬) ইসলামী সাহিত্য ও বস্তুবাদী সাহিত্য, (৭) ইসলাম ও প্রতীক চর্চা প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা হতে পারতো।

অসম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ততর হওয়া সত্ত্বেও আবদুল মান্নান তালিব তার 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়ে আমাদের সামনে একটি নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছেন। আর, এজন্যে লেখক এবং প্রকাশক উভয়ই বাংলাভাষীদের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।

গ্রন্থখানির ছাপা ঝকঝকে, প্রচ্ছদ রুচিসম্মত! মুদ্রণে দু'চারটি ত্রুটি রয়েছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান– আবদুল মান্নান তালিব। প্রকাশক: এ. কে. এম. নাজির আহমদ। বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ৭১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-৫। মূল্য : বার টাকা। পৃষ্ঠা : ৪৮।

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান প্রসঙ্গে
আসাদ বিন হাফিজ

'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' এমন একটি মৌলিক বিষয়, যার আলোচনা কেবলমাত্র ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী এমন ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব, যিনি আধুনিক সাহিত্যের অলিগলি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান রাখেন। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এ বিষয় নিয়ে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি। ফলে বিষয়টি যেমন নতুন, তেমনি অভিনবত্বের দাবিদার। এ ধরনের একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রকাশিত আবদুল মান্নান তালিবের 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' গ্রন্থটি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

লেখকের জীবনদর্শন ও মন-মানসিকতাকে কেন্দ্র করেই যেহেতু সাহিত্যের সৃষ্টি, তাই সাহিত্য বিষয়ক আলোচনার পূর্বেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ইসলামী সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি কি প্রথমেই খুব সংক্ষেপে লেখক এখানে তা উল্লেখ করেছেন। এ পর্বের আলোচনায় জীবন ও জগতের সম্পর্ক, স্রষ্টা কে? জীবনের উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা তিনি পেশ করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে তিনি আলোচনা করেছেন সাহিত্য ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, এ সম্পর্কে। তৃতীয় পর্বের আলোচনা ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও ইসলামী সাহিত্য কি এ সম্পর্কিত। চতুর্থ পর্বে তিনি ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেছেন। পঞ্চম পর্বের আলোচনা ছিল ইসলামী সাহিত্যে প্রেম প্রসংগ এবং ইসলামী সাহিত্য ও অশ্লীলতা বিষয়ক। এরপর তিনি অকাট্য যুক্তি-

www.pathagar.com

তর্কের মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্যের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায় ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও বিশ্বজনীনতা সম্পর্কিত। সবশেষে তিনি ইসলামী সাহিত্যের নিদর্শন পর্যায়ে আলোচনা রাখেন।

বইটির পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা পড়লে বুঝা যায় প্রতিটি বিষয়সূচি যে সিরিয়াস আলোচনার দাবি রাখে, লেখক সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই সাথে পাঠকদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়, বইটির প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনাই অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। যে কোন কারণেই হোক, আলোচনার এ সংক্ষিপ্ততা পাঠকদের অতৃপ্তি ঘুচাতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য পর্যায়ে সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামতের পর্যালোচনা করে তিনি যে দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, সেখানে এ সংক্রান্ত কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি আরো অধিক পরিমাণে থাকলে ভালো হতো। ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য পর্যায়ের আলোচনাটিকে ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা বলা যেতে পারে। এখানে ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পয়েন্টভিত্তিক আলোচনা সংগত কারণেই দাবি করা যায়। ইসলামী সাহিত্য কি? এ পর্যায়ের আলোচনা তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ। ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে তিনি বলেন, ইসলাম যে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যে সাহিত্য সেগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, যে সাহিত্যে এই মূল্যবোধগুলো পত্র-পল্লবে, শাখা-প্রশাখায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেটিই ইসলামী সাহিত্য। এতে বক্তব্যের পজেটিভ দিকটিকেই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে, নেগেটিভ দিকটি আসেনি। ইসলামী সাহিত্য কি? এ আলোচনায় যদি আলোচনার সাথে সাথে সংজ্ঞা নির্দেশের প্রয়াস থাকতো তবে আরো ভালো হতো। ইসলাম শুধু সমাজে কতকগুলো মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিতই করতে চায় না, বরং কতকগুলো মূল্যবোধ সে সমাজ থেকে উৎখাতও করতে চায়। এ ব্যাপারেও ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইসলামী সাহিত্য কি, এ পর্যায়ে ইসলামী সাহিত্যের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে যা ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য পর্যায়ে আলোচিত হলেই অধিক সঙ্গত হতো। ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু এ সম্পর্কে আলোকপাত করতে যেয়ে তিনি সাতটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। আমার মনে হয়, বিষয়বস্তুর বিশ্বাসে সামান্য পরিবর্তন করলে ভালো হতো। তিনি বিষয়বস্তুকে এভাবে উল্লেখ করেছেন:

এক. ইসলামের তিনটি মৌল বিশ্বাস : তৌহিদ, রিসালাত ও আখেরাত।

দুই. ইসলামী চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলী।

তিন. আমাদের সমাজ ও পরিবেশ এবং

চার. চতুর্থ বিষয় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন নারী। আমার মনে হয়, বিষয়বস্তু হওয়া উচিত আকীদাগত দিককে কেন্দ্র করে। নারী আমাদের লেখায় আসবে না তা নয়, তবে নারী ও পুরুষ সাহিত্যে আসবে

www.pathagar.com

পাত্র-পাত্রী ও চরিত্র হিসেবে। এক্ষেত্রে ইসলাম নির্ধারিত অধিকার ইসলামের দাবি ও তার বর্তমান অবস্থা হতে পারে; তবে পাত্র-পাত্রী ও চরিত্রাবলীকে বিষয়বস্তুর পর্যায়ে নিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত নয়।

পাঁচ. পঞ্চম বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম। বিষয়বস্তুর শিরোনাম হিসেবে পুঁজিবাদ ও কমিউজিম না রেখে অনৈসলামী মতবাদ রাখলে ভালো হতো। তবে অনৈসলামী মতবাদের অংশ হিসেবে পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে।

ছয়. ষষ্ঠ বিষয়বস্তু দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক সুবিচারের পরিবর্তে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার হওয়া উচিত।

সাত. ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লব।

ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি কতিপয় বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আলোচনাটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হলেও তিনি নির্দেশনা পেশ করেননি। বক্তব্যকে আরো পয়েন্ট আউট করলে সুবিধা হতো।

ইসলামী সাহিত্যে প্রেম প্রসঙ্গ ও ইসলামী সাহিত্য ও অশ্লীলতা শীর্ষক আলোচনা দু'টি এ বইয়ের সবচাইতে সমৃদ্ধ, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল আলোচনা। এতে এ গোঁড়ামি ও গোঁজামিলের যেমন তিনি প্রশ্রয় দেননি, তেমনি মানবিকতার নামে বল্গাহীন বক্তব্য পরিবেশন যে ইসলাম অনুমোদিত নয়, দ্ব্যর্থহীনতভাবে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে ইসলামের সীমারেখা নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি কুরআনে হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনা তুলে ধরেছেন। কুরআন এ ঘটনাটি পরিবেশনের ক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করেছে ইসলামী সাহিত্যিকদের আদর্শ তাই। এরকম হলে যেমন সাহিত্যের মান ক্ষুণ্ন হতে পারে, এর বেশি হলে তা দুর্ঘটনার জন্ম দিতে পারে।

অনেকেই জীবনকে উলঙ্গভাবে সাহিত্যে তুলে ধরার পক্ষপাতী। কিন্তু আমরা যেমন নিজেদের সমাজে তুলে ধরার ক্ষেত্রে পোশাকের আশ্রয় নিই এবং যত বেশি সম্মানিত পরিসরে নিয়ে যেতে চাই তত বেশি ভাল পোশাকের আশ্রয় গ্রহণ করি তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অলঙ্করণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কোন গোপনীয় বিষয় যেমন সর্বসমক্ষে পেশ করা লজ্জাকর তেমনি সাহিত্যেও লজ্জাকর বিষয়কে উলঙ্গভাবে তুলে ধরা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে আমরা যত কৌশল ও উপমা-অলঙ্করণের আশ্রয় নেবো, সাহিত্য তত বেশি শোভন, শালীন ও আকর্ষণীয় হবে।

ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য শীর্ষক আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও স্পষ্টতার অধিকারী। ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুসমৃদ্ধ অধ্যায়। তেমনি একটি মূল্যবান অধ্যায় ইসলামী সাহিত্য নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে ইসলাম শীর্ষক আরেকটি অধ্যায় এখানে সংযোজিত করার কথা লেখক ভেবে দেখতে পারেন। ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ইসলামী সাহিত্যের চর্চা ও ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গুরুত্ব পর্যায়েও আলাদা অধ্যায় সংযোজিত হতে পারে। এছাড়া রসূল স. ও সাহাবাদের দ্বারা ইসলামী সাহিত্যের চর্চার যে

www.pathagar.com

সকল নিদর্শন এ বইয়ে পরিবেশিত হয়েছে সেগুলোকে একটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করতে পারলে ইসলামী সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব পাঠক আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে পারত।

'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' পুস্তকটিকে কেন্দ্র করে আলোচনা প্রসঙ্গে আসওয়া নামক উর্দু ম্যাগাজিনে প্রকাশিত মওলানা মওদূদীর একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের স্মরণ করা যেতে পারে। ইসলামী সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে এ নিবন্ধে মওলানা মওদূদী বলেন, সাহিত্য শুধু শ্লীল ও পরিচ্ছন্ন হলেই ইসলামী হয় না, বরং ইসলামী মতাদর্শের উপর ভিত্তিকৃত হলেই তা ইসলামী সাহিত্য। যেসব জিনিসকে ইসলাম সঠিক বলে, মুসলমান সাহিত্যিক সেগুলোকে সঠিক মনে করে ও অন্যের কাছে সেভাবে প্রচার করে এবং তাদের আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে। যেসব কথা ইসলামে বাতিল, মুসলিম সাহিত্যিক সেগুলোকে মিথ্যা মনে করে এবং সেগুলো যে মিথ্যা তা প্রচার ও প্রমাণ করে। আর ইসলাম যে জীবনবিধান প্রতিষ্ঠা করতে চায়, মুসলিম সাহিত্যিক সেজন্য সাহিত্যের পরিমণ্ডলে প্রচেষ্টা চালায়।

জ্ঞানের সাহিত্যের উদ্দেশ্য চিন্তার পুনর্গঠন আর ভাবের সাহিত্য মনকে জয় করে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই Pure literature-কে মর্মস্পর্শী হতে হয়। যদি তা হৃদয়গ্রাহী না হয় আর আবেগ-অনুভূতির উদ্বেলতায় মানুষকে সক্রিয় করে না তোলে তাহলে সে সাহিত্য নিষ্প্রাণ।

Effective সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সাতটি জিনিস প্রয়োজন। আমি মুসলিম সাহিত্যিকদের এগুলো গ্রহণ করতে অনুরোধ করবো। Effective সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম শর্ত হচ্ছে তাতে হীনমন্যতা থাকবে না। মুসলিম সাহিত্যিক নিজেকে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিহীনতার বাইরে রাখবেন। তার লেখায় আবেদন থাকা চাই আর তার চিন্তাশক্তির নতুন পথ বের করতে পারা চাই। গতানুগতিক পথের লিখিয়েরা পাঠকদের মনে দ্রুত ক্লান্তি এনে দেয়।

দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, সাহিত্যিকের ভাষা হবে গণবোধ্য। তাতে কোন জটিলতা ও অবোধ্য শব্দের ব্যবহার থাকবে না। দুর্বলতা ওদের মাঝেই বেশি থাকে, যারা ভিন্ন ভাষা পড়ে এবং চিন্তা করে আর নিজের ভাষায় তার অনুবাদ করে। কিন্তু উপযুক্ত শব্দ না পেয়ে তাতে গোঁজামিলের আশ্রয় নেয়। এদের প্রতি পাঠকের মন আকৃষ্ট হয় না এবং তারা অচেনা থাকে। ফলে এসব কবি-সাহিত্যিক সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পথভ্রষ্ট লোকদের অধিকাংশই এ রোগে ভুগছেন। তা না হয়ে তাদের ভাষা গণবোধ্য হলে, আরো অনেক বেশি লোককে তারা পথভ্রষ্ট করতে সমর্থ হতো। খোদার কাছে প্রার্থনা ইসলামী সাহিত্যিকদের আল্লাহ এ থেকে হেফাজত করুন!

Effective সাহিত্যের জন্য তৃতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে, চিন্তার দৃঢ়তা। মুসলিম সাহিত্যিকের আধ-খেচড়াঁ অস্পষ্ট চিন্তা পেশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত, বরং তার চিন্তাকে ভালভাবে গুছিয়ে নেয়া চাই। আর গুছানো চিন্তার বর্ণনাভঙ্গি সাবলীল ও জটিলতামুক্ত হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

চতুর্থ জিনিস হচ্ছে সাহিত্যিকের জ্ঞান ও জানাশোনার পরিধি ব্যাপক হতে হবে। এটা ছাড়া সাহিত্যিক না কোন কাজের কথা বলতে পারেন আর না মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন। তার মগজ হয় অগভীর কূপের মত, যার ভাণ্ডার অল্পতেই শেষ হয়ে যায়। সাহিত্যিকের জানাশোনা যত ব্যাপক হবে তিনি তত effective কথা বলতে পারবেন। আর তাই ইসলামী সাহিত্যিকদের দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদির উপর ভালো চর্চা থাকা চাই।

পঞ্চম জরুরি জিনিস হলো, সাহিত্যিকদের যুক্তি প্রদান ক্ষমতা। বস্তুনিষ্ঠ রচনায় যেমন যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করতে হয়, তেমনি কবি-সাহিত্যিকেরও যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এদের প্রমাণ পেশের ধরন মধুর ও মনোরম। আর এভাবে প্রমাণ দিয়েই তারা পাঠককে নিজের কথা গ্রহণ করান। প্রমাণ ছাড়া সাহিত্য effective হয় না।

ষষ্ঠ হচ্ছে, সাহিত্যিকের সততা। সৎ সাহিত্যিকের শব্দচয়ন ও ভাষা তার অনুভূতি ও ধ্যান-ধারণার অনুরূপ হয়। অনুভূতির বিপরীত কিছু বলতে চাইলেও ভাষা ও লেখনী তাকে সহযোগিতা করে না। মুসলিম সাহিত্যিক তার প্রকৃত আবেগ-অনুভূতি অনুযায়ী ভাষা এবং সাহিত্যের নিদর্শন পর্যায়ে সমালোচনা রাখেন। তাতে অপ্রত্যাশিত শক্তির সৃষ্টি হয়।

সপ্তম ও শেষ জিনিস হচ্ছে, সাহিত্যিকের জীবন তার চিন্তার অনুরূপ হবে। যারা বলেন এক কথা আর করেন অন্য কিছু, তাদের চেয়ে বাজে মানুষ আর নেই।

এরা পৃথিবীতে কোন কাজই করেনি। চরিত্রই লেখা ও বর্ণনায় শক্তি সৃষ্টি করে। চরিত্র ছাড়া শুধু আলোচনায় কোন ফল হয় না। আর কোন ইসলামী সাহিত্যিক এমন বাজে কাজে ব্যাপৃত হতে পারেন না।

মওলানা মওদূদী র.-এর পরামর্শ কয়টি আলোচ্য বইয়ের আলোচনার সাথে স্মরণ রাখলে আমাদের গতিপথ নির্ধারণে তা আরো সহায়ক হবে।

সুসাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিবের 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' বইটি প্রকাশ করেছে বাংলা সাহিত্য পরিষদ। পরিষদের এটিই প্রথম প্রকাশনা। পরিবেশনায় পরিষদ যে পরিচ্ছন্নতা ও রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছে, তা শুধু প্রশংসনীয় নয়, বাংলাভাষী তৌহিদী জনতার হৃদয়ে পরিষদ নিঃসন্দেহে এর মধ্য দিয়ে একটি সম্মানজনক আসন দখল করে নিতে সক্ষম হবে। বইটিতে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থাকলেও এর অঙ্গসজ্জা ও প্রচ্ছদ সবই আকর্ষণীয়। মজবুত বোর্ড বাঁধাই, সাদা কাগজে ছাপা, দু'রঙা প্রচ্ছদের এ বইটির দাম মাত্র বারো টাকা। বইটির বহুল প্রচার আমাদের কাম্য।

www.pathagar.com

একটি উচ্চাঙ্গের মননশীল গ্রন্থ

ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান

নাসীর আহমদ

ইসলামী সাহিত্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে একটা বইয়ের অভাব দীর্ঘদিন ধরেই আমরা অনুভব করে আসছিলাম। এ সম্পর্কে অমুসলমান তো দূরের কথা, বড় বড় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের পর্যন্ত কোন ধারণাই নেই। যাদের বা কিছুটা ধারণা আছে তারাও অস্পষ্টতার শিকার। ইসলামী সাহিত্যকে অনৈসলামী সাহিত্য থেকে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করে পেশ করবার তাকিদে আমরা ষাটের দশকে স্থাপিত পশ্চিমবংগ ইসলামী সাহিত্য সমিতির সভায় ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করেছিলাম। এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ পয়গাম ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিল এবং এ ধরনের একটা বই লেখার বাসনা আমার ছিল। কিন্তু অগ্রজপ্রতিম মান্নান সাহেব অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে আমার মত সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হলেন। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে ইসলামী সাহিত্যের উপর এমন উচ্চাঙ্গের মননশীল বই আর দ্বিতীয়টি নেই। এই পুস্তকটি ইসলামী সমালোচনা সাহিত্যে লেখককে স্থায়ী আসনের মর্যাদা দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আবদুল মান্নান এখানে ইসলামী সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, 'ত্রয়োদশ শতকে আমাদের দেশের মুসলমানরা যখন ইসলামী সমাজের গোড়াপত্তন করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের আদর্শকে তারা গ্রহণ করেছিলেন। এই আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস তারা চালিয়েছেন, এতে সন্দেহ নেই। এর প্রথম প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের মানবতাবাদকে তারা বাংলা

www.pathagar.com

সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ফলে দেবদেবীর পরিবর্তে মানুষ হয়ে উঠেছিল সে সাহিত্যের বিষয়বস্তু।' এ ধরনের আরো অতীব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বইটির পরতে পরতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামী সাহিত্য কি ও কেন এ সম্পর্কে যারা জানতে চান পুস্তকটি তাদের জন্য অপরিহার্য।

বইটির মলাটে ও ভেতরে লেখকের পুরো নাম লেখা হয়েছে আবদুল মান্নান তালিব কিন্তু পশ্চিম বাংলায় তিনি আবদুল মান্নান হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পরিচিতি এপার বাংলায়ও নেহায়েত কম নয়।

বইটি বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা প্রকাশ করেছে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই, প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সবই রুচিসম্মত। পুস্তকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। (সাপ্তাহিক মিযান, কলকাতা, ১৭.২.১৯৮৫)

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট
নাসীর মাহমুদ

নামকরণেই গ্রন্থের প্রাথমিক পরিচিতি স্পষ্ট– এটি একটি প্রবন্ধ সংকলন। প্রতিটি প্রবন্ধেই লেখকের নিজস্বতার স্বাক্ষর লক্ষণীয়। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসায় সুযুক্তিপূর্ণ আত্মভাবনার অভিব্যক্তি লেখকের গবেষক ও দার্শনিক মনন ও স্বাতন্ত্র্য চেতনার পরিচায়ক। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায় অতিনতুন ও অভিমত প্রকাশে তিনি দৈনিক ও কালিক সংকীর্ণতাকে পরিহার করে বিশ্বজনীন প্রশস্ততাকে ধারণ করেছেন। ফলে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি মন্বন্তরের চূড়ান্ত মানদণ্ডের দাতা হিসেবে তিনি কোন মানুষকে স্বীকার করেননি, বরং বলেছেন– ... 'এ ধরনের কোনো মানদণ্ড দিতে (মানুষ) অগ্রসর হলেই সেটা সার্বজনীন না হয়ে হবে একদেশদর্শী।' উদ্ধৃত অংশটুকুই লেখকের চিন্তার গভীরতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তিনি তাই মানদণ্ড দেয়ার ব্যাপারে নিখাদ সৌন্দর্য ও নিরপেক্ষ সত্তা আল্লাহকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান তালিবের মনন-মনীষা সার্বজনীন মহিমময় ইসলামী জ্ঞানলব্ধ।

'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে মোট সতেরোটি প্রবন্ধ। গ্রন্থের শিরোনামেই গ্রন্থকার প্রবন্ধগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। বলা বাহুল্য, তিনটি শ্রেণীর বিষয়বস্তুই পরস্পর সম্পৃক্ত, এর কোনটিই অবিমিশ্র না হলেও এ বিভাজন পাঠককে লেখকের বক্তব্য সহজভাবে অনুধাবনে সহায়তাই করবে। তবুও প্রতিটি প্রবন্ধে বিষয় ও বক্তব্যের

www.pathagar.com

ভিন্নতা এবং উপস্থাপ্য বিষয়ের বিন্দুমুখী অগ্রসরমানতা আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। আপাতত কঠিন ও যুগান্তরব্যাপী বিতর্কিত বিষয়কে অতি সহজ সাবলীল ঋজু অর্থাৎ সর্বজনীন বোধ্য ভাষায় তিনি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন, মূলত এটা তাঁর প্রবন্ধ রচনার একটা বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো হলো 'শিল্প ও সাহিত্য এবং সাহিত্যের পরিসর', 'সাহিত্যে সুন্দরের সাধনা', 'জীবন ও সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা', 'লেখক ও তার সামাজিক দায়িত্ব', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলন : ইসলামের দৃষ্টিকোণ', 'সাহিত্য অঙ্গনে বিরূপতা', 'আমাদের সংস্কৃতি,' 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি,' 'বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব,' 'সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ,' 'বিশ শতকের দাবী ও আমাদের সংস্কৃতির বিপর্যয়,' ঈদুল ফিতরের সাংস্কৃতিক দিক,' 'আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সিনেমা,' 'নাটক ও অভিনয় : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি' 'আমাদের ভাষা,' 'ভাষা বনাম জাতিসত্তা' ও 'বাংলা ভাষার ঐতিহ্যিক স্বাতন্ত্র্য'। প্রবন্ধের শিরোনামেই বিষয়ের অভিনবত্ব সূচিত হয়ে যায়। 'আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সিনেমা' ও 'নাটক ও অভিনয় : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টি সম্পূর্ণ নতুন। প্রবন্ধকার প্রায়শই উদার। তিনি এসব নতুন বিষয়ে মুসলিম সমাজবিদ, চিন্তানায়ক ও তত্ত্বসন্ধানী বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়গুলো প্রকৃতই সহৃদয় পাঠককে ও চিন্তাবিদদের ভাবিয়ে তুলবে আশা করছি।

লেখক ভূমিকাতে বলেছেন, 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূলত জীবন চর্চারই আর এক নাম। আর ইসলাম তার ব্যাপকতর পরিসরে এ জীবন চর্চার সুযোগ দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর অন্যান্য মতবাদ যেখানে এ জীবন চর্চার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতর করে রেখেছে যার ফলে দেখা দিয়েছে বিদ্রোহ, সীমালংঘন করার প্রবণতা এবং অবশেষে পূর্ণ প্রত্যাখ্যান। সেখানে ইসলাম দেড় হাজার বছর ধরে জীবন চর্চা করে আসছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোথাও বিদ্রোহ করতে হয়নি, বরং ইসলামী আদর্শ নতুন নতুন সংযোজনকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। কোথাও বিরুদ্ধবাদিতার প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। ইসলামী মতাদর্শের এ ব্যাপ্তি ও ঔদার্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।' গ্রন্থকারের এই মহৎ উদ্দেশ্য সফলতা অর্জন করুক, গ্রন্থকারককে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনার মাধ্যমে তাই প্রত্যাশা করি।

সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা : ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট– আবদুল মান্নান তালিব, প্রকাশনায় বাংলা সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯১।

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান
ভাবনার নতুন দিগন্ত
ফারজানা কাদির

বাংলা সাহিত্যজগতে আবদুল মান্নান তালিব (১৯৩৬-২০১১) একটি সুপরিচিত নাম। সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রেই তাঁর সরব উপস্থিতি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও সফল ভূমিকা রেখেছেন। অনুবাদ সাহিত্যে তিনি যেমন উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন, ঠিক তেমনি মৌলিক সাহিত্যেও। ইসলাম- মুসলিম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই তাঁর জীবন, কর্ম ও সাহিত্য সাধনা।

'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান' লেখকের একটি অনবদ্য রচনা। সেখানে তিনি ইসলামী সাহিত্য কি, এর মূল্যবোধ, উপাদান, নিদর্শন, বিশ্বজনীনতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

'শিল্পের জন্য শিল্প' না 'জীবনের জন্য শিল্প' এ বিতর্ক অনেক দিনের। দুই দলেরই যুক্তির অভাব নেই। তবে যে সাহিত্যে মানুষের কল্যাণ নেই, সে সাহিত্য নিয়ে খুব সহজেই প্রশ্ন তোলা যায়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস খুব পুরানো না হলেও নতুন নয়। এ ইতিহাস আলোচনা করলে সাহিত্যে যুগবিভাগ দেখা যায়। প্রাচীন যুগের নিদর্শন চর্যাপদ রয়েছে শুরুতে। এটি বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের রচনা হলেও এখানে ধর্মকথার পাশাপাশি রয়েছে মানুষের জীবনের সাধারণ সুখ-দুঃখের কথা। সাহিত্যের বিষয়, উদ্দেশ্য, উপাদান কি হওয়া উচিত তা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্যকর্মে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ, মানবতাকে স্থান দিয়েছেন, তেমনি আমাদের ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করে কালোত্তীর্ণ, যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। যে বিষয়গুলো ঘুণে ধরা মুসলিম সমাজকে প্রেরণা দেয়, সাহস জোগায়, নতুন করে বাঁচতে উজ্জীবিত করে, সেগুলো নিঃসন্দেহে মহৎ সাহিত্য। সাহিত্যের বিষয় কি হওয়া উচিত তা নিয়ে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলি অবিকল অপরিবর্তিত অবস্থায় সাহিত্যে রূপ দেওয়া চলে না। সেই অভিজ্ঞতার ফল একমাত্র সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি করার কাজে লাগতে পারে।' অন্যদিকে প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তার 'প্রবন্ধ সংগ্রহ (১৯৫২)'- সাহিত্যে খেলা প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন এভাবে, 'শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো, কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, এ কথা সকলেই জানেন।'

লেখক আবদুল মান্নান তালিব এখানে ইসলামী সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি প্রসংগ কথায় উল্লেখ করেছেন, 'ত্রয়োদশ শতকে আমাদের দেশের মুসলমানরা যখন ইসলামী সমাজের গোড়াপত্তন করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের আদর্শকে তারা গ্রহণ করেছিলেন। এই আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস তারা চালিয়েছেন, এতে সন্দেহ নেই। এর প্রথম প্রমাণ হচ্ছে ইসলামের মানবতাবাদকে তারা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ফলে দেবদেবীর পরিবর্তে মানুষ হয়ে উঠেছিল সে সাহিত্যের বিষয়বস্তু।' আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব মুসলিম সাহিত্যিকরা সাহিত্য অঙ্গনে দেরিতে এসেছে। এর পেছনে কারণ হিসেবে এসেছে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিমুখতা এবং ভাষাগত সমস্যা। যাই হোক, এ সমস্যা চিরস্থায়ী হয়নি। স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ হিতৈষীর প্রচেষ্টায় 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' নামে ১৮৬৩ সালে একটি সাহিত্য কমিটি গঠিত হয়। এ ছাড়া ১৮৮৯ খ্রি. প্রকাশিত 'সুধাকর' পত্রিকার মাধ্যমে একদল সাহিত্যিক সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সাহিত্যগুলো ইসলামী সাহিত্য হিসেবে ধরা হয়। কারণ এর পেছনে ধর্মীয় অনুভূতি কাজ করেছিল। এ সাহিত্যিকরা মূলত পিছিয়ে পড়া জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মুসলিম মানস গঠনের জন্য কাজ করেছিলেন। এ সাহিত্যিক গোষ্ঠী কুরআন হাদীসের অনুবাদ, জীবনদর্শন প্রভৃতি রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি এদেশ অধিকার করেন। পরবর্তী দেড়শ' বছর কোন সাহিত্য রচিত হয়নি। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক এ সময়কে অন্ধকার যুগ হিসেবে অভিহিত করলেও ড. আহমদ শরীফ তা স্বীকার করেননি, তিনি একে বর্ণনা করেছেন প্রস্তুতিকাল হিসেবে।

মধ্যযুগের অনেকটা সময় জুড়ে ছিল মঙ্গলকাব্যের কবিদের জয়-জয়কার। দেবদেবীই ছিল সে সাহিত্যের মূল সুর। মঙ্গলকবিরা

www.pathagar.com

দেবদেবীর নির্দেশে এ কাব্য রচনা করত বলে তারা দাবি করেছে। এ ধারার সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে মনসা মঙ্গল, ধর্ম মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল, শিব মঙ্গল প্রভৃতি। এ ধারায় প্রথম আঘাত হানেন মুসলিম সাহিত্যিকরা অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে। তারাই প্রথম মাটির পৃথিবীতে নেমে এসে মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন।

লেখক, এ গ্রন্থে বাংলা ভাষায় কিভাবে ইসলামী সাহিত্য রচনা সম্ভব, সেটা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধের শুরুতে তিনি জীবন, জগৎ স্রষ্টা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের কাজ, আমাদের সৃষ্টি মহৎ না হলে তা উত্তরপুরুষদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। স্রষ্টার সংজ্ঞা দিয়েছেন খুব সুন্দরভাবে, 'যা কিছু দৃশ্য, অদৃশ্য, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, যা কিছু কালের গর্ভে নিহিত, যা কিছু কালের অতীত, কল্পনায় যা ধরা দেয় এবং যা অকল্পনীয়, সেসব বস্তু, শক্তি ও অন্যান্য সব কিছু তার সৃষ্টি।' (পৃষ্ঠা-১০) এ ছাড়া তিনি বলেছেন, 'মুসলমানদের জীবনের সাহিত্য চর্চার যে অংশ রয়েছে তা পুরোপুরি ইসলামী বিধানের অনুসারী হতে হবে।' (পৃষ্ঠা-১৩) জীবনের উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, তাই সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়, চরিত্র ইসলামী বিধানের বাইরে যেতে পারে না। এখানে মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন এসে যায়, এটা কি সাহিত্যে অনুসরণ করা সম্ভব? প্রবন্ধ সাহিত্যে সম্ভব হলেও কাব্য কিংবা উপন্যাসে সম্ভব নাও হতে পারে। প্রশ্ন থেকেই যায়, কারণ উপন্যাস কিংবা কবিতায় আমরা আমাদের মত কাউকে অথবা সমাজের কাউকে প্রধান চরিত্র হিসেবে কল্পনা করি আর আমরা সাধারণ মানুষ দোষে-গুণে মানুষ। কেউই Perfect নয়। তাহলে উপন্যাসের চরিত্রের কেন দোষে-গুণে পরিপূর্ণ হবে না, কেন তার জীবনে ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন থাকবে না?

মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এই ধর্ম সাহিত্যে জীবন, জগতের রহস্য সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়া হয়েছে। যেমন রসুল চরিত, নবীকাহিনী, মারফততত্ত্ব, পীর পাঁচালি-প্রভৃতি। কিন্তু এগুলো সাহিত্যিক মানে উত্তীর্ণ নয়। মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ ইসলাম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা দূর করার জন্য এসব ধর্মীয় সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

লেখক সাহিত্য কি, এর উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি ইসলামী সাহিত্য কি, এর উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু যদি এভাবে বলা হয়, যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ, যা কিছু সৎ, যা কিছু কল্যাণকর তাই-ই ইসলাম, আর এটা সার্বজনীন। তাই আমরা যদি সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্য না বলে মহৎ সাহিত্য বলি, তাহলে কি ভুল হবে? আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে, প্রশ্নটা থেকেই যায়। সাহিত্য হবে শুধুই সাহিত্য আর তা সবার জন্য। ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞায় তিনি বলেছেন, 'ইসলাম যে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যে সাহিত্য সেগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, যে সাহিত্য এই মূল্যবোধগুলো পত্র-পল্লবে শাখা-প্রশাখার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেটা ইসলামী সাহিত্য।'

www.pathagar.com

কিন্তু এগুলো গল্প, উপন্যাস, কবিতায় বাস্তবায়ন কিভাবে সম্ভব তার উদাহরণসহ বিস্তারিত বর্ণনা লেখক দেননি। তিনি বলেছেন, 'সাহিত্য তথা কবিতা ও গল্প ইসলামী হওয়া মানে নিশ্চয়ই কেউ একথা মনে করবেন না যে, তার মধ্যে অযু, গোসল ও নামায রোযার মাসলা-মাসায়েল থাকবে বা সেখানে হবে কেবল হামদ নাতের অবাধ রাজত্ব অথবা ধর্মের গুণকীর্তন হবে সে সাহিত্যে। ইসলামী গল্প ও ইসলামী কবিতা তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে জীবনের এমন সব মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে যেগুলোকে ইসলাম মানবতার জন্য কল্যাণপ্রদ করেছে।' (পৃষ্ঠা-২০) অর্থাৎ সাহিত্যের চরিত্র ইসলামবিরোধী, মানবতাবিরোধী হবে না, তিনি এটা বুঝাতে চেয়েছেন। লেখক পাঠকের সামনে প্রশ্ন রেখেছেন, টলস্টয়, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ, ইলিয়ড, বার্নাডশ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের মতবাদ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারলেও সাদী, ফররুখ, ইকবাল নন কেন? এক্ষেত্রে বলা যায় সাহিত্য ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হতে পারে না, এটা আলোচনার বিষয়, যুক্তির বিষয়, বুদ্ধির বিষয়, অবশ্যই আবেগের নয়। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ। আর বিজ্ঞান আবেগের বিষয় নয়। আর আবেগ কল্পনা ছাড়া কি উপন্যাস লেখা সম্ভব?

বরং এক্ষেত্রে প্রবন্ধ সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। টলস্টয়, গ্যেটে, দান্তে, তারা তাদের মতবাদ সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন এবং সার্থকতা লাভ করেছেন। কারণ এখানে তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। আসলে করা যায় না। কেননা উপন্যাস, গল্প, কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আবেগ মেশাতে হয়, হয় কল্পনার ফানুস উড়াতে, যা ধর্মগ্রন্থ সামনে রেখে সম্ভব নয়। আর তারা তা করেছেন এবং সফলতা লাভ করেছেন। অন্যদিকে বিষয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে কিংবা উমর রা., আবু বকর রা., আলী রা. চরিত্র নিয়ে উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়, সম্ভব এজন্য নয় যে, এখানে কোন কিছু সংযোজন, বিয়োজনের অবকাশ কিংবা অধিকার আমাদের নেই। কুরআন মানুষের বাণী নয়, এটা আল্লাহর বাণী। তাই এখানে কোন কিছু করার অধিকার কারো নেই। অন্যদিকে, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বিশ্বাস নিয়ে যেসব কালজয়ী রচনা ও মহাকাব্য রচিত হয়েছে তার একমাত্র কারণ এগুলো মানুষের সৃষ্টি।

তাই মহাভারতের রাম রাবণ মেঘনাদবধ কাব্যে এসে হয়ে যায় দেশপ্রেমিক রাজা কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে দেবতা কৃষ্ণ হয়ে যায় খল, দুশ্চরিত্র একজন। এজন্য ফররুখ, ইকবাল তাদের সমকক্ষতা অর্জন করেননি কিন্তু তাঁদের লেখা কালোত্তীর্ণ, মহৎ। তাই ফররুখের পাঞ্জেরী, সিন্দবাদ আজো ঘুণে ধরা অন্ধকার সমাজের কাণ্ডারি।

'প্রেম সাহিত্যের একটি প্রয়োজনীয় বিষয়, বলা যায়, এটা ছাড়া সাহিত্য অসম্পূর্ণ কিন্তু সাহিত্যে বিষয়টি সুন্দরভাবে আসা উচিত বলে লেখক মনে করেন। কেননা ইসলামে অবৈধ প্রেম-প্রণয়ও অবৈধ। মূলত এটা ইসলামী সাহিত্য নয় বলে সাহিত্যে এটা গ্রহণযোগ্য নয় বলাই শ্রেয়। কেননা বিষয়টি অন্যায়। এ ছাড়া লেখক ইসলামী সাহিত্য ও অশ্লীলতা

www.pathagar.com

নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। তিনি মুসলিম সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা দেয়ার পাশাপাশি উদাহরণ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন উমাইয়া ইবনে আবী জাহেলি যুগের কবি হওয়া সত্ত্বেও রাসূল সা. তার কবিতা পছন্দ করতেন। কারণ তার কবিতার মধ্যে তাওহীদ, কিয়ামত প্রভৃতি বিষয় ছিল। লেখক বলেছেন, 'মুসলিম সাহিত্য মুসলমানদের সৃষ্ট সাহিত্য, অন্যদিকে ইসলামী সাহিত্য মুসলিম, অমুসলিম সবার সৃষ্ট সাহিত্য।' সাহিত্যের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, বহু লেখক আছেন যারা মুসলিম কিন্তু তাদের সাহিত্য মোটেও ইসলামী সাহিত্য নয়। যেমন, হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যে পদ্মাবতীর শরীরের বর্ণনা যেভাবে করা হয়েছে, তা কোনভাবেই শ্লীল হতে পারে না।

আবার ধর্মীয় বিষয় নিয়ে লিখলে সেটা ইসলামী সাহিত্য হয়ে যায় না। তার উদাহরণেরও অভাব নেই। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' কিংবা শাহ মুহাম্মদ সগীর-এর অনুবাদ সাহিত্য 'ইউসুফ জুলেখা'য় ইতিহাসের চরিত্র আছে কিন্তু ঘটনার অস্তিত্ব নেই। তাই কোনভাবেই এগুলো ইসলামী সাহিত্য হতে পারে না।

সাহিত্য যদি মানুষের কল্যাণের জন্য হয়, জীবনের জন্য হয়, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা আর অন্যায়ের উৎখাতের জন্য হয় তাহলে এটাকে কেন আমরা ইসলামী সাহিত্য বলে আলাদা ভেদরেখা টানব? কেননা মানুষ ভাববে এটা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। লেখক বলেছেন, 'ইসলামী সাহিত্য জীবনের সমগ্র আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিশেষ সাহিত্যকর্ম নয় বরং সমগ্র জীবনের সাথে এর সমান সম্পর্ক, জীবনের সমগ্র বিভাগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারসাম্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিই এর কাজ।' (পৃষ্ঠা-১৯)

তাই আমাদের মুসলমানদের বিষয়টি মনে রেখে এমন সাহিত্য রচনা করা উচিত যেটা ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, যা হবে সৎ, কালোত্তীর্ণ, যুগোত্তীর্ণ, দেশোত্তীর্ণ, সাহিত্য মানসম্পন্ন সাহিত্য। কেননা সাহিত্যে আমরা যে সত্য দেখি সেটা হুবহু সত্য না হলেও এটা এক ধরনের সত্য যেটাকে সাহিত্যতত্ত্ববিদরা নাম দিয়েছেন শিল্প সত্য। আর মহৎ সাহিত্যের পেছনে থাকে এই শিল্প সত্য। আর এই সাহিত্য হল সার্বজনীন সাহিত্য।

www.pathagar.com

জীবনদর্শন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

একটি জীবন একটি ইতিহাস

তৌহিদুর রহমান

জন্ম ও মৃত্যু

আবদুল মান্নান তালিব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে ১৫ মার্চ ১৯৩৬ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম তালেব আলী মোল্লা, মাতা মরহুমা মেহেরুন্নেসা।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগঠক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব (৭৬) ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১ ইন্তেকাল করেছেন। এই মহান ব্যক্তিত্ব সারা জীবন মুসলমানদের কল্যাণ ও ইসলামী জীবনাদর্শের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করেছেন। আবদুল মান্নান নামের আধিক্যের কারণে লেখকসত্তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য তিনি পিতৃপ্রদত্ত নাম আবদুল মান্নান-এর সাথে 'তালিব' শব্দটি যুক্ত করেন। তালিব শব্দটি পিতা তালেব আলী মোল্লা নামের অংশ বিশেষ। তালিব শব্দের অর্থ– সন্ধানী, অন্বেষণকারী, তালাশকারী। স্বধর্ম, ঐতিহ্য, জাতীয় পরিচয় ও সত্যের সন্ধানে পুরোটা জীবন ব্যয় করে তিনি 'তালিব' নামকে অর্থবহ ও সার্থক করে তোলেন। তাঁর গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজ পেয়েছে সঠিক দিক-নির্দেশনা। অসংখ্য মুসলিম জীবনে পূর্ণতা পেয়েছে তাঁর চিন্তা-চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে। তাঁর লেখার মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থারূপে ইসলামের যথার্থ পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে।

www.pathagar.com

নানা গুণের সমাহার

আবদুল মান্নান তালিব বিরল প্রতিভাধর একজন অসাধারণ মানুষ। তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি দুনিয়ায় দুর্লভ। এমন বহুমুখী গুণের সমাবেশ সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। তিনি ছিলেন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে পবিত্র কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, আইনশাস্ত্র, ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি নামের দিক থেকে যেমন অনন্য, কাজের দিক থেকেও তেমনি অসাধারণ। কথা প্রসঙ্গে তিনি অনেক বার বলেছেন, 'আমার নাম নিয়ে আমাকে অনেকবার বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে। অনেকেই আমার নাম বিকৃতভাবে লেখেন। তালিব শব্দটা অনেকেই লেখেন না আবার কেউ কেউ লিখলেও ভিন্নভাবে লেখেন। কেউ লেখেন তালেব, কেউ বা তালুকদার প্রভৃতি। আমি বলি আবদুল মান্নান দুনিয়াতে অনেক আছেন কিন্তু আবদুল মান্নান তালিব একজনই।' ভুল স্পেলিং-এ নাম লেখা চিঠি-পত্র এলে তিনি হাসতে হাসতে এভাবেই কথাগুলো বলতেন। এক সময় রাগ করে তিনি পাসপোর্ট থেকে তালিব শব্দটা ডিলিট করে দেন, যা আর সংযোজন করেননি।

কুরআন-হাদীসে সুবিজ্ঞ আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী সাহিত্যের রূপরেখা দিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। একাধারে তিনি আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের লেখা বহু মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি ইসলামী নানা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি শিশুদের মানস গঠনে যেভাবে ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য রচনা করেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। ইসলামী সাহিত্য কেমন হবে তার দিক-নির্দেশনামূলক মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছেন। বিভিন্ন সাহিত্য ও গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকাও তিনি সার্থকভাবে সম্পাদনা করেছেন। বাংলা ছাড়াও উর্দু ভাষার পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেছেন। লাহোরে থাকার সময় তিনি একটি উর্দু পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি সমকালীন বিষয় ও যুগজিজ্ঞাসামূলক বহু নিবন্ধ ও প্রবন্ধ লিখেছেন। বিচিত্র ঘটনা প্রবাহ ও ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে ওঠা তাঁর জীবন এক ইতিহাস। তাই সে ইতিহাস থেকে পাঠ নেয়ার জন্য তাঁর ওপর গবেষণা ও চর্চা হওয়া এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি। তবে এখানে তাঁর জীবনের সামগ্রিক দিক নয়, সংক্ষিপ্তাকারে কিছু পরিচয় পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

তিনি ছিলেন প্রধানত কুরআন-গবেষক। আল-কুরআনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে তিনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন। লিখেছেন শিশুতোষ অনেক রচনা। তিনি দীর্ঘদিন 'আল কুরআনে সাহিত্য' এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন। বাংলা সাহিত্য পরিষদে এ বিষয়ে তিনি অনেক দিন ক্লাস পরিচালনা করেছেন। এর ওপর তিনি একটা খসড়া পাণ্ডুলিপিও তৈরি করে গেছেন। পবিত্র কুরআনের অধিকাংশ আয়াত তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি যুক্তি-প্রমাণে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি ছাড়া কথা বলতেন না। বিশ্বখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন' তিনি অত্যন্ত সহজ সরল বাংলায় অনুবাদ করেছেন। উল্লেখ্য, কয়েক হাজার পৃষ্ঠার বিশাল ভলিউমের

www.pathagar.com

উনিশ খণ্ডের এ তাফসীরের চৌদ্দ খণ্ড তিনি অনুবাদ করেন, যা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের নিকট খুবই সমাদৃত হয়েছে। এছাড়া মহাগ্রন্থ আল কুরআনের বাংলা কাব্যানুবাদ করে এক সময় তিনি পাঠকমহলে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিলেন। ধারাবাহিকভাবে তাঁর সম্পাদিত 'পৃথিবী' পত্রিকায় যখন এটা ছাপা হয়, তখন এ পত্রিকার সার্কুলেশন অর্ধলক্ষে পৌঁছেছিল। এ অনুবাদের প্রশংসা করে তখন অসংখ্য চিঠি-পত্র আসে।

তিনি ছিলেন হাদীসবিশারদ। তিনি লাহোরের জামেয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসা থেকে দওরা-ই-হাদীসে উচ্চতর ডিগ্রিধারী একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। বহু সংখ্যক হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি সহীহ বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন, আবু দাউদ শরীফ অনুবাদ করেছেন। এছাড়া সীরাতে সরওয়ারে আলম, পয়গামে মোহাম্মদী, খতমে নবুওয়াত, রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতাসহ সীরাত সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। তিনি একজন ফেকাহবিদ ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি সহীহ মুসলিমের মুকদ্দমা, ইসলামের সমাজ দর্শনসহ অনেক বই অনুবাদ ও সম্পাদনা করে যোগ্যতার সাক্ষর রেখেছেন। দেশ-বিদেশের বহু আলেম-ওলামার সাথে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। প্রবাসী অনেক বাংলাভাষী মাসলা-মাসায়েল জানতে চেয়ে তাঁকে ফোন করতেন। তাছাড়া ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ইউকে, আমেরিকা, সৌদি আরব, কুয়েত, মালয়েশিয়া, আরব আমিরাত, মিশর প্রভৃতি দেশের স্কলারদের সাথে আবদুল মান্নান তালিবের মত বিনিময় হতো। ইউসুফ আল কারদাভী, মাওলানা ইউসুফ ইসলাহি, আহমদ তুতুনজি, নঈম সিদ্দিকী, খুররম জা মুরাদ অনেকের সাথে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি ইসলামী ফিকাহর ওপর অসংখ্য প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন আইন ও অর্থশাস্ত্রে বিশারদ। ইসলামী আইন ও ইসলামী অর্থনীতির ওপর তাঁর পড়াশোনা ছিল অগাধ। আমৃত্যু তিনি ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এখান থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন। মৃত্যুশয্যায় থেকেও তিনি এর শেষ সম্পাদকীয় লিখে গেছেন। ভুল সংশোধনসহ সম্পাদনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন শেষ পর্যন্ত। প্রতিটি সংখ্যায় যে সম্পাদকীয় লিখে গেছেন পুস্তক আকারে প্রকাশিত হলে তা ইসলামী আইনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এছাড়া 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর অনেক প্রবন্ধ তিনি নিজেই অনুবাদ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি একটি গ্রন্থও অনুবাদ করেছেন। যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপরও তিনি ব্যাপক পড়ালেখা করেছেন। অনুবাদ করেছেন, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বীমা ইত্যাদি গ্রন্থ। সুদের ব্যাপারে তাঁর একটাই বক্তব্য ছিল তা হচ্ছে, অর্থ লেনদেনের সময়, বিশেষ করে আসল বাদে বাড়তি আদায়ের ক্ষেত্রে 'যা জুলুম তাই সুদ'। এর ওপর

www.pathagar.com

তিনি আমৃত্যু অনড় ছিলেন। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে তিনি ত্রুটিযুক্ত বলে মনে করতেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন। লিখেছেন প্রবন্ধ নিবন্ধ। আধুনিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর কয়েকটি প্রবন্ধ অনুবাদ করে তা ছাপার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন বিজ্ঞ ইতিহাসবিদ। ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন। একাধারে প্রায় সাত বছর দৈনিক সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পাতা সম্পাদনা করেছেন। তখন তিনি মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগ নিয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে গেছেন। দু'একটি বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। 'সত্যের তরবারি ঝলসায়' তার মধ্যে একটি।

তিনি ছিলেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ। শেষ জীবনে বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখতাম। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁর বেশ পড়াশোনা ছিল। প্রথম জীবনে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ পড়ে শেষ করেছিলেন। 'বার্নাবাসের বাইবেল'-এর বাংলা অনুবাদ প্রথমে তাঁর সম্পাদনায়ই ছাপা হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত এ জেড এম শামসুল আলমের 'হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম' বইটি আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদনা করেছেন। 'অন্তিম ঋষি' নামে একটা গুরুত্বপূর্ণ বই তিনি সম্পাদনা করেছেন, যা ছাপার অপেক্ষায় আছে। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আসরার আলমের 'ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি চক্রান্ত' বইটিও তিনি অনুবাদ করেছেন।

তিনি ছিলেন ইসলামী ভাবধারার সাহিত্যের ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শক। ইসলামী সাহিত্য কি, কেন?— এ বিষয়ে আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা প্রথমে আবদুল মান্নান তালিবের কাছ থেকেই একটা পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা পেয়েছি। ১৯৮৩ সালে ৭১ নং নিউ এলিফ্যান্ট রোডস্থ বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রথম সাহিত্য সভায় তাঁর পঠিত প্রবন্ধ ছিল 'ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান'। পরিপূর্ণ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটিই ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ। পরে এটা ১৯৮৪ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এটিই বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রকাশনা। আমার দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে তিনিই পথ-প্রদর্শক।

সর্বোপরি তিনি ছিলেন আপাদমস্তক পরিপূর্ণ একজন উদার মনের পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি প্রথম জীবনে অনেকের মতো কবিতা লেখার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। আবদুল মান্নান তালিবের অসংখ্য কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তখন ছাপা হয়েছে, যা দিয়ে কয়েকটি কবিতার বই হতে পারে। কিন্তু তিনি কখনো কবি হতে চাননি। তাই হয়তো কবিতাগুলোকে গ্রন্থবদ্ধ করেননি। ছন্দ সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিবের ছিল পরিপূর্ণ জ্ঞান। সে কারণে তিনি ছোট বড় অনেক লেখকের অনেক কবিতার বই সম্পাদনা করে গেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এজন্য তিনি কোন প্রকার পারিশ্রমিক নেননি এবং সম্পাদক হিসেবে নিজের নামটিও ব্যবহার করেননি। তিনি বরাবরই বলতেন, সম্পাদক হিসেবে আমার নাম ব্যবহার করা হলে লেখককে ছোট করা হবে। শুধু কবিতার বই নয়, বহু সংখ্যক

www.pathagar.com

গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বইও তিনি সম্পাদনা করেছেন, কিন্তু নিজের নাম কোথাও ব্যবহার করেননি। অনেকে ভূমিকার লেখক ও সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম ব্যবহার করার জন্য পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নাম ব্যবহার করার অনুমতি দেননি। বলতেন, ভূমিকা লিখে দিলে সবাই তো জেনেই ফেলবে আমি এটা সম্পাদনা করেছি। বলতেন, একদল মুসলমান লেখক তৈরি আমার মিশন। যেহেতু তিনি অতিরিক্ত অন্তরালপরায়ণ ছিলেন তাই তাঁর সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানা হয়তো আমাদের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হবে না। তবু তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

বাল্য জীবন ও শিক্ষা

ছোটবেলা থেকেই পড়ার প্রতি অসম্ভব রকমের আগ্রহ ছিল তাঁর। যা পেতেন তাই পড়তেন। না পড়তে পারলেও যত্ন করে কাগজখানা তুলে রাখতেন চালের বাতায়। লবণ, চিনি, জিরে, সোডা কেনার কোনো ঠোঙাও তিনি না পড়ে ফেলে দিতেন না। জীবনের শুরুতেই সবার মতো তিনিও বাড়ির মক্তবে আরবি মানে 'আলিফ বা তা ছা'র মাধ্যমে লেখাপড়ায় হাতেখড়ি পেয়েছেন। আবদুল মান্নান তালিব বিরাট গোষ্ঠীপতি পরিবারের সন্তান। বলা যায় মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল গ্রামের প্রায় পুরোটায় নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের বসবাস। মৃত্যুর বছর তিনেক আগে তিনি শেষবারের মতো মগরাহাটের অর্জুনপুরে নিজ গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বলছিলেন, 'মগরাহাট আর আগের মতো নেই। আমাদের গ্রামটা এখন আরো বিস্তৃত হয়েছে। খালের দু'পাড়েই এখন জনবসতি হয়েছে। আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা যে এখন কতো তা বাড়ির মুরুব্বিরাও বলতে পারেন না। তিনদিন ধরে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে শুধু সাক্ষাৎই করেছি। তারপর বিরাট এক জলসা করে সবার সাথে পরিচিত হয়েছি। সব পরিবারেই লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বেড়েছে। দেখলাম, বেশ কয়েক জন ডাক্তারিও পাস করেছে, কিন্তু কারো কোনো চাকরি-বাকরি নেই। সবাই বেকার। বি.এ. পাস, এম.এ. পাস অনেকেই বসে আছে। বহু বছর পর গ্রামে যেয়ে ভালোই লাগল। দেখলাম আমাদের ভাইবোনদের অনেকের ছেলেমেয়েই বুড়ো হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। 'মগরাহাট মুসলিম হাই স্কুল' এখন শুধুই 'মগরাহাট হাই স্কুল'। 'মুসলিম' শব্দটা দেশ ভাগের পর পরই বাদ দেয়া হয়েছে। আমরা যখন পড়তাম তখন সবাই ছিল মুসলমান শিক্ষক, কিন্তু এখন আরবি শিক্ষক ছাড়া সব শিক্ষকই হিন্দু। মগরাহাট এখন অনেক বড় শহর, কিন্তু পুরোটাই হিন্দুদের দখলে। মুসলমানদের জমিদারী, ব্যবসা-পাট সবই হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে। আমাদের জমিদারী সব কোথায় তলিয়ে গেছে। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মুসলমানরা সবাই গরীব। দিনমজুর, কামলা, জেলে। বউ-ঝিদের পরনে সব ছেঁড়া তেনা। লজ্জায় অনেকেই আমার সামনে আসতেই পারেনি। বসতে দেয়ার মতো অনেকের ঘরে একটা মাদুর পর্যন্ত নেই।'

www.pathagar.com

এসব কথা বলতে বলতে দেখলাম তিনি হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছলেন। তারপরও নিজের গ্রাম অর্জুনপুরের কথা তিনি কখনো বিস্মৃত হননি। গল্পে গল্পে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মাঝে মাঝেই বলতেন। জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা মানুষের চিরাচরিত। অর্জুনপুর গ্রামে একটা পাকা মসজিদ হচ্ছে, এতে অসম্ভব রকম খুশি হয়েছিলেন তিনি। মৃত্যুর কিছু দিন আগে নিজের গ্রামের সেই মসজিদ তৈরির জন্য দু'বার তিনি ত্রিশ হাজার করে মোট ষাট হাজার টাকা পাঠিয়েছেন।

এই মগরাহাট মুসলিম হাই স্কুল থেকেই তিনি কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন। স্কুলের, গ্রামের অনেক স্মৃতিই আমৃত্যু তাঁকে বিমোহিত করতো। মাঠে মাঠে ঘুড়ি ওড়ানো, মাছ ধরা, খালে সাঁতার কাটা, ছোলাহুড়া করে খাওয়া, মটরশুটি খাওয়া, বন-বাদাড়ে পাখির বাসা খুঁজে ফেরা ইত্যাদি।

সবারই চলার পথের শুরুটা থাকে সতত স্বপ্নময়, রঙিন। সেই স্বপ্নময়তা যেমন শৈশবের, তেমনি কৈশোরের ও ছাত্রজীবনের। স্মৃতি-বিস্মৃতির কুয়াশার জাল ছিঁড়ে ফেলে আসা দিনের জলছবি জীবনের শেষ বেলায় কেন যেন বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে! ছাত্রজীবন, বিশেষ করে স্কুলজীবনের স্মৃতি সবাইকে এক সময় আন্দোলিত করে, বিমোহিত করে। তাঁকেও মাঝে মাঝে আন্দোলিত করতো। জীবনের ঊষালগ্নে ছুটে চলা দুরন্ত কৈশোর জীবনে আবার ফিরে যেতে তাঁর মন চাইতো। সে নস্টালজিয়া তাঁর স্মৃতিকাতর মনকে বিষণ্ন করে তুলতো।

আবদুল মান্নান তালিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫০ সালে এন্ট্রান্স পাস করেন। জামেয়া আশরাফিয়া, লাহোর থেকে দাওরা-ই-হাদীস বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং হাদীসশাস্ত্রের ওপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর এইচ.এস.সি. পাস করেন ঢাকা বোর্ড থেকে ১৯৬৬ সালে। লেখাপড়ার প্রতি তিনি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। বিভিন্ন ভাষা শেখার ব্যাপারেও তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। ফলে তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি– এ ছয়টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ সকল ভাষা থেকে সাহিত্যসহ গবেষণাধর্মী অনেক গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন।

ব্যক্তি আবদুল মান্নান তালিব

রংতুলির মতো একটা মোলায়েম কম্বিনেশন ছিলেন আবদুল মান্নান তালিব। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটতেন তখন চারদিকে রংধনুর সাত রঙের একটা মধুর আস্তরণ ছড়িয়ে পড়তো। সে আভায় কখনো চোখ ধাঁধিয়ে যেতো না আবার চোখ জুড়েও থাকতো না। তা সহসাই ছড়িয়ে পড়তো মনের পরতে পরতে। এতই আস্তে হাঁটতেন যেন মাটিও টের পেত না! প্রকৃত মুসলিমের ন্যায় তিনি মহান স্রষ্টার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করতেন। সে কারণে তিনি কখনো মাটিতে দম্ভভরে পা ফেলতেন না। পথের দাবি যতটা সম্ভব আদায় করে চলতেন। সবার আগেই পরিচিত অপরিচিত পথিকের দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি কামনা করতেন। সব সময় মাথা নিচু করে হাঁটতেন। যতটা উচিত দৃষ্টি সংযত রাখতেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করা, কিছু খাওয়া পরিহার করে

www.pathagar.com

চলতেন। পথে কষ্টদায়ক কিছু থাকলে সম্ভব হলে নিজ হাতে তা সরিয়ে ফেলতেন। রিকশাচালক, দারোয়ান, কুলি-মজুর বা অন্যদের সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলতেন না। সাধারণত অল্প দূরত্বে হেঁটেই চলা-ফেরা করতেন। জরুরি প্রয়োজনে আগেই দাম-দর করে রিকশায় উঠতেন। অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে গৃহশিক্ষকরা পুরো মাস পড়াতে না পারলেও পুরো মাসের টাকা ঠিকই পরিশোধ করে দিতেন। তাঁর বাচ্চাদের দীর্ঘ দিন থেকে পড়াতেন, সেই গৃহশিক্ষক কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'আমার শিক্ষকতা জীবনের ১৮ বছরে এমন ভালো মানুষ আমি আর দেখিনি। কখনো পড়াতে আসতে না পারলে বা সময়মতো না এলে কোনদিন আমাকে একটি কথাও বলেননি। বলেননি, আপনি নিয়মিত আসেন না কেন? ডিসেম্বর মাসে সাধারণত পরীক্ষা শেষে স্কুল বন্ধ থাকে। তখন পড়ানো বন্ধ করে দিলেও তিনি পুরো মাসের বেতন দিতেন। আমি না নিতে চাইলে জোর করে হাতের মধ্যে দিয়ে দিতেন এবং বলতেন, আপনি পরিবার নিয়ে এক মাস চলবেন কিভাবে?'

অফিসে তিনি কখনো আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করেননি। অনেক সময় কাজ ভাগ করে দিতেন। প্রায় দিনই প্রত্যেকের কাজের হিসেব নিতেন। তবে কখনো ওভারটেক করে কারো কাছে কৈফিয়ত চাইতেন না। আমার কাছ থেকেই সব কাজের খবরাখবর নিতেন। বিশেষ কোন কারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে মিটিং-এ বসে তার কারণ জানতে চাইতেন।

তিনি সব সময় অপ্রয়োজনীয় কথা এড়িয়ে চলতেন। তবে প্রয়োজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। আহার করতেন পরিমিত। মাঝে মাঝে অফিসে দুপুরে হালকা নাস্তা হতো, তিনি একটার বেশি রুটি খেতেন না। তবে সবজি হলে একটু বেশি সবজি খেতেন। ডায়াবেটিস-এর কারণে মিষ্টি খাবার এড়িয়ে চলতেন। তিনি নিজের জন্য কখনো অফিসের টাকায় খাবার কিনে আনতে বলতেন না। শেষের দিকে প্রায়ই দেখতাম অফিসে আসার পথে এক প্যাকেট ডায়াসল্ট বিস্কুট কিনে আনতেন। একদিন কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, ইদানিং পেট খালি থাকলে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। আসলে তিনি ভেতরে ভেতরে আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

যশোরের ভেণ্ডারি মোড়ের মানুষের চোখে অন্য এক আবদুল মান্নান তালিব

আবদুল মান্নান তালিব বিয়ে করেন ঢাকা শহরের শান্তিবাগে। তাঁর প্রথম স্ত্রী নূরজাহান বেগম ছিলেন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন। এখানেই তিনি স্থায়ী নিবাস গড়ে তোলেন। দুর্ভাগ্যবশত চার ছেলে দুই মেয়ে রেখে প্রথম স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। ফলে যশোরের ভেণ্ডারি মোড়ের কোদলা গ্রামে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। কোদলা গ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করে। ফলে এক খণ্ড জমি কিনে তিনি এখানে দ্বিতীয় স্ত্রী ফাতেমা বেগম ও পরের তিনটি ছেলেমেয়ের জন্য আর একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। প্রায়ই তিনি এখানে বেড়াতে আসতেন।

www.pathagar.com

এখানে তিনি ছিলেন প্রকৃতির মতো শান্ত। ঠিক যেন গভীর অন্ধকারে নুয়ে পড়া বাঁশবাগানের মতো ধ্যানমগ্ন। ভাবতেন স্রষ্টার সৃষ্টি নিয়ে! মহান রবের প্রার্থনায় কাটিয়ে দিতেন সারাটা সময়। চিন্তামগ্ন থাকতেন কখনো কখনো। খুব কম কথা বলতেন। তবে এলাকার সবার সঙ্গেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন অল্প সময়ের মধ্যে। এখানে তাঁকে এক নামে সবাই চেনেন। মগরাহাটের শৈশব- কৈশোরের সেই দুরন্ত কিশোর মা-বাবার অতি আদরের আবদুল মান্নানকে তারা দেখেননি। তারা দেখেছেন কোদলার ভেগুারি মোড়ের ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে চলা আবদুল মান্নান তালিবকে। পুকুর পাড়ের ধারেই সবুজের সমারোহ, বাতাসে আন্দোলিত ধান ক্ষেত— মহাব্যস্ত মহানগরীকে পেছনে ফেলে এখানে এসে তিনি একটু বুক ভরে শ্বাস নিতেন। দু'দণ্ড দাঁড়াতেন, হাঁটতেন। হয়তো বা একটু বসতেন। হিসেব-নিকেশ মেলাতেন অতীত জীবনের। দোলদোলানো ছন্দে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখতেন। শহরের কোলাহল ছেড়ে এখানে এসে তিনি দু'দণ্ড শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া আহমদ ইবরাহীম শামীম, আহমদ নাঈম একদিন বড় হবে। লেখাপড়া শিখবে। 'মেহেরুন্নেছা' মায়ের নামে নাম রেখেছেন ছোট মেয়ের। আদর করে তিনি তাকে মেহের বলে ডাকতেন। মেহেরকে ডাক্তারি পড়ানোর ইচ্ছা ছিল তাঁর। তারপর মেহেরের বিয়ে দেবেন। কত স্বপ্ন ছিল চোখে! বাকি জীবনের ভাবনাটা এখানে বসেই ভাবতে চেয়েছিলেন। এসব গল্প তিনি এলাকার লোকদের সাথে অনেক বারই করেছেন। এ নির্জনে বসে কিছু গবেষণার কাজ করতে চেয়েছিলেন।

এখানে নিজের বাড়ির সাথেই প্রশান্ত এক চিলতে পুকুর! আশেপাশে আরো বেশ কয়েকটা পুকুর। পুকুরপাড়ে তিনি প্রায়ই বসতেন। এর স্বচ্ছ পানিতে তাঁর প্রতিবিম্ব হতো। কখনো আনমনে তাকিয়ে থাকতেন পুকুরের নিস্তরঙ্গ পানির দিকে। শীতল পানিতে জীবনের পঙ্কিলতা ধুয়ে ফেলে মহান রবের পাথেয় কতটুকু সংগ্রহ হয়েছে তার হিসেব মেলাতেন বসে বসে। কখনো ভাবতেন, কখনো বা কাঁদতেন, কখনো বা নীরবে নিভৃতে দু'হাত তুলে মহান প্রভুর সাহায্য চাইতেন। না জানি কতবার তিনি এই পুকুর পাড়ে বসেছেন! তিনি একান্তে এখানেই জীবনের শেষ বেলাটা অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন। মনের রং মিশিয়ে একটা বাগান বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়েছেন। চারপাশে সুপারি গাছের সারি। প্রবেশ পথের মুখে দু'টি দেবদারু গাছের চারা সংগ্রহ করে তিনি নিজ হাতে লাগিয়েছেন। যা আজ পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়ে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ফলের গাছ লাগিয়েছেন পুরো আঙিনা জুড়ে, যা এখন ফলবতী হয়ে উঠেছে। ঠিক বাগানের মাঝখানটায় বাড়ি বানিয়েছেন। বাড়ির দু'পাশে সুন্দর দু'টি গেট তৈরি করেছেন। হয়তো পড়ন্ত জীবনের শেষ বেলাটা এখানে বসেই গবেষণা ও লেখালেখি করে পার করতে চেয়েছিলেন। ছায়া সুনিবিড় এ সুখের নীড় তিনি নিজ হাতে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। মহান রবের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। তাঁর ইচ্ছা রয়েছে অপূর্ণ।

www.pathagar.com

আমি এখানেই তাঁর কবর দিতে চেয়েছিলাম। তাহলে অন্তত বছরে একবার এখানে আসা হতো, তাঁর কবরটা জিয়ারত করা হতো। তাঁর মেজ ছেলে আব্দুল্লাহিল মাসুদ এখানে এসে মুগ্ধ হয়েছেন। এখানে আব্দুল্লাহিল মাসুদ মসজিদ মাদ্রাসা করতে চেয়েছেন। এসব হলে যুগ যুগ ধরে এ এলাকার মানুষ তাঁকে মনে রাখবে। আমরা জানি ঢাকার আজিমপুরের কবরটা দু'এক বছর পরে আর থাকবে না।

তিনি যশোরে বেড়াতে এলেই বাজারে গিয়ে ছেলে-বুড়ো সবার সাথেই বসতেন। সবাইকে দ্বীনের পথে ডাকতেন। বোঝাতেন। ওখানকার রাজগঞ্জ বড় একটা বাজার। দোকানদারদের নিয়ে কয়েকটা মিটিং করেছেন। কার দোকানে কেমন বিক্রি হয় জানতে চেয়েছেন। সংগঠনের কতজন সদস্য আছেন তাদের খোঁজখবর নিয়েছেন।

এই যে যশোর মনিরামপুরের কোদলা গ্রামের ভেণ্ডারি মোড়ের প্রতিটি ইট-কাঠ, গাছ-পালা, মানুষ-জন, ছেলে-বুড়ো সবাই খুব নীরবে-নিভৃতে আবদুল মান্নান তালিবকে চিনতো, জানতো– এটা কি কম কথা! অথচ ঢাকা মহানগরীর একই বিলডিং-এর, একই পাড়ার, একই অফিসের লোকরা, একই ছাদের নিচে বসবাস করেও তাঁকে অনেকেই চিনতো না, চিনতে চায়ওনি! এক মহামূল্যবান নক্ষত্রের পতন হলো, অথচ আমরা এ ঢাকা মহানগরীর অনেক দিকপাল তাঁকে চিনলামই না! নাকি হয়তো কখন কোন বইয়ের রয়্যালিটি চেয়ে বসে এ ভয়ে চিনতে চাইলাম না। যা হোক, সমস্ত লেনদেনের হিসেব কিন্তু একদিন হবে আদালতে আখেরাতে।

অবরুদ্ধ জীবনের কথা থেকে রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা

এখন আমরা প্রায়ই নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তির কথা শুনছি। নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মক্ষেত্র, নারীর সমান অধিকার– আরো অনেক বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত মাঠ গরম করা হচ্ছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না। এখনো দেখছি নারীরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরাবগুণ্ঠিতই রয়ে গেছে। আবদুল মান্নান তালিব নারী মুক্তির ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়াকে অসম্ভব গুরুত্ব দিতেন। বলতেন, উপমহাদেশে বেগম রোকেয়া মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি বেগম রোকেয়কে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করতেন। তাঁর সব বই বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে ছাপার পরিকল্পনাও তিনি নিয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, জীবনের প্রথম পর্যায় থেকেই আবদুল মান্নান তালিব নারী মুক্তির বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁর রচিত প্রথম বই 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা'। নারীদের উদ্দেশে লেখা। তিনি বলছিলেন, 'অন্তত দশ বারো দিন একটানা পড়াশোনা করার পর 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' বইটি আমি লিখতে শুরু করি। মাত্র পনের দিনের মধ্যে আমি এটি লিখে শেষ করি। ছাপার পর কয়েক মাসের মধ্যেই এর প্রথম সংস্করণ বিক্রি হয়ে যায়। বইটি সে সময় হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল।' বইটির প্রথম প্রকাশক ছিলেন নারী মুক্তি আন্দোলনের আরেক সিপাহসালার শাহ আবদুল হান্নান। তাঁরই বিশেষ তাগিদে আবদুল মান্নান তালিব 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' বইটি লিখেছিলেন। ঢাকা, সিলেট, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন স্থান থেকে বইটি ছাপা হয়েছিল।

www.pathagar.com

কুরআন-হাদিসে নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা তুলে ধরার একটা অদম্য প্রয়াস আবদুল মান্নান তালিবের মধ্যে বরাবরই লক্ষ্য করেছি। মিশরের প্রখ্যাত লেখক, গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুজতাহিদ আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ রচিত 'তাহরীরুল মারআ ফী আসরির রিসালাহ' অর্থাৎ 'রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা' নামক গ্রন্থটি অনুবাদ ও প্রকাশের দায়িত্ব আসে তাঁর কাঁধে। এর মুদ্রণের ভার পড়ে আমার ওপর। এটি ছিল সাত খণ্ডের বিশাল আকৃতির একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। প্রতিটি খণ্ড তিনশ' থেকে চারশ' পৃষ্ঠার। প্রখ্যাত মনীষী আহমদ তুতুনজীর বিশেষ সহযোগিতায় ও ওয়ামীর তত্ত্বাবধানে এর মুদ্রণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৯২ সালে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, নারী শুভার্থী শাহ আবদুল হান্নান সাহেব কোঅর্ডিনেটর হিসেবে পুরো কাজ দেখ-ভাল করেন। আবদুল মান্নান তালিব যথারীতি তাঁর পরিচিত আরবি জানা কয়েকজনকে ডেকে এক জায়গায় জোগাড় করেন। কিন্তু দেখা দিল মহাবিপত্তি– দু'একজন ছাড়া আরবিতে বিশেষজ্ঞ অধিকাংশ ব্যক্তি বাংলায় ভালো মতো পারদর্শী নন। তারপরও দশ বারোজন নিয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়। যতদূর মনে পড়ছে, কমিটির সদস্যরা ছিলেন শাহ আবদুল হান্নান, আবদুল মান্নান তালিব, আবদুল মুনয়েম, অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক, ড. আবুল কালাম পাটোয়ারী, মুনওয়ার হোসেন প্রমুখ। আমিও এ কাজের সাথে আগাগোড়া যুক্ত ছিলাম। তিনি প্রতিটি খণ্ডের প্রাথমিক সম্পাদনার কাজটা আমাকে দিয়ে করিয়েছেন। চতুর্থ খণ্ডটি সম্পূর্ণ আমি একাই সম্পাদনা করেছি। এর অনেক পৃষ্ঠা আমি অনুবাদও করে দিয়েছি। শেষের দিকে কোন টাকা-পয়সা না থাকায় অন্য কেউ চতুর্থ খণ্ডের সম্পাদনার কাজে হাত দেয়নি। এ বিরাট কাজের কোন প্রকার রয়্যালটি অনুবাদকগণ পাননি। এই বিশাল কাজ তালিব সাহেব সম্পাদনা করে দিয়েছেন বিনা পারিশ্রমিকে। শুধু নারী মুক্তি আন্দোলনের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে জাতির কাছে দায়মুক্তির জন্য আল্লাহর রাহে এটা তিনি করেছেন। চতুর্থ খণ্ডটি আমার সম্পাদনার পরে অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হককে দিয়ে একবার দেখিয়ে নিয়েছি। তবু আমি সম্পাদক হিসেবে আবদুল মান্নান তালিব ও অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হকের নাম ব্যবহার করেছি। আবদুল মান্নান তালিব বহু বই আমাকে দিয়ে সম্পাদনা করিয়ে নিয়েছেন। তিনি আমাকে হাতে কলমে শিখিয়েছেন সব কিছু। তাঁর কারণে যে কোন লেখা সম্পাদনা করা আমার জন্য সহজ হয়েছে।

একজন উদার মনের মানুষ

অশেষ আন্তরিক, অসম্ভব অমায়িক ও অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই আলেমে দীন মানুষটির কাছে সম্ভাব্য এমন কোন বিষয় ছিল না, যা আমার জন্য উন্মুক্ত ছিল না। জীবনের সব বিষয় আমি তাঁর সাথে মন খুলে শেয়ার করেছি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি এমন কোন বিষয় ছিল না যা নিয়ে তাঁর সাথে আমার মত বিনিময় হয়নি।

www.pathagar.com

কুরআন, হাদিস, ফেকাহ, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাকার নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হয়েছে। তিনিও আমার কাছে তাঁর জীবনের সব বিষয় একদম খোলামেলাভাবে আলাপ করতেন। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় হওয়ার পরও জীবনের কোন পর্বই আমাদের মধ্যে গোপন ছিল না। যা ইচ্ছা তাই তাঁর কাছে জানতে চাওয়াতে কোন অপরাধ হতো না। শুধু আমি নই, প্রত্যেক ব্যক্তিই, এমনকি নবাগত একজন হলেও তাঁর কাছে যে কোন ধরনের প্রশ্ন করতে পারতেন। এমন উদার মনের মানুষ পৃথিবীতে সত্যিই বিরল।

ভালোবাসা চলে যায় সীমানা পেরিয়ে

আবদুল মান্নান তালিবের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষও তাঁকে অসম্ভব রকম শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। আমার ছেলের চিকিৎসার জন্য আমি কয়েকবার ভারতে গিয়েছি। মনে পড়ে প্রথমবার যাওয়ার সময় কলকাতার কোথায় থাকবো এমন আভাস দিলে তিনি একটি পত্র লিখে দিয়ে যাবতীয় করণীয় বলে দিয়েছিলেন। সুখের বিষয়, কলকাতায় গিয়ে যথাস্থানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে চিঠিটি দেয়ার সাথে সাথেই সবাই যেন আপনজন হিসেবে তালিব সাহেবের আত্মীয়-স্বজনকেই পেলেন মনে করে আমাদেরকে আদর-যত্ন করতে লাগলেন। সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অত্যন্ত কৃপণ। একজন মানুষ মরে গেলেও কেউ কারো প্রতি সহজে সহানুভূতিশীল হয় না। আমার কাছে তালিব সাহেবের চিঠিটা না থাকলে আমাকে হয়তো কলকাতার পথে পথে ভেউ ভেউ করে ঘুরতে হতো। অনেক দিন হয়ে গেছে কলকাতার রইচউদ্দীন ভাইয়ের কথা আজও মনে পড়ে। তিনি আমাদের থাকার জন্য একটা রুম ছেড়ে দিয়েছিলেন। খুব দ্রুত আরাধ্য ডাক্তার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের নাতি প্রখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ইন্দ্র শেখর রায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, রইচউদ্দীন ভাইয়ের কাছ থেকেই সেদিন আবদুল মান্নান তালিবের পারিবারিক বিভিন্ন পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। ওখানকার মানুষ অসম্ভব শ্রদ্ধা করেন তাঁকে। ওখানে সবাই তাঁকে আবদুল মান্নান বা 'মন্নান সাহেব' বলে চেনেন। তিনি মহাকবি ইকবালের 'বাঙ্গেদারা'সহ আরো কয়েকটি বই ওখানে বসে অনুবাদ করেছিলেন যার খবর এপার বাংলার মানুষ জানে না। তিনি তাবলীগে নেছাব চার খণ্ডে অনুবাদ করেছেন কলকাতায় বসে, যা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল ওখানে। সাপ্তাহিক মিযান পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন ওখানে থাকতে। তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ি অর্জুনপুরে একটা পাকা মসজিদ বানিয়েছেন। শুধু এটুকুই শেষ নয় পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ তাঁকে জানতেন, ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। এখনো অনেকে তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

অমলিন ভালোবাসা

পরিচয়ের শুরু থেকে যেভাবে তিনি আমাকে অন্তরে ঠাঁই দিয়েছিলেন, সেভাবে সব সময় বা সব ক্ষেত্রেই আমাকে অনুভব করতেন। আমার অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার পরিমাপে কখনও কোন কাজের দরকার পড়লে

www.pathagar.com

যথারীতি তিনি আমাকেই স্মরণ করতেন। যে কোন প্রকল্প ঠিক করে তার দায়িত্ব তিনি আমার ওপরই অর্পণ করতেন। অফিসের বাইরে অনেক প্রকল্পের সেক্রেটারি তিনি আমাকেই বানিয়েছেন। প্রায় সব ধরনের ছোট-বড় আর্থিক লেনদেনে তিনি কেবল আমার ওপরই ভরসা করতেন। মনে পড়ে উদার, নিঃস্বার্থ ব্যক্তিটির কথা। তিনি আমাকে অসম্ভব রকম বিশ্বাস করতেন। আমিও তাঁর বিশ্বাসের মূল্য জীবনের পরতে পরতে দিয়েছি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অফিসিয়াল, সাংগঠনিকসহ অনেক অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব তিনি আমার ওপর অর্পণ করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তাঁর মীরপুরের বাড়ি বিক্রি করার সময় আমি বারবার তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলাম, এতে তিনি আমার ওপর কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন। শেষমেষ তিনি বাড়িটি বিক্রি করে দেন এবং টাকা-পয়সা আমার হাত দিয়েই লেনদেন হয়েছিল। আমি ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে সব ঠিক করার পরই তিনি জমি রেজিস্ট্রি করে দেন। তার যশোরের বাড়ির জমিটি আমিই কিনে দিয়েছি। আমার লন্ডনের দু'জন বন্ধু রাণী এলিজাবেথ শিক্ষা কমিশনের বিশেষ কর্মকর্তা ড. কামরুল হাসান ও বিশিষ্ট লেখক গবেষক ডা. জিয়াউল হকের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সহযোগিতার কারণে যশোরের বাড়ির জমিটি কেনা সম্ভব হয়েছিল। সেখানে বাড়ি তৈরির কাজটাও তিনি আমার কাঁধেই দিয়ে গেছেন। মৃত্যুর পরও তাঁর ব্যক্তিগত অনেক লেনদেনের ভার আমার ওপরই দিয়ে গেছেন।

তাঁর ও পরিবারের চিকিৎসার ব্যাপারে শেষ জীবনে তিনি আমার ওপর অসম্ভব রকমভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সমস্যায় তিনি সর্বপ্রথম আমাকেই স্মরণ করতেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি ২৪ ঘণ্টা আমাকে সান্নিধ্যে রাখতে চাইতেন। অনেক সময় ছোটখাটো প্রয়োজনেও আমাকেই তালাশ করতেন। গভীর রাতেও যে কোন সমস্যায় তিনি সবার আগে আমাকেই ফোন দিতেন। মাঝে মাঝে রাতে আমার ফোন বন্ধ থাকাতে খুবই বিরক্ত হয়েছেন। আমি যদিও চিকিৎসক নই, তবে দেশ-বিদেশের অনেক চিকিৎসকের সাথে আমার দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। এই কারণে অনেকেই চিকিৎসার ব্যাপারে আমার সহযোগিতা নিয়ে থাকেন। আমি তো মনে করি তাঁর ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার থেকে আমাকেই তিনি বেশি ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন।

তিনি আর্থিক ব্যাপারে কখনোই তাঁর বন্ধুদের বিরক্ত করতেন না। বছর পাঁচেক আগে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের মতো টাকা তাঁর হাতে ছিল না। এছাড়াও অন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর প্রায় লাখ তিনেক টাকার জরুরি প্রয়োজন পড়ে। আমাকে বললেন, একটা ব্যবস্থা করেন। আমি তখন দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আবুল আসাদ ও বিশিষ্ট লেখক বদরে আলমকে বিষয়টি জানালাম, কিন্তু কেউই সুরাহা করতে পারলেন না। অবশ্য আবুল আসাদ আধুনিক প্রকাশনী ও বিআইসি থেকে রয়্যালটির কিছু টাকা অগ্রিম হিসেবে আদায় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরিমাণ ছিল খুবই কম। অবশেষে

www.pathagar.com

তাঁর মারাত্মক পেরেশানি দেখে আমি বললাম, আপনার বন্ধুদের কাছে বিষয়টা বলি। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সামর্থ্য রাখেন। তিনি সরাসরি আমাকে না করে দিলেন। বললেন, এমনও দিন গেছে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে দিনের পর দিন অনাহারে অর্ধাহারে থেকেছি তবু আমার বন্ধুদের কাছে কখনো হাত পাতিনি। কি করা যায় ভাবতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধুদের কাছে সাহায্য চাইলাম। বিদেশেও অনেকে আবদুল মান্নান তালিবকে অসম্ভব রকম শ্রদ্ধা করেন। বিদেশ থেকে আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে অধিকাংশ টাকা পাঠিয়ে দেন। অবশ্য তিনি সে টাকা যথারীতি পরিশোধ করেন।

মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তিনি তাঁর সন্তানদের কাছে আমার সম্পর্কে অসম্ভব রকমের ভালো ভালো কথা বলে গিয়েছেন। বলেছেন, বাংলা সাহিত্য পরিষদের এই পর্যায়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে সবটুকু কৃতিত্বই আমার। আরো অনেক কিছু। আমি হাজারবার দেখেছি লেখক, কবি-সাহিত্যিকরা অসম্ভব রকমের ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে থাকে। তারা সহজে কারো ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে চায় না। সম্পাদনা থেকে শুরু করে বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রায় শতভাগ কাজ আমি দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিবেশনের উপযোগী করে পেশ করি, তবু দেখা যায় শেষমেষ আমার নাম-গন্ধটুকুও সেখান থেকে কেটে ছেঁটে বাদ দেয়া হয়েছে। না, এসব বিষয়ে আমি কোনদিন তালিব সাহেব বা অন্য কারো কাছে অভিযোগ করিনি। বিনা কারণে আমাকে অনেকেই অপমানিত করে, বদনাম করে বেড়ায়। আমি এসবের কোন কিছুই গায়ে মাখি না। কারণ আমি দেখেছি আবদুল মান্নান তালিবও কোন কিছু গায়ে মাখতেন না। তিনি বলতেন, 'কাজ করলে সমালোচনা হবেই। যারা কাজ করে না তাদের কোন সমালোচনা হয় না।'

তিনি একজন বড় মাপের কবি

কবিতার মাধ্যমেই তিনি লেখালেখি শুরু করেন। মগরাহাট মুসলিম হাই স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তাঁর ছোট ভাইয়ের লেখা থেকে এটা জানা যায়। তখনই কবি হিসেবে তাঁর বেশ নাম-ডাক হয়েছিল। সেই থেকে অনেকেই কবি আবদুল মান্নান বলে চিনতো তাঁকে। তারপর থেকে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন। দৈনিক আজাদ, দৈনিক সংগ্রাম, সাপ্তাহিক জাহানে নও-সহ বহু পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে। তিনি কবি ইকবালের 'বালে জিবরিল, 'বাঙ্গেদারা', 'জরবে কলীম'সহ চারটি কবিতার বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

তাঁর বন্ধু বিশিষ্ট লেখক, গবেষক, সংগঠক, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান লিখেছেন, 'আবদুল মান্নান তালিবের কবি-খ্যাতি খুব একটা বিস্তৃতি লাভ করেনি। এর দু'টো কারণ হতে পারে। প্রথমত তিনি মাত্র নির্দিষ্ট দু'একটি পত্রিকায়ই লিখেছেন, দুর্ভাগ্যবশত যার প্রচার সংখ্যা ছিল কম। ফলে বৃহত্তর পাঠক সমাজ তাঁকে কবি হিসেবে জানার তেমন সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয়ত তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কবিতা চর্চা করলেও এ পর্যন্ত তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। একাধারে দারিদ্র্য

www.pathagar.com

এবং কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহাই হয়ত এর জন্য দায়ী। তাঁর নিজের নির্লিপ্ত মানসিকতাও এ ব্যাপারে কম দায়ী নয়। অবিলম্বে তাঁর সব কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এরপরেই কেবল কবি হিসেবে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে।'

আবদুল মান্নান তালিবের কতিপয় শব্দের বানানরীতি

আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব ছিলেন যেমন একজন অতি আধুনিক মনের মানুষ তেমনি তাঁর লেখনীর মধ্যেও ছিল একটি অতি আধুনিকতা। শুধু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই নয়, বানানরীতির ক্ষেত্রেও ছিলেন আধুনিক। তার সামান্য নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

তিনি সাধারণত মহানবী হযরত মুহাম্মদ-এর পরে সব সময় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে লিখতেন। তাঁর যুক্তি ছিল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' সংক্ষেপে লিখলে সংশ্লিষ্ট লেখক সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন। কারণ হিসেবে তিনি বলতেন, আমি দেখেছি অধিকাংশ পাঠকই মুহাম্মদ-এর পরে (দ.) লেখা থাকলে দরূদ শরীফ পাঠ করেন না। আবার (ছাঃ) (সা.) (সঃ) স. নানাভাবে লিখলে পাঠক বিভ্রান্ত হয়, তখন কি পড়বে পাঠক নিজেই বুঝতে পারে না। তখন পাঠক-লেখক উভয়েই সওয়াব থেকে বঞ্চিত হন। একইভাবে তিনি আলাইহিস সাল্লাম, রাদিআল্লাহু আনহু, রাহমাতুল্লাহে আলাইহি ইত্যাদি সংক্ষেপে লেখা পছন্দ করতেন না। তবে আমার সাথে মতবিরোধের কারণে মাঝে মাঝে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদলে স., আলাইহিস সাল্লাম-এর বদলে আ., রাদিআল্লাহু আনহু-এর বদলে রা., রাহমাতুল্লাহে আলাইহি-এর বদলে রহ. এভাবে লিখতেন। এক্ষেত্রে আমার যুক্তি ছিল দু'একবার পূর্ণভাবে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' লিখে তারপরে সংক্ষেপে স. লিখলে পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন, স. থাকলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পড়তে হবে।

তিনি কোরান, কুরান, কোরআন এভাবে লেখাকে যথাযথ মনে করতেন না। তিনি সব সময় 'কুরআন' এভাবে লিখতেন। তিনি 'রাসূল' না লিখে 'রসূল' লিখতেন। রসূলে করীম, মুনাফেকী, দীন, দীনী, দলীল ইত্যাদি শব্দ এমনই লিখেছেন।

প্রমিত বানানরীতির ক্ষেত্রে বিদেশি শব্দে তিনি ি-কার ব্যবহার করতেন না। সব সময় ী-কার ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে আরবি, ফারসি ও উর্দু শব্দের ক্ষেত্রে। যেমন তিনি লিখতেন, ইসলামী, আরবী, ফারসী, জিন্দেগী, বন্দেগী, হাদীস ইত্যাদি। তিনি বলতেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ বিদেশি শব্দের ধুয়ো তুলে এক্ষেত্রে ছুরি চালিয়েছে শুধু মুসলমানী শব্দের ওপর। মুসলমান লেখকদের সংস্কৃত ব্যাকরণ ফলো করা উচিত নয়। তিনি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যাকরণ তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন। ড. এস.এম. লুৎফর রহমান সাহেবের ওপর এ কাজের ভার দিয়েছিলেন।

তিনি বিশেষ কিছু বানানের ব্যাপারে দ্বিত্বের দ্বিত্ব লিখতেন না। যেমন তিনি লিখতেন, বৈশিষ্ট, লক্ষ, সত্ত, তত্ত, ধৈর্য ইত্যাদি। বৈশিষ্ট্য, ধৈর্য্য, লক্ষ্য, সত্ত্ব, তত্ত্ব লিখতেন না।

www.pathagar.com

পুনরগঠন, পুনরজীবন, পুনরবার, অন্তরনিহিত, অন্তরভুক্ত, অন্তরঘাত, অন্তরজগৎ, আন্তরজাতিক– এ জাতীয় শব্দ এভাবে সহজ করে লিখতেন। পুনর্গঠন, অন্তর্জগৎ, অন্তর্নিহিত, আন্তর্জাতিক– ইত্যাদি শব্দ এভাবে লিখতেন না।

তাছাড়া অন্তপুর, অন্তসত্ত্বা, অন্তকরণ, অন্তসারশূন্য, নিসন্দেহে, নিশব্দে, নিস্ব, নিসঙ্গ, নিশ্বাস, নিঃসঙ্কোচ, বস্তুত, অংশত, কার্যত, মূলত ইত্যাদি অসংখ্য শব্দে 'ঃ' ব্যবহার করতেন না।

আমি এখানে তাঁর বানানরীতি সম্পর্কে মাত্র দু'একটি উদাহরণ পেশ করলাম। তাঁকে নিয়ে যত গবেষণা হবে ততই চমকপ্রদ তথ্য আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে বলে আমরা আশা করি।

জীবনে প্রথম শব্দ করে কাঁদতে দেখলাম

কবি মতিউর রহমান মল্লিককে অসম্ভব রকম ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন। সব সময়ই মতিউর রহমান মল্লিকের খবর রাখতেন। বাস্তবিকই হৃদয়-নিংড়ানো ভালোবাসা ছিল তাঁর প্রতি। মল্লিক কেন লেখালেখি বাদ দিয়ে অন্য কিছু করছেন, মল্লিকের সাথে দেখা হলেই তার কৈফিয়ত চাইতেন। লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার জন্য বারবার তাগিদ দিতেন। তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হওয়ার পরেও সব সময় মল্লিককে ভাই বলে ডাকতেন। মল্লিক অসুস্থ হওয়ার পর কয়েকবার হাসপাতালে দেখতে গেছেন। প্রতিবারই চোখের পানি ফেলে তাঁর জন্য হাত তুলে দোয়া করেছেন। কবি মতিউর রহমান মল্লিকের মৃত্যুর পর একটা টিভি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে শব্দ করে কেঁদে ফেললেন। অনেকবারই চোখের পানি ফেলে কাঁদতে দেখেছি কিন্তু এই প্রথম দেখলাম শব্দ করে কাঁদতে। মতিউর রহমান মল্লিককে যে আপন ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন এটা তারই বহিপ্রকাশ।

আমাদের সাহিত্যের আকাশে যে ক'জন প্রতিভাধর লেখক কবি নিকশ কালো নিকুঞ্জ বনে স্বর্ণলতার আলোর ঝলকানি ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক তাঁদের অন্যতম। তাঁকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হচ্ছে না দেখে আবদুল মান্নান তালিব সব সময় মর্মযাতনায় ভুগতেন। মতিউর রহমান মল্লিককে বলতেন, ওয়াজ করার লোকের অভাব হবে না। আপনার কাজ ওয়াজ করা নয়। আপনার লেখালেখি বাড়ানো দরকার।

এমডি প্রেস

১৯৭৩ সাল। আবদুল মান্নান তালিব তখন কলকাতার সাপ্তাহিক মিযান পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। মিযান পত্রিকা তখন ছাপা হতো এই এমডি প্রেস থেকে। ঐ প্রেসে বসেই তিনি সংশোধন ও সম্পাদনার কাজ করতেন। সম্ভবত প্রেসটা ছিল ফ্রি স্কুল স্ট্রিট এলাকায়। এটা ছিল মুসলিম অধ্যুষিত। মালিকের নাম এ.আর. চৌধুরী। আবদুল মান্নান তালিব বলছিলেন, ভদ্রলোক খুব আন্তরিক। অমায়িক ব্যবহার। সব সময় আগেই সালাম বলেন। আমিও সালাম দিই। মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কথাবার্তা হয়। গল্প হয় অতীত বর্তমান নিয়ে। সংখ্যালঘুদের সমস্যা,

www.pathagar.com

বাংলাদেশ নিয়ে কথা হয়। ভদ্রলোকের বাসা আর প্রেস একই সাথে। এক রুম প্রেস আর দেড় রুমে তিনি পরিবার নিয়ে থাকেন। বড় ছেলে সেভেন না এইটে পড়ে। মাঝে মাঝে ভিতর থেকে চা-নাস্তা আসে। আমি ধরে নিয়েছি এমডি প্রেস মানে মহাম্মদী প্রেস আর এ.আর. চৌধুরী হচ্ছে আবদুর রহমান চৌধুরী। একদিন সকালে আমি প্রেসে এসে বসে আছি, ভদ্রলোক তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন। দেখলাম, নবাব সিরাজ উদ্দৌলাহ সম্পর্কে খুব জঘন্য একটা বই পড়ে শোনাচ্ছেন। সেদিনই আমার সন্দেহ হলো। মিযান পত্রিকার একজন দায়িত্বশীলকে বিষয়টা বললাম। তিনি বললেন, ভাই, ভদ্রলোক তো হিন্দু! এমডি প্রেস মানে মা দুর্গা প্রেস। দীর্ঘ দিন থেকে আমাদের কাজ করে, তাই সালাম-কালাম শিখে নিয়েছে। আর এ.আর. চৌধুরী অর্থ অরূপ রতন চৌধুরী। কিছু দিলে খাবেন না। আমি বললাম, 'আরে ভাই, আগে বলবেন না!'

তিনি কলকাতা থেকে তখন অনেক দূরে থাকতেন। যেতে আসতে অনেক সময় লাগতো। বাড়িতে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যেত। তাই সম্পাদকীয়টা সব সময় ট্রেনে বসেই লিখতেন। ট্রেনে চারদিকে তাস খেলার আড্ডা চলতো আর তিনি বসে টুকটুক করে সম্পাদকীয়টা লিখে ফেলতেন। ইন্ডিয়াতে দূরপাল্লার ট্রেনে উঠলে তাস খেলার আড্ডাটা চোখে পড়ার মতো। বলছিলেন, 'এর পরে প্রেসে একদিন প্রসাদ নিয়ে এসে খেতে দিয়েছে। পড়লাম বিপদে। কি করি! যা হোক, কাগজে মুড়ে রেখে দিলাম। এক ফাঁকে পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম, পরে বাইরে গিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম।'

বাঙ্গালি উর্দু নেহি চলতা হু

আবদুল মান্নান তালিব তখন লাহোরের রোজনামা তাসনীমে সবেমাত্র জয়েন করেছেন। প্রথম দিন ওনাকে একটা রিপোর্ট লিখতে দেয়া হলো। অনেক খেটে-খুটে রিপোর্টটা লিখলেন। কিন্তু রিপোর্টটা ছাপা হলো না। আবদুল মান্নান তালিব বলছিলেন, 'আলতাফ হোসাইন কোরাইশি, মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজসহ আরো নাম করা বড় বড় লেখক-সাংবাদিক তখন রোজনামা তাসনীমে লেখেন। আমি একমাত্র বাংলাভাষী। মাদ্রাসায় পড়েছি, উর্দু মোটামুটি জানি। আমার লেখাটা জমা দেয়ার পর সবার সামনে মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ সাহেব ওটা জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন। কিছু অংশ পড়ার পর সবাই হো হো করে হেসে দিলেন। আলতাফ হোসাইন কোরাইশি সাহেব বললেন, 'বাঙ্গালি উর্দু নেহি চলতা হু'। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। রাতে বাসায় ফেরার পথে একটা উর্দু ব্যাকরণ কিনে নিয়ে গেলাম। সারা রাত ধরে পড়লাম। খুব সহজ ব্যাকরণ। দু'দিনেই সব আয়ত্তে এসে গেল। পরের সপ্তাহে আরেকটা রিপোর্ট লিখলাম। না, উর্দু লেখার জন্য আর কারো বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়নি।'

আসলে আবদুল মান্নান তালিব খুব ভালো উর্দু জানতেন, যা ছিল তাঁর মাতৃভাষার মতো।

www.pathagar.com

অসংখ্য লেখক তাঁর কাছে আসতেন তাদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তা সম্পাদনা ও মুদ্রণের জন্য। প্রত্যেককেই তিনি সুপরামর্শ দিতেন। সম্ভব হলে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করেও দিতেন। খুব কম লেখকই বিমুখ হয়ে ফেরত গিয়েছেন। একদিন একজন ব্যারিস্টার এসেছিলেন রসূল স.-এর বহু বিবাহ সম্পর্কে একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর কাছে। তিনি সাগ্রহে সেটা রেখে দিলেন। দু'দিন সময় নিয়ে ব্যারিস্টার সাহেবকে বললেন, ছাপার যোগ্য হলে অবশ্যই আমি দেখে দেব। দু'দিনের মধ্যে তিনি পাণ্ডুলিপিটি পড়ে শেষ করলেন। দু'দিন পর ব্যারিস্টার সাহেব এলেন। তিনি ব্যারিস্টার সাহেবকে চা-নাস্তা খাইয়ে পরে বললেন, আপনার লেখায় অত্যন্ত আপত্তিকর বিষয় আছে। দশ লাখ টাকা দিলেও এটা আমি ছাপার জন্য সুপারিশ করবো না। আর আমি চাই এটা যেন না ছাপা হয়! ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ লেখাপড়া না করে ইসলামী বিষয়ে বই লেখা ঠিক নয়।

আর একজন লেখকের একটা পাণ্ডুলিপি আবদুল মান্নান তালিব সাহেবের কাছে জমা দেয়া হয়েছিল সম্পাদনার জন্য। আবদুল মান্নান তালিব লেখাটা পড়ে খুব চটে গেলেন। তিনি বাহকের সামনেই ওটা রিজেক্ট করে দিলেন। কারণ লেখার ভাষাটা ছিল খুবই এলোমেলো ও দুর্বল। তিনি পাণ্ডুলিপির বাহককে বললেন, 'এই লেখকের একটা বাক্যও সঠিক হয়নি। লেখাটা রিরাইট করতে হবে। তাছাড়াও এটা জাতীয় তিনজন নেতার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে। আমাদের একজন নেতার বিপক্ষেও কয়েক পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে, কিন্তু পক্ষে একটা লাইনও লেখা হয়নি।'

এরপর আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই কবি বন্ধু পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতে দিলেন। বললেন, ভাই গ্রামের লেখক, কাটছাঁট করে যদি লেখাটা ছাপতে পারেন তবে খুব ভালো হয়। যদিও ইতিপূর্বে কয়েকটা প্রকাশনীতে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কবি বন্ধু ঘুরেছেন, কেউই ছাপতে রাজি হয়নি। যা হোক, অনেক অনুরোধের পর আমি পাণ্ডুলিপিটা কয়েকবার পড়লাম এবং পড়তে পড়তেই কাটা ছেঁড়া করে ফেললাম। লেখক লেখাটা লিখে বিতর্কিত হতে চেয়েছিলেন। আমি তার মুখটা ঘুরিয়ে দিলাম সত্যের দিকে। লেখক যা লিখেছেন নেতার বিপক্ষে আমি তা করে দিলাম নেতার সপক্ষে। এছাড়া আমি নেতার পক্ষে অতিরিক্ত ছয় পৃষ্ঠা লিখেও দিলাম। বইটা ছাপা হওয়ার পর আবদুল মান্নান তালিবের হাতে দিলে তিনি আমাকে মৃদু ধমক দিলেন। বললেন, 'যিনি যা চান তাকে তাই পেতে দিন।' আমি তাঁর আদেশে অনেক লেখকের অসংখ্য পাণ্ডুলিপির কাটছাঁট করেছি, কিন্তু কখনো বকা শুনতে হয়নি।

যা হোক, পরবর্তীতে বইটা আমাদের ঐ নেতার হাতে পৌঁছানোর পর নেতা তো মহাখুশি। আমার কাছ থেকে বইটির কয়েকশ কপি কিনে নিয়ে বিতরণও করলেন। নেতা কয়েক দিন পরে লেখককে ফোন করে ধন্যবাদ জানালেন এবং লেখককে বিশেষভাবে পরামর্শ দিলেন, তোমার বই তো আমি অনেক কপি বিক্রি করে দিয়েছি, তুমি প্রকাশকের সাথে রয়্যালটির চুক্তি করে ফেল। গ্রামের নতুন লেখক, এই পরামর্শের পর যা হবার তাই

www.pathagar.com

হলো। মানে 'দারোগায় কয়েছে চাচি আমি কি আর আমি আছি।' গ্রাম থেকে- লেখক পড়ি-মরি ঢাকায় চলে এলেন। লেখক প্রকাশক একটা চুক্তিও হলো।

অতঃপর পরের ঘটনা অত্যন্ত বিড়ম্বনার। লেখকের ধারণা হলো প্রকাশক তার পঞ্চাশ টাকা দামের এই বইটি বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছেন এবং লেখককে মহাঠকানো ঠকাচ্ছেন। একদিন তালিব সাহেবের সামনে লেখকের এক আত্মীয় আমাকে খুব অসৌজন্যমূলক কথাবার্তা বললেন। আবদুল মান্নান তালিব এসব শুনতে শুনতে এক সময় বিরক্ত হয়ে লেখকের আত্মীয়ের উদ্দেশে বললেন, 'কার ওসিলায় শিন্নি খাইলি মোল্লা চিনলি না।'

আবদুল মান্নান তালিব আল্লাহর ওলি ছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা আমাকে সব সময় মুগ্ধ করতো। তিনি সংশ্লিষ্ট লেখককে প্রথম দিন দেখেই আমাকে বলেছিলেন, সাবধান! এই লেখক থেকে দূরে থাকবেন! এই ধরনের লোকরা সব সময় বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কি জানি আল্লাহর কি মহিমা এই ঘটনার কিছু দিনের মাথায় ঐ লেখক অসংখ্য বিপদের মধ্যে পড়ে গেলেন।

তাবলীগ জামাতের আবদুল মান্নান

দেশ বিভাগের বছর ছিল ১৯৪৭। ভারত জুড়ে তখন ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। সারা ভারতে হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। সমগ্র ভারতে এই দাঙ্গার রেশ ছিল আরও অনেক বছর। সেসব স্মৃতি আবদুল মান্নান তালিবকে সব সময় তাড়িত করতো। এর মর্মজ্বালা বুকে নিয়েই তিনি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েছিলেন। লক্ষ্য একটাই, 'মাসিক তরজমানুল কুরআন' অফিসে গিয়ে মাওলানা মওদূদী রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। এই উদ্দেশে আবদুল মান্নান তালিব ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। নিয়ত ছিল হায়দরাবাদ যাবেন। রওয়ানাও দিয়েছিলেন হায়দরাবাদের উদ্দেশে। লোকমুখে শুনে শুনে ট্রেন রাস্তা ধরে ওনারা পায়ে হেঁটে হায়দরাবাদের দিকে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু তিন দিন হাঁটার পর পুলিশ তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের দিকে। পুলিশ বলেছিল, এদিকে গেলে মারা পড়বে। পাকিস্তানের দিকে যাও। কিন্তু ট্রেন লাইন ওনাদেরকে নিয়ে গিয়েছিল নিজামুদ্দীনে। তারপর চলে আসেন মুরাদাবাদে। মুরাদাবাদের এক তাবলীগ জামাতের নেতার পেছনে তিনি ঘুরেছেন অনেক দিন। প্রথম জীবনে আবদুল মান্নান তালিব তাবলীগ জামাত করেছেন। বলা যায় এখান থেকেই তাঁর তাবলীগ জামাতের জীবন শুরু। চিল্লাও দিয়েছেন। তাবলীগের মাদ্রাসায় পড়েছেন। শুধু কি তাই? তাবলীগে নেসাব চার খণ্ডে অনুবাদও করেছেন। অত্যন্ত ঝরঝরে, সাবলীল ও মনোলোভা ভাষায় অনুবাদের কারণে এর লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে সারা দুনিয়ার বাংলাভাষীদের মাঝে। আবদুল মান্নান তালিবের ছোট ভাই লিখেছেন, অনুবাদের সাথে সাথে শুধু আমেরিকাতেই বইটির পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে তিনি আবদুল মান্নান নামে খ্যাত। ওখানে

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব নামে অনেকেই তাঁকে চেনেন না। ওপার বাংলার সবাই তাঁকে মান্নান সাহেব বলে ডাকতেন।

আবদুল মান্নান তালিবের ছোট ভাই মাওলানা আব্দুল হামীদ কাশেমী লিখেছেন, 'মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মগরাহাট মুসলিম হাই স্কুল থেকে সুনামের সঙ্গে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ক্লাসে প্রথম স্থান বরাবরই তাঁর রিজার্ভড্ ছিল। তাঁর এক বছরের বড় সহোদর ভাই মাওলানা ডাক্তার আব্দুল হান্নান রহ. তাবলীগ জামাতের বিখ্যাত মুবাল্লিগ একই সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু পড়াশুনায় আবদুল মান্নান তালিব বড় ভাইকে সর্বদা পেছনে রাখতেন। এর চেয়ে দুই বছরের বড় সহোদর ভাই তাবলীগ জামাতের বিখ্যাত মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুল হাকিম কাশেমী ১৯৫০ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ বর্তমান আযাদ কলেজ থেকে আই.এসসি. পাস করে ঢাকায় এম.বি.বিএস. পড়তে চলে যান। একই বছরে এরা দুই ভাই পাশ করেন। এক চিল্লার নিয়তে নিজামুদ্দীন মারকাজে চলে যান। ওখান থেকে জামাতে পুনায় যান। নিজামুদ্দীনে ফিরে জানতে পারেন বড় ভাই আব্দুল হান্নান জামাতে মুরাদাবাদ গেছেন এবং সেখানে মাদ্রাসায় হালাহে দারাইনে হিফজে কোরআন বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। জানতে পেরে তাঁরও ইচ্ছা হলো বাড়ি না ফিরে মাদ্রাসায় পড়বেন। এই নিয়তে ইনি মুরাদাবাদে গিয়ে মাদ্রাসা এমদায়িদাতে ভর্তি হয়ে যান। আব্বাজানের ইচ্ছা ছিল সেজ ছেলে আব্দুল হাকিমকে ডাক্তার তৈরি করবেন, এজন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়তে পাঠান। আর এদের দু'জনের এক জনকে ওকালতি পড়াবেন। কিন্তু দু'জনেই আব্বার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুনিয়ার লাইন ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জিন্দেগী পরকালের লাইন গ্রহণ করে ধন্য হন। এক ভাই হয়ে গেলেন মুহাদ্দিস, মুবাল্লিগ। আর এক ভাই হলেন দুই শতাধিক গ্রন্থের অমর লেখক, গবেষক ও অনুবাদক মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব রহ.। মুরাদাবাদে দুই বছর পড়ার পর বাড়ি ফিরে পূর্ববর্তী শিক্ষাজীবন শুরু করেন বীরভূমের সিউড়ীর মাদ্রাসা জিয়াউল ইসলামে ভর্তি হয়ে। এখানেই মাদ্রাসার বার্ষিক মুখপত্র জিয়াউল ইসলামে প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা। প্রবন্ধ লেখা ও সম্পাদনায় এখানেই তাঁর হাতেখড়ি।'

আবদুল মান্নান তালিব তাঁর সেই জীবনের পুরোটা অংশই হয়তো ইচ্ছে করেই এপার বাংলায় গোপন রেখেছিলেন। বলেননি কোনদিন কারো কাছে। তবে তিনি এক সময় তাবলীগ জামাতে সক্রিয় ছিলেন তা মাঝে মধ্যে কথা প্রসঙ্গে বলতেন। কিন্তু এত গভীরভাবে সক্রিয় ছিলেন, তা তাঁর ছোট ভাই আব্দুল হামীদ কাশেমীর লেখাটি না পাঠ করলে জানা যেত না। তিনি লিখেছেন, 'বাংলা ও উর্দু ভাষায় তিনি এমন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন যে, ভাষান্তরে তাঁর সমকক্ষ মানুষ খুব কমই নজরে পড়ে। শায়খুল হাদীস মাওলানা জাকারীয়া সাহারানপুরী রহ. রচিত তাবলীগ জামাতের সর্বশ্রেষ্ঠ তালিমের গ্রন্থ ফাজায়েলে আমাল বা তবলীগী নেসাব মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে এই জামাতের প্রধান হাতিয়ার ছিল আল্লামা হাফেজ মহিউদ্দিন রচিত আরবি গ্রন্থ রিয়াযুজ সালেহীন ও এর উর্দু তর্জমা।

www.pathagar.com

তাবলীগে নেসাব মুদ্রিত হওয়ার পর এই কিতাব কেবল আরবি মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় স্থান পায়। কিন্তু এর ভাবাদর্শ এতই মনোমুগ্ধকর ও লোভনীয় যে, মাওলানা মরহুম (আবদুল মান্নান তালিব) এটির বঙ্গানুবাদ এমন আকর্ষণীয় ভাষায় করেন, দু'খণ্ড কিতাবকে চার খণ্ডে মুদ্রিত (ব্যাখ্যাসহ) করেন, মাওলানার ভাষার কারণে কেবল আমেরিকায় বাঙালী অভিবাসীর মধ্যে পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হয়। এমনিভাবে লক্ষ্ণৌ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মাওলানা সুলাইমান নদভীর কালজয়ী বক্তব্যের সংকলন 'খুতবাতে মাদ্রাজ'-এর বঙ্গানুবাদ 'পয়গামে মুহাম্মদী' বাংলা সাহিত্য জগতে অমর সৃষ্টি। 'বাংলাদেশে ইসলাম' বঙ্গে ইসলামী আগমনের প্রামাণ্য গবেষণামূলক সুবিশাল গ্রন্থ। সুবিখ্যাত বুখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ, 'সিরাতুন নবী'র কয়েক খণ্ডের বঙ্গানুবাদ। কবি ইকবালের 'রমুজে বেখুদী, বালে জিব্‌রীল, বাঙ্গে দারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বাংলা কাব্যে অনুবাদ তাঁর যোগ্যতার বিরাট দলীল।'

কিন্তু সত্যের সাধক, সত্য সন্ধানী এই চলন্ত জ্ঞানসিন্ধু পাহাড়-পর্বত, চড়াই-উৎরাই, দুর্গম বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিকই পৌঁছতে পেরেছিলেন মহাসাগরের কাছে। তিনি বলতেন, 'মাসিক তরজমানুল কুরআন' আমার চোখ খুলে দেয়। তরজমানুল কুরআনের প্রায় সব সংখ্যা আমাদের বাড়িতে আসত। এর কয়েকটি সংখ্যা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। দেখলাম তরজমানুল কুরআনে ইসলামকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যে সম্পর্কে আমাদের মতো মাদ্রাসা পড়ুয়াদের কোন ধারণাই ছিল না।' এরপরই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে কোন মূল্যেই হোক, তরজমানুল কুরআনের সম্পাদকের সাথে দেখা করবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিকই পৌঁছেছিলেন পাঠানকোট এবং দীর্ঘ ১১ বছর তিনি কাটিয়েছেন জ্ঞানসাগরের সান্নিধ্যে। প্রতিদিন তাঁর বিকেলের আসরে তিনি যোগ দিতেন। অসংখ্য প্রশ্নের জবাব শুনতেন– আত্মস্থ করতেন। সেই অনুযায়ী আমল করতেন।

মেরা জিভ কাট লো

যা হোক, ওপারে অবস্থানরত তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই তাবলীগ করেন। বড় ভাই পশ্চিমবঙ্গ তাবলীগের আমীর ছিলেন। তারপরও আবদুল মান্নান তালিব তাবলীগ ছেড়েছিলেন কয়েকটি সেনসেটিভ কারণে। মাদ্রাসায় পড়ার সময় তিনি দেখেছিলেন, সারা বছরের খরচ বাবদ মাদ্রাসার প্রত্যেক ছাত্রকে কোন একজন দানবীর সেই আমলে ২৫০ টাকা করে অনুদান দিতেন। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয়, সবার সামনে শিক্ষকরা স্লিপে সই করিয়ে ছাত্রদের হাতে ২৫০ টাকা করে তুলে দিতেন, কিন্তু দাতারা চলে গেলেই শিক্ষকরা ছাত্রদের হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে নিতেন। এই টাকার সিকি ভাগও ছাত্রদের জন্য খরচ করা হতো না। তারপর আরেক দিনের একটি ঘটনা আবদুল মান্নান তালিবের মনে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। মুরাদাবাদ স্টেশনে তিনি তাবলীগের এক নেতার সফরসঙ্গী ছিলেন। স্টেশনে বসে ছিলেন ট্রেনের অপেক্ষায়। একজন ভিক্ষুক এসে নেতার কাছে কয়েকবার ভিক্ষা চাইলো। নেতা বিরক্ত হয়ে

www.pathagar.com

ভিক্ষুককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'মেরা জ্বিব কাট লো'। মাদরাসার টাকা আদায়ের জন্য এই হুজুররা অনেক সুন্দর সুন্দর বয়ান করেন, অথচ নিজে সামান্য কপর্দকও দান করতে চান না। কথা ও কাজের এই বৈপরীত্য তাঁকে দারুণভাবে আঘাত করে। তারপরই তিনি তাবলীগ জামাত ত্যাগ করেন।

ইসলাম আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়

তিনি বলতেন, দুনিয়াতে কোন আদর্শই অবিকৃত অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকেনি। একমাত্র ইসলামী আদর্শ কোন রকম পরিবর্তন ছাড়া ত্রিশ বছর অবিকল টিকে ছিল। তারপর থেকে ইসলামের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের কারণে ইসলামের বিকৃতিটা হয়েছে চোখে পড়ার মতো। সে কারণে এই অঞ্চলে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপটা সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। উপমহাদেশের অন্য ধর্মগুলোর মতো ইসলাম এখানে এসে আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মে পরিণত হয়েছে। ইসলাম শুধু একটা আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়, এটা যে একটা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, হাজার বছরের চেষ্টায়ও তা উপমহাদেশের সাধারণ মানুষকে কোনভাবেই বুঝানো যাচ্ছে না।

তাঁর বাসায় কখনো ইফতারি বানানো হতো না

দীর্ঘ পচিশ বছর এক সাথে পাশাপাশি কাজ করেছি আমি ও আবদুল মান্নান তালিব। না, আমার সাথে তাঁর কোনদিন মনোমালিন্য হয়নি। তবে তাঁর সাথে অনেক বিষয়ে আমার বিস্তর মত-পার্থক্য হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে যুক্তিতর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে সুবিধা হয়েছে। আমি দেখেছি একজন আদর্শবান মানুষের সাথে কাজ করার মজাই আলাদা। তিনি সব সময় যে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে কুরআন-হাদিসের মানদণ্ড সামনে রাখতেন। তারপর ফেকাহ ও অন্যান্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতেন।

যা হোক, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আবদুল মান্নান তালিবের বাসায় খুব একটা যাওয়ার দরকার পড়ত না। তবে হ্যাঁ, জীবনের শেষ কটা দিন আমি প্রায় সর্বক্ষণ তাঁর পাশে থাকতে পেরেছি। সেজন্য প্রায় প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসা অথবা হাসপাতালে তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তখন রমজান মাস হওয়ার কারণে মাঝে মাঝে তাঁর বাসায় ইফতারিতে শরীক হতে হয়েছে। প্রথম দিন ইফতারির সময় তিনি আমাকে বললেন, আপনাকে এর আগে বহুবার বলেছি, আমাদের বাসায় কোন প্রকার ইফতারি তৈরি করা হয় না। কারণ সে ধরনের অর্থনৈতিক সঙ্গতি বা সামর্থ্য আমার কোনদিনই ছিল না। আমার আগের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি কোনদিন আয়োজন করে ইফতারিতে বসতে পারিনি শুধু অভাব-অনটনের কারণে। বললেন, আমরা সাধারণত পানি বা খেজুর দিয়ে ইফতারি সেরে সাথে সাথে রাতের খাবার খেয়ে নিই। প্রায়ই বলতেন, জাহানে নও-এ থাকতে বারো আনা বেতন পেতাম, তাও আবার ভেঙে ভেঙে– এই ধরেন দুই আনা, চার আনা করে দিত।

www.pathagar.com

সম্ভবত ১৯৯২ সালের কথা। একদিন সকাল বেলা আমি কোন বিশেষ কাজে ওনার বাসায় গিয়েছিলাম। দেখলাম তাঁর ছেলে শামীম ও কোন একজন নাতনি শুধু খিচুড়ি খাচ্ছেন। জানলাম তখন ডিম বা গোশত কেনার মতো সামর্থ্য ওনার ছিল না।

একজন রাজনীতিবিদকে বললেন দাড়িতে কালো খেজাব লাগাতে

মানুষ মৃত্যুশয্যায় ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদের কথা আর ঈমানদারেরা পরকালের কথা ভাবনা-চিন্তা করেন। মৃত্যুর আগে অনেককে কাছ থেকে দেখেছি ছেলেমেয়ের নাম ধরে উচ্চ স্বরে হা-হুতাশ করতে। অনেককে কাঁদতে দেখেছি ছেলেমেয়েদের কি হবে এই ভেবে। কিন্তু ব্যতিক্রম বিরল মানুষ আবদুল মান্নান তালিব। তাঁকে একবারের জন্যও হা-হুতাশ করতে দেখলাম না। তিনি দুরারোগ্য কঠিন ক্যানসারে ভুগছেন, যে কোন সময় মারা যেতে পারেন! শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও বিষয়টা জেনে ফেলেছিলেন। না, তাঁর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই! অসহ্য যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তিনি স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলছেন, বিনম্রভাবে হাসছেন, আগত অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছেন, উপদেশ দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে দিচ্ছেন। সম্পাদনা করছেন, লিখছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাশেদ বা নুসরাতের সাহায্যে খবরের কাগজ পড়ে আত্মস্থ করছেন। সবকিছুই স্বাভাবিক! আমি যেহেতু সর্বক্ষণ তাঁর পাশে ছিলাম তাই প্রায় সবকিছুই অবলোকন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সুপ্রিয় মাহবুবুল হকের কথাই ঠিক, 'ওনাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি কিছু সময়ের জন্য পৃথিবী নামক এ গ্রহে সফরে এসেছিলেন, এখন আবার অন্য কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন তারই পূর্ব প্রস্তুতি তিনি সেরে নিচ্ছেন।' এ সবই আশ্চর্য আমাদের কাছে! এসব দেখে আমার বারবার মনে হয়েছে তিনি সাধারণ মানুষ ঠিকই তবে অতি সুউচ্চ মানের একজন সাধারণ মানুষ।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি দেশ নিয়ে, সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে অসম্ভব রকম ভাবনা-চিন্তা করতেন। এসব নিয়ে দু'একটি লেখাও তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শেষ লেখাটির কিছু অংশ পাঠকের জ্ঞাতার্থে এখানে উদ্ধৃত করা হলো : 'দুনিয়ার কোন্ দেশটি আছে তার নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন? মানুষ যখন পৃথিবীতে এসেছে তখন ধর্ম নিয়ে এসেছে। এমন নয় যে, ধর্ম আগে এসেছে, তারপর মানুষ এসেছে অথবা মানুষ আগে এসেছে এবং তারপর ধর্ম এসেছে অর্থাৎ মানুষ ধর্ম তৈরি করেনি, বরং মানুষ ও ধর্ম একই সাথে এসেছে। ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত, মানুষের ফিতরাত। মানুষের প্রতিটি প্রাণকোষে, প্রতিটি রক্তকণিকায়, প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে ধর্মের বীজ লুকিয়ে আছে। মানুষ একটি প্রাকৃতিক জীব একথা কি একটি মানুষ অস্বীকার করতে পারবে? তার একটি প্রকৃতি আছে এবং প্রতিনিয়ত প্রতিটি কাজে তাকে পদে পদে তার সঙ্গ দিতে হয়।'

আমার মনে আছে, মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে প্রখ্যাত একজন রাজনীতিবিদ তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি প্রথমেই তাঁকে বললেন, 'জনাব, আপনি দাড়িতে লাল খেজাব লাগিয়েছেন কেন? আপনার কালো

www.pathagar.com

খেজাব লাগানো উচিত। কারণ আপনি এখন অবস্থান করছেন জেহাদের ময়দানে। শত্রুর চোখে যাতে আপনাকে যুবক দেখায় সেজন্যই কালো খেজাব লাগাবেন। বাংলাদেশ আজ বিপন্ন। এ দেশটাকে বাঁচাতে হলে যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।'

আরো বলেন, 'ভাই সাহেব, যেদিন মালিবাগ মোড়ে আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম সেদিন বলেছিলাম, সাহিত্য-সংস্কৃতি ময়দানের জন্য কিছু কাজ করুন, তা না হলে দেশ বাঁচাতে পারবেন না। আজ আবারও বলছি, সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে একটু নজর দিন, তা না হলে দেশ থাকবে না।' এসব কথা শুনে জনৈক রাজনীতিবিদকে শুধুই হাসতে দেখেছি।

এর কয়েক দিন পরে অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর গিয়েছিলেন তাঁর সাথে দেখা করতে। আবদুল মান্নান তালিব তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, দেখুন, আমরা কম বেশি অনেকেই জানি। তবুও বলছি, শুধু রাজনীতি করে ইসলাম কায়েম করা যাবে না, ইসলামকে বাঁচাতে হলে সাহিত্য-সংস্কৃতির ময়দানকে প্রস্তুত করুন। এখনো সময় আছে সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজকে অগ্রাধিকার দিন।

ছদ্মনামে অনুবাদ করেছেন কাশ্মীর সিরিজ

তিনি লেখালেখির শুরু থেকেই অনেক লেখা ছদ্মনামে লিখেছেন ও অনুবাদ করেছেন। তিনি কয়েকটি ছদ্মনামে লিখেছেন ও অনুবাদ করেছেন। তা হচ্ছে আবু নাঈম, আবু আহমদ ও ওয়ারেসুল হক প্রভৃতি। আবু নাঈম নামে তিনি হিন্দি থেকে কিছু কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। আর আবু আহমদ নামে তিনি কাশ্মীর সিরিজের 'ইহুদী এজেন্ট' বইটি অনুবাদ করেছেন। তারপর ওয়ারেসুল হক নামে 'টার্গেট তিন শয়তান, প্রতিশোধের আগুন, বাচনাথের মন্দিরে ও পোখরানের পাহাড়ে' বইগুলো অনুবাদ করেছেন। উর্দু ভাষাতে তাঁর মাতৃভাষার মতোই দখল ছিল। সেজন্য এ বইগুলো অনুবাদ করা তাঁর জন্য খুবই সহজ ছিল। আমি দেখেছি দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই তিনি এক একটি খণ্ড অনুবাদ করে দিতেন। তাঁর অনুবাদ সব সময় প্রাণস্পর্শী, ঝরঝরে, সহজ, সরল ও সাবলীল হতো। তিনি নিজেই পাকিস্তান থেকে এম.এ. হামিদ লিখিত মূল উর্দু বইগুলো সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এম. এ. হামিদ পাকিস্তানের একজন অত্যন্ত নামকরা উঁচুদরের ঔপন্যাসিক। নসীম হিজাজীর পরেই পাকিস্তানে তাঁর জনপ্রিয়তা রয়েছে।

একজন বড় মাপের শিশু সাহিত্যিক

আমরা প্রতিদিনই একটু সময় পেলেই আমাদের অতি নিকটের আপনজন শিশুদের গল্প শুনিয়ে থাকি। রূপকথার গল্প থেকে শুরু করে নানান ঢঙের গল্প। রাক্ষস-খোক্ষস, বাঘ, শিয়াল, কুকুর, বিড়াল আরো কত কিছুর গল্প যে বলতে হয়– তা যাদের ঘরে ছোট বাচ্চা ও নাতি-পুতি আছে তারা ভালো করেই জানেন। আমরা ছোটবেলায় নানা-নানী, দাদা-দাদী ও বড়দের কাছে এ ধরনের হাজারো গল্প শুনেছি। হালে অবশ্য 'টম এন্ড জেরি' ও 'ডোরেমন'দের ভিড়ে সেসব হারাতে বসেছে। এখন শহরের

www.pathagar.com

বাচ্চারা খেতে না চাইলে আর 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্প বলতে হয় না, 'ডোরেমন' অন করে দিলেই চলে। আমরা ঈশপের উপদেশমূলক গল্পের কথা জানি, জানি নাসিরউদ্দীন হোজ্জার হাসির গল্পের কথা। গোপাল ভাঁড়ও অনেকের থলিতে আছে। বন্দে আলী মিয়া, নাসির আলীসহ অনেকেই শিশুদের জন্য কথা সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তা ছিল অনেকটা অবাস্তব কল্পকাহিনীর মতো। কিন্তু আবদুল মান্নান তালিবের শিশু সাহিত্যে এ দিক দিয়ে ব্যতিক্রম।

আবদুল মান্নান তালিবের শিশু সাহিত্যের তালিকাটা একেবারে নগণ্য নয়। তা হচ্ছে, সহজ পড়া, ছোটদের ইসলাম শিক্ষা ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ, ইসলাম শিক্ষা ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, এসো জীবন গড়ি ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, পড়তে পড়তে অনেক জানা, মা আমার মা, আমাদের প্রিয় নবী, মজার গল্প, কে রাজা, হাতিসেনা কুপোকাত, আদাবুল আরাবিয়া ও খেলতে খেলতে লিখতে শেখা ইত্যাদি। শিশুমনের উপযোগী এ সমস্ত বইয়ের বিষয়বস্তু খুবই চমৎকার। কুরআন-হাদিসের আলোকে যথাস্থানে কুরবান-হাদিসের উদ্ধৃতিসহ অত্যন্ত শিশুহৃদয়স্পর্শী ভাষায় এসব বই লেখা হয়েছে। এখানে ছোটদের সব বইয়ের ওপর আলোকপাত করা সম্ভব হচ্ছে না। 'এসো জীবন গড়ি' (১ম ভাগ) বইটিতে কি আছে একটু দেখি। এ বইয়ে মোট চৌদ্দটি বিষয়কে অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। বইয়ের বিষয়গুলো হচ্ছেঃ আল্লাহর বান্দা, সালাম করা, কুরআনের প্রতি সম্মান, পিতা-মাতার সেবা, শিক্ষকদের প্রতি সম্মান, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, লজ্জা, সত্যবাদিতা, অভুক্তকে আহার করানো, ছোটদের প্রতি স্নেহ, প্রাণীর প্রতি মমতা, প্রতিবেশীর অধিকার, প্রতিশোধ না নেয়া এবং নিজের হাতে কাজ করা। প্রতিটি লেখাতে ইসলামী আদর্শের সত্য ঘটনা অত্যন্ত চমৎকারভাবে গল্পাকারে লেখক তুলে ধরেছেন, যা শিশুমনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। শিশুদের সত্য, সুন্দর ও সুন্নাতি মনন ও আদর্শ চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তুলতে এ ধরনের বই খুবই উপযোগী।

পৃথিবীতে কে কাহার?

প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আবদুল মান্নান তালিব আজ আর দুনিয়াতে নেই। চলে গেছেন সবকিছু ছেড়ে। চলে যায় সবাই। আমরা কেউই একদিন থাকবো না। দুনিয়া থেকে একজন মানুষের প্রস্থান ঘটলে আমরা সবাই কম বেশি কাঁদি। সমবেদনা জানাই নিকট জনদের। আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী, ভক্তকুলের শোক কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে। পৃথিবীতে নানান মানুষের কান্নার ধরন নানান কিসিমের। তবে অধিকাংশ মানুষ উচ্চ স্বরে কাঁদে। আবদুল মান্নান তালিবের ইন্তেকালের পর যতদূর মনে পড়ে তাঁর ছেলেমেয়েরা কেউ উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি করেনি। কিন্তু কোন কোন সময় একজন মানুষের মৃত্যু কারো জন্য সারা জীবনের কান্না বয়ে আনে। আবদুল মান্নান তালিব ছয় ছেলে, তিন মেয়ে ও স্ত্রী রেখে গেছেন। এদের মধ্যে তিনটি অসহায় শিশু আছে। এরা এখনো দুনিয়ার রং-রূপ-গন্ধ অনেক কিছুই চোখ মেলে দেখেনি। হয়তো দেখতে শেখেনি। যখন এরা পৃথিবীটাকে দেখতে শিখবে তখন অনেক কাঁদবে আর সে কান্নাটা

www.pathagar.com

হবে তাদের মহৎ পিতা আবদুল মান্নান তালিবের জন্য। হয়তো বা এটা ঠিক নাও হতে পারে।

যা হোক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ছোট গল্প 'পোস্ট্‌মাস্টার'-এর একটা লাইন উদ্ধৃত করে আমার এই অংশের লেখা শুরু করেছিলাম। আমরা অনেকেই পোস্টমাস্টার গল্পের পটভূমি অল্প-বিস্তর জানি। আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। শুধু বলি, পল্লী গাঁয়ের পোস্ট্‌মাস্টার বদলির দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়াতে চাকরিতে জবাব দিয়ে যখন নৌকো চড়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছিলেন তখন গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পোস্ট্‌মাস্টারের অন্তরের কথা এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, '–কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে–এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি। পৃথিবীতে কে কাহার?'

৩ জানুয়ারি ২০১২। রাত ১টা। আমরা তিনটি অবুঝ শিশুসহ একজন অসহায় মহিলাকে মালিবাগের সোহাগ বাস কাউন্টারে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম। তাদের গন্তব্য ছিল যশোর। বাস আসতে দেরি হওয়াতে আমি বাসায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। মহিলাটি অঝোরে কাঁদছিলেন। তার এ কান্না চিরদিনের। হয়তো এ কান্না আরো আরো দীর্ঘায়িত হতেই থাকবে। মহিলাটি বারবার ভাবছিলেন, তার দীর্ঘ সতের বছরের ঢাকার জীবনের আজ এখানেই ইতি। চিরচেনা মৌচাক মার্কেটে হয়তো তার আর কখনোই আসা হবে না। তার স্বামী আবদুল মান্নান তালিব তাকে একদিন হাত ধরে এই অভিজাত মৌচাক মার্কেটে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর একা একা কত এসেছেন এই মার্কেটে। চিরচেনা মালিবাগের এই ব্যস্ত রাস্তায় হয়তো আর কখনোই তার পা পড়বে না। কারণ মহিলার পায়ের নিচে যে মাটি ছিল তা আজ সরে গেছে। অসহায় তিনটি শিশু বারবার ফ্যালফ্যাল করে পরিচিত জনদের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল আর নীরব অভিমানে জানতে চাচ্ছিল, হে ঢাকা শহর! তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? তোমার বুকের ইট-পাথরের দালান-কোঠা এত কঠিন থেকে কঠিনতর কেন? তোমার পিচঢালা পথ এত শক্ত কেন...কেন...কেন? হে ঢাকা শহর! তোমার বুকে এত দালান-কোঠা তবুও আমাদের থাকার একটু স্থান হলো না!

শামীম বারবার বলছিল, আংকেল, আমি মতিঝিল সরকারি বালক বিদ্যালয়ে পড়ি। এটা খুব ভালো স্কুল। আমি ঢাকায় থেকে পড়তে চাই। দরকার হলে আমি মেসে থেকে পড়বো। আমি তার এ আবেদনে সাড়া দিতে পারিনি। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্ট্‌মাস্টার'-গল্পের শেষ অংশ উদ্ধৃত করতে হচ্ছে, 'হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।'

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব আমার ওপর বিশাল গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। জানি না আমি তার কতটুকু পালন করতে পারবো। দায়িত্বের সবটুকুই কি দুনিয়াতে পরিপূর্ণভাবে পালন করা যায়? আর না সে সামর্থ্য সবার থাকে?

বহু ভাষাবিদ

বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ মুজতবা আলীর পর আমার বিবেচনায় আর এক জনের নামের পাশে বহু ভাষাবিদ শব্দটি লাগানো যথার্থ হতে পারে। তিনি হলেন আবদুল মান্নান তালিব। বহু ভাষাবিদ তাঁকেই বলা যেতে পারে যিনি শুধু ভাষাটি জানেনই না, সেই ভাষা থেকে জাতির প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে পারেন। আমি মনে করি আবদুল মান্নান তালিব এ ক্ষেত্রে একজন সফল ও সুপণ্ডিত লেখক ও অনুবাদক। তিনি পৃথিবীর অনেক ভাষা ভালোমতো জানতেন এবং অনেক ভাষা থেকে দক্ষতার সাথে অনুবাদ করেছেন। তাছাড়া তিনি বাংলা থেকে ইংরেজি ও উর্দুতে অনেক লেখা অনুবাদ করেছেন। তিনি সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করেছেন যেসব ভাষা থেকে তা হলো আরবি, উর্দু, ফারসি, ইংরেজি ও হিন্দি। এছাড়া তিনি অহমি, তেলেগু, মারাঠি, গুজরাটি ভাষা বুঝতেন। এসব ভাষার শব্দ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। বলতেন, সব ভাষার শব্দের মধ্যে একটা আত্মীয়তার বন্ধন আছে। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে অনেক ভাষার অনেক শব্দই বোঝা যায়। তিনি তেলেগু ভাষার অনেক শব্দ বিশ্লেষণ করে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। বলতেন, নেপালি আর অহমি ভাষা তো বাংলার ভিন্ন রূপ। ঠিক যেমন চট্টগ্রামের ভাষা আর সিলেটের ভাষা!

বাংলা সাহিত্য পরিষদের কঠিন দিনগুলো

সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান কখনো সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। কতিপয় হাভেতো কবি-লেখকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিতান্তই দীনহীনভাবে শুরু হয় সাহিত্য সংস্কৃতির কাজ। সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান পরজীবী উদ্ভিদের মতো। কারো বাগানের গাছতলায়, কারো বারান্দায়, কারো ড্রইংরুমে অথবা বিশেষ নেক নজরে কারো জলসাঘরে এর অংকুরোদ্গম হয়ে থাকে। তাই পরজীবী উদ্ভিদের মতো এর হায়াতও অতি সীমিত। রস সিঞ্চন বন্ধ হলেই এর যবনিকাপাত ঘটে। অতএব, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান কখনো দীর্ঘজীবী হয় না। এ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য পরিষদের অনেকটা সৌভাগ্য বলতে হবে। সুদীর্ঘ প্রায় আড়াই যুগ ধরে এটা টিকে আছে, যদিও এর চলার গতি খুবই মন্থর।

আজ থেকে প্রায় আড়াই যুগ আগে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের বারান্দার এক ক্ষুদ্র সূতিকাগারে জন্ম হয়েছিল বাংলা সাহিত্য পরিষদের। আঁতুড় ঘর থেকে বের হতে এই পরিষদের সময় লেগেছে প্রায় ছয় বছর অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে এটিকে সৎ ভাইয়ের মর্যাদা দিয়ে পৃথক করে দেয়া হয়েছিল। অনেকটা টোকাইয়ের পোশাকে একে এসে উঠতে হয়েছিল এর

www.pathagar.com

আসল মালিকের এক নিভৃত অন্ধকার কুটিরে। সেখানে তার মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেও বাঁচার আশা ছিল খুবই ক্ষীণ। অনেকেই শুনলে অবাক হবেন, তখন এই প্রতিষ্ঠানের পাঁচ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক মোট বেতন ছিল মাত্র আটাশশ' টাকা। মানে গড়ে এক একজনের বেতন ছিল ছয়শ' টাকার মতো। যদিও পরিচালক কোন বেতন-ভাতা বা সম্মানী গ্রহণ করতেন না। এমনই এক জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এর হাল ধরেন আবদুল মান্নান তালিব। তিনি এসে দেখলেন, জন্মের পর থেকে এটা এতটাই অপুষ্টিতে ভুগছে যে, সহসা রক্ত না দিলে একে বাঁচানো যাবে না। তিনি প্রাণপণ দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দিলেন। মালিকের হাতে পায়ে ধরেও তেমন কোন ফল হলো না। ক্রমেই এটি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যদিও এটি গড়াতে গড়াতে তখন ১৭১ নং ডাক্তারের গলির তিন তলায়। সহসা ১৯৯১ সালে বিশেষ অনুগ্রহের কিছু টাকা বাংলা সাহিত্য পরিষদকে ঋণ হিসেবে দেয়া হলো। হাভাতের সংসারে যা হয় আর কি– হুড়মুড় করে খ্যাত-অখ্যাত কিছু লেখকের মূল্যবান কিছু বই মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হলো। এর মধ্যে ছিল সতেরটি কবিতার বই, আটটি প্রবন্ধের বই, পাঁচটি গল্পের বই, সাতটি উপন্যাস ও অন্যান্য মিলে তখন প্রায় আটচল্লিশটির মতো বই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু বিধি বাম, এর বেশির ভাগই ছিল পাঠকের রুচির প্রতিকূলে অথবা বলা যায় ঐ মানের পাঠক পাওয়া ছিল দুষ্কর। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অধিকাংশ বইই ছিল অবিক্রিত। আবদুল মান্নান তালিব পড়ে গেলেন খুবই দুশ্চিন্তায়। টাকা কর্জ নিয়েছিলেন বটে কিন্তু যথাসময়ে ফেরত দিতে পারলেন না। বলা যায় এবার ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে থালা হাতে নামতে হলো পথে।

১৯৯৬ সাল। বাংলা সাহিত্য পরিষদের দুই বছরের ঘরভাড়া বাকি, কারো কারো বেতন বাকি তারও অধিক। আবদুল মান্নান তালিব প্রায় হাল ছেড়ে দিলেন। অনানুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হলো যে, এটাকে অন্য একটি প্রকাশনীর সাথে যুক্ত করে দিলে ভালো হয়। প্রতিষ্ঠানটির একমাত্র রক্ত সঞ্চালনকারী বই সাইমুম সিরিজের ২৯টির মধ্যে তখন প্রায় ১৮টি আউট অফ প্রিন্ট। তখন একদিন তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয় না প্রতিষ্ঠান আমরা আর সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। আমিও আর এভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। চিন্তা-ভাবনা করে দেখেন।

যা হোক, এরপর আমাকে প্রকাশনাসহ সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হলো পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে। পর পর কয়েকটা মিটিং হলো পরিচালনা পরিষদের। সম্মানিত নির্বাহী সদস্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক মরহুম জামেদ আলী ও জনাব মাহবুবুল হক ফান্ড সংগ্রহের জন্য চেষ্টা চালাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত লাভ-লোকসানের সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাড্ডার ব্যবসায়ী জনাব আবদুর রউফ সাহেবের কাছ থেকে কয়েক কিস্তিতে কয়েক লক্ষ টাকা ধার নেয়া হলো। অন্য দিকে নয়া বাজারের সোনার গাঁ পেপার হাউজ এক সাথে দু'হাজার রিম কাগজ আমাকে বাকিতে দিয়েছিল এবং আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস ২০টির মতো বই বাকিতে ছেপে দিয়েছিল। তখন যদিও এসব টাকা পরিশোধ করতে

www.pathagar.com

আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল, তবুও সকলের সহযোগিতায় সামনে চলার পথ কিছুটা হলেও আলোকিত হয়েছিল। আর শত প্রতিকূলতার মাঝেও শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের হাল ধরে ছিলেন আবদুল মান্নান তালিব।

যা জুলুম তাই সুদ

আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী অর্থনীতির ওপর অনেক পড়াশোনা করেছেন। তিনি 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' 'জীবন বীমা'সহ অর্থনীতির কয়েকটি বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তিনি বলতেন, আধুনিক বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতির ওপর অসংখ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। এ নিয়ে গবেষণা চলছে বিশ্বব্যাপী। খোদ বৃটেন থেকে এ বিষয়ে ২৫০ খণ্ডের একটি বই বেরিয়েছে। আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব তার খোঁজ পর্যন্ত রাখেন না। আমাদের দেশে যারা ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরে কাজ করছেন তাদের এ সব জানা দরকার। ইসলামী অর্থনীতির ওপর ব্যাপক গবেষণা আমাদেরই করতে হবে। আমরা ইসলামী ব্যাংককে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছি, তা সম্পূর্ণ সুদী ব্যাংকের আদলে। কিন্তু একে সুদমুক্ত অর্থনীতির মডেল হিসেবে পেশ করতে পারিনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সুদী ব্যাংকের চেয়ে বেশি কিছু মনে করতেন না। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি আর্টিকেল লিখেছিলেন। কিছু অনুবাদও করেছিলেন। তা দৈনিক সংগ্রামে ছাপতে দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সাহস করে সেগুলো ছাপেনি। তিনি বারবারই বলে আসছিলেন, 'যা জুলুম তাই সুদ'। আমরা ন্যায় ও ইনসাফের মডেল হতে পারতাম। তা আমরা পারিনি!

তিনি আজীবন সুদমুক্ত, শোষণমুক্ত, জুলুমমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন। ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন।

মৃত্যুর সময়ও ছেলেদের সহযোগিতা নিতে চাইলেন না

কারো সাথে গভীরভাবে না মিশলে তার নাড়ি-নক্ষত্র জানা যায় না। আবদুল মান্নান তালিব সাহেবের ছেলেমেয়েদের সাথেও যদি আমি গভীরভাবে না মিশতাম তাহলে আমারও জানার অনেক বিষয়ে অপূর্ণতা থেকে যেত। দূর থেকে তাদের সম্পর্কে আমার মধ্যে অন্য রকম একটা ধারণা ছিল। মানুষ যা ভাবে তা সব সময় বাস্তবের সাথে মেলে না। আমি ভাবতাম তাদের মায়ের মৃত্যুর পর তারা পিতার প্রতি মনে হয় অনীহ। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। পিতার অসুস্থতার পর ছেলেমেয়েরা রাত দিন তাঁর পাশে ছিল। সেবা-যত্ন করেছে বেপরোয়াভাবে। যার যা সামর্থ্য তাই নিয়ে পিতার পাশে ছিল সর্বক্ষণ। যখন যা প্রয়োজন ছেলেরা তাই করছিলেন। পিতার একটু আরাম-আয়েশের জন্য কেউ ফোম কিনে এনেছিলেন, কেউ আরাম কেদারা, কেউ টেবিল ফ্যান ইত্যাদি সবই তারা হাসপাতালে এনে জড়ো করেছিলেন। পিতা খেতে না চাইলেও ছেলেরা

www.pathagar.com

সাধ্যের অতিরিক্ত করেছেন। তবু কেন জানি না তিনি ছেলেদের কোন সহযোগিতাই নিতে চাচ্ছিলেন না। একান্তে বারবার বলছিলেন, আমি কারো সাহায্য-সহযোগিতা কখনো নিতে চাইনি। আমি যেন সে ধরনের অসুস্থ হয়ে না পড়ি, যাতে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়! মৃত্যুর আগের ক'দিন হাসপাতাল থেকে বাসায় চলে আসার জন্য ছটফট করছিলেন।

যে আলোর বিচ্ছুরণ বহু দূর থেকে অনুভব করা যেত

ছুটে চলা নদী, বয়ে যাওয়া স্রোত- বয়ে চলা জীবনের স্মৃতি; চলমান জীবনের পথ পরিক্রমায় প্রতিটি বাঁকে বাঁকে কত না স্মৃতিচিহ্ন সময়ের আরশিতে ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে যায়! তবুও জীবন চলার পথে এমন কিছু স্মৃতিচিহ্ন থাকে, যা কখনো অনুজ্জ্বল হয় না। প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি আবদুল মান্নান তালিবের সাথে পথ চলেছি- এই পঁচিশ বছরের কত শত স্মৃতিই না আজ মনের জানালায় উঁকি দিচ্ছে! এর কোনটা সাত রঙা রঙিন। আবার কোনটা সব রঙের মিশ্রণ- গাঢ় অন্ধকার। জীবনের এই রঙ্গমঞ্চে তার সবটুকু হয়ত স্বপ্নময় ক্যানভাসে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে না। তবুও স্মৃতির মিনার সত্যের আলোয় সমুজ্জ্বল রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা থাকবে আমার।

৭১ নং নিউ এলিফেন্ট রোড। সেই বিআইসি'র অফিস। চিরঅচেনা এ.কে.এম. নাজির আহমদ, হারিয়ে যাওয়া সিদ্দীক জামাল, কবি মতিউর রহমান মল্লিক, তারপর ছিলেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, এ.কে.এম. শরীফুর রহমান, বদরুল আলম, আব্দুল হামীদ, শেখ আহমদ, আবদুর রহিম আরো অনেকে। অতিথি কবি মহারসিক আবদুস সাত্তার, সোনালি কাবিনের কবি আল মাহমুদ, এক পশলা বৃষ্টির কবি মাহবুবুল হক, সোনালি শাহজাদার কবি সাজজাদ হোসাইন খান, কবি বুলবুল ইসলাম, কবি সোলায়মান আহসান, কবি বুলবুল সরওয়ার, কবি গোলাম মোহাম্মদ, কবি মোশাররফ হোসেন খান প্রমুখ এক ঝাঁক সোনালি সূর্যের মাঝে হঠাৎ আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব। মাথাভর্তি কুচকুচে কালো চুল। মুখে ঘন কালো দাড়ি। চেহারাও কালো। সবই কালো। তবে হৃদয় জুড়ে ছিল অসম্ভব রকমের আলো, যে আলোর বিচ্ছুরণ বহু দূর থেকে অনুভব করা যেত। সেজন্যে সেই আলোর আকর্ষণে তাঁর চারপাশে এত প্রজাপতির মেলা বসেছিল।

তিনি ছিলেন নারীদরদী লেখক

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।' আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম নারীদের যে দৃষ্টিতে দেখেছেন আবদুল মান্নান তালিবও সেভাবেই নারীদের দেখেছেন। তিনি ভাবতেন ইসলামের প্রথম যুগে অর্থাৎ রসূল স. ও খলিফাদের যুগে নারীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেছেন তাদেরকে সে ধরনের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর এ লক্ষ্যেই তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' এটিই তার লেখা প্রথম বই।

www.pathagar.com

বইটিতে নারী মুক্তির যে আকুতি লেখক দরদভরা হাতে তুলে ধরেছেন, তা লেখকের নারীদের প্রতি আন্তরিকতার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি এ বইটি ১৫ দিনের মধ্যেই লিখেছিলেন। পুস্তিকাকারে যখন এটা প্রকাশিত হয়েছিল তখন চারদিকে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তিনি অসম্ভব নারীদরদী লেখক ছিলেন। অন্যদিকে নারী লেখক তৈরিকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক কাজ বলে মনে করতেন। নারীদের ইসলামের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি সব সময় কাজ করেছেন। 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' এ বইটি মুদ্রণের ব্যাপারে অনেক আলেম-ওলামা ও মুসলিম পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁর অসম্ভব রকমের বাহাস করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিবের একটাই যুক্তি ছিল কুরআন-হাদিসে নারীদের যে পরিমাণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে তা যারা মেনে নেবে না, আমি মনে করি তাদের মধ্যেই গলদ আছে। শেষ পর্যন্ত অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে তিনি 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' সাত খণ্ডের বিশাল বই অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজ নিজ দায়িত্বে করেছিলেন। যখন 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' বইটি কেউ অনুবাদ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না তখন তিনি সবচেয়ে আলোচিত-সমালোচিত তিন নম্বর খণ্ডটি নিজ দায়িত্বে প্রথম অনুবাদ করে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেকের দৃষ্টিতে সেই খণ্ডটি ছিল সবচেয়ে বিতর্কিত। বলা বাহুল্য, এই অনুবাদকর্মের জন্য তিনি কোন প্রকার পারিশ্রমিক নেননি। তিনি মনে-প্রাণে চাচ্ছিলেন, ইসলামের এই মৌলিক বিষয়গুলো নারীদের জানানো দরকার। নারীরা যদি কুরআন-হাদিসে তাদের সম্পর্কে কি বলেছে তা জানতে পারে, তাহলে তারা নিজেরাই নিজেদের পথের অনেক বাধা দূর করতে পারবে, যদিও এ বইটা ছাপা হওয়ার পর 'আবদুল মান্নান তালিব ডিরেলড্ হয়ে গেছেন' বলে অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন। আমি দেখেছি যারাই তাঁকে ও 'রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' গ্রন্থটিকে ভুল বুঝেছিলেন তারাই এখন এ বইয়ের দারুণ ভক্ত। তাদের অনেকেই নিজের লেখায় এখন দলিল হিসেবে এ বইয়ের হাওলা পেশ করেন। আবদুল মান্নান তালিব একজন দূরদর্শী লোক ছিলেন বলেই এ বইগুলো তখন বাজারে আসতে পেরেছিল।

আল্লাহওয়ালা মানুষ

ছয় সাত বছর বয়সেই তিনি কুরআনের অধিকাংশ হেফজ করেছিলেন। কণ্ঠের ত্রুটির কারণে পুরোপুরি শেষ করেননি। তবে আমি দেখেছি কুরআনের অধিকাংশ আয়াত অর্থসহ তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি যে একজন আল্লাহওয়ালা বা খোদাভক্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তা তাঁর পেছনে নামাজে দাঁড়ালে অনুভব করা যেত। ছোট-বড় যে কোন জামাতে যে অবস্থায়ই তাঁর ইমামতিতে নামাযে দাঁড়িয়েছি রুকু ও সিজদায় তাঁর মতো এতটা খুসুখুজু আর কাউকে এমন দেখিনি। তিনি অতিথিপরায়ণও ছিলেন। তাঁর বাসায়ই হোক বা তাঁর অফিসে, কাউকে কখনও খালি মুখে ফিরতে হয়নি। স্বভাবগতভাবে তিনি ছিলেন বিনয়ী, স্বল্পভাষী। স্বল্পভোগী, অল্পে তুষ্ট, দৃঢ়চেতা ও মুক্ত মনের মানুষ।

www.pathagar.com

'তিনি আল্লাহর অলি ছিলেন' এ কথা আমরা অনেকের মুখেই শুনি। তার দূরদৃষ্টি ছিল অত্যন্ত প্রখর। মানুষের মুখ দেখেই তিনি অনেক কিছু বুঝে ফেলতেন। মৃত্যুর আগে আমরা অনেকে সার্বক্ষণিক তার পাশে ছিলাম। তিনি হাসপাতালে থাকতে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বারবার বলছিলেন, আমাকে বাসায় নিয়ে চলুন, পাকসাফ হয়ে আমার কিছু আমল করা দরকার। একদিন হাসপাতালে অনেকটা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আমি আর বারো দিন বাঁচতে পারি। আমাকে রিলিজ করার ব্যবস্থা করুন। ডাক্তারদের বললেন, আমার ক্যানসার হয়েছে এটা আমি জেনেছি। আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না। দয়া করে আমাকে রিলিজ করে দিন। তাঁর ব্যবহারে সেদিন হাসপাতালের অনেকেই মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। এরপরেও জোর করে তাঁকে আরও ৬ দিন হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। বাসায় এসে তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। মৃত্যুর দিন চুল দাড়ি ছেটে ফ্রেস হয়ে গোসল করে মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেলেন। কিন্তু তখনো আমরা জানতাম না তার কথায় সত্য হতে চলেছে। ঠিকই তিনি বারো দিনের দিন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। এ দিনের মৃত্যু নাকি সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ তাঁর এই প্রিয় বান্দাকে ক্ষমা করুন।
দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর পার হয়ে গেল। আমি মাঝে মাঝেই তাঁকে দেখতে যাই। কখনো দিনে কখনো রাতে। কখনো একা কখনো বা মাওলানা মোজাম্মেল হক সাহেবকে সাথে নিয়ে। আমি কবরের পাশে দু'একটি ফুলের চারা লাগিয়েছিলাম। তাতে পাঁপড়ি মেলেছে। এবার যখন দেখতে গিয়েছিলাম তারা আমার চোখের পাঁপড়িতে অশ্রুর বন্যা এনে দিয়েছিল। গভীর রাতে আজিম পুরে গেলে দেখবেন লক্ষ তারার মেলা বসে। সেই লক্ষ-কোটি তারার মাঝে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব। তখন পনে পড়ে 'তোমার সমাধী ফুলে ফুলে ঢাকা, কে বলে আজ তুমি নেই, তুমি আছ মন বলে তাই।'

উপলব্ধি, জীবনযন্ত্রণা ও কর্মজীবন

আবদুল মান্নান তালিবের উপলব্ধি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ। সে উপলব্ধিতে তাড়িত হয়েই তিনি মাত্র তের বছর বয়সে দেশ ছেড়েছিলেন। ভেবেছিলেন মুসলমানদের যে স্বতন্ত্র আবাসভূমি হচ্ছে সেখানে গেলে অবশ্যই একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য কাজ করা সহজ হবে। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। তিনি তাঁর স্বপ্ন এগিয়ে নেয়ার জন্য কাজ শুরু করেন প্রথমে পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে, পরে অবশ্য চলে আসেন পূর্ব অংশে। এখানে এসে তিনি পরিপূর্ণভাবে কাজ শুরু করেন। তিনি প্রথমেই চিন্তা করেন, দু'শ' বছরের ইংরেজ শাসনের ফলে মুসলমানরা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হলে নিজস্ব সংস্কৃতির পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে আর সেই লক্ষ্যেই কাজ শুরু করেন আবদুল মান্নান তালিব। প্রথমেই তিনি কাজ শুরু করেন, 'জাহানে নও' পত্রিকায়। 'জাহানে নও' নামটাও কিন্তু তাঁরই দেয়া। 'জাহানে নও'-তে তিনি শেষ অবধি সম্পাদকের দায়িত্বেই

www.pathagar.com

ছিলেন। এটা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তিনি এ দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক কাজের শুধু সূচনাই করেননি, সেই সাথে সূচনা করেন একটি আন্দোলনের। সে আন্দোলন এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার আন্দোলন। এ দেশের ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট সবাই জানেন এবং অকপটে স্বীকার করেন, মরহুম আবদুল মান্নান তালিব এ আন্দোলনে অসমান্তরাল অবদান রেখে গেছেন। এই অবদান সূত্রেই তিনি বাংলাদেশে এখন অভিহিত হচ্ছেন 'বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রপথিক' অভিধায়।

এরপর তাঁকে 'মাসিক পৃথিবী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। তখন থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে তাঁকে প্রচলিত সাংবাদিকতার অর্গল ভাঙতে হয়েছে। প্রতি মাসে একটি করে পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি তিনি সময়ের চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে যখন যা দরকার, সাধ্যমতো তাই করেছেন।

আয়োজন করেছেন সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ের ওপর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও সাহিত্য সভার। এর বাইরে সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক বই প্রকাশ করে তা তুলে দিয়েছেন এক ঝাঁক তরুণ বিশ্বাসী পাঠকের হাতে। তার পর তিনি শুরু করেন, সাহিত্য পত্রিকা 'কলম' প্রকাশের কাজ। আসলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল স্বভাবজাত। তাই আমরা তাঁকে ছাত্রজীবনেও 'জিয়াউল ইসলাম' নামে বার্ষিকী সম্পাদনা করতে দেখেছি। তবে 'পৃথিবী' তাঁর এ ক্ষেত্রে সফল উদ্যোগ। কয়েক দশকেরও বেশি সময় ধরে এ পত্রিকাটি এ দেশের নিয়মিত, সর্বাধিক প্রচারিত ও সবচেয়ে প্রভাবশালী পাঠকপ্রিয় ইসলামী গবেষণামূলক মাসিক হওয়ার গৌরব নিয়ে আজও প্রকাশিত হয়ে আসছে। আর তাই এই চল্লিশ বছরের ইসলামী সংস্কৃতি অঙ্গনের মিছিলে অবধারিতভাবে উঠে আসে আল্লামা আবদুল মান্নান তালিবের নাম। তাই তো সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনের একদল কর্মীকে উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না— আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব কী করে গেছেন আর কী করতে প্রয়াসী ছিলেন!

অনেকেই দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেন, আবদুল মান্নান তালিব তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে অনেক ওপরে তুলে রেখে গেছেন। তিনি একজন ব্যক্তি মাত্র নন, একটি প্রতিষ্ঠান। একটি ইনস্টিটিউশন। এ ইনস্টিটিউশন কাজ করে গেছেন একটি মাত্র লক্ষ্য নিয়ে : এ জাতিকে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। আর এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতম হাতিয়ার করতে চেয়েছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতিকে। সেখানেই তিনি ছিলেন অনন্য এক প্রেরণাপুরুষ। ভাবলে অবাক হবেন, তিনি বিপরীত মেরুর কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, রাজনৈতিক নেতা, সর্বোপরি আমজনতার কাছে ইসলাম তথা ইসলামী সংস্কৃতির দাওয়াত পৌঁছে দিতে অভাবনীয় শ্রম, মেধা ও শক্তি ব্যয় করে গেছেন, যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই কবি আল মাহমুদ থেকে শুরু করে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ পর্যন্ত তাঁর গুণে মুগ্ধ। সাংবাদিক নূরুল আমীন থেকে রুহুল আমীন গাজী সকলেই তাঁর অনুগামী। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাঁদেরকে তিনি ইসলামের সুশীতল

www.pathagar.com

ছায়াতলে আনতে চেয়েছিলেন, তাঁদের তালিকা এতটাই দীর্ঘ যে, তা আজ আমাদের পক্ষে অনুমান করাও সত্যিই কষ্টসাধ্য। শুধুই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অবিরাম ছুটেছেন কারকুন বাড়ি লেন থেকে মেরাদিয়া, যাত্রাবাড়ি থেকে পল্লবী। নিজ উদ্যোগে নীরবে নিভৃতে ঢাকা থেকে একাই চলে গেছেন কুষ্টিয়ার অধ্যাপক আবু জাফরের বাড়িতে।

আবদুল মান্নান তালিবের কর্মময় জীবন শুরু হয় মূলত সাংবাদিকতার মাধ্যমে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিকসহ বহু পত্রিকার সম্পাদনার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। রচনা করেছেন মৌলিক গ্রন্থ, গবেষণা গ্রন্থ। বই সম্পাদনাও করেছেন প্রচুর। অনুবাদকর্মেও রয়েছে তাঁর বিরাট ভূমিকা। তিনি ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী ঢাকার রিসার্চ স্কলার ছিলেন ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। রিসার্চ স্কলার ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত। ১৯৮৭ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি দৈনিক সংগ্রামের শিশুদের পাতা, ফিচার পাতা ও বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারের 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ঐতিহ্যিক ধারার সাহিত্য আন্দোলনে আবদুল মান্নান তালিবের রয়েছে পথিকৃতের ভূমিকা। তিনি আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে একজন শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

যা হোক, তিনি জাতিকে যা দেবার দিয়ে গেছেন হৃদয় নিংড়ে। আজ জাতির কাছে সবকিছু চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে তিনি। তবে জাতি হিসেবে আমাদের উপর তাগিদ বর্তেছে তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান আর শ্রদ্ধা জানানোর। সেই সাথে তাগিদ আসে তাঁর অবদানের জাতীয় স্বীকৃতির। আমাদের জাতীয় নেতারা সে তাগিদে কিভাবে সাড়া দেবেন সেটাই এখন দেখার বিষয়।

লেখালেখি ও প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

মৌলিক গ্রন্থ : অবরুদ্ধ জীবনের কথা (১৯৬২), মুসলমানের প্রথম কাজ (১৯৭৫), বাংলাদেশে ইসলাম (১৯৭৯), ইসলামী সাহিত্য : মূল্যবোধ ও উপাদান (১৯৮৪), আমল আখলাক (১৯৮৬), ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন (১৯৮৭), ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ (১৯৮৮), সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষাঃ ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট (১৯৯১), ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন (১৯৯৪), সত্যের তরবারী ঝলসায় (২০০০), আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম (২০০১)।

শিশু কিশোর সাহিত্য : সহজ পড়া (১৯৮২), ছোটদের ইসলাম শিক্ষা ১ম ভাগ (১৯৮০), ২য় ভাগ (১৯৮১), ৩য় ভাগ (১৯৮২), ইসলাম শিক্ষা ১ম ভাগ (১৯৭৬), ২য় ভাগ (১৯৭৬), এসো জীবন গড়ি ১ম ভাগ (১৯৭৫), ২য় ভাগ (১৯৭৫), পড়তে পড়তে অনেক জানা (২০০০), মা আমার মা (২০০১), আমাদের প্রিয় নবী (১৯৭৫), মজার গল্প (১৯৭৬), কে রাজা (১৯৮১), হাতিসেনা কুপোকাত (১৯৯০), আদাবুল আরাবিয়া (১৯৮৪)।

www.pathagar.com

সম্পাদিত গ্রন্থ : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা (১৯৬৯), সহীহ্ আল বুখারী, ১ম খণ্ড (১৯৮২), সহীহ আল বুখারী ৩য় খণ্ড (১৯৯৬), রিয়াদুস সালেহীন ১ম খণ্ড (১৯৮৫), মুসলিম শরীফের মুকদ্দমা (১৯৮৬), নির্বাচিত গল্প (১৯৮৫), সত্য সমুজ্জ্বল (১৯৮১), রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড ও ৪র্থ খণ্ড (১৯৯৫-২০০৪)।

অনুবাদ সাহিত্য : খতমে নবুয়ত (১৯৬২,) পয়গামে মোহাম্মদী (১৯৬৭,) ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ (১৯৬৪), ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন (১৯৬৫), ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বীমা (১৯৬৬), ইসলামের সমাজ দর্শন (১৯৬৭), সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং (১৯৭৯), আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি (১৯৭৬), আত্মশুদ্ধি কিভাবে (১৯৭৬), ভাষাভিত্তিক সাংস্কৃতিক জাহেলিয়াত (১৯৭৫), ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি (১৯৬৮), মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী (১৯৮২), মহররমের শিক্ষা (১৯৭৭), ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী (১৯৭৫), কুরবানীর শিক্ষা (১৯৭৬), চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান (১৯৬৮), শাহাদাতে ইমাম হোসাইন (১৯৬৮), রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খণ্ড (১৯৯১), ৩য় খণ্ড (১৯৯১), যরবে কলিম (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৯৪), সীরাতে সরওয়ারে আলম ১ম খণ্ড (১৯৮১), রাসায়েল ও মাসায়েল ৩য় খণ্ড (১৯৯১), রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা ৩য় খণ্ড (১৯৯৪), রিয়াদুস সালেহীন ২য় খণ্ড (১৯৮৬), ৩য় খণ্ড (১৯৮৬), ৪র্থ খণ্ড (১৯৮৭), ইরান বিপ্লব একটি পর্যালোচনা (১৯৮২), সহীহ আল বুখারী ৪র্থ খণ্ড (১৯৮২), তাফহীমুল কুরআন ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৩তম ও ১৯তম খণ্ড (১৯৮৯-১৯৯৪), আবু দাউদ শরীফ ৭ম খণ্ড (১৯৯৫), মুসলমানকে যা জানতেই হবে (২০০০), ভারত যখন ভাঙলো (২০০২), প্রত্যয়ের সূর্যোদয় (২০০৩), অপরাজিত (২০০৩), ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি চক্রান্ত (২০০৬)।

সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা : সাময়িক পত্র 'জিয়াউল ইসলাম' সম্পাদনা (বার্ষিকী ১৯৫২, বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ), সহ-সম্পাদক, উর্দু দৈনিক 'রোজনামা তাসনীম' (লাহোর ১৯৫৭-৫৯), সহ-সম্পাদক 'দৈনিক ইত্তেহাদ' ঢাকা (১৯৫৯-৬০), সম্পাদক 'সাপ্তাহিক জাহানে নও' (১৯৬২-৬৬), সম্পাদক 'মাসিক পৃথিবী' (১৯৬৯-৭১ ও ১৯৮১-৯৯), ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, 'সাপ্তাহিক মীযান' (কলিকাতা ১৯৭৩-৭৫) সম্পাদক, 'ত্রৈমাসিক ও মাসিক কলম' (১৯৭৭-৯৪) সম্পাদক শাহীন শিবির, দৈনিক সংগ্রাম (১৯৭০-৭১), ১৯৮৩ থেকে দৈনিক সংগ্রামের কলামিস্ট ও ফিচার এডিটর হিসেবে ছিলেন। বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টারের 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। 'প্রতিশ্রুতি' ও 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ পরিষদ পত্রিকা' সম্পাদনা করেছেন কয়েকটি সংখ্যা।

পরবর্তী প্রজন্ম

আবদুল মান্নান তালিব পরবর্তী প্রজন্মের যাদের রেখে গেছেন তারা হলো বড় মেয়ে মাহফুজা সুলতানা, মোঃ নূরুল হুদা ১ম পুত্র, আব্দুল্লাহিল মাসুদ

www.pathagar.com

২য় পুত্র, আব্দুল্লাহিল মাহমুদ ৩য় পুত্র, আবদুর রহমান ৪র্থ পুত্র, আয়েশা সুলতানা ২য় কন্যা, আহমদ ইবরাহীম শামীম ৫ম পুত্র, মেহেরুন্নেছা ছোট মেয়ে ও আহমদ নাঈম ছোট ছেলে এবং নাতি-নাতনিরা হলো যথাক্রমে নুসরাত জামিলা, মোঃ রাশেদ হাসান চৌধুরী, ফারাহ দিবা (মৌমি), ফারহাত লামিসা (মাইশা), মালিহা মাসুদ (মাহী), হামিম তাহসীন (রাহী), নওমী নওশীন (সারা), নাওয়ার নওশীন (জারা), রবাব রাদিয়া রহমান, আমীম আহসান আজান, আদিল আদনান তিতুমীর ও তানজিল বখতিয়ার। এদের মধ্যে আব্দুল্লাহিল মাসুদ ও আয়েশা সুলতানা প্রতিশ্রুতশীল লেখক। তারা পিতার যথার্থ লেখক উত্তরসূরি।

অনেক কথার শেষ কথা

অনন্য একটি দেশের নাম বাংলাদেশ। এমন সুন্দর দেশ দুনিয়াতে বিরল। নিরস্ত্র অবস্থায় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেও মাত্র নয় মাসের মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে এ জাতি। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ প্রমাণ করে ছেড়েছে, এ জাতি আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করে না। বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো সারা বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে এ দেশের মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে টিকে আছে। এ জাতি সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে যে কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে সেই সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবই যেন আমাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে! কুসংস্কার, দুর্নীতি, অশিক্ষা, কুশিক্ষা এখনো আমাদের পেছনের দিকে টানছে। তার ফলে স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছর পরেও আমরা এখনো পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছি না। অথচ এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একটা পথ আমাদের জন্য সব সময় খোলা ছিল। তা হলো পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তোলা। তাহলে সৎ, যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ একটা জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতাম!

কিন্তু সে পথে আমরা পা রাখিনি। সেই পথ ধরে চলার দূরদর্শিতা আমরা দেখাতে পারিনি। ফলে আমাদের জাতীয় অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত মানে হয়নি। বিষয়টি যে কোনো সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিকের জন্য পীড়াদায়ক। তবে একজন মানুষ ছিলেন যিনি আমৃত্যু দেশ নিয়ে ভেবেছেন, দেশের মানুষ নিয়ে ভেবেছেন আর ভেবেছেন মুসলমানদের নিয়ে এবং কাজ করেছেন কিভাবে আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে মানুষের জন্য দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়। আর সেই মানুষটি ছিলেন লেখক, গবেষক, সম্পাদক, অনুবাদক, সর্বোপরি এ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের প্রাণপুরুষ আল্লামা আবদুল মান্নান তালিব রহ.। তাঁর সম্যক উপলব্ধি ছিল আর সব দেশ থেকে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশকে দ্রুত সামনে এগিয়ে নিতে হলে মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে সংস্কৃতি। তিনি জানতেন, যে জাতি যত বেশি সংস্কৃতিবান সে জাতি তত উন্নত।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিব একজন কিংবদন্তিতুল্য মানুষ। তিনি ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের একজন মহীরুহ। আবদুল মান্নান তালিবের তুলনা শুধু তিনি নিজেই। ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসার টানে তিনি দেশ ত্যাগ করেছেন, এই উদাহরণ এ যুগে বিরল। একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তাঁর এই অবিরাম পথ চলা। নারী, টাকা-পয়সা, খ্যাতি কোনো কিছুর মোহ তাঁকে কখনো টলাতে পারেনি। উপমহাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির পৌত্তলিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে যাঁরা একটি নবতর খালেছ ইসলামী সংস্কৃতির ধারা প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তাই তিনি প্রতিটি শব্দই লিখেছেন মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের মুক্তির জন্য। মহান আল্লাহ পরকালে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

আমীন!

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের

সর্বশেষ লেখা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি
ইতিহাসে বিরূপ প্রভাব

আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস সবকিছুর উপর মুশরিকিয়াত বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। কথাটা পুরোপুরি নেতিবাচক হয়ে যায়। মনে হতে পারে তাহলে আমাদের একান্ত নিজস্ব কি কিছুই নেই? না, একথা বলা এখানে উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমি যেকথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের আজকের পরিণতি। আমরা একটা অশান্ত, অপ্রিয়, বিরূপ পরিবেশে ঘেরাও হয়ে গেলাম কেমন করে? এতে আমাদের হিস্যা কতটুকু? আমরা কি সরল সোজা ভালো মানুষের মতো আজকের এ পরিবেশের শিকার হয়েছি?

আমরা মুসলমান একথা তো চিরন্তন সত্য। এটা তো কোনোক্রমে ভুলিয়ে দেবার নয়। দেশ যেমন আমাদের 'বাংলাদেশ' তেমনি 'ইসলাম'ও আমাদের আরেকটি দেশ। বাংলাদেশের সাথে ইসলাম এবং ইসলামের সাথে বাংলাদেশ একাত্ম হয়ে গেছে। দু'টোর কোনোটা বিচ্ছিন্ন একক নয়। দুয়ে মিলে একটি একক। বাংলাদেশের এই ভূখণ্ড অতিপ্রাচীন। সভ্যতার দেশ না হলেও মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা যুগের সভ্যতার সাথে তার যোগ আছে। তবে সপ্তম অষ্টম শতকে ইসলামের সংস্পর্শে এসেই বাংলাদেশের নতুন জন্ম হয়েছে। আর এটিই হচ্ছে আধুনিক ও অত্যাধুনিক বাংলাদেশ।

দুনিয়ার কোন্ দেশটি আছে তার নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন? মানুষ যখন পৃথিবীতে এসেছে তখন ধর্ম নিয়ে এসেছে। এমন নয় যে, ধর্ম আগে এসেছে তারপর মানুষ এসেছে, অথবা মানুষ আগে

www.pathagar.com

এসেছে এবং তারপর ধর্ম এসেছে অর্থাৎ মানুষ ধর্ম তৈরি করেনি, বরং মানুষ ও ধর্ম একই সাথে এসেছে। ধর্ম মানুষের প্রকৃতিগত, মানুষের ফিতরাত। মানুষের প্রতিটি প্রাণকোষে, প্রতিটি রক্তকণিকায়, প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে ধর্মের বীজ লুকিয়ে আছে। মানুষ একটি প্রকৃতিক জীব একথা কি একটি মানুষ অস্বীকার করতে পারবে? তার একটি প্রকৃতি আছে এবং প্রতিনিয়ত প্রতিটি কাজে তাকে পদে পদে তার সংগ দিতে হয়?

যেমন মানুষের দু'টো চোখ আছে। চোখ দিয়ে সে দেখে। মানুষ ইচ্ছা করলেই চোখ দিয়ে খাবার খেতে পারে না। মানুষের মুখের মধ্যে একটা জিভ আছে। জিভ দিয়ে সে কথা বলার কাজ করে। হাজার ইচ্ছা করলেও সে জিভ দিয়ে দেখার কাজ করতে পারে না। মানুষের মগজে চিন্তা করার জন্য এমন একটা ব্যবস্থাপনা আছে যা অতুলনীয় অকল্পনীয়। দেহের অন্য কোনো যন্ত্র বা অংশ দিয়ে এ ব্যবস্থাপনাটা সে গড়ে তুলতে পারে না। মানুষ অনেক কিছু করছে কিন্তু এই অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনাটা গড়ে তোলা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। মানুষ রোবট তথা যন্ত্রমানব তৈরি করতে পারে, কিন্তু একটা প্রাকৃতিক মানুষ তৈরি করতে পারে না, যার মধ্যে একটি প্রকৃতি আছে এবং যার দেহাবয়রের প্রতিটি কোষে আছে প্রাণপ্রবাহ। এটাই মানুষের ধর্ম। এ ধর্ম অস্বীকার করার নয়। আমরা প্রকৃতিকে স্বীকার করি অথচ ধর্মকে অস্বীকার করি। এটা কেমন কথা? মানুষের প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিলে মানুষের ধর্মকে অস্বীকার করার যুক্তি থাকে কোথায়? কারণ প্রকৃতি যেমন এক তেমনি ধর্মও এক ও অভিন্ন। তবে মানুষ তাকে বিভিন্ন করে নিয়েছে। এটা মানুষের স্বার্থ, প্রকৃতি নয়।

প্রকৃতি হচ্ছে, আল্লাহ প্রত্যেক মানব শিশুকে তার ইসলামী তথা আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন। তারপর তার বাপ-মা তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাঠগড়ায় তাকে বলিদান করে। নিজের স্বার্থ অনুযায়ী কেউ তাকে বানোয়াট ইহুদি-খৃস্টান ও অন্যান্য মুশরিকী ধর্মের অনুসারী করে। আবার নাস্তিক্যবাদের প্রচারমাত্রায় অনুপ্রাণিত হয়ে কেউ তার স্রষ্টাকেই অস্বীকার করে বসে। কিন্তু তাদের সবার ভেতরের প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতে যেমন বীজের অংকুরোদ্গম হয় তেমনি বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত কোনো এক অস্বাভাবিক আকস্মিক মুহূর্তে তাদের মধ্যেও জেগে উঠতে পারে ভেতরের ঘুমন্ত আনুগত্যশীল সত্তা।

আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা একটি আদর্শিক ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী জাতি হিসাবে হাজার বছর ধরে এ ভূখণ্ডে টিকে আছি। হাজারো ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের আদর্শ ও ঐতিহ্য বিসর্জন দিইনি। আমাদের মধ্যে অনেক বেঈমান, মীরজাফর, মীরসাদেক, বিভীষণ ও কুইসালিং-এর জন্ম হয়েছে। কিন্তু কালের প্রবাহে তারা অন্তরীণে বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে মুশরিকিয়াতের অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও ক্ষমতায় অন্য কাউকে শরীক করা তথা অংশীদার বানানো। আল্লাহর একক ও অভিন্ন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে অন্য কারোর অনুপ্রবেশ আমাদের তৌহিদী পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত করে

www.pathagar.com

দিয়েছে। বিগত সাত-আটশো বছরের মুসলমানদের সাহিত্য পরিবেশ মাঝে মধ্যে এ অযাচিত অনুপ্রবেশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমাদের অগ্রজ সাহিত্যিকরা শুরু থেকেই একটা বিধ্বস্ত পরিবেশ পেয়েছেন। আরবের সাহিত্যের তুলনায় ইরানের সাহিত্য তাদেরকে বেশি করে আকৃষ্ট করেছে। এদেশে তের-চৌদ্দ শতকের মুসলমানদের সাহিত্য চর্চার যুগ থেকে দেখা যায় আরবের তৌহিদী মনন এদেশে ইরানী ও তুর্কী মরমিবাদী মননের মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়েছে। রুমী, জামী ও সাদীরাই ছিলেন এদেশের সাহিত্যিকদের আদর্শ ও প্রাণপুরুষ। হযরত আলী রা., আয়েশা রা. ও সাবা মুআল্লাকার কবিতার চর্চা খুব কমই হয়েছে এখানে। আমাদের কবিতায় হামদ ও নাত এখনো একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটা যেন একটা ধর্মীয় আদর্শে পরিণত হয়েছে। আধুনিক কালে এটাকে আবার ভক্তিবাদ নাম দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে যে জীবনধর্মিতা ও জীবনবিশ্লেষণ এবং জীবন পরিণতির বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া হয়নি। আমাদের কবি যখন বলেন—

'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল
মিঠা নদীর পানি
খোদা, তোমার মেহেরবানী।'

তখন আমরা ভাবি সমুদ্রের অতলান্ত লবণাক্ত পানির তুলনায় আল্লাহ এই নদীর পানিকে মিঠা করে দিয়েছেন আমাদের জীবন নির্বাহ করার জন্য। বৃক্ষকে ফলে ফুলে সজ্জিত সুশোভিত করে আল্লাহ আমাদের বাঁচার ও জীবন চর্চার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ পৃথিবীতে আমাদের পাঠিয়েছেন সেই সংগে বেঁচে থাকার পরিবেশ ও উপকরণ তৈরি করে দিয়েছেন। এটা একটা জীবন দর্শন— যা সবদিক দিয়ে আল্লাহর প্রতি সমর্পিত। একথা ভুলে গিয়ে আমরা আর এক জীবন দর্শনের চর্চা শুরু করে দিয়েছি যেখানে আল্লাহর অস্তিত্বই গৌণ বা নাস্তি।

ফলে পার্শ্ববর্তী বিশাল সমুদ্রের বিপুল জলরাশির মতো অতলস্পর্শী মুশরিকিয়াত আমাদের সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তৌহিদ ও শিরক একাকার হয়ে গেছে। গোরক্ষবিজয় ও সত্যপীরের গোলকধাঁধায় আমাদের সাহিত্যের একটা অংশ পথ হারিয়ে ফেলেছে। তবে কবি সৈয়দ সুলতানের মতে সত্যাশ্রয়ীরা সর্বত্র সচেতন ও সোচ্চার থেকেছেন এবং 'গোঙাইয়ে' ফিরেছেন—

'লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবিন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি।
হিন্দু মোছলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রছুলের কথা কেহ না সোঙরে।
গ্রহ শত রস জোগে অব্দ গোঙাইল
দেশী ভাসে এই কথা কেহ না কহিল।'

সরকারী সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই তারা মুশরিকিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তৌহিদী ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শাসকদের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে রাজনীতিই হয় প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে শিরকের সাথে তারা আপোস করে নেন। মুশরিকিয়াতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এভাবে চলছে আমাদের পথ চলা। তৌহিদী, মুসলিম ও ইসলামী ধারা দুর্বল হলেও শুরু থেকেই মাথা উঁচু করে চলে আসছে এবং আধুনিক যুগে নজরুল, ফররুখ, মতিউর রহমান মল্লিক পর্যন্ত আমাদেরকে বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। তবে বর্তমানে সেক্যুলারবাদের নামে নব্য মুশরিকিয়াত প্রাচ্য ও প্রতিচীর উভয় দরোজা দিয়ে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের গৃহে প্রবেশের নতুন নতুন কৌশল নিয়ে এগিয়ে আসছে।

এজন্য আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা-ইতিহাস-ঐতিহ্য সচেতন হতে হবে এবং নতুন প্রজন্মকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। মুসলিম সাহিত্যিকদের দায়িত্ব তাই এক্ষেত্রে অপরিসীম।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের

অগ্রন্থিত লেখা থেকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাঙলা বাংলাদেশী মুসলমান হিন্দু সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক

কেবল তত্ত্বকথাই নয়, জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ববহ এ শব্দগুলো, বিশেষ করে সাহিত্য অঙ্গনে যথেচ্ছ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যবহারের কারণে এগুলোর মধ্যে অনেক প্রকার অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষকে সঠিক দিক নির্ণায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলে এই দুর্বোধ্যতা ও জটিলতার অবসান দরকার।

বাঙালী শব্দটা বংগ, বাংগালা ও বাংলা এর সাথে জড়িত। বর্তমানে যে এলাকায় আমাদের বসবাস, মুসলমান আমলেই সর্বপ্রথম এ এলাকাটা 'বাংগালা' নামে চিহ্নিত ও পরিচিত হয়। মুসলমানরাই প্রথম বাংলা ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করে, অথচ সে যুগে আরবী ও ফারসী সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পরিচালকের আসন দখল করেছিল। মুসলিম শাসকরা চাইলে সেই সাহিত্যের চর্চা এখানে করতে পারতো। তাদের জন্য সেটাই হতো স্বাভাবিক ও সহজ। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা পূর্ববর্তী হিন্দু শাসকদের নির্যাতন থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে উদ্ধার করে। সংস্কৃতের যূপকাষ্ঠ থেকে তার কল্লাটা বের করে আনে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য স্বাভাবিক পরিবেশে তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। এদেশের মুসলমান, বর্ণহিন্দু এবং অন্ত্যজ- শূদ্র, ডোম ও চাঁড়ালদের মন থেকেও দূর করে দেয় রৌরব নরকের ভয়। সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে বাংলা সাহিত্য চর্চায়।

www.pathagar.com

এটা ছিল মুসলমানদের দায়িত্ব। কারণ তারা সকাল-সন্ধ্যায় কুরআন পড়তোঃ খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান অর্থাৎ 'আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন' এই সংগে তাকে মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাও শিখিয়েছেন। কাজেই মাতৃভাষা মায়ের ভাষা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যায় না। তাই দেশের শাসনভার গ্রহণ করেই মুসলমানরা মজলুম বাংলা ভাষাকে উদ্ধার করলো। বাংলা সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করে নতুন জীবন দান করলো। এই মুসলমানরা তো সাম্প্রদায়িক হতে পারে না! হ্যাঁ, সাম্প্রদায়িক হচ্ছে এদেশীয় ঐ সংকীর্ণমনা গোষ্ঠী যারা নিজের বা এদেশের জনমানুষের মুখের ভাষার গলা টিপে ধরে অপ্রচলিত ও অব্যবহৃত সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চায় এখানে মেতে উঠেছিল এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চাকে দণ্ডনীয় অপরাধে পরিণত করেছিল যার ফলে বাংলাভাষী কবি-সাহিত্যিকরা গোপনে তাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন। ফলে দেশের আনাচে কানাচে কোথাও তাদের সাহিত্যকর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়নি, বরং তা পাওয়ার জন্য আমাদের সুদূর হিমালয় পর্বতে যেতে হয়েছে। পর্বতের পাদদেশে নিভৃত শান্ত অবিদ্বিষ্ট পরিবেশে নেপাল রাজ্যে ধরনা দিতে হয়েছে। হীনমন্য সংকীর্ণমনা সম্প্রদায়, বিশেষ করে সব সময় ভাষা ও সাহিত্যকে নিজেদের কব্জায় ও কর্তৃত্বের অধীনে রাখতে চেয়েছে। এরাই সাম্প্রদায়িক। যারা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্প্রদায় বিশেষের কব্জা থেকে ছিনিয়ে এনে আমজনতা অর্থাৎ যাদের সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিয়েছে তারা সাম্প্রদায়িক হতে যাবে কেন?

আর এই হীন সংকীর্ণমনা সম্প্রদায়, বিশেষ করে যদি বাঙালী হতো তাহলে অবশ্য তারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতো। আসলে তারা বাঙালী নয়, বাঙালীর ছদ্মবেশধারী। তাই প্রথম সুযোগেই ১৮৫৭ সালে ইংরেজ বেনিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত, বিধ্বস্ত ও সর্বস্বান্ত অবস্থা দেখে তারা নিজেদের সংকীর্ণ সম্প্রদায় বিশেষের আদর্শ, ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এজন্য একটা অ-বাংলা ভাষার আশ্রয় নিয়েছে। বিদেশী বেনিয়ার সাথে যোগসাজশে মৃত সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্প্রদায় বিশেষের ছাঁচে ঢালাই করেছে। এখন দাবী করছে এতে মুসলমানরা নিজেদের ভাবধারা ও আদর্শের প্রতিফলন করতে চাইলে সেটা হয় সাম্প্রদায়িক। এই হচ্ছে এদের সাম্প্রদায়িক, অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালীপনার রহস্য।

একটা ক্ষুদ্রাংশ বিদেশ থেকে এলেও মুসলমানরা এদেশেরই অধিবাসী। আর 'সম্প্রদায় বিশেষে'র পূর্বপুরুষরাও বিদেশাগত। এক সময় এদেশে তাদের মাতৃভূমি পিতৃভূমি ছিল না। এক দেশ থেকে তারা আরেক দেশে এসেছে। এ প্রক্রিয়া মানুষ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে চলছে। এখনো অব্যাহত আছে বিশ্বব্যাপী এ ইমিগ্রেশান। পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে মানুষ জন্মভূমি ত্যাগ করে। অন্য জায়গায় অন্য দেশে অন্য পরিবেশে আলয় ও আবাস গড়ে তোলে জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও গতিশীল করার জন্য। কাজেই কাদের শেকড় কত গভীরে আছে এটা বড় কথা নয়, বরং কে কতটা দেশকে ও দেশের পরিবেশকে আপন করে নিতে ও সমৃদ্ধ

www.pathagar.com

করতে পেরেছে সেটাই আসল কথা। বাঙলার মুসলমানদের যারা ভিন দেশ থেকে এসেছে এবং যারা এদেশের সন্তান তারা সবাই একযোগে এদেশকে সমৃদ্ধ করেছে। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনের সমগ্র কাঠামো তৈরি হয়। এ বিশ্বাস জীবনকে পরিচালিত করে। যারা সততা, নিষ্ঠা ও সক্ষমতার সাথে এ বিশ্বাসের আলোয় জীবন পথের সমস্ত অন্ধকার দূর করে তারা সফল মানবিক জীবন যাপন করে। তাদেরকে আমরা সাম্প্রদায়িক বলতে পারি না। আর যারা এ বিশ্বাসে জীবনকে সিক্ত করেনি বা কোনো স্থির বিশ্বাসের সাথে জীবনকে বেঁধে দেয়নি তাদেরকে আমরা অসাম্প্রদায়িক আখ্যা দিতে পারি না।

কারণ সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক কথা দু'টি বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনকে যারা ভগবানের আশীর্বাদ ও কৃপা মনে করছিল ১৮৫৭ সালে মুসলমানদের উপর ইংরেজের ক্রোধ নেমে আসায় তারা ফোর্ট উইলিয়ামী চক্রান্তের মাধ্যমে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক এবং তার আগে থেকে চলে আসা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে তাকে নিজেদের সম্প্রদায় বিশেষের ধাঁচে গড়ে তোলার যে সফল চক্রান্ত চালিয়েছিল তারই জঠর থেকে সাম্প্রদায়িক শব্দটির উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। নয়তো ইতিপূর্বে মুসলমানরা ম্লেচ্ছ, যবন, নেড়ে, পাতনেড়ে ইত্যাদি বিশেষ সাম্প্রদায়িক 'শ্রুতিমধুর' শব্দ দ্বারা কখনো বিশেষিত হয়নি। এইসব এবং আরো অনেক 'শ্রুতিমধুর' বিশেষণকে এই সাম্প্রদায়িক শব্দটির মধ্যে ভরে দেয়া হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ামী চক্রান্তের সফল বাস্তবায়নের পরে বাংলা সাহিত্য যে নতুন আকৃতি লাভ করে সেখানে মুসলমানদের প্রবেশ অনেক পরে হয়েছে। ঐসব সংস্কৃতপীড়িত ও সংস্কৃততাড়িত শব্দসম্ভার রপ্ত করতে মুসলিম লেখকদের যথেষ্ট সময় লাগে। তাদের কাছে এবং বাংলার সমগ্র জনপদের অধিবাসীদের কাছে এটা ছিল সম্পূর্ণ একটা নতুন ও বজ্রকঠিন শব্দসম্বলিত ভাষা। তা কানের সাথে সাথে তাদের মনকেও পীড়া দিতো। যা হোক ইংরেজের পরাধীনতা ও প্রতিবেশী সংকীর্ণমনা বিশেষ সম্প্রদায়ের চক্রান্তের শেকড়ে আবদ্ধ মুসলিম লেখকরা এ ভাষার কাছে এক সময় নতি স্বীকার করে। তাদেরকে কোণঠাসা করার জন্য তাদের নিজস্ব চিন্তা-মানসিকতা ও তার সাথে জড়িত শব্দসম্ভারকে সব সময় 'সাম্প্রদায়িক' ও 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দের হুল ফোটানো হয়েছে। এ এলাকায় মুসলমানদের স্বাধীন রাজ্য কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদের এ প্রচেষ্টার বিরাম হয়নি। তবে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুসলমানদেরকে আর দুর্বল প্রতিপক্ষ ভাবতে তারা পারছিল না।

মুসলমানদের মধ্যে বর্ণভেদ শ্রেণীভেদ নেই। তাদের বাইরের সকল মানুষকেও তারা একই দৃষ্টিতে দেখে। সবাইকে একই বাবা আদম ও মা হাওয়ার সন্তান মনে করে। মর্যাদার ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। আল্লাহর দুনিয়ায় মানুষকে তারা আশরাফুল মাখলুকাত– সৃষ্টির সেরা মনে করে।

মুসলমানদের সাহিত্য চর্চায় তাদের এই আদর্শের প্রতিফলন ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। আর এই স্বাভাবিকতা বাংলা সাহিত্যের গতিধারাই

www.pathagar.com

পাল্টে দিয়েছে। ধর্মের প্রভাব সাহিত্যের উপর এক্ষেত্রে একটি অনস্বীকার্য সত্য। কারণ মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম কেবল ধর্মমাত্র নয়, বরং একটি জীবনদর্শন ও জীবনবোধ। জীবনের তাগিদে মুসলমানদের এ ধর্মের বিধান মেনে চলতে হয়। জীবনের তাগিদে মুসলমানদের এ বিধানের আওতায় জীবন গড়ে তুলতে হয়। আর এ বিধান যেমন মুসলমানদের জন্য তেমনি সমগ্র মানবতার জন্য সমানভাবে প্রযুক্ত। এ বিধান মেনে নেয়ার কারণে মুসলমানরা কোথাও কোনো জুলুম ও অন্যায়ে আবিষ্ট হয়নি।

তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিগত আটশো বছরের ইতিহাসে মুসলিম কবি- সাহিত্যিকদের কোনো রচনাই ভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি কোনো প্রকার কটাক্ষ, আক্রোশ বা বিদ্বেষ দোষে দুষ্ট নয়। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা উন্নত মানের ফরাসী সাহিত্যের সাথে সাথে স্থানীয় হিন্দি সাহিত্যেরও চর্চা করছেন। এদেশীয় কবি-লেখকদেরকেও তারা সমান মর্যাদা দিয়েছেন। মুসলিম শাসকগণ রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করিয়েছেন খ্যাতিমান হিন্দু কবি ও পণ্ডিত কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস ওঝা দ্বারা। এটাই তাদের সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রমাণ। মধ্যযুগের কথা বাদ দিলেও আজকের উনিশ-বিশ-একুশ শতকের অত্যাধুনিক যুগেও বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা কোনো একদেশদর্শী সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। তাদের সাহিত্যে এক সম্প্রদায় বিশেষের কথা বলে অন্য সম্প্রদায়কে হেয় করা হয়নি। সাহিত্যে তারা মানবতাবাদেরই প্রবক্তা। মানুষ সে যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, তাকেই বড় করে দেখা হয়েছে। তার ধর্ম, তার সম্প্রদায়কে খাটো করা হয়নি। মুসলমানদের লেখা বাংলা কবিতায় ও কথা সাহিত্যে মানুষের কথা বলা হয়েছে, মানবতার কথা বলা হয়েছে। কেবল সম্প্রদায় বিশেষের কথা বলা হয়নি।

কাজেই সাহিত্য অঙ্গনে সাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রদায়িকতা শব্দ মুসলমানদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসত্য। সাহিত্যে জাতীয় ভাবধারা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে, এটাই সাহিত্য। কারণ এটা মানুষ ও মানুষের সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট। সাহিত্যিক যে মানুষকে জানে এবং যে সমাজকে চেনে এটা তারই প্রতিচ্ছবি। এখানে মুসলমান-অমুসলমানের কোনো পার্থক্যবোধ নেই। আমাদের সাহিত্যে আমরা এ ধরনের সংকীর্ণবোধ ও বিচার-বুদ্ধির লালন করতে পারি না।

www.pathagar.com

কুরআনের
সাহিত্য উপাদান

কুরআনকে আমরা আল্লাহর কিতাব বলে জানি ও মানি অর্থাৎ আমরা জানি কুরআনে আমাদের জন্য রয়েছে জীবনে চলার দিকনির্দেশনা ও পথনির্দেশ। কুরআনের কথা আমরা এত বলি ও শুনি যে, কুরআন প্রায় আমাদের আকিদার মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। প্রতিদিন আমরা নামাযে কুরআন পড়ি। আবার রমযানে সারা মাস ধরে তারাবিহতে কুরআন খতম করি। এছাড়াও প্রতিদিন অনেকে নির্দিষ্ট সময়ে কুরআন তেলাওয়াত করে। এখনো মুসলমানরা কোনো সভা-সমিতি, সমাবেশ, আলোচনা সভাতে একত্র হলে কুরআন তেলাওয়াত দিয়েই শুরু করে। আবার তার অনুবাদও শুনানো হয়। এগুলো নিশ্চয়ই কেবল বরকতের জন্য নয়। সেখান থেকে দিকনির্দেশনা ও প্রেরণা লাভেরও উদ্দেশ্য থাকে।

তারপর রয়েছে কুরআনের অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় এবং তার তাফসীর ও ব্যাখ্যা। এটা চলছে হাজার বছর থেকে। প্রতি যুগে এই তাফসীরগুলোর মধ্যে নতুন নতুন ভাষ্য আসছে। এই ভাষ্যগুলো মুসলমানদেরকে চলমান জীবন ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে পৃথিবীর সঠিক পথ পরিক্রমায় সাহায্য করছে।

বুঝা গেলো জীবনের সব ক্ষেত্রে পথ নির্দেশনার জন্য আমরা কুরআনের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক নীতি নির্দেশনা, রাজনৈতিক বিধি-বিধান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আমরা কুরআনের দিকে তাকাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর থেকে একশো বছরের মধ্যে তিনটি মহাদেশ এশিয়া, আফ্রিকা ও

www.pathagar.com

ইউরোপের বৃহত্তম এলাকায় মুসলমানদের শাসন তথা কুরআনের বিধান ছড়িয়ে পড়ে। বিগত শতকের প্রথমদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্তও পৃথিবীর একটা অংশের উপর মুসলমানদের শাসন ছিল। এভাবে বলা যায় কিছুকাল আগেও পুরাতনের ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর একটা অংশের উপর কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে মুসলমানরা আবার কুরআনের দিকে ফিরে যেতে চাচ্ছে। কুরআন থেকে জীবনের সবক্ষেত্রে অনুশাসন গ্রহণ করতে চাচ্ছে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতো সাহিত্য আমাদের জীবনের একটি ক্ষেত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সভ্যতার পরিমাপ করা হয়। কোন জাতি কতটা সুসভ্য তার সাহিত্য পাঠ করলে তা অনুমান করা যায়।

কুরআন একটি উন্নত পর্যায়ের সাহিত্যের মাধ্যমে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। কুরআনের সাহিত্যধারা এত উচ্চ পর্যায়ের যে, তা সেকাল থেকে একাল এবং আগামীকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকেও চ্যালেঞ্জ করছে তার মতো দু'টি ছত্র রচনা করে আনার জন্য। এছাড়াও কুরআনে সাহিত্যের দিকনির্দেশনাও আছে। সূরা আশ্‌ শুআরার শেষের আয়াতগুলোতে বিভিন্ন বিভ্রান্ত মতবাদ আশ্রয়ী সাহিত্যের অনুগামিতাকে নিষেধ করা হয়েছে। এক আল্লাহে বিশ্বাসী, সৎকর্মশীল, বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণকারী ও জুলুমের প্রতিবিধানকারী তথা ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যধারাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

সাহিত্যের এই দিকনির্দেশনা ছাড়াও আমরা কুরআন থেকে সাহিত্যের বহু উপাদান সংগ্রহ করতে পারি। এজন্য প্রথমে আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হতে হবে। সাহিত্য কি? সাহিত্য কোনো জীবনের দিকনির্দেশনা নয়। দিকনির্দেশনা দেবার ক্ষমতা সাহিত্যের নেই। সুস্পষ্ট চিন্তাধারার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে সাহিত্য হচ্ছে সে জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি যেগুলো সাধারণ অবস্থায়ও অসাধারণ হয়ে ওঠে। একজন দরিদ্র ও একজন ধনী জীবনকে একই দৃষ্টিতে দেখে না। দু'জনের জীবনধারার মতো দৃষ্টিভংগীর মধ্যে বিরাট ফারাক দেখা যাবে। আবার একজন ইসলামী আদর্শবাদী ও আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ ধনী ও দরিদ্রের জীবনদৃষ্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না, যেহেতু তাদের চিন্তা ও বিশ্বাস একই উৎস থেকে উৎসারিত এবং আনুগত্য একই সত্তার প্রতি নিবেদিত। তাই জীবনের ঘটনাবলীকে তারা অব্যাহত শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিতে বিচার করে না। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরকালীন পরিণতির দৃষ্টিতে বিচার করে তারা জীবনপথে এগিয়ে চলে। সেখানে দরিদ্র-ধনীর ভেদাভেদ মুখ্য নয়। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি উভয়েই নির্ভরশীল এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উভয়ই সমান যত্নশীল। এক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম নয়, ঈমানই মানুষের সমাজের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। বিষয়টাকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে : একজন মুসলমানের (পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে মুসলমান বলতে হচ্ছে কিন্তু আসলে মুসলমান না বলে মুমিন বললে মানায় বেশি) জীবন এবং একজন অমুসলমানের জীবন

www.pathagar.com

এবং একজন অমুসলমানের জীবন, একজন মুসলমানের অনুভূতি এবং একজন অমুসলমানের অনুভূতি। অন্যদিকে সমাজে একজন দরিদ্র ও একজন ধনী থাকলেও মুসলিম সমাজে এই ধনী ও দরিদ্রের অনুভূতির মধ্যে গরমিলের চাইতে মিলই বেশি। অন্যদিকে অমুসলিম সমাজে তাদের অনুভূতির পার্থক্যের মধ্যে প্রকৃতির কোন অবদান নেই। যা আছে তা তাদের নিজের হাতে গড়া। মুসলিম সমাজে তাদের অর্থনৈতিক বৈষম্যটা বড় আকারে দেখা দেয় না। কারণ তারা উভয়ে উভয়ের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়। তারা উভয়ে মনে করে তাদের মধ্যকার অর্থনৈতিক অক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় তাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। ধনীর ধনের প্রাচুর্য নিজের একচ্ছত্র উপভোগ করার জন্য নয়, বরং এতে গরীবের ও বঞ্চিতের হক রয়েছে এবং এ হক তাকে পুরোপুরি আদায় করতে হবে। এ হক আদায় করার জন্য যেমন ইসলামী ব্যবস্থা ও অনুশাসন তাকে সাহায্য করে তেমনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, তাঁকে সন্তুষ্ট করা এবং পরকালীন সাফল্যের প্রেরণাও তাকে উদ্বুদ্ধ করে। ধনী ও গরীব পরস্পরের প্রতি যুদ্ধংদেহী মূর্তিতে সেখানে আবির্ভূত হয় না। সমাজকে অর্থনৈতিক সংঘাতের মুখোমুখি করার লক্ষ সেখানে থাকে না, বরং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব পালন করে এবং একে অন্যের হক আদায় করে। বড় ছোটর অনুভূতি সেখানে সৃষ্টি হয় না, ধনী গরীবকে অর্থ দেয় না, বরং ধনী তার কাছে পাওনা গরীবের অর্থ দেয় রাষ্ট্রকে এবং রাষ্ট্র সেখান থেকে প্রত্যেক গরীব ও বঞ্চিতের প্রাপ্য অর্থ তাকে দেয়, সহানুভূতি ও দয়ার ভিক্ষা হিসাবে নয়, বরং বঞ্চিতের প্রাপ্য হিসেবেই।

এভাবে প্রাণ সংহরণকারী ক্ষতিকর অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকৃতির উপাদান নয়, প্রকৃতির মধ্যে এর চিরস্থায়ী অবস্থান নেই, বরং নিজেদের মনগড়া মতাদর্শের ভিত্তিতে স্বাধীন জীবন যাপনকারী মানুষের স্বার্থ বুদ্ধি একে প্রকৃতিতে এমনভাবে প্রতিস্থাপন করে যেন এটা তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে যায়। কুরআনে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির বর্ণনা এসেছে তা অতিপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নিয়ে এ যুগের প্রান্তসীমাও স্পর্শ করেছে। একক মানুষ আদম এবং হাওয়া থেকে শুরু করলে দেখা যায় তাঁরা তাঁদের পরিবেশ ও পরবর্তী বংশধরদের সমাজ গঠনে যে সহায়তা দিয়েছেন তার মূলে কোনো দ্বান্দ্বিক বিষয় নেই, বরং আছে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য। এভাবে ব্যাবিলন, নিনেভা, মিসর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার মূলে রয়েছে আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং আল্লাহর বিধান না মেনে অন্য কোনো জাগতিক বা তথাকথিত আধিভৌতিক শক্তির বিধান মেনে চলার দ্বন্দ্ব। সভ্যতার প্রতি স্তরে নবীরাই সমাজ গঠন করেছেন। তাঁরাই ছিলেন সমাজপতি, সমাজের পরিচালক। আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে হযরত নূহের সমাজে যে পচন ধরেছিল এবং সমগ্র জনসমষ্টি সত্য ও আল্লাহপ্রদত্ত স্বাভাবিক জীবন যাপনের বিরুদ্ধে যেভাবে মারমুখী হয়ে উঠেছিল, তাকে ধ্বংস করা ছাড়া মানবতার এই পতন রোধ করার আর কোনো পথ ছিল না বলেই আল্লাহ মহাপ্লাবনের মাধ্যমে তাকে উচ্ছেদ করেছিলেন। তারপর হযরত নূহ এবং

www.pathagar.com

তাঁর অনুসারীরা আল্লাহর আনুগত্যভিত্তিক নতুন সমাজ ও নতুন মানব বসতি স্থাপন করেছিলেন। সে বসতি বিস্তৃত হয়েছিল বিশ্বময়। জীবনের তাগিদে তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল জীবিকা, পেশা ও কর্মধারা। মেধা ও শ্রমের ভিত্তিতে তারা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য থেকে যখনই সরে গিয়েছিল তখনই নেমে এসেছিল আবার বিপর্যয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এমন দারিদ্র আছে যা মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়।' কাজেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সেই দারিদ্র থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি।

আজকের দিনে আমরা যে নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় দেখি এটাও আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করার প্রত্যক্ষ ফল। এভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার এবং ঈমান না আনার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফল আজো অব্যাহত আছে। এটাই মানব সমাজের সঠিক চিত্র এবং আমাদের সাহিত্য এ চিত্রেরই প্রতিচিত্র।

এজন্য সাহিত্যকে বলা হয় জীবনের প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছায়া, যার ভেতর দিয়ে সমাজের মানুষেরা নিজেদের সঠিকভাবে চিনে নিতে পারে যে তারা আল্লাহর সৃষ্টি এবং স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁরই বান্দা। একজন বিদ্রোহী আত্মা হবার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি অনুগত মানুষ হবার মধ্যে মানুষ খোঁজে তার সার্থকতা। নতুন ও আগামী প্রজন্মের কাছে মানুষ এটাই চায়। মানুষ চায় না তার পরবর্তী বংশধররা বুদ্ধির বৈকল্যে আক্রান্ত হয়ে চিন্তা ও বিশ্বাসের শূন্যতায় আচ্ছন্ন হোক। তারা যেমন সুস্থ ও সঠিক চিন্তা-বিশ্বাসের আলোকে নিজেদের হৃদয়-মনকে উদ্ভাসিত করেছে তার বংশধরদের মনও তেমনি আলোকিত হবে। তারা কোনো কাল্পনিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করবে না। কুরআনের সূরা আল বাকারার ১৩৩ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'আম্ কুন্‌তুম শুহাদাআ ইয্ হাদারা ই'য়াকুবাল মাউত?...' 'ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল, তখন তোমরা কি সেখানে ছিলে? যখন সে তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলো, আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বললো, আমরা সেই এক ও অভিন্ন ইলাহর ইবাদত করবো যাকে আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহ হিসাবে মেনে এসেছেন আর আমরা তাঁরই অনুগত ও মুসলিম।'

হযরত ইয়াকুব ছিলেন আল্লাহর একজন শ্রেষ্ঠ নবী। ইসরাঈলী বংশধারার উদ্ভব সেখান থেকেই। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার সময় যে প্রজন্ম রেখে যাচ্ছিলেন তার মধ্যে দেখতে চাচ্ছিলেন সত্য পথপ্রাপ্ত তাঁর পূর্বসূরীদের প্রতিচ্ছবি। সে পূর্বসূরীরা ছিলেন ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক প্রমুখ আল্লাহর সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ। এখানে এক 'অভিন্ন ইলাহ' এবং তাঁর আনুগত্যভিত্তিক জীবনধারাকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। এই 'অভিন্ন আনুগত্যভিত্তিক' জীবনধারা প্রত্যেক নবীর বৈশিষ্ট ছিল। এটি আজকেরও একক জীবনধারা। যারা এ জীবনধারা গ্রহণ করে তারা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন

www.pathagar.com

সমাজে বিভিন্ন পরিবেশে বিশিষ্টতা অর্জন করে। তারা বিশিষ্ট সাহিত্যধারার জন্ম দেয়। সে সাহিত্যে ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, অবিচার ও সুবিচার, দুষ্কৃতি ও সুকৃতি পৃথক রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যেহেতু জীবন এখানে একক ইলাহর অনুগত তাই একক ইলাহর আনুগত্যের বাইরে এ সাহিত্যের নতুন পরিচিতি নেই। একক ইলাহর একচ্ছত্র বিধানের আওতায় এখানে জীবন পরিচালিত ও গঠিত। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবকিছুকে নিয়ে এখানে মানুষের জীবন। এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবিক উদ্যোগ সমান তালে এগিয়ে চলে। প্রকৃতির কোনোটা আরোপিত নয়। মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন সহজ ও সুন্দর করে তোলার জন্য প্রকৃতি মানুষের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানুষ ভালো-মন্দ যেমন করে চায় তার জীবন গড়ে তুলতে পারে। মানুষ ভালো করে জীবন গড়তে চায়, প্রকৃতি চাপ দিয়ে তাকে মন্দের দিকে নিয়ে যাবে না। মানুষও মন্দ করে জীবন গড়তে চায়, প্রকৃতি চাপ দিয়ে তাকে ভালোর দিকে নিয়ে যাবে না। জীবন হচ্ছে মানুষের সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্র। এই সৃষ্টিশীলতার মধ্যে একক ইলাহর অনুভূতি এবং তাঁর অভিন্ন আনুগত্যের চেতনা মানুষের সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলে। এই জীবনের আঙিনায় যে সাহিত্য গড়ে ওঠে সেটিই সত্যিকার অর্থে মানবিক সাহিত্য। মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয়ে যে জীবনধারা গড়ে তোলে এবং তার ফলে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে কোন্ অর্থে মানবিক সাহিত্য বলা যাবে? কারণ এই ভুল পথে পরিচালিত মানুষ তো আসলে সেই মানুষ নয় যার প্রতিদ্বন্দ্বী করে আল্লাহ শয়তানকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন তার উপর বিজয় লাভ করে আল্লাহর আদম সৃষ্টির যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য। এ মানুষ তো শয়তানের কাছে পরাজিত, তার করদাতা প্রজা, তার বান্দা। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ী আল্লাহর বান্দা নয়। কাজেই তাকে সত্যিকার অর্থে আমরা মানুষ তথা আল্লাহর বান্দা না বলে শয়তানের অনুচর বা শয়তানের বান্দা ভাবতে পারি।

হযরত ইয়াকুব তাঁর বংশধরদের কাছ থেকে সত্যিকার অর্থে শয়তানের বান্দা নয় বরং এই আল্লাহর বান্দা হবার অংগীকার নিতে চাচ্ছিলেন। এই অংগীকারের মধ্যে রয়েছে মানবিক জীবন এবং সে জীবননির্গত সাহিত্যের যথার্থতা।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায়
ইসলামী সাহিত্য চর্চা

সাহিত্যের গোড়ার কথা

ইসলামের নবী কেবল আরব দেশে আসেননি, দুনিয়ার সব দেশেই এসেছেন। আল্লাহর পাঠানো সব নবীই ছিলেন ইসলামের নবী। সাহিত্যের আলোচনায় প্রথমেই নবী প্রসংগে এলাম কেন? কারণ নবীরাই মানুষের প্রথম শিক্ষক। নবীরাই সমাজ সংগঠক। নবীদের যোগ মানুষের সাথে তৃণমূল পর্যায় থেকেই। মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য নবীদের ভূমিকা ছাড়া কল্পনাই করা যেতে পারে না। নবীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক পথের সন্ধান এনেছেন এবং সে পথ মানুষকে দেখাননি এমনটি হতে পারে না। সাহিত্য মানুষের জীবনের একটা প্রয়োজনীয় অংশ আর নবীরা এ অংশে কোনো অবদান রাখেননি একথা কেমন করে ভাবা যেতে পারে? নবীরা যেসব সহীফা ও কিতাব এনেছেন সেগুলোও সাহিত্যরস- সমৃদ্ধ। নিছক কাটখোট্টা আলোচনা কোনো কিতাবেই নেই। জীবনকে উপলব্ধি করে আলোচনাগুলো জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে জীবনরস সমৃদ্ধ করে। তবেই তা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। মানুষ তার সাহায্যে উন্নতি করে উন্নত জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে এবং তার ভিত্তিতে মানুষ করেছে সাহিত্য সাধনা। এটাই হচ্ছে মানুষের সাহিত্য সাধনার গোড়ার কথা।

আজ যেন সাহিত্য বলতে নবুওয়াতী খাতের ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত একটা স্রোত বুঝায়। এটা মানুষের জীবনের অন্যান্য খাতের ভুলের

www.pathagar.com

মতো একটা ভুল। 'রাধাকৃষ্ণের লীলা' এই ভুলেরই একটা ফসল। সাহিত্যিকও নবুয়াতী ধারায় সম্পৃক্ত হতে হবে, নয়তো তা মানুষের জন্য উপাদেয় ও উপযোগী হতে পারে না। সাহিত্যরস ও সাহিত্যের আস্বাদ মানুষের জীবন গঠনে সহায়তা না করে যদি ক্ষতিসাধন করে তাহলে কে এমন মানুষ আছে যে তা গ্রহণ করবে? শেষ নবীর কিতাব আল কুরআনে জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'দুনিয়ার জীবনটা তো খেলা-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হলো- বৃষ্টি হয়ে গেলো এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারপর সে ফসল পেকে গেলো এবং তোমরা দেখতে পেলে তা হলুদ বর্ণ ধারণ করছে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আখেরাত এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়' (আল হাদীদ : ২০)।

এ জীবনকে আমরা গ্রহণ করেছি এবং জীবনকে উৎকর্ষিত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু জীবনের প্রতারণা জালে জড়িয়ে আমরা নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলতে পারি না। আমাদের সামনে রয়েছে আখেরাতের জীবনের কামিয়াবী। এই আখেরাতের জীবনের জন্য দুনিয়ার জীবন আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়াকে বলা হয়েছে আখেরাতের কৃষিক্ষেত (হাদীস)। এখানে যেমন পরিশ্রম করা ও যত্ন নেয়া হবে তেমনি আখেরাতে তার ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতারণা জালে যদি আমরা ফেঁসে যাই, দুনিয়ার আসল কাজে জড়িত না হয়ে যদি তার প্রতারণামূলক খেলা-তামাশায় মেতে উঠি এবং দুনিয়ার সম্পদ আহরণ ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হই, তাহলে আমাদের আখেরাতের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে। দুনিয়া আমাদের সামনে আছে এবং আখেরাত আমাদের সামনে নেই। তবে আখেরাত আমাদের কল্পনা জগতের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের সকল বাস্তবতার সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। কাজেই তাকে আমরা জীবনকর্ম ও জীবনচিন্তা থেকে আলাদা করতে পারি না।

জীবনকে খেল-তামাশা বলা হয়েছে কোন্ অর্থে? স্বল্পকালীন স্থায়িত্বের অর্থে। একশো বছরের জীবনের বাস্তব কঠিন কর্মক্ষেত্রে খেলা-তামাশা মাত্র কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার আনন্দ বিনোদন। এই স্বল্পস্থায়ী ক্ষণটুকুর পর আবার বাস্তব কঠোর কঠিন জীবন শুরু। ঠিক তেমনি এই স্বল্পস্থায়ী জীবনটা খেলা-তামাশা এবং আখেরাতটাই বাস্তব ও অনন্তকালীন জীবন। কাজেই আমাদের যা কিছু কাজ তা চিরস্থায়ী আখেরাতের জন্য। জীবনটা শুধু দু'মুঠো খাদ্য গ্রহণ, শরীর ঢাকার জন্য বস্ত্র আহরণ এবং শারীরিক, জৈব ও যৌন চাহিদা পূরণ করার নাম নয়, বরং এই স্বল্পকালীন দুনিয়ার জীবনকে অনন্তকালীন আখেরাতের জীবনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই জীবনটাকে আমাদের বুঝতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে। জীবনের সাথে

www.pathagar.com

সাহিত্য, জীবনকে পরিশীলিত ও বিকশিত করার জন্য সাহিত্য। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নয়। জীবনকে বিকৃত করেও সাহিত্য নয়। সাহিত্য আমাদের জীবনেরই নির্যাস।

সাহিত্য আমাদের সুন্দর করবে। আমাদের পরিশীলিত ও পরিচ্ছন্ন করবে। আমাদের জীবনকে ক্লেদমুক্ত অপাপবিদ্ধ করবে। সাহিত্য আমাদের সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী করবে। জীবনের ঘটনাবলী থেকে আমরা সত্য ও ন্যায়কে বাছাই করে নিতে পারবো। জীবন সংগ্রামে সাহিত্য কেবলমাত্র একজন দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না, বরং একজন দক্ষ পর্যবেক্ষক ও দক্ষ সমালোচকের দৃষ্টি হবে সাহিত্যের দৃষ্টি। এই স্বল্পকালীন পৃথিবীর জীবনে মানুষকে তার যথাযথ ভূমিকা পালনে অর্থাৎ কিভাবে মানুষ যথার্থ মানবতার আধারে পরিণত হতে পারে এবং নিজের নফসের ও জীব-জড়ের কৃত্রিম শক্তির অনুগত না হয়ে বিশ্বজাহান ও বিশ্বপ্রকৃতির মালিক একমাত্র আল্লাহর অনুগত হতে পারে, তাই হবে সাহিত্যের সাধনা।

গাংগেয় বদ্বীপে ইসলামের ভিত

বাংলাদেশে ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবার পরই ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনকালে খৃস্ট্রীয় সপ্তম শতকেই ইসলামের দাওয়াত বাংলাদেশে প্রবেশ করে। প্রাকৃতিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে এখানকার পরিবেশ ছিল অনুকূল। এই অনুকূল পরিবেশে ইসলামের দাওয়াত সহজে বিস্তার লাভ করে। উপমহাদেশের কেন্দ্র দিল্লী থেকে বহু দূরে থাকায় বিদেশি আক্রমণকারীদের দৃষ্টি কমই এদিকে পড়েছে এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরাও এখানে কম সুযোগ পেয়েছে। তাছাড়া সবুজ শ্যামল বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত ও প্রাকৃতিক বন-জংগলাকীর্ণ সমতল ভূমি এমন এক ধরনের নৈসর্গিক গুরুগম্ভীর পরিবেশ তৈরি করেছিল যা নিরিবিলি নিশ্চিন্তে সত্য দীনের দাওয়াত ছড়াবার পথে সহায়ক হয়েছিল। ফলে স্থানীয় বৌদ্ধ, জৈন ও আর্য ধর্ম প্রভাবিত জনগোষ্ঠী ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করে। এই সংগে আর একটি বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার মতো। কয়েক হাজার বছর থেকে এ এলাকায় বিপুল সেমেটিক জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাদের ঐতিহ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল তৌহীদবাদী। কালের আবর্তনে তাতে মরচে পড়ে গিয়েছিল। আর্য ব্রাক্ষণ্যবাদ বিরোধী বৌদ্ধবাদী ও জৈনবাদী ধর্মীয় সংস্কার যেভাবে এ এলাকায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল ঠিক একই ধারায় ইসলামী তৌহীদবাদ সমগ্র বাংলার অভ্যন্তরে বিস্তৃত হয়েছিল অতি অল্প সময়েই। যেন এটা ছিল তাদের প্রাণের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ! সকালে হারিয়ে গিয়েছিল আবার সন্ধ্যায় তাকে ফিরে পেয়েছিল, এভাবে তারা এটাকে গ্রহণ করেছিল। তাই হিন্দুস্তানের অতি প্রাচীন মুশরিকী আবাসভূমির মধ্যে গড়ে উঠতে পেরেছিল একটি বিশাল তৌহীদবাদী জনগোষ্ঠী।

www.pathagar.com

আলেম উলামা ও কাজীদের জ্ঞান চর্চা

মুসলিম বিজেতাদের পূর্বে সমুদ্র ও নদীপথে আরব বণিকদের সাহায্যে বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করে ইসলামের প্রথম যুগেই। এরপর ইসলাম প্রচারকদের আগমন ঘটতে থাকে। মুসলিম বিজেতাদের ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ ধারা বলিষ্ঠতা অর্জন করে। এ সময় এ দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম আইনজ্ঞ তথা ফকীহ ও কাজীদের আগমন ঘটতে থাকে। তাঁরা ছিলেন ইসলামী শাস্ত্রে সুদক্ষ ও পারদর্শী। মুসলিম বিশ্বে যে বিপুল জ্ঞান চর্চা হচ্ছিল তার ঢেউ এখানেও এসে পড়ে। ফলে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকেই এখানে গৌড়, পাণ্ডুয়া, মাহিসুন (মাহিসন্তোষ), সোনারগাঁও ইত্যাদি এলাকায় বড় বড় ইল্‌মী তথা ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এখানকার মাদরাসাগুলোতে ইসলামী জ্ঞান আহরণ করার জন্য সমগ্র হিন্দুস্তান থেকে ছাত্রদের আগমন ঘটতো। শায়খ তাকীউদ্দীন আরবী, শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ, শায়খ ইয়াহইয়া মানেরী, শায়খ আলাউল হক, হযরত শায়খ নূর কুতবুল আলম প্রমুখ বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্ঞানসাধক এ সময় এসব জ্ঞানকেন্দ্র আলোকিত করেছিলেন। তাই বলা যায় ইসলামী শাসনের প্রথম যুগেই বাংলাদেশ ইসলামী জ্ঞান চর্চার পীঠস্থানে পরিণত হয়। এখানে এর পরিবেশও ছিল। তখন জ্ঞান চর্চার ভাষা ছিল আরবী ও ফারসী। ফলে বিদেশাগত মুসলমান এবং এদেশীয় শিক্ষিত, জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে মূলত এ জ্ঞান চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের মূল কেন্দ্র দিল্লীতে শক্তিশালী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর জ্ঞান সাধনার এই কেন্দ্র বাংলা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।

সাধারণ মুসলমানদের ভাষা ছিল বাংলা। ইতিপূর্বে পাল যুগে বৌদ্ধ শাসনামলে সাহিত্যের ভাষা ও রাজভাষা সংস্কৃত থাকলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চর্চা যা একটু আধটু হয়েছিল সেন যুগে হিন্দু শাসনামলে এসে তা সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যায়। এরপর সংস্কৃতের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা ও রাজকার্য চলতে থাকে। এজন্য একটা দরবারী জগাখিচুড়ি মার্কা সংস্কৃত ভাষাও গড়ে ওঠে। মুসলিম সুলতানদের শাসনামলে মূলত বাংলা ভাষার পুনরজন্ম হয়। মুসলিম শাসকগণ তাঁদের দরবারী ও রাজভাষা ফারসী এবং ইল্‌মী ভাষা আরবী রাখলেও মুসলিম এবং এদেশটায় জনসাধারণের ভাষা বাংলার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করার জন্য রাজকোষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করেন। ফলে ধীরে ধীরে বাংলা ইল্‌মী ভাষায় রূপান্তরিত হবার পথ প্রশস্ত হতে থাকে।

সুফী সাধকদের ইসলাম প্রচার

মুসলমানদের মধ্যে দিনরাত আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন এবং তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা একটি দল গড়ে উঠেছিল। তাঁরা ছিলেন সুফী নামে খ্যাত। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের যোগী, সন্ন্যাসী ও রাহেবদের মতো তাঁরা সংসার বিরাগী ছিলেন না। তাঁরা সংসারধর্ম, জ্ঞান চর্চা, এমনকি জিহাদ

www.pathagar.com

চর্চাও করেছেন। এই সংগে আল্লাহর ইবাদত ও মানবতার সেবাই ছিল তাঁদের ব্রত। বাংলায় ইসলাম প্রচারে এই সুফীদের অবদানই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই বাংলার মুসলিম সমাজে সুফীদের জীবন চর্চার প্রভাব বেশি অনুভূত হয়েছে। কিন্তু সুফীগণ ইসলামী শরীয়তের বাইরে কোনো অভিনব ও কৃত্রিম জীবন যাপন করতেন না। তাঁরা ছিলেন আদর্শ মুসলিম এবং আদর্শ ইসলামী চরিত্রের অধিকারী। তাঁরা ছিলেন কুরআনের সূরা আল-কাসাসের ৭৭নং আয়াতে 'আল্লাহ্ তোমাকে যা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান করো, তবে সেই সংগে দুনিয়ায় তোমার প্রাপ্য অংশ ভুলো না'— এ মর্মবাণীর যথার্থ আধার। তাঁরা সবর ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করেননি। খিলাফতে রাশেদার চার-পাঁচশো বছর পরে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক শাসকদের সাথে কোথাও তাঁরা কোনো আপোস করেননি, বরং কবি ও দার্শনিক ইকবালের ভাষায় অনেক জায়গায় 'সিকান্দাররা' কালিন্দরদের কথায় ওঠাবসা করতেন। দিল্লীর খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ., হযরত বু আলী কলন্দর রহ. আজমীরের হযরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশ্‌তী রহ. এবং গৌড়ের হযরত শাহ নূর কুতুবুল আলম রহ. এর জ্বলন্ত উদাহরণ। এই সুফীরা কখনো কোনো অন্যায়, জুলুম ও শোষণের সাথে আপোস করেননি। তাঁরা ব্যাপক হারে জনগণকে ইসলামের তালিম ও তরবীয়ত দিয়েছেন এবং তাদের ইসলামী জীবন যাপনে সাহায্য করেছেন।

এই সুফীদের হাতে এক সাথে এত বেশি সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে যে, তাদের ইসলামী তালিম ও তরবিয়ত দেয়া এবং তাদের ইসলামী চরিত্র গঠন করা এই সীমিত সংখ্যক সুফীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, যদিও পনের শতকের জৈনপুরের বিখ্যাত সুফী হযরত মীর সাইয়েদ আশরাফ জাঁহাগীর সিমনানীর একটি পত্র থেকে জানা যায়— মোটকথা বাংলার বড় শহরের কথা বাদ দিলেও এমন কোনো ছোট শহর বা গ্রাম নেই যেখানে খোদাভীরু সুফীগণ আগমন ও বসতি স্থাপন করেননি। তারপরও বলা যায় কুরআন ও সুন্নাহ চর্চার অবর্তমানে বিপুল মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারেনি, যার ফলে মুশরিকী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বেড়া টপকে তারা ইসলামী মিল্লাতের আওতাভুক্ত হলেও ওদিক থেকে আসার সময় নিজেদের বহিরংগে মুশরিকী সভ্যতা সংস্কৃতির অনেক কিছু সাথে করে নিয়ে আসে। কালক্রমে এগুলো মুসলিম জীবন ধারায় জেঁকে বসে।

মূলত ইসলাম এমন একটা জীবন ব্যবস্থা ও জীবনাদর্শ যা মোটেই অনুষ্ঠান নির্ভর নয়, বরং কতিপয় বিশ্বাস ও বিশ্বাসভিত্তিক কর্মের উপরই তা নির্ভরশীল। ইসলামের উৎস হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল। তৃতীয় কোনো সত্বার সাথে ইসলাম সরাসরি জড়িত নয়। তাই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়ে সুফী দরবেশ বা উলামায়ে কেরামের যারাই জড়িত থাক না কেন, সেক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ চর্চার যতটুকুন কমতি থেকে গেছে তা ইসলামী ভিত্তির দুর্বলতা হিসাবেই চিহ্নিত হবে।

www.pathagar.com

স্থানীয় কুফরী উপাদান

বাংলায় মুসলমানদের আগমন এবং ইসলামী আদর্শবাদের প্রসারের পূর্বে যেসব ধর্মমত বিস্তার লাভ করেছিল সেগুলোর পেছনে কোনো পরিচিতি ও পরীক্ষিত আসমানী কিতাবের সমর্থন ছিল না। বৌদ্ধবাদ, জৈনবাদ ও আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদেরই এখানে প্রচলন ছিল বেশি। এই তিন বৃহৎ ধর্মমতের বাইরে কাল্পনিক দেবদেবীর পূজারও একটা ধারা প্রচলিত ছিল। মূলত সবগুলো ধর্মমতই ঈশ্বর আরাধনার নামে প্রকৃতি পূজা ও পুতুল পূজায় পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মমত তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদ, ত্রিপিটক ইত্যাদিকে অভ্রান্ত মনে করতো। কিন্তু এর পেছনে কোনো শক্তিশালী ভিত্তি উপস্থাপন করতে পারতো না। ফলে সেগুলো প্রায় গালগল্প, পুরাতন কাহিনী, নিছক নীতিকথা এবং দার্শনিক আলোচনার কচকচি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আল্লাহর অস্তিত্বে বিভিন্ন জীব ও জড়কে শরীক করা এবং এতদসংক্রান্ত ব্যাপক কুসংস্কারই ছিল ধর্ম। ফলে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে নানান বিভ্রান্তি ও বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটেছিল। প্রকৃত সত্যকে মেনে নেবার মতো মানসিকতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী রীতি বর্ণবাদের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করে ফেলেছিল। মানুষ সরাসরি মানুষের দাসে পরিণত হয়েছিল, বরং একদল মানুষ সমাজে অন্ত্যজ ও মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। বিরোধী ধর্মমত জৈন ও বৌদ্ধবাদও ধীরে ধীরে বর্ণভেদ প্রথার হাতে নিজেদের সোপর্দ করে দিয়েছিল অথবা কোথাও আত্মরক্ষার্থে আত্মগোপন করে সহজিয়া, তান্ত্রিক ইত্যাদি মতবাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিল অর্থাৎ ধর্মের নামে সমগ্র বাংলাদেশে ধর্মীয় অনাচার, কুসংস্কার ও চারিত্রিক নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। এই ছিল তখনকার বাংলা সাহিত্য চর্চার পটভূমি বা পরিবেশ।

মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার কয়েকশো বছর পূর্বে থেকে ইসলাম প্রচারকদের এদেশে আগমন শুরু হয়। ইসলামের খালেস তৌহিদবাদ ও সামাজিক সাম্য বাংলার পৌত্তলিক সমাজে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সামাজিক অবিচার, জুলুম, নিপীড়ন এবং প্রশাসনিক শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী পরিবেশ হয়ে ওঠে। সর্বোপরি নিরাকার সর্বশক্তিমান একক স্রষ্টার আরাধনার ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাকালে চতুরদিকে যখন ইসলামের প্রতি আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বেড়ে চলছিল তখনকার সমাজে ইসলামের শক্তির একটা অস্পষ্ট প্রভাব সমসাময়িক একটি কবিতায় ফুটে উঠেছে। অজ্ঞতাবশত কবি রামাই পণ্ডিত তের শতকের শেষের দিকে লিখিত তাঁর এ কবিতায় ইসলামী আদর্শ ও সদ্যগঠিত মুসলিম সমাজের চিত্র সঠিকরূপে আঁকতে না পারলেও ইসলামের অসাধারণ ও যাদুকরী প্রভাব এর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতাটির নাম নিরঞ্জনের রুষ্মা। এ কবিতায় মধ্যযুগীয় ইউরোপের পোপ ও যাজকদের

www.pathagar.com

ক্ষমতার মতো ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু পুরোহিতদের ক্ষমতার কিছু আভাস পাওয়া যায়। জাজপুর তথা ওড়িষার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সধর্মীদের নিকট কর আদায় করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠী গলায় পৈতা, কানে বেড় দিয়ে বৌদ্ধ জনসাধারণকে শাপ-শাপান্তর করে তাদের বাড়ি-ঘর আগুন জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়। তাদের এ জুলুম উৎপীড়ন দেখে ধর্মদেবতা বৈকুণ্ঠে বসে এর প্রতিবিধানে মনোনিবেশ করলেন। ধর্মরূপী মুসলমানরা জাজপুরে প্রবেশ করলো এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীরা রাতারাতি ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো। কবির কল্পনায় বিষয়টা এভাবে ধরা দিয়েছে :

ধর্ম হইল জবনরূপী মাথায়েত কালটুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হত্র ত্রিভুবনে লাগে ভ-এ
খোদায়ে বলিআ এক নাম ॥
(নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলএ দম্বদার ॥
জথেক দেবতাগণ সভে হৈয়্যা একমুন
আনন্দেতে পরিলা ইজার ॥)
ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হইল শূলপানি।
গনেশ হইলা হাজী কার্তিক হইলা কাজী
ফকির হইলা জথমুনি ॥
তোজয়া আপন ভেক, নারদ হইলা শেক,
পুরন্দর হইলা মলনা।
চন্দ্র, সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলে বাজাএ বাজনী ॥
আপনি চণ্ডিকা দেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হৈল্যা বিবি নূর।
জথেক দেবতাগণ, সভে হয়া একমন,
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, ক্যাড়্যা ফিড়্যা খাএ রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল ॥
ধরিয়া ধর্মের পাএ, রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥

শব্দার্থ : দম্বদার-দম-ই-মদার, বদরুদ্দীন মওলানা শাহ-ই মাদার, পনের শতকের লোক, এ অংশটি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত। আদম্ফ-আদম। পাখড়-পাকড়াও।

কবির বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে : ধর্মদেবতা মাথায় কালো টুপি পরে ত্রিকচ অর্থাৎ তীরকাশ তথা তীরধারী কামান নিয়ে উন্নত জাতের অশ্বে আরোহণ করে ত্রিভুবনে ভীতি সঞ্চারকারী আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুলে

www.pathagar.com

জবন তথা মুসলিম রূপ ধারণ করলেন। (নিরঞ্জন নিরাকার বেহেশতের অবতার হয়ে মুখে দম-ই-মাদর বলতে লাগলেন। সমস্ত দেবতা একমত হয়ে আনন্দে ইজার পরে নিলেন অর্থাৎ সবাই মুসলমান রূপ ধারণ করলেন।) ব্রহ্ম মুহাম্মাদ হলেন, বিষ্ণু হলেন পয়গম্বর এবং মহাদেব হলেন আদম। গনেশ গাজী, কার্তিক কাজী এবং যত মুণি ঋষি ফকির দরবেশ সাজলেন। আপন বেশভূষা পরিত্যাগ করে নারদ শেখ ও পুরন্দর মওলানা সাজলেন। চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি আদিদেব পদাতিক হয়ে বাজনা বাজিয়ে তাদের সেবা করতে লাগলেন। চণ্ডিকা দেবী স্বয়ং হাওয়া বিবি হলেন আর পদ্মাবতী হলেন দেবী নূর, যত দেবতা ছিলেন সবাই এভাবে মুসলমান সেজে এক সাথে জাজপুরে প্রবেশ করলেন। তারা দেবালয় ও দেবগৃহ ভাঙলেন, মনের আনন্দে লুটতরাজ করে খেতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের 'পাকড়াও পাকড়াও' ধ্বনি তুললেন। এই দারুণ গণ্ডগোল দেখে রামাই পণ্ডিত ধর্মের পায়ে লুটিয়ে পড়লো এবং গান গাইলো। এতে বুঝা যাচ্ছে দেশে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে এবং ইসলামের ন্যায়ের দণ্ড তথাকথিত বর্ণবাদী সমাজের জুলুম, অবিচার ও উৎপীড়ন নির্মূল করে সমাজের শান্তি, সমতা ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনছে। মানুষ ইসলামের হক ও সাম্যের আহ্বান গ্রহণ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। বাংলায় তুর্কীদের হাতে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। তুর্কীরা পাঠান ও মোগলদের তুলনায় বেশি ইসলামী ভাবাপন্ন ছিলেন। ফলে বাংলায় আরব দেশের মতো না হলেও তাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল একটা ন্যায় ইনসাফ ও সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলায় মুসলমানদের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। সমাজে একটা ইসলামী পরিবেশ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হচ্ছিল।

সেটা ছিল মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই এক আদমের সন্তান। এক আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক। একমাত্র তাঁরই ইবাদত ও আরাধনা করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই। সবাই তাঁর অনুগত। বাংলার বিশাল ভূখণ্ডে (অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও বৃহত্তর আসাম) এই তৌহিদি পরিবেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু যেহেতু বাংলা ভাষা তখনো স্থিতিশীলতা লাভ করেনি, তখনো সৃজ্যমান ছিল (কয়েকশো বছর আগের চর্যাপদের ভাষা দেখলে তা বুঝা যাবে) আর সৃজ্যমান ভাষায় বড় ও সৃষ্টিশীল কোনো কিছুর আশা করা যায় না, তাই এ সময়কার সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত নিদর্শন থাকলেও তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মুসলিম কবির রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। পনের শতক থেকে আমরা মুসলিম কবিদের একটা 'ধারাবাহিকতা লক্ষ করি'। শাহ মুহাম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন, মুজাম্মিল তাঁদের অন্যতম। শাহ মুহাম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'য়ুসুফ-জুলিখা' রচনা করেন গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আমলে (১৩৮৯-১৪১০)। কবি জৈনুদ্দীন ছিলেন গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১) সভাকবি। কবি মুজাম্মিল

www.pathagar.com

পনের শতকের মধ্যবর্তীকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পনের শতক হতে উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত যে অসংখ্য মুসলিম কবির সন্ধান পাই তাদের অন্যতম হচ্ছেন সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), শেখ ফয়জুল্লাহ, শুকুর মাহমুদ (১৬৮০-১৭৫০), সাবিরিদ খান, দোনাগাজী, বাহরাম খান, আফজাল আলী, মুহম্মদ কবির, মুহম্মদ খান (১৫৮০-১৬৫০), দৌলত কাজী (১৬০০-১৬৩৮), আলাওল (১৬০৭-১৬৮০), শেখ পরান (১৫৫০-১৬১৫), আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০), শাহ গরীবুল্লাহ, মুহম্মদ ইয়াকুব, মুহম্মদ মুকীম (১৭০০-১৭৭৫), সায়্যিদ হামজা (১৭৫৫-১৮১৫) প্রমুখ।

মুসলিম শাসনের অবসানের পর, বিশেষ করে এদেশের অমুসলিম সমাজের সহযোগিতায় বিদেশি বণিক ইংরেজরা দেশের শাসনযন্ত্র দখল করে। ফলে উনিশ শতকের শুরু থেকে ইংরেজ ও হিন্দুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বসে বাংলা ভাষার নিত্য ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দগুলো দুই হাতে বাদ দিয়ে মৃত সংস্কৃত ভাষার অপ্রচলিত ও অপরিচিত কঠিন শব্দসম্ভারে ভারাক্রান্ত করে একটা নতুন বাংলা গদ্য তৈরি করা হয়। অতপর এ ভাষায় গদ্য ও পদ্য লেখার কাজ চলে। ইংরেজের সাথে সংঘাতে লিপ্ত থাকার কারণে মুসলমানরা প্রথমে এ বিষয়ে উদাসীন থাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাদের এক ধাপ পিছিয়ে আসতে হয়। ইংরেজের সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্দীপিত হিন্দু মনীষীর কারণে হিন্দু ঐতিহ্য এই সাহিত্যে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে। তবুও এই উনিশ শতকে যে সকল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে তারা এর মধ্যে নিজেদের ঐতিহ্যবাহী স্বতন্ত্র পথটি তৈরি করার চেষ্টা চালান। এদের মধ্য থেকে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকের নাম এখানে উল্লেখ করছি। এঁরা হচ্ছেন, ঔপন্যাসিক প্রবন্ধকার মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), প্রবন্ধকার শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১), কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), কবি, প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), প্রবন্ধকার ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), কথাশিল্পী এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ঔপন্যাসিক নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩), কবি শেখ ফজলল করীম (১৮৮২-১৯৩৬), ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), কবি, কথাশিল্পী ও প্রবন্ধকার বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কবি শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), কবি ও ঔপন্যাসিক শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫)।

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্যের উপাদান

মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা যখনই সাহিত্য ময়দানে পদার্পণ করেছেন তাদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র ও সচেতনতা লক্ষ করা গেছে। তাদের একটা বিশিষ্ট অংশ নিজেদেরকে নিছক কবি-সাহিত্যিক মনে করেননি। তাঁরা মনে করেছেন বাংলার এই কুফরী সমাজে যেমন তাদের একক তৌহিদবাদী হিসাবে টিকে থাকতে হবে তেমনি এখানে কুফরীর গলদ চিহ্নিত করাও তাদের দায়িত্ব। এজন্য তারা একই সংগে ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যে ভাষায় ইসলামী আদর্শ ও আচরণ প্রকাশ এবং তার বিকাশ সাধন করা যায় সে ভাষা প্রয়োগ করার কথা তারা চিন্তা করেছেন। যেমন-

দেশেত আলিম থাকি যদি ন জানায়।
সে আলিম নরকেতে যাইব সর্বথায় ॥
নর সবে পাপ কৈলে আলিমের ধরি।
আল্লাহর সাক্ষাতে মারিবেন্ত দণ্ড বেড়ী ॥
তোম্মারা সবের মেলে মোর উৎপন।
তে কারণে কহি আমি শাস্ত্রের বচন ॥
আল্লায় বলিব তোরা আলিম আছিলা।
মানুষ্যে করিতে পাপ নিষেধ ন কৈলা ॥
আছুক আপনা পাপ আলিমে খণ্ডাইব।
পরের পাপোর লাগি লাঘব পাইব ॥

(শব-ই-মিরাজ : সৈয়দ সুলতান)

কবি সৈয়দ সুলতান যেমন হিন্দু ধর্ম কাহিনী ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইসলামী কাহিনী ও প্রস্তাব বাংলায় লিখে প্রচার করেছিলেন ঠিক তেমনি তাঁর শাগরিদ কবি মুহম্মদ খান পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'মকতুল হুসেন'-এও এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। এ গ্রন্থটি রচিত হয় ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে। এতে বলা হয় :

হিন্দুস্থানে লোকে সবে ন বুঝে কিতাব।
ন বুঝি শুনি নিত্য করে মহাপাপ ॥
তেকাজে সংক্ষেপ করি পঞ্চালী রচিলুং।
ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কিছু ন জানিলুং ॥
পঞ্চালী পড়িতে সবে মনে ভয় পাই।
অবশ্য কিতাব কথা শুনিবেক যাই ॥
কিভাবে আল্লার আজ্ঞা শুনিবেন্ত যবে।
দান ধর্ম পুণ্য কর্ম করিবেন্ত তবে ॥
অবশ্য মোহোরে সবে দিবে আশীর্বাদ।
মহাজন আশীর্বাদ খণ্ডিবে প্রমাদ ॥
বিশেষ পীরের আজ্ঞা ন যায় লঙ্ঘন।
রচিলুং পঞ্চালীকা তাহার কারণ ॥

www.pathagar.com

শেখ মুত্তালিব (১৫৯৫-১৬৬০) লিখছেন :

আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল মন্দ।
তেকারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ ॥
মুছলমানী শাস্ত্র কথা বাঙ্গালা করলু।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু ॥
কিন্তু মাত্র ভরসা আছয়া মনান্তরে।
বুঝিয়া মুমিন দোয়া করিব আমারে ॥
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক।
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ খেমিবেক ॥
এসব জানিয়া যদি করয়ে রণ।
তবে সে মোহোরে পাপ হইবে মোচন ॥

(কিফায়িতুল মুসল্লীন)

মধ্যযুগের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা তাদের জীবন ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তারা তাদের সাহিত্যে ইহকাল ও পরকাল উভয় কালকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। কেবলমাত্র মানব-মানবীর প্রেমোপাখ্যান লিখেই তারা নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেননি। এই সংগে তারা ইসলামী শরীয়ত, হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর মোকাবিলায় মুসলিম পৌরাণিক কাহিনী, হিন্দুদের পৌরাণিক ও আজগুবি সৃষ্টিতত্ত্বের তুলনায় সঠিক তথ্যসমৃদ্ধ ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামী দর্শন ও সুফীতত্ত্ব, মুসলিম ঐতিহাসিক কাব্য, রূপক সাহিত্য তথা এক প্রকার রূপকের মাধ্যমে হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা, মর্সিয়া সাহিত্য, মারফতি ইত্যাদি ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন গান রচনা করেন। তাদের এতদসম্পর্কিত কিছু গ্রন্থের নামোল্লেখ করলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা আরো একটু সুস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে মনে হয়।

যেমন-

শরীয়ত নামা- নসরুল্লাহ খান
নসীহত নামা- শেখ পরান
কিফায়িতু-ল-মুসল্লীন- শেখ মুত্তালিব
হিদায়িতু-ল-ইসলাম- নজরুল্লাহ খান
নামাজ মাহাত্ম্য- মাহাম্মদ জান
শিহাবুদ্দীন নামা- আবদুল হাকীম
হিতজ্ঞান বাণী- হায়াত মাহমুদ
নবী বংশ- সৈয়্যদ সুলতান
রসূল বিজয়- ঐ
শব-ই-মিরাজ- ঐ
ওফাৎ-ই-রসূল- ঐ
ইবলিস নামা- ঐ
আম্বিয়া বাণী- হায়াত মাহমুদ
কিয়ামত নামা- মুহম্মদ খান

www.pathagar.com

নূর নামা (সৃষ্টিতত্ত্ব)- শেখ পরান
নূর নামা (সৃষ্টিতত্ত্ব)- আবদুল হাকীম
জ্ঞান প্রদীপ (সুফীতত্ত্ব)- সৈয়্যদ সুলতান
কারবালা (মর্সিয়া সাহিত্য)- আবদুল হাকীম
জঙ্গনামা- গরীবুল্লাহ ও ইয়াকুব
সায়াৎনামা (জ্যোতিষ শাস্ত্র)- মীর মুহাম্মদ শফী

এ ধরনের ইসলামী জ্ঞান ও মুসলিম জীবন সম্পর্কে অসংখ্য গ্রন্থ তাঁরা রচনা করেন। তাঁদের লেখনীর সাহায্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চার একটা সাগর সৃষ্টি হয়। তবে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, মুসলিম কবিদের এই ইসলাম চর্চার সাথে খালেস তৌহীদের সম্পর্ক যতটুকু তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পর্ক সূফিতাত্ত্বিক মরমীবাদের। বাংলার কবিদের কাব্য চর্চার উপর ইরানের প্রভাব ব্যাপকতর। সে তুলনায় আরবীয় প্রভাব অতি সামান্যই। আর ইরানী প্রভাব মানেই হচ্ছে ইরানী সাহিত্যে যে মাশ্‌শায়ী, ইশরাকী, ইরফানী ইত্যাদি এরিস্টটলীয় বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিবাদী দর্শন এবং তাসাউফের গূঢ় রহস্যভিত্তিক মরমীবাদের প্রসার ঘটে তারই প্রভাব বাংলার কবিদের মনোজগতকে আচ্ছন্ন করে।

আব্বাসীয় আমলে হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে গ্রীক দর্শনের আলোচনা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ইমাম গাজ্জালী ও ফখরুদ্দীন রাযীর আক্রমণাত্মক ভূমিকার ফলে মাশ্‌শায়ী দর্শন ধীরে ধীরে শক্তি হারিয়ে ফেললে ইশরাকী ও ইরফান তাসাউফ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইশরাকী তাসাউফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শায়খ শিহাবদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে আমিরাক সোহরাওয়ার্দী (৫৪৯ হিঃ-৫৮৭ হিঃ)। রেই, হামেদান, কাযভীন ইত্যাদি ইরানের বিভিন্ন শহরে তাসাউফের এই ভাবধারাগুলোর মধ্যেই বিকশিত হয়। পনের শতকের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর থেকে শুরু করে উনিশ শতকের বাংলার কবিদের মধ্যে এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইরানী কবিদের সাথে তারা গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। 'ইউসুফ জুলিখা'সহ ইরানী কবিদের অনেকগুলো কাব্য তারা বাংলায় অনুবাদ করেন, এমনকি অনেকে তাদের আদলে কাব্য ও কবিতা চর্চা করেন। এখানে পীরের নির্দেশে গ্রন্থ রচনার কথা অনেক কবিই বলেছেন। পনের শতকের কবি লিখেছেন :

শাহা বদরুদ্দীন পীর কৃপাকুল হরি।
শতমুখে সে বাখান কহিতে ন পারি ॥
তাহান আদেশ-মালা শিরেতে ধরিয়া।
রচিলেন্ত মুজাম্মিলে মনে আকলিয়া ॥
(সায়াৎনামা)

পীর শাহ দৌলার আদেশে কবি শেখ চান্দ লিখছেন :
ফতে মোহাম্মদ সুত শেখ চান্দ নাম।
গুরুর আজ্ঞায় পঞ্চালী রচে অনুপাম ॥

www.pathagar.com

কাছাছুল আম্বিয়া এক কিতাবেত শুনি।
পঞ্চালী বাঁধিয়া তাকে পুস্তকেত ভনি ॥

মূলত মধ্যযুগের বাংলা কবিতা তাসাউফের চত্বরে ঘোরাফেরা করে। ইউরোপ ও আমেরিকার খ্রিস্টান কবিরা যখন বাইবেলের মধ্যে ডুব দেয়, বাইবেল চর্চা করে এবং বাইবেল থেকে পথ নির্দেশনা নেবার চেষ্টা করে তখন এশিয়ার মুসলিম কবিরা ডুব দেয় তাসাউফের মধ্যে। তাসাউফের মধ্যে জীবন দর্শনের চিত্র অংকন করে। তাসাউফকে কুরআনের নির্যাস বিবেচনা করে। ফলে কুরআন থেকে পথ নির্দেশনা নেবার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। বাংলা মধ্যযুগের কবিরা কুরআন ও ইসলামের নামে যা কিছু বলেছেন তা সরাসরি কুরআন ও হাদীসের চিন্তা থেকে নয়, বরং ইরানী সাহিত্যের মধ্যস্থতায় তাসাউফের জারক রসে সিঞ্চিত করে বলেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায় মওলানা রুমীর মসনবীকে বলা হয়েছে :

'হস্ত কুরআঁ দর যবানে পাহলভী'
মসনবী-ই-মনবী-ই মৌলভী

অর্থাৎ 'পাহ্‌লবী তথা ফরাসী ভাষায় মওলানা রুমীর মসনবীই হচ্ছে কুরআন মজীদ।'

অথচ অন্যদিকে ইমাম গাজ্জালী র. মওলানা রুমীর এই মসনবীর চিন্তা উদ্ভূত (সামা) গান ও নাচের প্রবল বিরোধিতা করেছেন, অর্থাৎ কোন গ্রন্থই কুরআনের সমান্তরাল হতে পারে না। তাসাউফের চিন্তার জটিলতার কারণে পনের ষোল শতকের বাংলার কিছু মুসলিম কবি শ্রীচৈতন্যের ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করেন। তারা এটাকে শির্কমিশ্রিত এবং মুসলিম জীবনধারা থেকে বিভিন্ন মনে করতে পারেননি। আল্লাহ যে খালেস তৌহীদের কথা কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, শিরক ছাড়া অন্য সমস্ত গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন, সেই শিরক থেকে আমাদের জীবনকে যেমন মুক্ত রাখতে হবে তেমনি সাহিত্যও হবে তা থেকে মুক্ত।

আধুনিক পরিবেশ ও আধুনিক সাহিত্য

উনিশ শতক থেকে এদেশের সাহিত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। এ আধুনিকতার সম্পর্ক ইংরেজি সভ্যতা সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় চিন্তার সাথে কবিতার আংগিকে কাঠামোয় এবং চিন্তায় যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি নতুন গদ্যভংগি রচিত হয়। উপন্যাস, প্রহসন, নাটক ইত্যাদি কথাসাহিত্যের একটি ধারা সৃষ্টি হয়। সমগ্র সাহিত্য জগতে যেন নতুন জোয়ার আসে। মুসলিম সমাজ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় মুসলিম সাহিত্যিকরা প্রতিবেশীদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়ে। প্রতিবেশীরা ভাষার উপর থেকে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রভাব ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়ে তাদের নিজেদের পৌরাণিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করে। তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় বড় বড় প্রতিভার জন্ম হয়। যথার্থই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নতির উচ্চ সোপান অতিক্রম করতে থাকে।

www.pathagar.com

এ সময় মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে এগিয়ে আসেন মীর মোশার-রফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)। তিনি নতুন ভাষার ঐতিহ্য আত্মস্থ করে প্রথম মুসলিম সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর পরে শক্তিশালী লেখক হিসাবে এগিয়ে আসেন মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), কবি, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার সৈয়্যদ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৩৮), প্রবন্ধকার মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ঔপন্যাসিক নজীবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩), প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিক বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কবি শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), কবি ও প্রবন্ধকার গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) প্রমুখ অসংখ্য শক্তিশালী সাহিত্যিক। তাঁরা সবাই নিজেদের সময় ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিকভাবে প্রবল। তাই সাহিত্য জগতে তাঁরা প্রতিবেশীদের তুলনামূলক উন্নতমানের সাথে সহাবস্থান করেও মুসলমানদের জন্য একটা সম্মানজনক অবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হন।

এই সময় আগমন হয় বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবি নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬)। ভাষার ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক প্লাটফর্মের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি মুসলিম ঐতিহ্যে ফিরে যাবার সকল প্রচেষ্টা শুরু করেন। তাঁর প্রতিভা প্রতিপক্ষ প্রতিবেশীদের হৃদয়ও স্পর্শ করে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ করে তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেন, বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সংগীত তাঁর অমর কীর্তি। নজরুলের পরে কবি ফররুখ আহমেদ (১৯১৮-১৯৭৩) তাঁর সাহিত্যধারাকে আরো পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ফররুখ ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যকে পূর্ণরূপে বিকশিত করেন।

১৯৭১ সালে রাশিয়ায় লেনিনবাদী কমিউনিস্ট বিপ্লব হবার পর এর প্রভাব সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। উনিশ শতকের জার্মান চিন্তাবিদ কার্লমার্কস ও ফেড্রারিক এঙ্গেলস ছিলেন এই বিপ্লবী চিন্তাধারার উদগাতা। তারা অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে এই বিপ্লবের ডাক দেন। আসলে কমিউনিস্ট ভাবধারা একটা অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম। একে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত করেন। একদল সাহিত্যিকের মাথায় শ্রেণীসংগ্রামের চিন্তা এবং এই সংগে নিরীশ্বরবাদিতা ও ধর্ম আফিমের ন্যায় এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেন। এরই ভিত্তিতে তারা দুনিয়াব্যাপী একটি সাহিত্যের আবহ তৈরিতে মেতে ওঠেন। মাত্র সত্তর বছরের মধ্যে তারা বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও ব্যর্থ হয়ে যান। মার্কসবাদ একটা অলীক কল্পনায় পরিণত হয়। কিন্তু বিশ্ব

www.pathagar.com

সাহিত্যকে তারা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এখন কয়েক প্রজন্ম ধরে। তারা সাহিত্য থেকে আল্লাহকে বিদায় দিয়েছেন। সাহিত্যের পরতে পরতে শ্রেণীসংগ্রাম প্রবেশ করিয়ে একটা হিংসাত্মক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা মানবতাবাদের কথা বলেন। কিন্তু তাদের সাহিত্যের মাধ্যমে সবচেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে মানবতা। তারা মানুষকে কোন এক পর্যায়ে নিয়ে স্থিতিশীল করতে পারেননি। মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে কার কাছে আশ্রয় নেবে? এক আল্লাহকে ত্যাগ করলে অসংখ্য আল্লাহ এসে যায়। দেশ এক আল্লাহর, দল এক আল্লাহর, প্রেসিডিয়াম এক আল্লাহর– এভাবে ক্ষমতাধর প্রত্যেকেই এক একজন আল্লাহ হয়ে যান। এই স্বৈরাচারী আল্লাহদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষমতা মার্কসবাদী সাহিত্যের নেই।

বিগত শতকের শেষার্ধব্যাপি এই মার্কসবাদী সাহিত্যের দাপাদাপি বাংলার মুসলিম সাহিত্য অঙ্গনে অশনি সংকেতের মতো অনুভূত হচ্ছিল। মুসলিম ঘরানার বহু সাহিত্যিক ইসলামী আদর্শবাদ ত্যাগ করে এদিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। মার্কসবাদের পতনের পর তাদের পালে আর হাওয়া বইছে না। তবুও তারা মার্কসবাদের মূলভিত্তি সেক্যুলারবাদের উপর দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। অনেকে ইসলামী আদর্শবাদের আওতায় ফিরেও আসছেন।

তবে ইসলামী আদর্শবাদও বিশ্বাসের নতুন বলয় সৃষ্টি করে ময়দানে নতুন করে জেগে উঠছে। আমাদের পূর্বসূরীদের বিগত ছ'সাতশো বছরের প্রচেষ্টা ও কর্মপ্রবাহ এ বলয়কে শক্তিশালী ভিত্তি দান করেছে। কুরআন ও হাদীস অবিকৃত থাকার এবং তাদের সাথে আমাদের আবেগগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ গড়ে ওঠার কারণে আজ সেখান থেকে পথনির্দেশ লাভ করা আমাদের জন্য সহজ হয়েছে। ইসলামী সমাজ চিন্তা যেমন নতুন করে নব উদ্যমে বলীয়ান হচ্ছে তেমনি ইসলামী সাহিত্য চিন্তাও তার সাথে সমান তালে এগিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা আমাদের স্বাধীনতা

দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরা এক সাগর রক্ত দিয়েছি। আর বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আমরা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছি। আমাদের বুকের রক্তে এসেছে স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা এসেছে ভাষার রক্তের ধারা বেয়ে। আমাদের মাতৃভাষা আমাদের মায়ের ভাষা। বাংলা ভাষাকে মুক্ত করে আমরা দেশকেও মুক্ত করেছি। তাই আমাদের ভাষার সাথে আমাদের দেশের স্বাধীনতা গভীরভাবে জড়িত। আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা যতই বৃদ্ধি পাবে আমাদের স্বাধীনতা ততই শক্তিশালী হবে।

হিমালয়ান উপমহাদেশের গংগা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের পলিবাহিত এ পূর্ব এলাকার একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। জনগোষ্ঠী, জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং তার সাথে তাদের ধর্ম একাকার হয়ে গেছে। মানুষের শরীরে রক্ত যেমন মানুষকে জীবিত ও সচল রাখে তেমনি ধর্ম তাকে সমাজে, সভ্যতায়, পৃথিবীতে জীবিত থাকার, সচল শক্তি হিসাবে কাজ করার এবং ইতিহাস সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ধর্মের বিকল্প তৈরি করার জন্য মানুষ দর্শন, সংস্কৃতি, মানবতাবাদ ইত্যাকার অনেক ধারার অবতারণার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী মানুষ জাতিকে মানুষ হিসাবে পরিচালনায় কোনোটাই সক্ষম হয়নি। উনিশ-বিশ শতকে ইউরোপে ধর্মকে বাদ দিয়ে একটা ব্যতিক্রমী চিন্তার জোয়ার উঠিয়েছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। লেনিন-মাওসেতুং-এর মতো বিশ্ব ব্যক্তিত্ব তার ভিত্তিতে একটা ধর্মবিহীন পৃথক মানব সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলার

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র সত্তর বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রাশিয়া, চীন ও পূর্ব ইউরোপে তার ব্যর্থতা এখন বিশ্বের সামনে শিক্ষণীয় হয়ে গেছে। আবার তাকে ফিরে আসতে হয়েছে ধর্মের কাছে। একুশ শতকেও ধর্মকে বাদ দেয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমাদের দেশে ভাষায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, এমনকি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্ম একটা নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। আর এ ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, যার সাথে আমরা মুসলমানরা সম্পর্কিত। আমাদের এ দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ভূমিকা যতটুকু ইসলামের ভূমিকা তার চেয়ে কম নয়। কারণ ইসলাম ও মুসলমানী পরিচয়ের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের এ ভূখণ্ডটি পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সত্তা লাভ করার সময় মুসলমানী পরিচিতির বাইরে বাংলা ভাষার সাথে সম্পর্কিত পার্শ্ববর্তী অন্য একটা ভূখণ্ড এর সাথে মিলিত হয়নি তার অমুসলমানী পরিচিতির কারণে। কাজেই বাংলা ভাষা ও মুসলমানিত্ব দু'টোই এদেশের ভিত্তিভূমির কাজ করেছে।

প্রথম পর্বে ইংরেজের হাত থেকে আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম আমাদের ঈমান ও মুসলমানিত্বের ভিত্তিতে। আর পরবর্তী পর্বে পাকিস্তানী শাসকদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করলাম আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার ভিত্তিতে। কাজেই আমাদের দেশের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখার জন্য বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের দারিদ্র্য ও অক্ষমতা দূর করতে হবে। আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে।

আমাদের ভাষার উপর দিয়ে এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে যখন আমাদের ভাষার প্রতি আমরা নির্লিপ্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা ভাঙা গড়ায় অন্যেরা তাদের কারিগরি কুশলতা ব্যবহার করে ভাষাটাকে তাদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে, অথচ এটা আমাদের ভাষা। গত সাত আটশো বছর থেকে এ ভাষাটাকে গড়েপিটে আমরা একে আমাদের ভাষা করে নিয়েছিলাম। 'আমরা' এবং 'আমাদের' শব্দ এজন্য ব্যবহার করছি যে, এদেশে ইসলাম আসার পর থেকে আমাদের জীবনধারার সাথে সাথে ভাষার ক্ষেত্রেও আমাদের ভূমিকা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এ ভাষাটাকেই আমরা আমাদের ঈমানের বাহনে পরিণত করেছিলাম। এ ভাষাই হয়ে উঠেছিল আমাদের তৌহীদী চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের বাহন। আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম যেমন- ইসলামী ও কুরআনী বিধান মোতাবিক চলতো তেমনি এ ভাষা হয়ে উঠেছিল সেই সমস্ত বিধানসম্বলিত শব্দাবলীর ভাণ্ডার। এ ভাষা পুরোপুরি আমাদের মুসলমানী সত্বা ধারণ করেছিল। কুফরী ও শিরকী পরিবেশবর্জিত এ ভাষার চেহারাটাই আলাদা হয়ে ফুটে উঠেছিল।

এটা ছিল আমাদের ভাষা। আমাদের মায়ের বুলি মায়ের ভাষা। যে ভূখণ্ডে বাংলাদেশের অবস্থান সেই ভূখণ্ডের বাংলা ভাষা, অন্য ভূখণ্ডের বাংলা ভাষা নয়। এ ভূখণ্ডের বাংলা ভাষার জন্য আমাদের ছেলেরা রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত প্রাণ দিয়েছিল, অন্য ভূখণ্ডের অন্য দেশের বাংলা ভাষার তাঁরা প্রাণ দেননি।

www.pathagar.com

এ ভূখণ্ডের বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট কী? এ ভূখণ্ডে নব্বই ভাগ মুসলমানের বাস। তারা এ এলাকার আদি অধিবাসী। হাজার, দু'হাজার, তিন হাজার, পাঁচ হাজার বছর থেকে এ এলাকায় যে ভাষার প্রচলন হয়েছে, স্বাভাবিক ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে এখানে যে ভাষা কাঠামো গড়ে উঠেছে, শত বিভিন্নতার মধ্যেও তার একটা একক রূপ আছে। এ এলাকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরাই তার ধারক। এ ভাষা থেকে তাদের এ মুসলমানিত্বকে আলাদা করা যাবে না। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বদ্বীপের অধিবাসীদের এ ভাষা-রূপের বিশিষ্টতা হচ্ছে, তারা তাদের কাজে-কর্মে কথাবার্তায় এ ভাষাই ব্যবহার করে আসছে। এ ভাষায় তাদের ঐতিহ্যাশ্রিত আরবী, ফারসী, তুর্কী ও উর্দু শব্দের ব্যাপক প্রচলন আছে।

উপমহাদেশের মুসলমানদের আর একটা ভাষা উর্দু যেমন হিন্দী ও প্রকৃত ভিত্তিভূমিতে (Background) আরবী, ফারসী ও তুর্কী শব্দাবলীর সহায়তায় মুসলমানদের ভাষা হিসাবে গড়ে উঠেছে ও বিকশিত হয়েছে ঠিক আমাদের এ বাংলা ভাষাও তেমনি আদি বাংলা তথা প্রকৃত ও অপভ্রংশ ভিত্তিভূমিতে আরবী, ফারসী, তুর্কী ও উর্দু শব্দসম্ভারে ভরপুর হয়ে বিকশিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনামলের পূর্বে মুসলমানরা যখন এদেশ শাসন করছিল তখন এ শব্দাবলী বিপুলভাবে এ ভাষাকে প্রভাবিত করে। কেবল রাজকার্য পরিচালনায় নয়, আমাদের আকিদা, বিশ্বাসে ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজকর্মে তৌহীদী বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপনে এসব শব্দ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যেমন- ভগবান ও ঈশ্বরের ধারণা মুসলমানী জীবনে আল্লাহ, খোদা, ইলাহ, মাবুদ, রব, মালিক, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি শব্দ রূপ নিয়েছে, পূজা, উপাসনা, আরাধনা ইত্যাদি শব্দ ইবাদত, বন্দেগী, নামাজ, সালাত ইত্যাদি শব্দ রূপ গ্রহণ করেছে। উপবাস ও অনশনব্রত রূপ নিয়েছে রোজা বা সিয়াম শব্দে, তীর্থযাত্রার পরিবর্তে হজ্জ্ব পালন শব্দের প্রচলন হয়েছে। দান, খয়রাত, সাদকা, জাকাত ইত্যাদি শব্দ মুসলমানদের অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ পরিচিতি বহন করেছে।

বিশেষ করে মুসলমানী জীবনের পদে পদে হালাল ও হারামের যে পার্থক্য বোধ গড়ে উঠেছে তার ফলে প্রয়োজনীয় ও যুতসই শব্দাবলীরও সমাবেশ ঘটেছে। পাক-পবিত্রতা মুসলমানের জীবনের একটা বিশিষ্ট অংশ। এজন্য অসংখ্য শব্দভাণ্ডার— যেমন- তাহারাত, নাজাসাত, নাজাসাতে গালীজা, নাজাসাতে খাফীফা, অযু, গোসল, তায়াম্মুম, হায়েজ, নেফাস ইত্যাদি শব্দের সমাবেশ ঘটেছে।

এভাবে ইসলামী বিধান ও শিক্ষা অনুযায়ী জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য মুসলমানরা নিজেদের জীবনাচারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা সবক্ষেত্রে অসংখ্য আরবী, ফারসী, তুর্কী শব্দের সমাবেশ ঘটায়। এগুলো তাদের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তার পরিচায়ক। কুফরী ও শিরকী থেকে দূরে অবস্থান করার ধারক এগুলো। এগুলো থেকে তাদের আলাদা হয়ে যাওয়া মানে তাদের শিরকী ও বিদাতী জীবনধারা থেকে আমরা ফিরে এসেছি। আমরা ইসলামী ও মুসলমানী জীবন গঠন করেছি। এটা আমাদের

www.pathagar.com

ইতিহাসের অংশ। আমাদের দেশ-ভূখণ্ড এলাকা যে রূপ ও আকার-আকৃতি গঠন করুক না কেন, আমরা আমাদের কোনো মুসলিম ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন রূপ ও নতুন মানচিত্র তৈরি করি না কেন, আমাদের এ ইতিহাসের কোনো পরিবর্তন নেই। এ ইতিহাস যদি আমরা ভুলে যাই এবং এ সংস্কৃতি থেকে যদি আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় তাহলে আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তাও একদিন অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে।

তাই আমাদের বাংলা ভাষার আসল রূপকে আমাদের সংরক্ষণ করতে হবে। তার পরিচর্যা করতে হবে। সেই আসল রূপের ভিত্তিতে তাকে বিকশিত করতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাষাকে যদি আমরা যাদুঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দেড়শ' বছর আগে আমাদের গোলামীর যুগে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বসে কিছু সংকীর্ণমনা এদেশি আর কিছু অতি উৎসাহী বিদেশি পণ্ডিতের আঁতাতে তৈরি করা পৌরাণিক শব্দাবলীর ভাঁড়ারে আমাদের ঢুকিয়ে দেয়াকে যদি আমরা বাস্তবসম্মত ও মর্যাদাজনক বলে মেনে নিয়ে তার উপর সন্তুষ্ট থাকি তাহলে আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তা অবশ্যই প্রশ্নবিদ্ধ হবে। অবশ্যই চৌদ্দ শতকে স্বাধীন সুলতানী আমলে আমাদের মাতৃভাষা মৃত্যুশয্যায় শায়িত বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করে যখন আমরা নতুন জীবন দান করেছিলাম, তখনই তাকে আমরা আমাদের জাতিসত্তার অংশে পরিণত করেছিলাম। এখন আবার এই ফোর্ট উইলিয়ামী চক্রান্তের কবল থেকে অবশ্যই আমাদের মুক্ত হতে হবে আমাদের দেশের এবং জাতিসত্তার স্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে। এজন্য আমাদের ভাষার স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে হবে। এর বানান রীতি ও উচ্চারণ রীতির স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রয়োজনে পৌরাণিক ভাষার বাহুল্যবর্জিত এর নিজস্ব সহজ ব্যাকরণ রীতি প্রণয়নে উদ্যোগী হতে হবে।

এভাবে অন্যের দখলমুক্ত করে আমাদের ভাষাকে আমাদের দখলে রাখতে হবে। তাহলেই এ ভাষার জন্য আমাদের প্রাণ দান ও রক্ত দান যথার্থ প্রমাণিত হবে। একটি দেশের ও জাতির স্বাধীনতা কেবলমাত্র একটা স্বাধীন ভূখণ্ড নয়। একটা স্বাধীন ভূখণ্ড পরিচালনা করা হয় একটা স্বাধীন রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে। তেমনি স্বাধীন অর্থনীতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতি অন্য দেশের কাছে বন্ধক রেখে বেশি দিন কোনো দেশ তার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারে না।

এগুলোর চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় ভাষা, বিশেষ করে ভাষা যখন দেশের স্বাধীনতার একটা ভিত্তি। কাজেই আমাদের বাংলা ভাষার স্বাধীন সত্তা পুরোপুরি বজায় রাখতে হবে। আজ এ কথা মোটেই সঠিক অর্থে বলা হয় না যে ফোর্ট উইলিয়ামী চক্রান্তের পর বাংলা ভাষা একটা স্থিতিশীল রূপ নিয়েছে। কোনো চক্রান্ত স্থিতিশীলতার জন্ম দেয় না। স্থিতিশীলতার সম্পর্ক জনমানসের সাথে। এ চক্রান্ত মুসলিম জনমানস বিরোধী। আর এ চক্রান্তের ধারা এখনো শেষ হয়নি। এখনো এ চক্রান্ত বহুমুখীভাবে এগিয়ে চলছে, বিশেষ করে বানান রীতিতে মুসলিম ধারাকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করা হয়েছে। কাজেই জাতিগতভাবে আমাদের এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

www.pathagar.com

আমাদের সাহিত্য কি আমাদের জীবন থেকে আলাদা হবে?

আমরা যে জীবন যাপন করি আমাদের সাহিত্য তা থেকে আলাদা হবে কেমন করে? আমরা যদি ঈমানী জীবন যাপন করি, আমরা যদি এক আল্লাহে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা যদি মনে করি আল্লাহর অনুগত জীবন যাপন করা ছাড়া আমরা মুসলমান থাকতে পারি না, তাহলে আমাদের জীবনধারাও সেভাবে গড়ে উঠবে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশও সেপথে এগিয়ে চলবে।

তবে আমরা যদি যা বিশ্বাস করি তার উল্টো পথে চলি, মুখে যে কথা বলি করি তার উল্টো কাজ, তাহলে আমাদের জীবনধারা হবে বিকৃত। পরস্পর বিপরীতধর্মী নানান কাজে অকাজে ভরে উঠবে আমাদের জীবনের আঙিনা। আমাদের বাগানে নানা বর্ণের ফুল ফুটবে। কোনো ফুলে সুবাস থাকবে। কোনো ফুলে সুগন্ধ থাকবে না। কোনো ফুলে দুর্গন্ধ ছুটবে। আবার এমনও হতে পারে হয়তো সব ফুলই নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ বিপরীতধর্মিতার কোনো পরিমাপ করা যাবে না। ঈমানের যেমন একটা শক্ত ভিত আছে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ ও সুস্পষ্ট চেহারা আছে, বিপরীতধর্মী কর্মকাণ্ড যেসব বিশ্বাস অবিশ্বাস বা নড়বড়ে বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সেগুলোর তেমন কোনো শক্ত কেন্দ্র বা ভর থাকে না। কাজেই তার ফলাফলগুলো বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল হয়। তা কোনো সুস্থ সবল জীবনধারা গড়ে তুলতে পারে না। সেটা কোনো সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের উৎসমুখ হয়ে ওঠে না, বরং সেখানে গড়ে ওঠে একটা সংঘাতমুখর জীবনধারা। অবিরাম বিপরীতধর্মী সংঘাতে জীবনের সমস্ত সদিচ্ছা ও সৎ সাংস্কৃতিক গুণাবলীর বিনাশ সাধিত হয়।

www.pathagar.com

ঈমান যদিও বাড়ে ও কমে— কোনো চোর যখন চুরি করে তখন তার ঈমান তার থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু যখন সে আবার খালেস দিলে তওবা করে এবং সর্বান্তকরণে অনুতপ্ত হয় তখন তার ঈমান আবার তার মধ্যে ফিরে আসে। সে আবার শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পারে। এভাবে ঈমানী জীবন যার মধ্যে বিপরীতধর্মিতা টিকে থাকতে পারে না তা আমাদের জীবনকে কেবল শক্তিশালীই করতে থাকে। আর যে ঈমানী জীবনের মধ্যে বিপরীতধর্মিতার অনুপ্রবেশ ঘটে, মুখে আল্লাহে বিশ্বাস, কিন্তু আল্লাহ যাতে অসন্তুষ্ট হন এমন সব কাজ করে, আল্লাহ কি চান তা জানার আগ্রহ নেই এবং কোনোভাবে জানতে পারলেও তার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বিপরীত কাজে ডুবে যায়, সে জীবনে কোনো শক্ত ভিত গড়ে ওঠে না।

বাংলাদেশে আমরা যে সাহিত্য চর্চা করছি এর ভিত কি আমাদের জীবন থেকে গড়ে উঠেছে? হাজার দেড় হাজার বছর পূর্বের আমাদের সাহিত্যের যে প্রাচীন নিদর্শনগুলো আমরা চর্যাপদে নাথপন্থী ও ছদ্মবেশী বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিকপন্থী কবিদের রচনায় পাই তার নিগূঢ় অধ্যাত্মতত্ত্বের সাথে আমাদের ঈমানী জীবনধারার কতটুকু সামঞ্জস্য আছে? আমরা দেখি অনেক মুসলিম কবিও এই তান্ত্রিক মরমীবাদে অবগাহন করতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও আমাদের একদল কবি মুসলিম মরমীবাদের ছোঁয়া পেয়েছেন। আর আজ আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের বিশাল অংশ বস্তুবাদ, ভোগবাদ ও এক আল্লাহর আনুগত্য বিরোধী নৈরাজ্যবাদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন। তাদের সাহিত্যে মুসলিম জীবন ধারার স্পর্শ নেই।

ইতিহাসের যে যুগে মানুষের জ্ঞান যে পর্যায়ে ছিল সে পর্যায়ে সে তার জীবনকে সুগঠিত করেছে। তার সাহিত্যও সেভাবে গড়ে উঠেছে। মানুষের জ্ঞান চর্চা গলদ যেমন তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে তেমনি তার সাহিত্যও সেই গলদের মধ্য দিয়ে শাখা-প্রশাখার বিস্তার লাভ করেছে।

আল্লাহর নবীর আগমনের পর এবং জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর হবার পর আবার আমরা আধুনিক অন্ধকারের মধ্যে ডুব দেবো কেন? কেন আমাদের সাহিত্যকে আমরা নবুওয়াতের আলোয় আলোকিত করবো না? এ আলো হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তার প্রতিবিধানের রূপ।

কাজেই আমাদের সাহিত্য হবে সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদমুখর। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের সমস্ত সাহিত্যধারাকে আমরা এই মানদণ্ডে বিচার করবো এবং এরি ভিত্তিতে আমাদের জীবনসম্পৃক্ত সাহিত্যধারা গড়ে তুলবো।

www.pathagar.com

ইকবাল সাহিত্যের আদর্শ

মানুষ নিজে সৃষ্টি হয়নি। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের স্রষ্টা তাঁর ইচ্ছামতো মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এই বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিস মানুষ ব্যবহার করছে। এগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতাও তার আছে। এ থেকে বোঝা যায়, এগুলো সেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সেই একজন স্রষ্টা মানুষকে দুনিয়ায় চলার জন্য জীবনবিধানও দিয়েছেন। মানুষের নিজের প্রকৃতি এবং বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিসের প্রকৃতি, শক্তি, প্রবণতা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই জীবনবিধান তৈরি করা হয়েছে। তাই এর নাম ইসলাম অর্থাৎ সেই স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ এবং যেভাবে তিনি চলার বিধান দিয়েছেন সেভাবে চলা। জীবনের কোনো ক্ষেত্রকে তিনি এই বিধানের বাইরে রাখেননি। কোনো ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনভাবে চলার অনুমতি দেননি। কারণ সকল ক্ষেত্রে যদি স্বাধীনভাবে চলা হয় তাহলে সমস্ত জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেবে। জীবনের একটি ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য কার্যকলাপ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের সামঞ্জস্য বিনষ্ট করবে।

এ বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করলে বোঝা যায়, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রবণতা সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাহিত্য প্রবণতা। এই সাহিত্য প্রবণতার চাহিদা পূরণ করার জন্য তিনি বিধানও দিয়েছেন। কুরআনে তিনি এই সাহিত্য প্রবণতাকে সঠিক পথে চলার জন্য দিকনির্দেশ দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে—

www.pathagar.com

'বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। কারণ তারা উদ্‌ভ্রান্ত পথহারাদের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এবং তারা যা করে না তাই বলে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে বারবার আর জুলুমের প্রতিবিধান করে। (শু'আরা : ২২৪-২২৭)

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ প্রবণতাটাকে সঠিক পথে চলার ব্যবস্থা করেছেন। নবী তাঁর যুগের এক জাহেলী কবির কবিতার একটি চরণ– আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহু বাতিলু অর্থাৎ 'জেনে রাখো আল্লাহ ছাড়া বাকি সবই মিথ্যা'– উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, এই কবির এই চরণটি সত্য। একদিন সাহাবী শারীদ রা. নবীর পেছনে সওয়ার ছিলেন। নবী স. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উমাইয়া ইবনে আবিস্ সাল্‌তের কোনো কবিতা জানো? তিনি বললেন, জানি। আদেশ করলেন, তাহলে একটি শোনাও। শারীদ উমাইয়ার একটি কবিতা শোনালেন। বললেন, আর একটি শোনাও। তিনি আর একটি শোনালেন। বললেন, আর একটি। এভাবে একটি একটি করে একশ'টি কবিতা শোনালেন। অন্য একদিন সাহাবী আবু সাঈদ খুদরীর রা. সাথে তিনি যাচ্ছিলেন 'আরজ' এলাকা দিয়ে। পথে এক কবি তার (অশ্লীল) কবিতা আবৃত্তি করতে করতে চলছিলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, ধরো শয়তানটাকে অথবা আটক করো শয়তানটাকে।

তারপর বললেন, 'মানুষের পেট এ ধরনের কবিতায় ভর্তি থাকার চাইতে বমিতে ভরে থাকা ভালো।'

এভাবে নবী নিজেই সাহিত্যের দিকনির্দেশ করেছেন। বিগত চৌদ্দশো বছর ধরে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায় যে সাহিত্য চর্চা করেছেন, সেখানে রসূলের এই দিকনির্দেশনাই মোটামুটি তাদের সামনে থাকে। এটাই তাদের জন্য আলোকবর্তিকা। তাই বিশ্বাসহীনতা, অনাচার, নৈরাজ্য তাদের সাহিত্যে আদর্শ হতে পারেনি। এদিক দিয়ে বিশ শতকের সাহিত্য অংগনে ইকবালই ইসলামী আদর্শের সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামী আদর্শের কারণে ইকবালের সাহিত্যে যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে সেদিক দিয়ে বিচার করে বলা যায়—

এক. ইকবালের সাহিত্য পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের জন্য। তিনি কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ গোষ্ঠীর ও জাতির জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। মর্দে মুমিন তাঁর আদর্শ, মুসলমান জাতির একজন সদস্য হিসাবে নয়, বরং আল্লাহর নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ বান্দা হিসাবে কাজ করেছেন। জাতি বা ন্যাশন বর্তমান বিশ্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ ও ট্রাডিশনের সাথে তাকে যেভাবে সংযুক্ত করা হয়, মুসলমান আসলে সে অর্থে কোনো জাতির নাম নয়। মুসলমান শব্দটিও এসেছে 'ইসলাম' ও 'সালাম' শব্দ থেকে। এর অর্থ হয় মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর অনুগত হওয়া এবং তাঁর নির্দেশ মতো জীবনের পথ পরিক্রম করা। এই অর্থে মুসলমান সংকীর্ণ 'জাতি' শব্দের গণ্ডীর আওতায় পড়ে না। আর মুমিনের তো কোনো বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হবার প্রশ্নই ওঠে না।

www.pathagar.com

দুই. ইকবালের সাহিত্যে বিশ্বাসকে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবনের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও লয় তিনটিই আমাদের প্রতি বিশ্বাস ও ঈমানেরই ফল। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া এ তিনটির কোনো অস্তিত্বই নেই।

তিন. মানুষ যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, যে সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে শোষণ ও নিপীড়নের ধারাকে মানবিক মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে এবং সমাজ ব্যবস্থায় যে বৈষম্য, জুলুম, বিদ্বেষ ও স্বার্থপূজার প্রচলন করেছে ইকবাল তার পুনরমূল্যায়ন করতে চান এবং তাকে নেকী, সততা, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সুগঠিত করার পরামর্শ দেন।

চার. ইকবাল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে চান। তিনি বলেন—

'মিল্লাতের সংযোগেই ব্যক্তির অস্তিত্ব
একাকী কিছুই নয়,
তরংগ প্রাণবন্ত সাগরের বুকে
সাগরের বাইরে কিছুই নয়।'

ব্যক্তি যেন এত বেশি ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে যায় যা তাকে ডিক্টেটরের আসনে বসিয়ে দেয়, আবার সমাজ ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করে ব্যক্তিকে সমাজের একান্ত দাসে পরিণত করতে না পারে, এদিকেও ইকবাল দৃষ্টি রেখেছেন।

পাঁচ. প্রত্যেক ব্যক্তি মূলত একটি স্বাধীন ও পূর্ণাংগ সত্তা। তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে একটি উদ্দেশ্যে ও লক্ষে পৌঁছার জন্য। এই লক্ষে পৌঁছাতে হলে তার নিজস্ব গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে তাকে উত্তরোত্তর অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। আল্লাহর দুনিয়ায় কারোর সে বান্দা নয়। সে একমাত্র আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সে মাথা নত করে না। আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার সব কিছুর গোলামী অস্বীকার করার ক্ষমতা ব্যক্তিকে পূর্ণাংগ মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত করে এবং এভাবেই সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হয়।

বলা যায়, সাহিত্য ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারাকে ইকবাল কেবল পুনরুজ্জীবিতই করেননি, প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। আধুনিক বিশ্বে ফরাসী বিপ্লব ও রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লব সাহিত্যকে যে ভাবধারা সরবরাহ করেছে তা মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়নি। বিশ্বব্যাপী তা এক বিশ্বাসহীনতা এবং তা থেকে সৃষ্ট নৈরাজ্যের প্লাবন ডেকে এনেছে। সে ক্ষেত্রে ইকবালের সাহিত্যের আদর্শ মানুষকে বিশ্বাসী, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্মঠ হবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। তাই বিশ্বব্যাপী ইকবালের কদর বেড়ে যাচ্ছে। এই উপমহাদেশে ও এশিয়া আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর সীমানা পেরিয়ে শুধু ইংল্যান্ড ও জার্মানীতেই নয়, ফ্রান্স ও রাশিয়াতেও ইকবালের সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কবির সমকালীন বিশ্ব তাঁর কবিতাকে যথার্থ মর্যাদা দেয়নি বলে কবি মোটেই ক্ষুব্ধ ছিলেন না, বরং তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, আগামীর বিশ্ব তাঁর কবিতার মর্ম

www.pathagar.com

বুঝতে পারবে এবং তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দেবে। কবির এ আশা আজ পূরণ হয়েছে এবং হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের দেশে জাতীয় পর্যায়ে ইকবাল সাহিত্যের চর্চার বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিগত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যতটুকু চর্চা শুরু হয়েছিল পরবর্তী সময়গুলোতে তার ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থেকেছে মনে হয়, ইকবালের রাজনৈতিক আদর্শের একটা বাহ্যিক খোলসকে এখানে অনর্থক বড় করে দেখাবার প্রবণতা কাজ করেছে। কালের গতিময়তা ও চিরন্তনতায় তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়নি। তাঁর সাহিত্যের আদর্শ আজ যেখানে বিশ্ব সাহিত্যের আদর্শ হবার যোগ্যতায় অভিসিক্ত হতে চলেছে, সেখানে আমরা তা থেকে দূরে থেকে নিজেদের ক্ষতির পসরা কেবল বাড়িয়েই চলেছি।

ইকবাল চিন্তার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, ইকবাল শুধু একজন কবিই নন, একজন দার্শনিক এবং চিন্তাবিদও। কিশোর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। প্রথম বয়সে তাঁর চিন্তায় যে অপরিপক্বতা ছিল তাঁর সে সময়কার কবিতাগুলোতে তার ছাপ রয়েছে। ধীরে ধীরে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তিনি পরিচিত হতে থাকেন এবং জীবন, জগত, মানুষ, সৃষ্টি, কর্ম, কর্মফল ইত্যাদি জীবনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হতে থাকে।

জীবন তাঁর কাছে এমন এক শক্তির নাম যা অনবরত গতিশীল থাকে। আর গতিশীলতার মধ্য দিয়েই সে উন্নতির সোপান অতিক্রম করতে থাকে। কিন্তু যে শক্তিটি জীবনকে গতিশীল রাখে এবং তার অস্তিত্বকে অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে টেনে বের করে এনে জীবনের ক্রমোন্নতির পর্যায় অতিক্রম করায় সেটি হচ্ছে তার খুদী বা অহংবোধ। ইকবাল চিন্তা ও ইকবাল সাহিত্যের দু'টি কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে, মানুষের জীবনের সীমাহীন সম্ভাবনা এবং বিশ্বজাহানের উপর মানুষের প্রাধান্য। আর এ দু'টিরই পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে তার খুদী। মানুষের এই খুদীর অন্তরনিহিত শক্তিকে আল্লাহ কুরআন মজীদে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

'মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর কালক্রমে সে হয়ে উঠেছে একজন প্রচণ্ড বিতর্ককারী।' (আন নাহল : ৪)

এর মানে হচ্ছে, নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা, নিজের কথা ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বীকৃতি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে নেয়া এবং প্রতিপক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা তার রয়েছে। মানুষের এসব অভ্যন্তরীণ শক্তি ও গুণাবলী মূলত তার খুদীরই অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষের মধ্যে তিনি এ ধরনের খুদীর শক্তি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ইকবালের মতে দুনিয়ায় চলছে একটি নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এখানে সংঘাত- মুখরতা, কঠোর পরিশ্রম ও লাগাতার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের নামই জীবন। কবি মানুষের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা শক্তিগুলোকে সচেতন করে তাদেরকে দুনিয়ার এই কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজে

www.pathagar.com

লাগাবার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ শুধুমাত্র এই দুনিয়ায় জন্ম নেবার কারণেই একজন মানুষ জীবন লাভের হকদার হয়ে যায় না, বরং তাকে নিজের শক্তি ব্যবহার করে এই দুনিয়ায় স্থান করে নিতে হয়। এভাবে সে নিজের জীবন লাভের প্রমাণ পেশ করে। তুচ্ছ বালুকণাও যদি প্রেমের পাঠ গ্রহণ করে জীবন সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে তার আভায় চন্দ্র ও সূর্যের ঔজ্জ্বল্যও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কবির ভাষায়—

'প্রেমের অক্লান্ত প্রয়াস যাকে দেয় উড়ে বেড়াবার স্বাদ
সে তুচ্ছ বালুকণাও করতে পারে চন্দ্র ও সূর্যকে বিধ্বস্ত।'

ইকবালের মতে জীবন হচ্ছে আশা-আকাঙ্ক্ষার আর এক নাম। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়াই জীবনের কাজ। আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম ব্যাহত হলে জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। আর এই জীবনের মূল পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে খুদী। খুদী হচ্ছে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। খুদী আল্লাহর নূর। সে মানুষের আলস্য ও কর্মবিমুখতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাকে দান করে স্বাধীন কর্মক্ষমতা। আর এটি এমন একটি গুণ যার মাধ্যমে প্রত্যেক বস্তু তার মূল অস্তিত্বের সাথে পরিচিতি লাভ করে এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য-লক্ষ সুলভ, নিম্নমুখী ও তুচ্ছ-নগণ্য না হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য ও লক্ষ যতই উচ্চ, বুলন্দ ও শ্রেষ্ঠতর হবে ততই খুদীর গুণাবলীর মধ্যে ঔজ্জ্বল্য ও শক্তি সঞ্চারিত হবে। কারণ নতুন নতুন ও নিষ্পাপ-পরিচ্ছন্ন উদ্দেশ্য লাগাতার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এবং অশেষ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে। আর জীবন গঠনে আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনাই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তবে খুদীকে যথাযথভাবে লালন করতে হবে। তাকে জীবনের পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত করার জন্য তার লালনকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করতে হবে।

প্রথম পর্যায় আনুগত্য,
দ্বিতীয় পর্যায় আত্মসংযম এবং
তৃতীয় পর্যায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব।

কবি জীবনকে ঝিনুক এবং খুদীকে বহুল প্রত্যাশিত বসন্তকালীন দুর্লভ বারিবিন্দুর সাথে তুলনা করেছেন, যে বারিবিন্দুর পতনে ঝিনুকের গর্ভে দুর্লভ মুক্তো জন্ম নেয় বলে কথিত আছে। কবির ভাষায়—

'জীবন ঝিনুক যেন
খুদী যেন দুর্লভ বারিবিন্দু,
সে আবার কেমন ঝিনুক
বিন্দুকে যে মুক্তো বানাতে অক্ষম!
খুদী যদি হয় আত্মপ্রত্যয়ী
আত্মসংযমী ও আত্মবিশ্লেষক
তাহলে এটাও সম্ভব
মৃত্যু তোমাকে মারতে অক্ষম হবে।'

পার্থিব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলে খুদীকে এই পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

খুদীর সাথে সাথে ইকবাল ফকরকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ খুদীর উন্নয়ন তাকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছানো ফকর ছাড়া সম্ভবপর নয়। ফকরের একটি মানে দারিদ্র্য এবং এর দ্বিতীয় মানে আল্লাহ নির্ভরতা অর্থাৎ অভাব বোধ না করা এবং তা দূর করার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা। এই ফকর সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

'ফকর' তথা অভাবহীনতা ও আল্লাহ নির্ভরতাই অহংকার।'

ইকবাল একে বলেছেন ইসলামের প্রাণ। আর এই প্রাণবস্তুটিই খুদীকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়। ফকরকে তিনি বলেছেন 'যিকির' ও 'ফিকির'-এর সমষ্টি অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে দুনিয়ার শাসনদণ্ড লাভ করা। এভাবে ফকর যখন খুদীকে পূর্ণতার পর্যায়ে উন্নীত করবে তখন—

'খুদীর তরবারি চড়ে যখন ফকরের শান প্রস্তরে
এক সিপাহীর আঘাত হয় একটি সেনাদলের সমান।'

খুদীকে যদি তলোয়ার ধরা হয় তাহলে সেই তলোয়ারের শান প্রস্তর হয় তৌহীদ। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শান প্রস্তরে ঘসে খুদীকে পূর্ণতা দান করতে হবে। এই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা তৌহীদকেই কবি ফকর হিসাবে চিহ্নিত করেছন। কারণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুমিন দুনিয়া ও আখেরাতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর সকল শক্তিকেই অস্বীকার করে এবং দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে এবং তাঁরই উপর ভরসা করে। আর কোনো শক্তিকে সে ভরসার যোগ্য মনে করে না। এই ফকরের শক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার অসভ্য, বর্বর, অশিক্ষিত জাতিদের পুরোধায় অবস্থানকারী আরবরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দুনিয়ার শাসকে পরিণত হয়ে গেলো এবং বিশ্ববাসীকে সভ্যতার শিক্ষা দান করলো।

সবশেষে বলবো, বাংলায় ইকবাল চর্চা আমাদের সাহিত্যের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি করবে এবং তাকে দেবে নতুন দিগদর্শন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব

প্রথমে আমরা সংস্কৃতির সঠিক চেহারাটা তুলে ধরার জন্য ধর্ম, দেশ ও জীবনের সাথে তার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো। তারপর ধর্ম গোষ্ঠীর মাঝে ইসলামের সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং এই সাথে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে তার কার্যকর ভূমিকা আলোচনা করবো।

ধর্ম-দেশ-জীবন

সংস্কৃতির পাশাপাশি আমরা ধর্মের নাম আগাগোড়াই শুনে আসছি। আবার সংস্কৃতির ক্ষেত্র হিসেবে যে দেশ ও মানুষের জীবনকে পাই সেখানে দেখি ধর্মের অবাধ বিচরণ, বরং পৃথিবীর বুকে যেদিন থেকে মানুষের আগমন ঘটেছে সেদিন থেকেই এখানে রয়েছে ধর্মের অস্তিত্ব। ধর্ম মানুষের তৈরি, না মানুষ যেখান থেকে এসেছে ধর্মও এসেছে সেখান থেকে– এ বিতর্কে আপাতত না গিয়েও আমরা বলতে পারি, মানুষের সাথে ধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং ধর্ম ছাড়া মানুষের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। আর সংস্কৃতির সম্পর্ক মানুষের সভ্য জীবন যাপনের সাথে। সভ্য জীবন যাপন এক মানবিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। এজন্য মানুষকে তার জীবন ও ইতিহাসের একটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। তাই আমরা ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্কের মধ্যে একটি অগ্র-পশ্চাতের দূরত্ব দেখি অর্থাৎ ধর্ম এসেছে আগে, তার পরে এসেছে সংস্কৃতি।

এরপর আসে মানুষের জীবনের প্রয়োজনের কথা। ধর্ম এখানে অপরিহার্য। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষের সমাজ, সভ্যতা, লোকাচার ও সমগ্র জীবনের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্ম অর্থে এখানে জীবন যাপনের মৌলিক চাহিদা পূরণের

www.pathagar.com

সাথে সংশ্লিষ্ট একটি অতিপ্রাকৃত চিন্তা, মতবাদ ও ভাবধারার কথাই বুঝাতে চাই, তা যে কোনো পর্যায়ের ও যে কোনো ধরনেরই হোক না কেন। এই অতিপ্রাকৃত ভাবধারা ও বিশ্বাস থেকে কোনো যুগের মানুষ মুক্ত থাকতে পারেনি। যেন মনে হয় মানুষের স্রষ্টা বা নির্মাতা কাদামাটি দিয়ে তার যে প্রাথমিক মডেলটি বানিয়েছিলেন তার প্রতিটি পরতে পরতে একে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর মানব সন্তানের প্রতিটি ভ্রূণের মধ্যে অতি সংগোপনে একে সঞ্চারিত করেছেন। কুরআনের আয়াত 'আলাস্‌তু বি রাব্বিকুম? কা-লু বালা'-এর মধ্যে এ কথাটিই বলা হয়েছে। সৃষ্টির আদি যুগে স্রষ্টা সমস্ত মানবাত্মাকে একত্র করে তাদের কাছ থেকে নিজের রব, প্রভু, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, পরিচালক ও সর্বময় তথা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবার স্বীকৃতি আদায় করতে চেয়েছিলেন।

দীর্ঘকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, টানাপোড়েন, অভিজ্ঞতা অর্জন ও সত্যানুশীলনের পর তারা তাঁর রবুবীয়াতের স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই স্বীকৃতি মানুষের শিরা- উপশিরায় ও প্রতিটি রক্তবিন্দুতে সঞ্চারিত। তাই রবের সর্বময় ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস মানুষের হৃদয়তন্ত্রীর প্রতিধ্বনি। মানুষের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞান এই প্রতিধ্বনি শুনতে কখনো ভুল করে না।

অন্যদিকে ইতিহাসের আদিম যুগে মানুষের কোনো সংস্কৃতি ছিল না। মানুষ তখনো মানুষ ছিল, পশু ছিল না। মানুষকে খেতে পরতে হতো। বিচার-বুদ্ধি ব্যবহার করে কাজ করতে হতো। আদিম মানুষের লজ্জাবোধের অভাব ছিল না। তারা লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতো। কুরআনে যেমন তাদের জান্নাত ত্যাগ করে দুনিয়ার বাসস্থানে রওয়ানা দেবার পূর্ব সময়ের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'ওয়া তাফিকা ইরাখসিফানে আলাইহিমা মিঁউ ওয়ারাকিল জান্নাহ—আর তারা দু'জনে জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে শরীর ঢাকতে লাগলো।' (আরাফ : ২২) এ অবস্থায় সংস্কৃতি মানুষের জন্য অপরিহার্য ছিল না। কিন্তু ধর্ম ছিল অপরিহার্য।

দুনিয়ার বুকে মানুষের যে প্রথম জোড়াটির আবির্ভাব হয়েছিল তাদের ইতিহাস একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র 'হেদায়াত' নিয়েই দুনিয়ায় এসেছিলেন। এই হেদায়াত কি? দুনিয়ার বুকে আবির্ভাবের শুরুতেই সত্য ও প্রকৃতি বিরোধী শক্তির সাথে মানুষের যে সংঘাত শুরু হয় তাতে বিজয় লাভ করে সত্য ও প্রকৃতির অনুকূল পথে চলার নির্দেশনাই হচ্ছে হেদায়াত। আল্লাহ বলেন, 'ফামান তাবি'আ হুদায়া ফালা খওফুন আলাইহিম ওয়া লা-হুম ইয়াহযানূন'– 'যারা আমার হেদায়াত অনুযায়ী চলবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং পরে তাদের পস্তাতেও হবে না।' স্রষ্টার এই হেদায়াত অনুযায়ী মানুষ তার জীবন ও সমাজ গঠন করেছে। স্রষ্টার এই হেদায়াতই ধর্ম। পরবর্তী কালে জীবন ও সমাজ গঠনের মাধ্যমে মানুষের যে সুসভ্য জীবন ধারা গড়ে ওঠে সংস্কৃতির উন্মেষ সেখান থেকেই। কাজেই দেখা যায়, ধর্মই সংস্কৃতির মূল উপাদান সরবরাহ করেছে।

এখানে আর একটি বিষয় এড়িয়ে গেলে চলবে না। আমরা আগেই বলেছি, একটি সত্য ও প্রকৃতি বিরোধী শক্তির সাথে সংঘাত নিয়েই

www.pathagar.com

দুনিয়ার বুকে মানুষের প্রথম পদচারণা শুরু হয়েছে। এই সত্যবিরোধী শক্তিকে কুরআনের পরিভাষায় 'তাগূত' বা শয়তান বলা হয়েছে। তাগূতী শক্তি মানুষকে সত্য ও হেদায়াত থেকে বিচ্যুত করার জন্য কঠোর সংকল্পবদ্ধ। কাজেই মানুষ হেদায়াতের সাহায্যে যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে এই তাগূতী শক্তি মানব সমাজের একটি অংশকে হেদায়াত থেকে বিচ্যুত করে তার বিরোধী এক বিভ্রান্ত সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। সংস্কৃতির এই পরস্পর বিরোধী ধারা মানুষের সমাজে প্রতি যুগেই বিরাজিত ছিল এবং আজো আছে।

কেউ কেউ উন্নততর সংস্কৃতি চর্চার উপস্থিতিতে ধর্মের প্রয়োজন বোধ করেন না। আমার মনে হয় আমাদের উপরোক্ত আলোচনা তাদের চিন্তার অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। কারণ ধর্মীয় চিন্তার ভিত্তিমূলকে এড়িয়ে যে সংস্কৃতি চিন্তা গড়ে ওঠে তাকে আমরা ইতিপূর্বে তাগূতী সংস্কৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এর মূলেই রয়েছে ধর্মের অস্বীকৃতি। তবে তাদের এই সংস্কৃতি চিন্তা যথার্থই উন্নততর কিনা তা অবশ্যি বাস্তব প্রমাণ সাপেক্ষ। এখনো দুনিয়ার কোথাও এই সংস্কৃতি চিন্তা স্থিতিশীলতা এবং ধারাবাহিক ও পূর্ণাংগ ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি। বিশ শতকে যে দু'টি বড় দেশে মার্কসবাদের নামে ধর্মবিরোধী সংস্কৃতি চর্চার প্রবল জোয়ার উঠেছিল, সম্প্রতি সেখানে ভাটা পড়ার কথা বহির্বিশ্বে প্রচার হতে শুরু করেছে। সেখানে ধর্মকে বরদাশ্ত করে নেয়ার এবং তাকে একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রবণতা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছে।

এই আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি ঃ

এক. ধর্মই সংস্কৃতির মূল উপাদান সরবরাহকারী।

দুই. ধর্মকে অস্বীকার করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার উন্নততর হবার কোনো প্রমাণ নেই।

সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের কথা আলোচনার পর আমরা আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ও এখানে তুলে ধরতে চাই। সেটি হচ্ছে, মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে দেশ, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কার্যকর ভূমিকা। ধর্ম, আদর্শ এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাধারা সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রীয় সৌধ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নির্মাণে স্থানীয়করণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু এগুলো কখনো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দিক নির্ণয় করে না। যে দিকে সে চলে সেদিকে তাকে চলায় সাহায্য করে এবং তার অলংকার ও শোভা বৃদ্ধি করে।

ইসলামের সাংস্কৃতিক অবস্থান

এবার সাংস্কৃতিক জীবনে প্রথমে ইসলামের প্রভাব নির্ণয় করতে হবে। এজন্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থানটা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। যেহেতু সংস্কৃতি ধর্মের সাথে সম্পর্কিত তাই এক্ষেত্রে দুনিয়ার ধর্ম গোষ্ঠীর মাঝে ইসলামের অবস্থান নির্ণয়ও জরুরী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামই

www.pathagar.com

মানুষের প্রথম, আদিম ও শাশ্বত ধর্ম, এটা ইসলামের দাবী। দুনিয়ার জন্য কোনো ধর্ম এ দাবী করে না। দুনিয়ার প্রাচীন ও বড় বড় ধর্মগুলোর উৎপত্তি হয়েছে চীন থেকে নিয়ে এশিয়ার পশ্চিম ভূখণ্ডের মধ্যে। চীনের কনফুসিয়াস ও তাউই ধর্ম, ভারতের বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম, ইরানের মাজুসী ও জরাথুস্ট ধর্ম, পশ্চিম এশিয়ার ইহুদি ও খৃস্ট ধর্ম ইত্যাদি ধর্ম মূলত আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত ধর্ম। কাজেই এই ধর্মগুলো আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম হবার কারণে একটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। আসমানী কিতাব ও সহীফা সম্বলিত প্রতিটি ধর্মেরই মূল ছিল ইসলাম। মানুষ সেগুলোকে বিকৃত করেছে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। এরপরও তাদের মধ্যে কিছু মূলনীতি অপরিবর্তিত থাকে যেমন কুরআনে 'মারূফ' ও 'মুনকার'–এর পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এর ভিত্তি এখানেই। মারূফ মানে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ভালো হিসাবে পরিচিত ও চিহ্নিত। আর মুনকার মানে সাধারণ মানুষ যাকে খারাপ বলে জানে। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দী ধরে একটি জিনিস মানুষের সমাজে প্রচলিত হয়ে যাওয়ার ফলে তা সমাজে ও মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এভাবে আমরা দেখি ভালো ও মন্দের বেশ কিছু মূলনীতি বিশ্বসমাজে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত। যেমন মিথ্যা বলা, গালি দেয়া, এমন কি কোনো কোনো দেশে ধর্মীয় আচারের অংগীভূত হওয়া সত্ত্বেও মদ পান করা সারা দুনিয়ার সব দেশেই মূলগতভাবে খারাপ কাজ বলে স্বীকৃত। সাধারণভাবে এগুলোকে ঘৃণা করা হয়।

মূলত ইসলামের মূলনীতি ও ভাবধারাই সরবরাহ করেছে বিশ্বমানবতার মূল সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ। একে আমরা এক কথায় বলতে পারি তৌহীদ। তৌহীদী আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে এ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই একে বলা যায় তৌহীদী সংস্কৃতি। মানুষ এর মধ্যে নিজের স্বার্থে যে পরিবর্তন সাধন করেছে তা দিনের পর দিন যুগের পর যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দীর চর্চা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে তৌহীদী সংস্কৃতির বিপরীত মেরুতে চলে এসেছে। এর মধ্যে মানুষের শিরকাত ও অংশীদারিত্ব মুখ্য বলেই একে মুশরিকী সংস্কৃতি বলা যায়। মূলত বিকৃত ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে স্থানীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তাই এই সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় শক্তি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্মবিহীনতা, ধর্মবৈরিতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এগুলোর সৃষ্টি এমন এক কারখানায় যার অবস্থান মানুষের মাথার খুপরির মধ্যে। তবে বিকৃত ধর্মীয় বিশ্বাসই এ কারখানার সব সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। তাই এর যোগসাজশ মুশরিকী সংস্কৃতির সাথে বেশ জমজমাট। তার সাথে বিরোধ কম, ঐক্য বেশি। ইসলামের শিরক ও কুফরী দু'টি ভিন্ন পরিভাষা হলেও অর্থের দিক দিয়ে উভয়কে একই পর্যায়ে রাখা হয়। কারণ শিরকও এক ধরনের কুফরী অর্থাৎ তৌহীদের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব শরীক করে দেয়ার ফলে 'খালেস' তৌহীদের অস্বীকৃতিই প্রকাশ পায়। ফলে তা অস্বীকৃতি তথা কুফরীতে পরিণত হয়। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল কুফর মিল্লাতুন ওয়াহিদাহ— সকল প্রকার কুফরী

www.pathagar.com

অর্থাৎ তৌহীদের বিরোধী সব রকমের ভাবধারা একই শ্রেণী ও দলভুক্ত।'

তাই তৌহীদী সংস্কৃতির বিপরীত সব রকমের সংস্কৃতিকে এক কথায় মুশরিকী সংস্কৃতি বলা যায়।

বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি

বাংলাদেশের একটি অংশ খুব বেশি প্রাচীন না হলেও এর পূর্বে ময়নামতিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। উত্তরে গৌড়ের সভ্যতাও প্রাচীন। এ থেকে প্রমাণ হয়, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং তার পূর্ববর্তীকালেও এখানে সুসভ্য জাতি বাস করতো। তবে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তরে আর্যদের আগমন তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে হলেও বাংলায় তাদের ও তাদের সভ্যতার আগমন দেড় হাজার বছর আগের ঘটনা নয়। আর্যরাই সর্বপ্রথম উপমহাদেশীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের আগমনের পূর্বে আর্যদের আগে ও পরে বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটেছে। আর্য, আর্য-পূর্ব ও আর্য-পরবর্তী সভ্যতার সম্মিলনে এখানে একটি স্থিতিশীল সভ্যতার জন্ম হয়েছে।

এই এলাকার মানুষের প্রাচীন ধর্মমতের সঠিক সন্ধান না পাওয়া গেলেও আর্য পরবর্তীকালে আর্যদের আদি ধর্ম প্রকৃতি পূজা বিরোধী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অবাধ প্রসার এখানে দেখা যায়। ইসলামের আগমনকালে এ দু'টি ধর্মই ছিল এই এলাকায় প্রবল। তবে এ ধর্ম দু'টি যে সময় বাংলাদেশে প্রবেশ করে তখন পর্যন্ত তাদের আসল চেহারা বিকৃতির আর কিছু বাকি ছিল না। আর্যদের মুশরিকী ভাবধারার সবটুকুই তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। প্রকৃতি পূজার সাথে সাথে আর্য ধর্মে পরবর্তীকালে যে মূর্তি পূজার প্রসার ঘটে এই দু'টি ধর্মেও তার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। ফলে বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় গাছপালা, পশু-পাখি ও মূর্তি পূজাই ছিল ঈশ্বর আরাধনার প্রকাশ। এই শিরকীয় ভাবধারার উপর সমাজ সংস্কৃতির ভিত্ গড়ে উঠেছিল। আর শিরকীয় ভাবধারার একটি বিরাট অংশ যেহেতু অযৌক্তিক কল্পনানির্ভর এবং জীবনের যথার্থ বাস্তবতাবিরোধী, তাই সেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বাস্তব সত্যের পরিবর্তে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই কুসংস্কারই সেদিনকার বাংলার সংস্কৃতির আসল পরিচয়।

এই সংগে সামাজিক কাঠামোর দিক দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ সেদিন ছিল উগ্র আর্যবাদীদের কবলে। আর এই উগ্র আর্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার মূল চেহারা ছিল বর্ণবাদী। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, মানুষের হাতে মানুষ লাঞ্ছিত এবং মানুষ মানুষের দাস– এই ছিল সেই সমাজের মূল কথা। আর্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হবার সাথে সাথে আর্য সমাজ ব্যবস্থার এ অনিষ্টকর প্রভাব থেকেও বাংলাদেশের মানুষ মুক্ত ছিল না। হিন্দুস্তানে আর্যদের বিজয় অভিযান শুরু হবার পর বাংলাদেশই আর্যবিরোধী গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় আবাস হিসেবে দীর্ঘকাল টিকে থাকে। কিন্তু উপমহাদেশের এই বিজয়ী সভ্যতা রাজনৈতিক বিজয়ের পূর্ব থেকেই এই এলাকায় তার

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফলে সেনদের শাসনামলের পূর্বে বৌদ্ধদের শাসনামলেও, যাদের ধর্ম ছিল বর্ণবাদের ঘোর বিরোধী, আমরা এদেশে দেখি বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থার দোর্দণ্ড প্রতাপ। পৌত্তলিকতা, শিরক, কুসংস্কার ও বর্ণবাদী সামাজিক রীতি এই ছিল ইসলাম-পূর্ব বাংলাদেশের সংস্কৃতির বুনিয়াদ।

রাজনৈতিকভাবে তের শতকের শুরু থেকে এদেশে ইসলামের আগমন হলেও ধর্ম হিসেবে তার আগমন ঘটেছে অষ্টম শতক থেকেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে বাংলাদেশে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামের সমুদ্রপথে আরব বণিকদের মাধ্যমে খালেস তৌহীদের ভাবধারা বাংলায় প্রবেশ করে ইসলামের একেবারে প্রথম যুগে। গৌড় থেকে নিয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত শিরকের রাজত্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলার মানুষ যথার্থ জীবন সত্যের সন্ধান পায়। ঈসায়ী তের শতকে গৌড়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা বাংলার সমাজে ইসলামের প্রভাব অনুভব করতে থাকি। ইসলামের শাসনের এই প্রথম পর্বে শুধুমাত্র বিদেশাগত কিছু মুসলমানই ইসলামী সমাজের সদস্য ছিলেন না, বরং তাদের সাথে ছিলেন এদেশীয় বিপুল সংখ্যক মুসলমান। এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয় :

এক. মানুষ জানতে পারে তার একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন, সকল গুণের আধার এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর কাজে, তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই।

দুই. তিনি ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার একটি মানদণ্ড দিয়েছেন। সেই মানদণ্ডে সবকিছু যাচাই করে মানুষের জীবনের সমগ্র কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

তিন. মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু কাজ করবে, তার পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকতে হবে। উদ্দেশ্যবিহীন কোনো কাজ সে করতে পারে না। প্রত্যেকটি কাজের একটি ফল আছে। প্রত্যেকটি কাজের জন্য তাকে একদিন স্রষ্টার সামনে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। ভালো কাজ করলে তার পুরস্কার পাবে এবং খারাপ কাজ করলে পাবে কঠোর শাস্তি।

এভাবে ইসলামী ভাবধারা বাংলাদেশের মানুষের জীবনের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে থাকে। তার ওঠা-বসা, চলাফেরা, আচার-আচরণ, অভ্যাস, নীতি-নৈতিকতা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যুর অনুষ্ঠান, লেবাস-পোশাক, আহার-বিহার, খেলাধুলা, আনন্দানুষ্ঠান, অবসর বিনোদন ইত্যাদি জীবনের সকল বিষয় এই ভাবধারা অনুযায়ী গড়ে উঠতে থাকে। আগে যেখানে মানুষ মানুষের সামনে মাথা হেঁট করতো, মানুষ মানুষের পদধূলি মাথায় নিয়ে নিজের জীবন সার্থক মনে করতো এবং মানুষ মানুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে পূজা করতো, সেখানে তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' (তোমার প্রতি আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক) বলে মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। তার হাতে হাত দিয়ে তাকে

www.pathagar.com

সম্প্রীতির বাঁধনে বাঁধতে থাকে। তার সাথে বুকে বুকে বুক মিলিয়ে কোলাকুলি করে হৃদয়ের দূরত্ব কমাতে থাকে এবং বড়-ছোট, উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ খতম করে দিতে থাকে। এভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এ সমাজে বর্ণবাদকে একটি কুয়ার ব্যাঙে পরিণত করা হয়। তওহিদী চিন্তা সাংস্কৃতিক জীবনের সকল কালিমা, মলিনতা ও জড়তা দূর করে তাকে শুচি শুভ্র করে তোলে। বুনিয়াদীভাবে এক আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই– এরই ভিত্তিতে সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠতে থাকে।

ইসলামী সংস্কৃতির আর একটি বুনিয়াদী বিষয় বাংলাদেশের মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সেটি হচ্ছে, তাহারাতের ভাবধারা ও বিধান। বলতে গেলে এ ভাবধারাটি ও এর বিধানগুলো পূর্ববর্তী কুফরী ও মুশরিকী সাংস্কৃতিক জীবন থেকে আলাদা করে এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনেকে সম্পূর্ণ নতুন ধারায় গড়ে তোলে। এমনিতে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ভাবধারা প্রত্যেকটি মানবিক সমাজে ছিল ও রয়েছে। কিন্তু ইসলাম এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ও যথার্থ বাস্তবমুখী ভাবধারা ও বিধান দিয়েছে। গোবর মাখিয়ে ও গোচোনা ছিটিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার রীতিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে, বরং একে মহাঅপবিত্রতা ঘোষণা করেছে। তাহারাত ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য পরিষ্কার পানি এবং পরিষ্কার ও শুকনো মাটিকে মাধ্যম বলে গণ্য করেছে।

পরিচ্ছন্নতার সাথে পবিত্রতার সম্পর্ক রয়েছে। প্রাণীর মল-মূত্র কোনদিন পরিচ্ছন্নতার স্বীকৃতি পেতে পারে না। কিন্তু বাংলার মুশরিকী সমাজে এর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের ভাবধারা বিরাজিত থাকার কারণে সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনে এক অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। চিন্তা ও কর্ম জগতের উপরও এই অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতার প্রভাব কার্যকর হয়। ইসলামের স্বাভাবিক পবিত্রতার বিধান এক্ষেত্রে একটি যথার্থ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলে। এই পরিবেশ মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য গঠনে সহায়তা করে।

পানি দিয়ে অযু ও গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা, পানি দিয়ে পোশাক-পরিচ্ছদ ধুয়ে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা এবং এই ধরনের দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কাজে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য কোনো পূতি-গন্ধময় অপবিত্র জিনিস ব্যবহারের পরিবর্তে পানি ব্যবহারের কারণে জীবন শুচি সুন্দর পবিত্র পরিচ্ছন্ন হতে থাকে। এভাবে তাহারাতের ভাবধারা বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে।

ইসলামী সংস্কৃতির তৃতীয় যে মৌল উপাদানটি জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে সেটি হচ্ছে পরকাল সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তববাদী ধারণা। এদেশীয় মুশরিকী জনজীবনে পরকাল সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তার মধ্যে একটি ছিল, এ দুনিয়াতেই মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য জন্মের পর জন্ম হতে থাকবে। দ্বিতীয়ত স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে পার্থিব জীবনের ভোগ-লালসাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর পরিবর্তে ইসলাম পরকালের জবাবদিহির

www.pathagar.com

ভিত্তিতে এদেশের মানুষের সমগ্র জীবন গড়ে তোলে। দুনিয়ায় মানুষ যা কিছু করছে তার প্রত্যেকটি কাজের জন্য কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কাজটি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী করলে পুরস্কার পাবে এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে করলে পাবে শাস্তি। এই পরকালের জবাবদিহির ভিত্তিতে সমগ্র জীবন গড়ে ওঠার কারণে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি কাজই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী হতে থাকে। ফলে সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাব পড়ে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। কুরআনে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইযা মার্‌রূ বিল্‌লাগবি মার্‌রূ কিরা-মা— তারা চলার পথে কোনো অশ্লীল ও গর্হিত কর্মকাণ্ডের সম্মুখীন হলে ভদ্রভাবে চলে যায়।' অর্থাৎ তারা কোনো নিরর্থক ও বাজে কাজে জড়িয়ে পড়ে না। তাদের প্রত্যেকটি কাজ হয় অর্থপূর্ণ। চিত্তবিনোদন ও অবসর বিনোদনের জন্যও তারা কোনো অর্থহীন আমোদ-আহলাদ ও ফুর্তিতে মেতে ওঠে না। এ থেকে বুঝা যায়, ঠিক এমনিভাবেই বাংলাদেশের মানুষের জীবন হয়ে ওঠে অত্যন্ত ভদ্র ও পরিশীলিত। ইসলামী সংস্কৃতির এটি একটি মুখ্য পরিচয়। এ ভাবধারাটিই মুশরিকী সাংস্কৃতিক জীবন থেকে এদেশের মানুষের জীবনধারাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা এখানে খেলাধুলার কথা বলতে পারি। চিত্তবিনোদনের জন্য খেলাধুলা একটি বিরাট মাধ্যম। ইসলামী সংস্কৃতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এটিও কখনো উদ্দেশ্যবিহীন ও অনর্থক হবে না। যেমন জুয়া খেলা, তাস খেলা। শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে এর কোনো সার্থকতা নেই, ফলে মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনে জুয়া খেলা, তাস খেলা বা এ ধরনের খেলার কোনো স্থান নেই।

এভাবে ইসলামের সাংস্কৃতিক ভাবধারা বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনকে একটি নতুন ধারায় গড়ে তোলে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা বাংলাদেশে প্রতি পদে পদে সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছে। মুশরিকী সংস্কৃতির সাথে বিনা যুদ্ধে কোথাও সে এক ইঞ্চি জমি দখল করতে পারেনি। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিগত হাজার বছরের ইতিহাসে তাকে মূলত তিনটি ফ্রন্ট থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই তিনটি ফ্রন্টের সবচেয়ে প্রবলটি হচ্ছে এদেশীয় মুশরিকী সংস্কৃতি। এর আক্রমণ প্রথম দিন থেকে চলছে এবং এখনো অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম সমাজে ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের পরিমাণ যেখানে যতটা কম, সেখানে এই মুশরিকী সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ততটাই বেশি অনুভূত হয়েছে।

দ্বিতীয় ফ্রন্টটি ছিল মুসলিম শাসক সমাজের। শাসকরা যে খালেস তৌহীদী সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন একটি জগাখিচুড়ি মার্কা তুর্কী, মোগলাই ইত্যাদি ধরনের সাংস্কৃতিক ধারার আমদানী এদেশে করেন, মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনে তার প্রভাব দীর্ঘকাল অনুভূত হতে থাকে। ইসলামী ঐতিহ্য— যাকে ইসলামের পরিভাষা 'শি'আর' বলা হয়, আমাদের এই শাসকদের আমদানী করা সংস্কৃতি কোনোদিন তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। বৃহত্তর ও সচেতন মুসলিম সমাজ কোনোদিন

www.pathagar.com

তাকে নিজেদের 'সাংস্কৃতিক শি'আর' হিসেবে গ্রহণ করেনি। যেমন মোগলদের আমদানী করা বর্ষ শুরুর দিন 'নওরোজ' উৎসব। মুসলিম সমাজে আজো বর্ষ শুরুর দিন কোনো ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে পালিত হচ্ছে না।

তৃতীয় ফ্রন্টটি খুলেছে বিগত দু-তিনশো বছর থেকে। ইউরোপীর শাসকদের এদেশে আগমনের সাথে সাথেই এ ফ্রন্টটির উদ্বোধন হয়। শাসকরা চলে গেছে কিন্তু এ ফ্রন্টটির আক্রমণের ধারা অব্যাহত রয়েছে। মূলত সেকুলারিজম ও নাস্তিক্যবাদ ও ফ্রন্টটির আমদানী করা মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় শক্তি। এই ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আওতাধীনে চলে এসেছে বর্তমানে সারা দুনিয়ার প্রায় সব ক'টি দেশ। কাজেই একে বর্তমান কালের প্রবলতর বা বিশ্বগ্রাসী সংস্কৃতি বলা যায়। আমাদের দেশের মুশরিকী সংস্কৃতির সাথে নীতি ও চরিত্রগতভাবে এর কোনো অমিল নেই। ফলে আমাদের এখানে এর প্রভাব ও প্রভাবের ব্যাপারটা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে ইসলামী সংস্কৃতির বিপরীতে অবস্থান নেয়ার কারণে একে বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা সহজ হয়েছে। ফলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হলেও এর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা আমাদের দেশের জন্যে মোটেই কঠিন হবে না। তাছাড়া পাশ্চাত্য জগতে এই সংস্কৃতির অন্ত্রমূলে যে পচন ধরেছে, তার চেহারা আমাদের দেশে দিনের পর দিন যতই সুস্পষ্ট হতে থাকবে, ততই এদেশের মানুষ এ সংস্কৃতির মোহ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

এই সাংস্কৃতিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারা এগিয়ে চলছে। ইসলামের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো এর গভীরতম প্রদেশে এমনভাবে শিকড় গেড়েছে, যাকে উপড়ে ফেলা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, বরং সঠিক ইসলামী জ্ঞান যত বেশি প্রসার লাভ করতে থাকবে, ততই এই শিকড় মজবুত হতে থাকবে।

www.pathagar.com

শিশু সাহিত্য : আমাদের দেশ ও জাতি গঠনের অংগীকার

ঘটনাটি ঘটেছিল একটি বাসে। দোতলা বাসে। বেশ চড়াসুরে কথার আওয়াজ আসছিল। তার মধ্যে দু'চারটে একটু বিশ্রী ধরনের গালিগালাজও কানে পড়লো। পাশের সিটে তাকিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক কাপড়ে-চোপড়ে তো কেতাদুরস্ত। কিন্তু উত্তেজনায় মুখ থেকে ফেনা ছুটছিল। সামনে পেছনে বেশ কয়েকজন আলোচনায় তাঁর সহযোদ্ধা মনে হলো। গুলিস্তান থেকে মীরপুরের বাস। এক কবির কবিতা আবৃত্তি করছিলেন ভদ্রলোক। শিশু শ্রেণীর কবিতা, না ছড়া। ছড়া এবং ছড়াকার উভয়েরই চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছিলেন তিনি। ছড়ায় একটা মিথ্যা নিয়ে বড়াই করে শিশুমনে আনন্দ সঞ্চার করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন ছড়াকার। আলোচনার মূল বিষয় ছিল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন, দেশকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আকর্ষণ— এসবই ছেলেদের কাছে বিরল সম্পদে পরিণত হতে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের বক্তব্য ছিল, ছোটবেলায় এমন সব কবিতা, ছড়া যাদেরকে শেখানো হচ্ছে, যাদের মন মগজে নীতিকথা, উপদেশমূলক কথা, চরিত্র গঠনের কথা ঢোকাবার প্রয়াসকে অনুৎসাহিত করা হচ্ছে, তারা বড় হয়ে ভালোর দিকে যাবে না, মন্দের দিকেই তো যাবে। ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায়ের পক্ষেই অস্ত্র ধরবে। মানুষের ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত ছিনতাই করবে, লুট করবে। মানুষকে খুন, জখম, হত্যা করবে। তারা দেশ বিক্রি করবে। দেশের স্বাধীনতাও বিকিয়ে দেবে। দেশের মাটিতে দেশবাসীর টাকায় লালিত হয়ে তারা হবে দেশবাসীর শত্রু।

www.pathagar.com

এই ছিল মোটামুটি চিত্রটা। আর এটা সারা দেশের চিত্র। শিশুদের কি পড়ানো হচ্ছে? কি শেখানো হচ্ছে? শিশুরা কি সত্যিকার মানুষ, সত্যিকার দেশপ্রেমিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারছে? পরবর্তীকালে যারা জাতি গঠন করবে, দেশের নাগরিক হবে, জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে তাদেরকে কি সেভাবে তৈরি করা হচ্ছে? আমাদের কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধের মাধ্যমে কি তাদের মধ্যে মানবিক বোধ জাগ্রত করা হচ্ছে? তাদের মধ্যে কি ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিপক্ষে লড়াই করার মনোভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে? সত্যের সংগ্রামে কি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে? মিথ্যার বিরুদ্ধে কি তারা খড়গহস্ত হচ্ছে? আমাদের শিশু সাহিত্য আমাদের শিশু সন্তানদের কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে? এটা একটা প্রশ্ন? বিগত অর্ধশতক ধরে শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে জোরেসোরে এই ধারাটি মশ্ক করা হচ্ছে। কি ফল পেলাম আমরা? কারা এটা করলো? কেন করলো? এ পথে আমরা কেন এলাম? আমাদের জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের সাথে এর মিলটা কোথায়?

আমাদের একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা ও আত্মবিচার করতে হবে। আমাদের ওপর দিয়ে এবং শুধু আমাদের ওপর দিয়ে নয়, বরং সারা পৃথিবীর মানুষের ওপর দিয়ে বিগত শতকের তিন-চতুর্থাংশব্যাপী একটি ঝড় বয়ে গেছে। আদর্শিক ঝড়। সদাচার, সংকর্ম, নৈতিক মূল্যবোধ, পুরাতন ঐতিহ্য, যা কিছু ভালো বলে বিবেচিত হয়ে আসছে, সুদীর্ঘ অতীত কাল থেকে— সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে, একটা বিপরীতমুখী নতুন মনন, নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র বিধি-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। মার্কস এংগেলীয় চিন্তাধারায় লেনিন মাও-এর কর্মধারার মিশেলে যে তরংগ সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের চিন্তাজগতে তার দাপাদাপি চলেছিল সত্তর পঁচাত্তর বছর ধরে। আমাদের দেশে সাহিত্য ও চিন্তার জগতে এর প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। আমাদের দেশে এ চিন্তাকে চিহ্নিত করার জন্য একটা বহুল প্রচলিত শব্দ আছে– বামচিন্তা। যদিও এই বামচিন্তা তার দুই মূল লালনভূমিতে রাশিয়ায় ও চীনে ব্যর্থ ও মৃত ঘোষিত হয়েছে এক দশক আগেই। কিন্তু আমাদের দেশে এর হোতারা কোমর ভেঙে ধপাস করে পড়ে গেলেও বামচিন্তার প্রধান ভিত্তি সেক্যুলারবাদকে পুঁজি করে মাঝে মধ্যে ওঠা বসার কসরত করে যেতে চাচ্ছেন।

কিন্তু তারা আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ করে শিশু সাহিত্যে যে ধ্বস নামিয়ে গেছেন তার প্রতিকার কি? সাহিত্য ক্ষেত্রে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে এই অনাসৃষ্টি অনাচার চলে আসছে। বিশিষ্ট বামপন্থী লেখক দৈনিক বাংলার স্বনামধন্য সম্পাদক মরহুম আহমদ হুমায়ুন রাশিয়ায় ও চীনে সমাজতন্ত্রের পতনের পর সাপ্তাহিক বিচিত্রার এক ঈদ সংখ্যায় এ ব্যাপারে সমীক্ষামূলক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বগোত্রীয়দের জিজ্ঞেস করেছিলেন, সংগঠনের আদর্শ ও নেতৃত্বের কাছে আত্মাহুতি দিয়ে বিগত অর্ধশতক ধরে আমরা জাতীয় আদর্শ উদ্দেশ্যকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার পরিপন্থী যে সাহিত্য সৃষ্টি করলাম তার কি হবে? আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই তো ব্যর্থ

www.pathagar.com

হয়েছে। তবে তিনি একটা বিষয় চিন্তা করে কিছুটা আত্মতৃপ্তিবোধ করেছিলেন যে, আমাদের সাহিত্যে মানবতাবাদের একটা ধারা আমরা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি। এটা বাংলা সাহিত্যে আমাদেরকে টিকিয়ে রাখবে। অথচ মানবতাবাদ আজ একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় শব্দে পরিণত হয়েছে। জালেমের কাছে এর এক অর্থ এবং মজলুমের কাছে আর এক অর্থ করছে। পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের ধ্বজাধারীরা মানবিক অধিকারের সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অর্থ করে যাচ্ছে। তাদের জুলুম নিপীড়ন শাসন শোষণ করার জন্য তারা যা কিছু করে যাচ্ছে, গোলাগুলি করে, মিজাইল নিক্ষেপ করে মানুষ হত্যা করছে, টনকে টন বোমা ফেলে নগর বন্দর জনপদ ধ্বংস করছে— সবই মানবিক অধিকার রক্ষার খাতিরে। এই জঘন্য নিষ্ঠুর মানবিকতা কোন্ রোবট সাইজের হৃদয়হীন মানবের জন্য তা নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপারই সন্দেহ নেই। অথচ মানুষের স্রষ্টা ও রব মহান আল্লাহ মানব প্রজন্মের অতি শৈশবকালেই যখন আদমের সন্তানরা পৃথিবীর বুকে সবেমাত্র পদচারণা শুরু করেছিলেন, মানবতাবাদের যে চার্টার ঘোষণা করেছিলেন তার প্রথম দফাই ছিল - নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কারোর জীবন রক্ষা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো। আল মায়েদা: ৩২।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইলাহী আদর্শের বাইরে গিয়ে যারাই মানবতাবাদের চেহারা দেখতে চেয়েছে তারাই বিভ্রান্ত হয়েছে এবং মানব সভ্যতা বিনাশে সহায়তা করেছে। আমরা আলোচনার মূল বিষয়ে ফিরে এসে বলতে চাই বিগত শতকের কথা। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে আমাদের সাহিত্যে বামধারার প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। এটা আমাদের শিশু সাহিত্য পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এখানে একটা কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার। বাম বলতে আমি এখানে বামচিন্তার মূল দর্শন ধর্মবিরোধিতা, ধর্মবৈরিতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার সবগুলি শাখা প্রশাখার কথা বলছি। মূলত এগুলিই পাশ্চাত্যের চিন্তাদর্শনেরও ভিত্তি। তাই এদিক দিয়ে আমাদের দেশের সেক্যুলার ও বামচিন্তার মূল কাঠামোর মধ্যে বিরোধটা কম। আল্লাহে অবিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের অবস্থান একই সমতলে। আল্লাহ বিশ্বাসে সামান্যতম ত্রুটি থাকলে তা মূলত আল্লাহে অবিশ্বাসে পরিণত হয়। এই আল্লাহে অবিশ্বাসের কারণে শিশু সাহিত্য থেকে আমাদের ঈমান-আকীদা-বিশ্বাস, ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং আমাদের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি মুছে ফেলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আমাদেরকে এক আল্লাহে অবিশ্বাস, সেক্যুলার ও আল্লাহর প্রতি নির্বিকার জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তথাকথিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ একটা শিশু-সাহিত্য তৈরি করা হয়েছে। সেখানে আমাদের কোনো উন্নত আদর্শ নেই। কোনো মহান সর্বশক্তিমান সত্তায় বিশ্বাস নেই। যেখানে একটা শিশুর মনে প্রথমে প্রশ্ন জাগে, আমি কে? আমি কোথায় থেকে এসেছি, কে আমাকে এখানে আনলো? এমনি আরো শত শত, হাজার হাজার প্রশ্ন। এগুলোর কোনো সদুত্তর নেই। এগুলো

www.pathagar.com

সব এড়িয়ে কেবল ছেলেভোলানো আগডুম বাগডুমের মধ্যে শিশু মনকে তলিয়ে দেয়া হয়েছে।

তারপর এই শিশু যতই বেড়ে উঠছে, তার চারদিকের পরিবেশের সাথে পরিচিত হচ্ছে, পশু-পাখি, গাছ-পালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, এদের সৃষ্টি-কৌশল, গঠনশৈলী, বিচিত্র জীবন প্রণালী ও নিয়ম শৃংখলার অনুবর্তিতা দেখে অবাক হচ্ছে শিশু। কিন্তু তার মনের প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজে পাচ্ছে না। সে যেসব বই পড়ছে সেগুলোতে তার প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। তাকে কেবল মনভোলোনো ছড়া কবিতা গল্পের মধ্যে মাতিয়ে রাখা হচ্ছে। বিগত কয়েকশো বছরের বিজাতীয় গোলামীর কারণে আমাদের ধ্বসে পড়া গৃহ ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশেও সে তার যুতসই মনের খোরাক পাচ্ছে না। বিভ্রান্ত হচ্ছে শিশু।

একটা শিশুকে তার ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে আলাদা করা হচ্ছে। তাকে জানতে দেয়া হচ্ছে না সে কোন্ জাতির সুপুত্র। কতবড় গৌরবের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে। তার প্রপিতা পূর্বপুরুষরা দুনিয়ায় কত বড় বড় কাজ করে গেছে। তার ওপর এসে পড়েছে কত বড় কাজ করার দায়িত্ব। একটা অহংকার একটা গর্ব নিয়ে একটা মানুষ ভরপেট না খেয়েও বেঁচে থাকে। একটি শিশু কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? মনের মধ্যে কোন ধরনের অহংকারের বীজ লালন করে বেড়ে উঠবে? কে জোগাবে তার অশেষ জীবনী শক্তি? একমাত্র তার জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্যই সরবরাহ করতে পারে এই জীবনী শক্তি। এই স্বাভাবিক জীবনী শক্তি তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আমাদের শিশু সাহিত্য। পংগু হয়েছে শিশু। একটা শিশু তার মায়ের কোল থেকে এসে বসছে পৃথিবীর কোলে। এই পৃথিবী অনেক বড়। স্কুল, মাদ্রাসা, শিক্ষা নিকেতন, খেলার মাঠ সর্বত্রই অনেক সাথী-সংগীদের সাথে মিশছে কম্পিউটার, তারপর আসছে সে আকেরটা এলাকায়- টেলিভিশন। বিচিত্র সব ঘটনা ও দৃশ্যের সাথে পরিচিত হচ্ছে। দেখছে অনেক কিছু শিখছে অনেক। কিন্তু শিশু বুঝতে পারছে না কোনটি তার? কোনটি তার যথার্থই আপন করে নিতে হবে? শিশু আমাদের আজকের এবং আগামীর শিশু সাহিত্য থাকতে হবে শিশুমন পরিচর্যার এবং সকল প্রকার রোগমুক্ত করে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠন করার প্রয়াস। বৃটিশ শাসন পূর্ববর্তীকালে আমাদের কয়েকশ বছরের শিশু সাহিত্যের ঐতিহ্য আছে। বৃটিশ শাসন উত্তরকালে, বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আমাদের শিশু সাহিত্য তার ঈমানী দৃঢ়তা ও ঐতিহ্যিক উত্তারাধিকার বজায় রেখেছিল। ফলে আমাদের জাতীয় জীবনে বিশৃংখলা কম ছিল এবং জাতীয় পরিচিতিও ছিল সুস্পষ্ট। আমরা মুসলমান, আল্লাহর সত্তায় বিশ্বাসী এবং আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত জাতি ভাবতে গর্ববোধ করতাম। নজরুল ও ফররুখ পর্যন্ত আমাদের এ ঐতিহ্য বজায় ছিল।

তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে
খোদার মদদ ছাড়া
তোরা পরের উপর ভরসা ছেড়ে
নিজের পায়ে দাঁড়া।

www.pathagar.com

আল্লাহর কাছে মদদ চাওয়া এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা ও ঐতিহ্য আমাদের শিশু সাহিত্য থেকে উধাও হয়ে গেছে। ফলে তা আমাদের জীবন থেকেও উধাও হয়ে গেছে। অতীতের সমস্ত ভুল ত্রুটি ধুয়ে মুছে ফেলে আজকের নতুন আংগিকে আমাদের এমন শিশু সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে যার–

প্রথম দফা

আল্লাহর প্রতি ঈমান। এ ঈমানে থাকবে বলিষ্ঠতা। সকল প্রকার মিশেল ও ভেজালমুক্ত অনাবিল স্বচ্ছতা। আল্লাহর প্রভুত্বের কাছে সকল প্রভুত্ব নতি স্বীকার করবে।

দ্বিতীয় দফা

আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ সা. হচ্ছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম আদর্শ। জীবন পথে চলার ক্ষেত্রে আমাদের তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে।

তৃতীয় দফা

আমাদের সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজন হলে-

জীবন দিয়ে রুখবো জুলুম
পাপীর হাতে আর খাব না মার
শহীদ হয়ে মুছে যাবো
সব জালিমের সকল অত্যাচার।

চতুর্থ দফা

আমাদের জীবনকে গড়ে তুলবো ফুলের মতো পবিত্র করে। দেশকে, জাতিকে, মানুষকে ভালবাসবো।

যে আলো তারার বুকে
যে আলো চাঁদের মুখে
সে আলো খোদার দেওয়া
যে আলো লুকিয়ে আছে
খুকুদের মনের মাঝে
ফোটে তা বাসলে ভালো।

মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা ফুটে উঠবে। বিশ্বব্যাপী ঘৃণা ও হিংসার রাজত্বের মধ্যে আমাদের শিশুরা তৈরি করবে ভালবাসার এক বহুকাংখিত জাতি। এভাবে আমাদের শিশু সাহিত্যকে যদি আমরা যথার্থ মানবিক ও ইসলামী ধারায় গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমরা এমন এক গর্বিত উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করতে পারবো যারা হবে আমাদের জাতীয় ভাবধারার আশা-আকাংখার প্রতীক এবং যারা আমাদের দেশ ও জাতির স্বাধীন সত্তাকে অম্লান রাখতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের

একটি অনন্য গ্রন্থ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুসলমানের
প্রথম কাজ

এলেম মানুষের বৈশিষ্ট্য

মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহর দান তার প্রতি অফুরন্ত। দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেকের শক্তি দান করে আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন। কিন্তু মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার দৈহিক ও মানসিক শক্তির কারণে নয়, জ্ঞানই তাকে এ শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করেছে। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞানের দিক দিয়ে মানুষের চাইতে উন্নত পর্যায়ের আর কোনো জীবের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির সামান্য অভাস পাওয়া যায় মাত্র। চর্চার মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের পরিধি অধিক দূর বিস্তৃত করাও সম্ভবপর নয়। একটি নেহাত ক্ষুদ্রতর সীমারেখার মধ্যে তার অবস্থান। যেমন বিভিন্ন মওসুমের আগমনের পূর্বে মওসুমী পাখীরা তা অনুমান করতে পারে এবং সে অনুযায়ী দেশ থেকে দেশান্তরে উড়ে যায়। পিপীলিকা শীতের আগমনের পূর্বেই তার খাদ্য সঞ্চয়ে প্রয়াসী হয়। মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে এবং তা সঞ্চিত করে রাখার জন্যে বাসা নির্মাণ করে। বাবুই পাখী রোদ-বৃষ্টি-ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বাসা তৈরি করে। কিন্তু তাদের সমস্ত জ্ঞানই অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ের। মনুষ্যত্বের জীবকুলের মধ্যে বানর ও শিম্পাঞ্জীর জ্ঞানের পরিধিই মনে

www.pathagar.com

হয় যা কিছুটা বিস্তৃত। কিন্তু তারও চৌহদ্দী বেশি দূর পরিব্যাপ্ত নয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কসরতের পরও তা একটি বিশেষ সীমানা অতিক্রম করতে পারেনি।

কিন্তু মানুষের জ্ঞানের সীমানা বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর। এক কথায় বলা যায় অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় পরিপূর্ণ। মানুষ এক বিশাল সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। একটি সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। আইন ও সংবিধান রচনা করে উন্নততর রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। অর্থনৈতিক বণ্টনে ভারসাম্য স্থাপন করেছে। নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাবার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করেছে। ন্যায় ও অন্যায়ের সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, মানুষ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছে এবং হককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উন্নততর জ্ঞানের অধিকারী মানুষের দল চিরকাল সংগ্রাম করে এসেছে।

মানুষের মধ্যে আবার নবী, রসূল ও পয়গম্বরগণই ছিলেন জ্ঞানের প্রদীপ। তাঁদের নিকট থেকে জ্ঞানের শিখা আহরণ করে অন্য মানুষেরা নিজেদেরকে আলোকিত করেছে। তাঁদের নিকট থেকে সভ্যতা, সংস্কৃতি, আইন, ইনসাফ, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড প্রভৃতি যাবতীয় নৈতিক ও ব্যবহারিক গুণাবলী লাভ করে মানুষ সমাজ জীবন গড়ে তুলেছে। পরগম্বরগণের এই জ্ঞানের একটিই মাত্র উৎস। তাকে বলা হয় অহী। আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো উপায়ে তাঁর পয়গম্বরগণকে এই জ্ঞান বা এলেম দান করেছেন।

জ্ঞানের উৎসে ফিরে যেতে হবে

পৃথিবীতে মানুষকে জীবন যাপনের পদ্ধতি দান করার জন্যে আল্লাহ যুগে যুগে নবীগণের নিকট কিতাব প্রেরণ করেছেন। এ ছাড়াও শয়নে-জাগরণে তিনি নবীগণকে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশ দান করেছেন। এগুলোকে বলা হয় হাদীস বা নবীগণের বাণী। নবীদের এই হাদীস মূলত কিতাবের নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যা হয়ে থাকে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাব-কুরআন ও তাঁর বাণী-হাদীস যেমন অভ্রান্তভাবে সংকলিত ও রক্ষিত হয়েছে এবং আজো অবিকৃত রয়েছে অন্য কোনো নবীর বাণী ও কিতাব সম্পর্কে সে কথা দাবী করা যেতে পারে না। অন্য নবীগণের শরীয়ত ও কিতাবসমূহের বাতিল হওয়ার এটিও অন্যতম কারণ।

এ কারণে বর্তমানে কুরআনই আমাদের নিকট এলেম বা জ্ঞানের একমাত্র প্রামাণ্য উৎস। তাই আমাদের জীবন ও সমাজকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে কুরআনের জ্ঞান লাভ করতে হবে।

www.pathagar.com

বলা যেতে পারে, কুরআনের শিক্ষার বাইরে যে সমাজ গড়ে উঠেছে বা অন্য কথায় অন্যান্য নবীগণের তথাকথিত শরীয়ত, কিতাব ও দ্বীনের ভিত্তিতে গঠিত যে সমাজের রূপ আজ আমরা দুনিয়ার বহু স্থানে প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যে কি সত্য ও ন্যায়ের কোন অংশ নেই? এবং বিশ্বমানবতা কি তার মাধ্যমে কল্যাণের যাত্রাপথে কোনো সাহায্য লাভ করতে পারে না? এ কথার জবাবে বলা যায়, অবশ্যই ঐ সমাজের সবটুকুকেই এক নিঃশ্বাসে অন্যায় ও অসত্য বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে সেখানে কিছু ন্যায় ও সত্য থাকলেও তা অন্যায় ও অসত্যের সাথে এমনভাবে মিশে রয়েছে যে, সেখান থেকে ন্যায় ও সত্যের অংশটুকুকে ছেঁকে বের করে আনা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই দুঃসাধ্য পথে যাত্রা করার চাইতে সহজলভ্য নির্জলা সত্য ও নির্ভেজাল ন্যায়ের পথে যাত্রা করাই অধিকতর বুদ্ধিসম্মত। এছাড়াও বলা যায়, ঐ সমাজে প্রকৃত সত্য ও ন্যায়ের যে অংশটুকু রয়েছে কুরআনের শিক্ষায়ও তা পুরোপুরি উপস্থিত। কাজেই এক্ষেত্রে কুরআনের শিক্ষা ও জ্ঞানই যথেষ্ট।

কুরআনের মূল দাওয়াত একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী

কুরআনের দাওয়াতের প্রথম ও প্রধান কথা হচ্ছে, সমস্ত মানুষ একমাত্র আল্লাহর বান্দাহ। আল্লাহ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন, আহার যোগাচ্ছেন। কাজেই সবাইকে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত, বন্দেগী, পূজা, উপাসনা ও আরাধনা করতে হবে। আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে। তাঁর নির্দেশানুসারে জীবন যাপন প্রণালী গড়ে তুলতে হবে। তাঁর বিধান অনুযায়ী সমাজ-সংস্কৃতির ভিত রচনা করতে হবে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁরই নীতি কার্যকর হবে। সাহিত্য-শিল্প-সভ্যতায় তাঁরই নির্দেশিত মানদণ্ড একমাত্র নিয়ামকরূপে গৃহীত হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর প্রদত্ত কোনো মানদণ্ড, বিধান ও নির্দেশ মানুষের নিকট গ্রহণীয় নয়। আল্লাহবিরোধী যাবতীয় বিধান, শক্তি ও মানদণ্ডকে কুরআনের পরিভাষায় এক কথায় বলা হয়েছে 'তাগূত' অর্থাৎ যা মানুষের প্রকৃতি বিরোধী এবং তার জন্য ক্ষতিকর এক অস্বাভাবিক ও বিদ্রোহাত্মক শক্তি।

আমর বিল মারূফ ও নিহী আনিল মুনকার

আল্লাহর বন্দেগী ও প্রভুত্ব এবং সমস্ত আল্লাহবিরোধী শক্তির প্রভুত্বের অস্বীকৃতির ভিত্তিতে মানুষের যে জীবন ও সমাজ গড়ে উঠবে তার মূলনীতি ও শক্তি হবে 'আমর বিল মারূফ ও নিহী আনিল মুনকার' অর্থাৎ সে সমাজে ন্যায়ের পথ উন্মুক্ত থাকবে আর অন্যায়ের পথ হবে রুদ্ধ। সে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে ন্যায়ের পথে চলা ও অন্যকে ন্যায়ের পথে চালানো নিজের দ্বীনী ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করবে এবং নিজের সর্বশক্তি

www.pathagar.com

দিয়ে অন্যায়ের পথে লৌহ-প্রতিরোধ দাঁড় করাবে। সে সমাজে ন্যায়ের পথে চলা যতটা সহজ ও স্বাভাবিক হবে অন্যায়ের পথে চলাটা হবে ঠিক ততটা কঠিন ও নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম।

সৎকাজ

তৃতীয়তঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথেই কুরআন মানুষকে সৎকাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। এজন্য কুরআন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, জনসেবা ও সমাজ সংস্কারের বিশেষ বিধান দান করেছে। মনে রাখতে হবে মানব কল্যাণের জন্য গৃহীত প্রতিটি ভালো কাজেরই মূল্য আছে।

ন্যায়ের পথে অবিচলতায় ধৈর্য

কুরআনের চতুর্থ দাওয়াত হচ্ছে, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে মানুষ যে সমস্ত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবে ধৈর্যের সাথে তার মুকাবিলা করতে হবে এবং তার উপর অবিচল থাকতে হবে। কুরআন তার এই সমগ্র দাওয়াতের ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে।

কুরআনের সাথে সাথে আমাদেরকে রসূলে করীম স.-এর হাদীস অর্থাৎ তাঁর বাণী, নীতি ও কর্মধারা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হবে। কুরআনের শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এই জ্ঞান আমাদের সহায়ক হবে। কারণ কুরআনের শিক্ষাকে কার্যকর রূপ দান করার জন্যে রসূলে করীম স.-কে পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি নিজের জীবনের সমগ্র কার্যধারার মাধ্যমে এই শিক্ষাবলীকে পূর্ণাংগ ও বাস্তব রূপ দান করেছিলেন।

এই সংগে রসূলে করীম স. ও তাঁর নিজ হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত আলোচনা আমাদের জ্ঞানকে পরিপক্বতা দানে সাহায্য করবে। কুরআন, হাদীস ও এই জীবনচরিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে ইসলামের একটি পরিপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপ ও চরিত্র আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। ইসলামের এই পরিপূর্ণ রূপ ও চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য কুরআন ও হাদীসের চিন্তাধারার ভিত্তিতে লেখা ইসলামের অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবহারিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধানসম্বলিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করাও অপরিহার্য বিবেচিত হবে।

আমলের অপরিহার্যতা

কিন্তু নিছক জ্ঞান লাভ যথেষ্ট নয়। জীবনকে যদি সত্য ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে এই জ্ঞানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তব রূপ দান করতে হবে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান, রসূলে করীম স. ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও চরিত্রের আদর্শ এবং ইসলামের সঠিক বিধানের ভিত্তিতে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে হবে। আমাদের জীবন একটি বিরাট কর্মক্ষেত্র, এখানে নিছক কল্পনা, ভাববাদিতা ও

www.pathagar.com

স্বপ্নবিলাসিতার কোনো স্থান নেই। আমাদেরকে শূন্যে নয়, মাটির পৃথিবীতে বাস্তব জগতে কাজ করতে হয়। এখানে কাজের মধ্যেই আমাদের সাফল্য নিহিত। ভালো কৃষক যেমন তার কৃষি সম্পর্কিত পরিপক্ব জ্ঞান, উন্নত জাতের বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি, প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ-সম্পদ প্রভৃতি নিয়ে চুপটি করে বসে থাকে না, বরং যথাসময়ে মাঠে নেমে পড়ে, পরিশ্রম করে, কৃষির নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করে, কৃষি সম্পর্কিত তার প্রতিটি জ্ঞানকে কাজে লাগায়, তারপরই সে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসলের আশা করতে পারে। আমাদেরও তেমনি নিজেদের জ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। ভালো কৃষকের ন্যায় ইসলামের বীজকে সযত্ন প্রয়াসে সুপুষ্ট চারা গাছে এবং তা থেকে আবার বিশাল মহীরুহে পরিণত করতে হবে। তবেই আমাদের জীবন সত্য-সুন্দর-সমৃদ্ধ হবে। এ জন্যে রসূলে করীম স. দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জীবনের কর্ষণক্ষেত্র আখ্যায়িত করেছেন। এখানে যত অধিক পরিশ্রম করা হবে, ইসলাম সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে যত অধিক বুদ্ধিমত্তা সহকারে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে ততই দুনিয়ার জীবনের সাথে সাথে পরকালীন জীবনের ক্ষেত্রও পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে।

জ্ঞান বিরোধী কর্ম অনভিপ্রেত

এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কর্মবিহীন জ্ঞান যেমন ইসলামের অভিপ্রেত নয় তেমনি জ্ঞান বিরোধী কর্মও মুসলমানের জন্য ধ্বংসকর অর্থাৎ মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করে এবং যার উপর তার দ্বীন ও ঈমানের ভিত্তি গড়ে ওঠে তার বিপরীতধর্মী কোনো কর্মে সে লিপ্ত হতে পারে না। এ ধরনের কর্মকে আমরা এককথায় মুনাফেকী বলতে পারি। মুসলমানের জীবনে মুনাফেকীর কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহর বন্দেগীর অংগীকার করার পর সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'তাগূতে'র বন্দেগীতে লিপ্ত হতে পারে না। ন্যায়ের পথ উন্মুক্ত ও ন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সে কখনো অন্যায়ের পথ উন্মুক্ত ও ন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে না। সৎকর্মের সাহায্যে জীবনকে সুগঠিত ও পরিপুষ্ট করার এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল ধৈর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পরিবর্তে সে অসৎকর্মে আত্মতুষ্টি লাভ করতে পারে না।

জ্ঞান অর্জন করার পর কর্মহীনতা বা নিষ্ক্রিয়তা এবং জ্ঞানের বিপরীত কর্ম বা মুনাফেকী মুসলমানকে দুনিয়ায় ও আখেরাতে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন করে। মুসলমানের দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও শৃংখলা তিরোহিত হয় এবং মানবতার নেতৃত্বের পদ থেকে বিতাড়িত হয়ে সে নিকৃষ্টতর জাতির অধীন ও অনুগত হয়ে পড়ে। আর আখেরাতে তার জন্যে যে অবিমিশ্র ও সীমাহীন শাস্তি অপেক্ষা করে আছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

মানবতার খেদমত

মানবতার খেদমত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। একাজে মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। মুসলমানের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশ্বমানবতার খেদমত। মুসলমান যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমগ্র বিশ্বমানবতাকে তার দিকে আহ্বান করা মুসলমানের নৈতিক ও দ্বীনী দায়িত্ব। সমগ্র বিশ্বমানবতা এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। একমাত্র মুসলমানই তাদেরকে অবধারিত সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হচ্ছে তাদের খোদাবিরোধী চিন্তা ও মতবাদ, তাদের ভোগ-সর্বস্ব পার্থিব জীবন, তাদের বিকৃত সমাজব্যবস্থা, ভারসাম্যহীন, জুলুম ও শোষণভিত্তিক অর্থনীতি এবং তাদের মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড। মুসলমান যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের সম্মুখে সেই সত্য তুলে ধরতে হবে। যে অন্ধকার তাদের দৃষ্টিশক্তিকে সমাচ্ছন্ন করেছে ইসলামের আলোকচ্ছটায় তাদেরকে তার প্রভাব হতে মুক্ত করতে হবে। এজন্যে মুসলমানকে কেবল সত্যানুসারীই নয়, সত্যের আহ্বায়কও হতে হবে। মুসলমান যে কোনো অবস্থায় যেখানেই থাক না কেন, ইসলামকে একমাত্র সত্য দ্বীন হিসাবে স্বীকার করে নেয়ার পর এটিই হবে তার উপর আরোপিত একটি অপরিহার্য দায়িত্ব।

সমাজ সংস্কার

সমাজ সংস্কার মুসলমানের নিজস্ব অংগনে একটি মহত্তম দায়িত্ব। সমাজকে যাবতীয় অনাচার, দুর্নীতি ও চিন্তার কলুষমুক্ত করতে হবে। নিজের গৃহ ও পরিবারের ন্যায় সমাজকেও পাপমুক্ত করার সংকল্পে ব্রতী না হলে পরিশেষে মুসলমানের নিজের গৃহও ঐ পাপে আচ্ছন্ন হতে বাধ্য। সমাজের যাবতীয় কুরীতি, কুপ্রথা, অন্যায়, অবিচার ও অনৈক্যের মূলোৎপাটন করতে হবে। ইসলামী সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায় ও সুবিচারের আলোকে সমগ্র সমাজদেহকে ঝলমলিয়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান এবং রসূলে করীম স. ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শকে পুরোপুরি সামনে রাখতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার প্রসার

সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এটি মুসলমানের সামাজিক দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম। এজন্যে মসজিদভিত্তিক মক্তব ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং মাদ্রাসা স্থাপন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিবেচিত হবে। ভবিষ্যত বংশধরদেরকে শিশুকাল থেকেই কুরআন, হাদীস ও ইসলামী চিন্তার সাথে পরিচিত করতে হবে। ইসলামের সার্বিক রূপের একটি প্রতিচ্ছায়া তাদের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে। তারা যেন সত্যিকার মুসলমানরূপে গড়ে উঠতে পারে এবং সমাজ, দেশ ও বিশ্বের সম্মুখে নিজেদের দ্বীনী দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারে। শিশু-শিক্ষার

www.pathagar.com

উপর এই অত্যধিক গুরুত্ব দেবার কারণ হচ্ছে এটাই যে, শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত, আশা-ভরসার কেন্দ্র। হয়তো বিশ্বব্যাপী যে দ্বীনী ব্যর্থতার গ্লানি আমাদের হৃদয়তল স্পর্শ করেছে আগামী দিনের এই কচি অভিযাত্রীদল তাকে সাফল্যের শৃংগশীর্ষে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। তাই শিশুদের ইসলামী শিক্ষার মধ্যে যেন কোনো প্রকার কমতি না থাকে সেদিকে আমাদেরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

মসজিদ সংস্কার

এই সংগে মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোর সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। মসজিদগুলো আবাদ রাখা, মুসল্লীর সংখ্যা বাড়ানো, মুসল্লীদের দ্বীনী, নৈতিক ও জ্ঞানগত মান বৃদ্ধি করা প্রত্যেক মুসলমানের দ্বীনী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ উদ্দেশ্যে মসজিদভিত্তিক ইসলামী বই-পত্রের পাঠাগার কায়েম করা একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাজ। মাঝে মাঝে মসজিদগুলোয় ইসলামী বিষয়াবলীর উপর সেমিনার, সম্মেলন ও আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করে সাধারণ মুসলমানদের ইসলামী জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই সংগে মসজিদগুলো মেরামত ও মুসল্লীদের জন্যে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাধারণ মুসলমানদের শারীরিক ও আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজে অগ্রসর হতে হবে। এজন্যে তাদের মধ্যে জনসেবার প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। রাজপথ থেকে একটি কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও ঈমানের অংগ্র এ বিশ্বাস তাদের মনে সুদৃঢ় করতে হবে। জনসেবামূলক কাজগুলোর মধ্যে মোটামুটি নিম্নোক্ত কাজগুলো গণ্য করা যেতে পারে :

*পথঘাট, পল্লী জনপদ, বস্তি ও মহল্লার ময়লা-আবর্জনা দূরীভূত করা ও বন-জংগল কেটে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

*বদ্ধ নর্দমা পরিষ্কার করা ও দূষিত পানি নিষ্কাশনের জন্যে নর্দমা তৈরি করা।

*ভাঙা রাস্তা মেরামত এবং নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুল তৈরি করা।

*বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

*বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও দুর্ঘটনায় দুর্দশাপীড়িত জনতার সাহায্য ও সেবা করা।

*জনসাধারণের পানীয় জলের অভাব দূর করার ব্যবস্থা করা।

*দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

*নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্যে ব্যক্তিগত প্রয়াস চালানো এবং সুযোগ মতো বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

*দরিদ্র, এতিম, বিধবা ও পংগুদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে মুষ্টি ভিক্ষার ব্যবস্থা করা।

এক্ষেত্রে যাকাত, ওশর, কোরবানীর চামড়া প্রভৃতির মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য লাভ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

*মুসলিম সাহিত্য যেখানে কেবলমাত্র
মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য সেখানে
ইসলামী সাহিত্য মুসলিম অমুসলিম
নির্বিশেষে সবার সৃষ্ট সাহিত্য।*

আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের

সাক্ষাৎকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'সাহিত্য থেকে সাহিত্যিক আলাদা নন'
– আবদুল মান্নান তালিব

(আবদুল মান্নান তালিবের যাত্রা শুরু পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট অর্জুনপুর গ্রাম থেকে। জীবনের পথ ও পন্থা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তরুণ বয়সেই তিনি ঘর ছাড়েন। ভারতের নানা স্থানে, নানা কেন্দ্রে মুসাফিরী জিন্দেগী কাটিয়ে তিনি লাহোর গিয়ে কয়েক বছর মওলানা মওদূদীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটান। এ সময় তাঁর জীবনের মঞ্জিল ও লক্ষ্য অর্জনের কর্মকৌশলও চিহ্নিত হয়ে যায়। ১৯৫৭ সালে আবদুল মান্নান তালিব লাহোরের উর্দু দৈনিক রোজনামা তাসনীম-এ সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৯ সালে এ কর্মস্থল ছেড়ে তিনি বাঙালি মুসলমানদের স্বাধীন আবাসকেন্দ্র ঢাকায় চলে আসেন এবং এ জনপদকে তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেন। তিনি ঢাকায় দৈনিক ইত্তেহাদ-এর সহ-সম্পাদক, সাপ্তাহিক জাহানে নও-এর সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক, মাসিক পৃথিবীর সম্পাদক, মাসিক কলম-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দৈনিক সংগ্রাম-এর কলামিস্ট, বিভাগীয় সম্পাদক ও ফিচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মীযান-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। চার দশকের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা পেশায় তাঁর ভূমিকা একজন মিশনারীর এবং সে কারণে একজন শিক্ষকের। সাংবাদিকতার পাশাপাশি আবদুল মান্নান তালিব মৌলিক গবেষণায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ইসলামিক রিসার্চ

www.pathagar.com

একাডেমীর রিসার্চ স্কলার হিসেবে ইসলামী গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘদিন ইসলামিক সেন্টারের গবেষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাক-সাহিত্য সংঘ-এর সভাপতি হিসেবে কবি-সাহিত্যিকদের সংগঠিত ও দায়িত্বে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং ১৯৮৭ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালক হিসেবে ইসলামী ঐতিহ্যের ধারায় বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষার আধুনিক বিকাশধারাকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কাজ করেছেন।

১৯৬২ সালে তাঁর লেখা প্রথম বই 'অবরুদ্ধ জীবনের কথা' প্রকাশিত হবার পর থেকে এ যাবৎ তাঁর ১২টি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ, ৮টি সম্পাদিত গ্রন্থ, ১৬টি শিশু-কিশোরদের সাহিত্য ও ৪২টি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

আবদুল মান্নান তালিব একজন মৌলিক চিন্তাবিদ। তিনি তাঁর সময়ের তুলনায় অগ্রসর হয়ে ষাটের দশকে, সত্তরের দশকে, আশির দশকে ও নব্বইয়ের দশকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, তা তার চারপাশের বহু মানুষের চিন্তাকে আলোকিত, উদ্দীপ্ত ও অগ্রসর করেছে। আলোকিত ও আধুনিক, উদার ও মুক্ত মনের মানুষ আবদুল মান্নান তালিব গত ১৫ মে সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় একটি সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকার নেন সরদার ফরিদ আহমদ ও ওমর বিশ্বাস। সাক্ষাৎকারটি এখানে তুলে ধরা হলো।)

সোনার বাংলা : সাহিত্য বলতে আপনি কি বোঝেন?

আবদুল মান্নান তালিব : সাহিত্য জীবনেরই আলোচনা, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও সমালোচনা। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরাই সাহিত্যের কাজ। জীবন যেভাবে চলবে সাহিত্যও তাকে সেভাবে তুলে ধরবে। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এজন্য জীবনটাকে সঠিক পথে পরিচালনা করাই হচ্ছে সাহিত্যকে সঠিক পথে পরিচালনা করার আসল পদ্ধতি।

আমরা যারা আল্লায় বিশ্বাস করি, ইসলামে বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি দুনিয়াটাই শেষ নয়। আমাদের সব কাজের হিসাব দিতে হবে। আর সে কারণেই আমরা ভেবে-চিন্তে প্রত্যেকটি কাজ করি। কাজ করার পরও চিন্তা করি। আসলে আমরা আমাদের জীবন ও সংস্কৃতিকে যেভাবে পরিচালিত করব, সাহিত্যও সেভাবে গড়ে উঠবে। সাহিত্যে সেই ধারাই প্রবাহিত হবে।

মনে রাখতে হবে সাহিত্য এমন বিষয় নয়, যা চাপিয়ে দেয়া যায়। জীবনের সঙ্গে এর পুরোপুরি সম্পর্ক। একটু আগে আমি যে বললাম, সাহিত্য আসলে জীবনেরই সমালোচনা। এটা অনেক আগে ম্যাথু আর্নল্ডও বলে গেছেন।

আসলে সাহিত্যে জীবনের কথাই বলা হয়। জীবনকেই তুলে ধরা হয়, ভালোভাবে হোক অথবা মন্দভাবে হোক। মানুষ সাহিত্যের মধ্যে নানা বিভাজন টেনে কোনোটাকে মন্দ সাহিত্য, কোনোটাকে ভালো বা কল্যাণকর সাহিত্য বলছে। আবার অসুন্দর বা খারাপটাকেও তো সাহিত্য বলা হচ্ছে। এর কারণ হলো– এসবের সাথে জীবনের সম্পর্ক

www.pathagar.com

রয়েছে। মানুষের মধ্যেও তো ভালো-মন্দ দিক থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। আর সাহিত্য যেহেতু জীবনের কথা বলে সেহেতু এতে ভালো-মন্দ থাকবেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে– আমরা কোন ধরনের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করব। কোন ধরনের সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাব? যে সাহিত্য জীবনকে সঠিকরূপে তুলে ধরে সে ধরনের সাহিত্যকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে, এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। জীবন যেখানে সঠিকভাবে আছে সাহিত্যকে সেখানে সেভাবেই তুলে ধরা হবে। আর জীবন যেখানে সঠিকভাবে নেই- সেখানে সাহিত্য সেই জীবনকে কিভাবে তুলে ধরবে? যদি এটাকে সঠিকভাবে তুলে ধরা না হয় তাহলে সাহিত্য কোন পথে চলবে? এই অবস্থায় সাহিত্যিকের একটা দায়িত্ব এসে যায়। মনে রাখতে হবে সাহিত্য থেকে সাহিত্যিক আলাদা নন। যা ইচ্ছা তাই চিন্তা-ভাবনা করলাম, তাই লিখলাম- আবার করার সময় করলাম ভিন্ন রকম– এ ধরনের ব্যাপার আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

আমরা মানুষের জীবন, তার চিন্তা ও কর্মকে ভাগ করার পক্ষপাতি নই। আসলে মানুষ যেভাবে চিন্তা করে তার কাজও সেরকম হয়। একজন মানুষের কাজের মধ্যে তার চিন্তার প্রভাব পড়বেই।

সোনার বাংলা : আপনি কি এটাই বলতে চাইছেন যে, একজন সাহিত্যিকের ব্যক্তিজীবন যেরকম, তার সাহিত্যও সেরকম হবে?

আবদুল মান্নান তালিব: তাই তো হওয়া উচিত। আমি এটাকে আরো সহজভাবে বলছি। আমি যদি মুমিন হই তাহলে আমার কলমটাও মুমিন হবে। আমি যেহেতু মুসলিম, আমার কলমটাও মুসলিম হতে হবে। আমি হবো মুসলিম, আর আমার কলম হবে কাফের- এ হতে পারে না। এ অসামঞ্জস্য আমরা সাহিত্যে মেনে নিতে পারি না।

বিশ্ব সাহিত্যে আমি দেখেছি অনেক সাহিত্যিকের ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে তার সাহিত্যকর্মের কোনো মিল নেই। আমাদের দেশেও বড় বড় সাহিত্যিকদের মধ্যে এমনটি লক্ষ্য করা যায়। জীবনের সাথে সাহিত্যের মিল তারাও হয়তো চান। কিন্তু তাদের কাজের সাথে সাহিত্যের গরমিল রয়ে গেছে।

সোনার বাংলা: তালিব ভাই, ইসলামী সাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্য এই ধরনের একটি বিভাজন টানা হয়। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

আবদুল মান্নান তালিব: আমরা যে সাহিত্যের কথা বলতে চাই, সেখানে ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী জীবনধারা থাকবে। আর যে সাহিত্যে এর প্রতিফলন থাকবে সেটাকেই আমরা ইসলামী সাহিত্য বলছি। এই ধরনের প্রতিফলন একজন মুমিন সাহিত্যিকের লেখায় যেমন থাকতে পারে, তেমনি কোনো অমুসলিম সাহিত্যিকের রচনাতেও থাকতে পারে। টলস্টয়ের সাহিত্যে আপনি বহু বিষয় দেখবেন যা ইসলামী উপাদান ও মূল্যবোধের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও বহু জিনিস রয়েছে যা ইসলামী ভাবধারার সাথে সম্পর্কিত। রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল ধারাটি বেদান্ত থেকে এসেছে বলে তিনি দাবি করেন। কিন্তু আসলে তিনি ফারসি সাহিত্যের কাছে ঋণী, যদিও তিনি

www.pathagar.com

এটি স্বীকার করেননি। তিনি তার সাহিত্যের মূলধারাটি হাফিজ, ওমর খৈয়াম, রুমিদের কাছ থেকেও নিয়েছেন। আসলে এই যে গ্রহণ এটা রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেছেন– এমনটি ভাবার কোনো যুক্তি নেই। আপনি যদি হাজার দু'হাজার বছরের বিশ্বসাহিত্য পর্যালোচনা করেন, তাহলে দেখবেন এই ধরনের ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। গ্রিক সাহিত্যে যা ছিল তা অন্য সাহিত্যেও এসেছে। গ্রিক সাহিত্য থেকে আরবি ও ফারসি সাহিত্যে এসেছে। ফারসি থেকে গেছে ইংরেজি সাহিত্যে। ইংরেজি থেকে এসেছে বাংলায়। দেখা যায়, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের চিন্তাধারা ও আদর্শবাদ প্রায় একই পর্যায়ের। ফারসি সাহিত্যের যে প্রবচন ছিল তা ইংরেজি সাহিত্যে গিয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যে এসেছে। এদেশে পাঁচশ' বছর ধরে ফারসি সাহিত্যের প্রাধান্য ছিল। তার প্রভাব আমাদের সাহিত্যে আছে। এই যে আমি কুরআন থেকে সাহিত্যের উপাদান নিয়েছি, সেটা তো অনেকদিন ধরে হয়ে আসছে। বারোশ-চৌদ্দশ বছর ধরে এ ধরনের কাজ হয়ে আসছে।

আবারো বলি, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী জীবনধারা, ইসলামী উপাদান থেকে যা কিছু গ্রহণ করা যায় তাই ইসলামী সাহিত্য। কাজটি একজন মুসলিম সাহিত্যিক করুন কি একজন অমুসলিম সাহিত্যিক করুন, তাতে কিছু যায় আসে না।

সোনার বাংলা: অনেক সাহিত্যিক ধর্মকে সাহিত্য থেকে বাদ দিতে চান। অনেকে ধর্মের বিরুদ্ধে নগ্নভাবে কলম ধরেন। সাহিত্য থেকে ধর্মকে বাদ দেয়া কি সম্ভব?

আবদুল মান্নান তালিব: সাহিত্য থেকে যারা ধর্মকে বাদ দিতে চান তারা মূলত ধর্ম সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা পোষণ করেন। তারা ভাবেন ধর্ম নিছক আল্লাহ, গড বা ভগবানের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। আল্লাহ এমন এক সত্তা যাঁর সম্পর্কে তাদের নিজেদের ধারণাটি পরিষ্কার নয়, এমনকি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কেও তারা সন্দিহান। তাদের কেউ কেউ এ ধারণাও পোষণ করেন যে, মানুষের চিন্তার বিবর্তনের ফলেই আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা নন, বরং মানুষ আল্লাহর স্রষ্টা। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা পোষণ করেন না, বরং আবহমানকাল থেকেই দুনিয়ার দেশে দেশে ধর্মের যত রকমের চেহারা দেখা গেছে সবগুলোতেই আল্লাহকেই স্রষ্টা এবং সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। তবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নকেই একদল লোক ধর্ম মনে করে আসছেন। সাহিত্যে এ ধরনের ধর্মকে যদি অপরিহার্য মনে না করা হয় তাহলে মনে হয় সাহিত্যের কিছু যায় আসে না।

কিন্তু যেখানে ধর্ম মানে কেবল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন নয়, বরং জীবনের সমস্ত কাজে-কর্মে আল্লাহকেই মূল শক্তি মনে করা হয় এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশ মতো সমস্ত কাজ করা যেখানে অপরিহার্য মনে করা হয়- আরো অগ্রসর হয়ে বলা হয়, বিগত হাজার বারোশ' বছরে মুসলিম শাসন ও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যে আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন এবং যার

www.pathagar.com

নির্দেশ ও বিধান মতে জীবনযাপন করে মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী আরবি, ফারসি, তুর্কি, বাংলা, উর্দু, মালয়ি ইত্যাদি ভাষায় বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার সৃষ্টি করলো সেই আল্লাহকে এবং সেই আল্লাহকে ধারণকারী ধর্মকে সাহিত্য থেকে বাদ দেয়া কোনো সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাজ বলে মনে হয় না।

মূল কথা হচ্ছে, ধর্মের যে অবয়ব ইসলাম তুলে ধরেছে সাহিত্য থেকে তাকে বাদ দেয়ার প্রশ্নই আসে না, বরং সাহিত্যের জন্য তা একান্তই অপরিহার্য। কারণ এ ধর্ম সমগ্র জীবনের সাথে জড়িত। জীবনের কোনো বিষয় থেকে একে আলাদা করা যায় না। আর জীবনই হচ্ছে সাহিত্যের বিষয়।

সোনার বাংলা: আমাদের দেশে ইসলামী চিন্তাধারা সম্পর্কিত গ্রন্থের প্রচুর অনুবাদ হচ্ছে। অনুবাদ হচ্ছে মূলত আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষা থেকে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক বিষয়। কিন্তু কেউ কেউ অভিযোগ করেন এসব অনুবাদের বেশিরভাগই মানসম্পন্ন নয়। এই বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কি?

আবদুল মান্নান তালিব: এখানে দু'টো বিষয় জড়িত। একটা হচ্ছে– ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ। আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন তারা ঠিকই অনুবাদ করছেন।

কারণ বর্তমান বাংলার যে গদ্য তা ইংরেজিরই বাংলা তরজমা। ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আছে। ডিকশনারি আছে।

উর্দু ও বাংলা প্রায় একই ভাষা। সাবকন্টিনেন্টের উত্তরাঞ্চলের উর্দু, হিন্দি, বাংলা, আসামি, পাঞ্জাবি– প্রায় সবগুলোই একই রকম ভাষা। একই ঢঙ। বাক্যের গঠন প্রায় একই, এমনকি প্রবচনগুলোও প্রায় একই রকম। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে- উর্দু ভাষায় সেটা চার লাইনে বলা হয়।

আরবি গদ্য অনেক পুরনো। চৌদ্দশ' বছর আগেও আরবি গদ্য ছিল। হযরত মুহাম্মদ স. যখন এসেছেন তখন আরবে গদ্য চলত। সেখানে কবিতা ও গদ্য পাশাপাশি ছিল। গদ্যটা ছিল মূলত বক্তৃতা হিসেবে। একটি অপ্রিয় কথা বলতে হয়, যারা উর্দু বা আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করছেন তাদের অনেকেই বাংলা ভাষাটা ভালোভাবে রপ্ত করেননি। আমাদের মাদরাসায় বাংলা ভালোভাবে পড়ানো হয় না। আগে তো বাংলা পড়ানোই হতো না। বাংলাদেশ হওয়ার পর মাদরাসায় কিছু বাংলা পড়ানো হচ্ছে। তবে যেভাবে বাংলা পড়ানো দরকার সেভাবে হচ্ছে না। কাজেই বাংলা ভাষায় তাদের মধ্যে কিছুটা ঘাটতি আছে, যার ফলে উর্দু ও আরবি থেকে তরজমাকারীদের খুব কম লোকই সঠিক অনুবাদ করতে পারছেন। তবে এদের মধ্যে যারা ইংরেজি ভালো জানেন তারা ভালো অনুবাদ করতে পারছেন। অনেক গ্রন্থ তো আরবি থেকে ইংরেজি এবং ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে এবং হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই। আমরা যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করছি– তা কি আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের ভাষা? আমার তা মনে হয় না। আমরা এখনো পশ্চিম বঙ্গের ভাষা ব্যবহার করে যাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের তৈরি যে বাংলা ভাষা তা তো আমাদের বাংলা ভাষা নয়।

www.pathagar.com

সেখানে রবীন্দ্রনাথের মতো বড় কবি জন্মেছেন বলেই পশ্চিম বঙ্গের বাংলা ভাষা কেউ ছাড়তে রাজি নন, বিশেষ করে যারা লেখালেখি করেন তারা এখনও পশ্চিম বঙ্গের ভাষাটাই চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষ যে বাংলায় কথা বলেন— সেটা তো পশ্চিম বঙ্গের বাংলা থেকে আলাদা। আমরা যারা জাতীয় ভাষার কথা বলি তারা কেন পশ্চিম বঙ্গের গোলামী করব?

ইদানীং কেউ কেউ বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের বাংলা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি। আমাদের নিজস্ব বাংলা ভাষা দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে এর সাথে আমি একমত নই। আচ্ছা সুনীলের গদ্যের সাথে আল মাহমুদের গদ্যের মধ্যে কি কোনো তফাৎ আছে- বলতে পারবেন? আমাদের বাংলা ভাষায় আরবি ও উর্দুর প্রভাব রয়েছে। কিন্তু কোলকাতার বাংলায় কি সেটা আছে? ভুলে যাই যে, আমরাই বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠাতা। মুখে বলি পানি, লিখি জল। দেখুন কি রকম মুনাফেকি! আজ যারা উর্দু ও আরবি থেকে বাংলা ভাষায় তরজমা করছেন তারা কিন্তু এই অঞ্চলের বাংলা ব্যবহার করছেন। তারা একটা নতুন ভাষা তৈরির প্লাটফর্ম তৈরি করে দিচ্ছেন। এটা কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটাকে উৎসাহিত করা উচিত। তবে সাথে সাথে খেয়াল রাখতে হবে ভাষাটা যাতে শুদ্ধ হয়।

আসলে দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে। যেমন ধরুন, বাংলা একটি শব্দ *গিয়ে*। *যাওয়ার* পরিবর্তে বলা হচ্ছে *গিয়ে*। *গিয়ে* এসেছে *গমন* থেকে। সংস্কৃতির *গচ্ছতি* থেকে এর উৎপত্তি। *যাওয়া* হচ্ছে খালেস বাংলা। *গিয়ে* হচ্ছে সংস্কৃত। *যেয়ে* যদি বলা হয় তাহলে সেটা হলো খাঁটি বাংলা। কিন্তু এখন যদি কেউ *যেয়ে* লেখে তাহলে বলা হবে সে ভুল করছে। *গিয়ে* বললে শুদ্ধ। বাংলাদেশের কোথাও কি *গিয়ে* বলা হয়?

সোনার বাংলা: আমাদের উপমহাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

আবদুল মান্নান তালিব: উপমহাদেশে সাহিত্যের দু'টো ধারা। একটি উত্তরের, একটি দক্ষিণের। উত্তরের ভাষাগুলো একরকম, আর দক্ষিণের ভাষাগুলো অন্যরকম। এই বিভক্তি আগে থেকেই ছিল। সেই যে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য। বিভক্তিটি এমনি হয়নি। দু'টোর মধ্যে যে রাজনৈতিক সংঘাত ছিল, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা প্রবল হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ভারত অনেক এগিয়ে গেছে। উত্তর ভারত খুব বেশি এগুতে পারেনি।

উত্তর ভারতের প্রধান ভাষা ছিল মূলত উর্দু এবং বাংলা। বাংলা তো চলে এল এইদিকে। আর উর্দু গেল পাকিস্তানে। ভারতের উর্দু এমনই হলো যে, অনেকেই এতে হতাশ হয়ে পড়লেন। ভারতের বিখ্যাত উর্দু কবি জোশ মালিহাবাদী যাকে শায়ের বাগী (বিদ্রোহী কবি) বলা হতো- নজরুলের পর্যায়ের কবি, নেহেরুর বন্ধু ছিলেন, তিনি পর্যন্ত সন্তানদের নিয়ে পাকিস্তান চলে যান। আমি তখন পাকিস্তানে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনি কেন ভারত থেকে চলে আসলেন। সেখানে তো আপনি ভালোই ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ছেলেমেয়েদের হিন্দি সাম্রাজ্য থেকে

www.pathagar.com

বাঁচানোর জন্য এসেছি। তারা হিন্দি বলে। মালিহাবাদী ভারতে অত্যন্ত প্রভাবশালী সাহিত্যিক ছিলেন। সেখানে তিনি দু'টো পত্রিকা চালাতেন। একটি উর্দু ভাষায়, অন্যটি হিন্দি ভাষায়। তারপরও তিনি ভারত ছেড়ে চলে আসলেন। বর্তমানে ভারতের যে উর্দু ভাষা তাতে হিন্দি প্রবলভাবে ঢুকে গেছে। অবস্থা এমন যে, হিন্দিকেই এখন উর্দু বলা হচ্ছে, অর্থাৎ উর্দুকে তারা অনেক কাটছাঁট করে দিয়েছে। এভাবে উত্তর ভারতের ভাষাগুলোর মধ্যে হিন্দি হয়ে গেল প্রবল। হিন্দিতে কিন্তু তেমন উন্নত কোনো সাহিত্য ছিল না। মুলকরাজ আনন্দ, প্রেমনাথ প্রমুখের মতো শক্তিশালী কিছু সংখ্যক লেখকের কারণে হিন্দি সাহিত্য কিছুটা উন্নত হয়েছে। আর যেহেতু হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা, কাজেই সেটার প্রভাব তো কিছুটা পড়বেই।

দক্ষিণ ভারতের ভাষাগুলোর মধ্যে তামিল, তেলেগু, মালায়লাম, কানাড়িসহ আরো কিছু ভাষায় উন্নত পর্যায়ের সাহিত্য ছিল। বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছু তো তামিল ভাষায় তরজমা হয়েছে। তেলেগু ভাষাতেও হয়েছে। তেলেগু ভাষার একটি পত্রিকার সার্কুলেশন ছিল ১৫ লাখ। বাংলা ভাষার কোনো পত্রিকার সার্কুলেশন পাঁচ ছয় লাখের উপরে কোনোদিন ওঠেনি। ইদানীং ভারতের পত্রিকাগুলোর প্রথম ও শেষ পাতায় খেলার উপর গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়। লাস্ট পেজ তো খেলার পাতা হয়ে গেছে। পালিটিক্যাল খবর কম। মানে রাজনীতির প্রতি তাদের অনীহা। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চা হচ্ছে।

ভারতে রবীন্দ্রনাথই সাহিত্যে একমাত্র নবেল প্রাইজ পেয়েছেন, অথচ সেখানে বিভিন্ন ভাষায় উন্নতমানের সাহিত্য চর্চা হচ্ছে। ভারত সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো এগিয়েছে। অনুবাদ হয়েছে প্রচুর।

বাংলা ভাষার এমন কোনো শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নেই যা উর্দু, হিন্দি, তামিল, কানাড়ি, মালায়লাম ভাষায় অনূদিত হয়নি। বাংলা সাহিত্য তো এক সময় গোটা ভারতে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখন বাংলা অনেক পিছিয়ে গেছে।

আবদুল হাকিম তামিল ভাষার একজন বড় লেখক। তাঁর সাহিত্য উন্নতমানের। সেখানে এরকম বড় বড় লেখক তৈরি হয়েছে, যা আমাদের এখানে হয়নি। আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে কেবল অহঙ্কার করি। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। কিন্তু আমাদের সুযোগ ছিল। আমরা যে আদর্শ লালন করি সেটাকে নিয়ে সাহিত্যে অগ্রসর হওয়া খুবই সহজ। বিশ্বসাহিত্যের অনেকেই এই ধরনের ভাবধারা থেকে বঞ্চিত। তারা এখন কি নিয়ে অগ্রসর হবে? তারা তো মানুষের অধিকার ও ধর্মকে বাদ দিয়েছে। অন্যদিকে ইসলামে ব্যাপক বিষয় রয়েছে। জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যা ইসলামে নেই। তাই ইসলাম থেকে আমরা জীবনের প্রতিটি বিষয়ের উপাদান পেতে পারি, যা সাহিত্যেরও উপাদান হতে পারে অতি সহজে। দুঃখজনক হলো– আমরা এই নিয়ে তেমন একটা চর্চা করছি না। শুধু আমাদের দোষ দিলেই হবে না। এটা আমাদের ইনহেরিটেজ। ইসলামী ভাবধারা নিয়ে সাহিত্যের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে মুসলমানদের যতদূর অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল, ততদূর তারা অগ্রসর হতে পারেনি। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রথম দুই তিনশ' বছর ফারসি সাহিত্যের অগ্রসরতা আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু আরবি সাহিত্যে তা হয়নি। আবার ফারসি সাহিত্যের অগ্রসরতার এই পর্যায়ে তাসাউফকে খুব বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের বর্তমান সাহিত্যের ধারায় পাশ্চাত্য ভাবধারা গৃহীত হয়েছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস সব জায়গাতেই এই ধারার প্রবল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বলতে গেলে গদ্য তো পুরোপুরিই এই ধারার সাহিত্যিকদের দখলে। সেখানে অবশ্য ইসলামী ভাবধারা নিয়েও কিছু কিছু লেখক লিখেছেন এবং লিখছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা কবি মাহিরুল কাদেরী ও কবি নঈম সিদ্দিকীর কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁদের লেখা আন্তর্জাতিক মানের। ঔপন্যাসিক নসীম হিজাযীও পাকিস্তানের খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তিনি ইতিহাসকে নির্ভর করে অসাধারণ ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। ইতিহাস ও ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ভাবধারা নিয়ে তিনি কাজ করেছেন।

সোনার বাংলা: ইসলামী ভাবধারায় বাংলাদেশে জনপ্রিয় সাহিত্যিক গড়ে না ওঠার পেছনে কারণ কি?

আবদুল মান্নান তালিব: কেন, নজরুল রয়েছেন। ফররুখ রয়েছেন। নজরুল তো বিশ্বমানের কবি। তাঁর কবিতা ও গান অসাধারণ। নজরুলের কবিতা ও গান ইসলামী সাহিত্যের একটি বিরাট স্থান জুড়ে আছে। তাঁর কিছু গান তাসাউফ ধরনের। আমরা তাঁকে বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠ কবি বলতে পারি। নজরুলের ভাবধারায় উজ্জীবিত ফররুখ আহমদ। নজরুল যেটুকু করেছেন সেটুকু না হলে ফররুখ ব্যাপকভাবে ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য চর্চা করতে পারতেন না। আমাদের কাজ হবে এঁদের ভাবধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সকলের জানা থাকা দরকার যে, মুসলমানরা যখন থেকে এই বাংলায় এসেছে তখন থেকেই তারা সাহিত্য চর্চা করে আসছে। এই দেশের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্য থেকেই সাহিত্যিক বেরিয়ে এসেছেন। অবশ্য এক হাজার বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে আজ এই পর্যায়ে এসেছে। হিন্দুদের লেখায় শিরকের ভাবধারা ছিল। তাদের লেখার বিষয় ছিল ভগবান ও দেবদেবী। মানুষ সেখানে ছিল অনুপস্থিত। চর্যাপদে খানিকটা জীবনের কথা আছে। তবে ব্যাপকভাবে নয়। মুসলমানরা সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতটা তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। মানুষকে তারা শ্রেষ্ঠ নায়ক হিসেবে আনলেন। ইসলাম মানুষের জীবনের সাথে যেভাবে সম্পর্কিত, তারা সেভাবে সাহিত্যকে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করলেন। এটা মুসলমান সাহিত্যিকদের বিশেষ কৃতিত্ব। শাহ মুহাম্মদ সগীর থেকে শুরু করে অনেকেই দেখি হিন্দি থেকে তরজমা করেছেন। তাদের হিন্দি ভাষার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল। স্বাভাবিকভাবে এসব সাহিত্যে হিন্দুত্ব থাকার কথা। কিন্তু তারা হিন্দুত্বের প্রভাব কাটিয়ে ইসলামকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

তারা ফারসি থেকে ব্যাপকভাবে তরজমা করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আমরা নজরুলের মতো সাহিত্যিককে পেলাম। ফররুখের মতো একজন ইসলামী ভাবধারার বলিষ্ঠ কবিকে পেলাম। এটা একদিনের কোনো ফসল নয়। কয়েকশ' বছর ধরে যে কাজ করা হয়েছে এগুলো তারই প্রসব। তাদের কারণেই এখন আমাদের জন্য ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য চর্চা করা সহজ হয়েছে।

সোনার বাংলা: সাম্প্রতিককালে ইসলামী ভাবধারায় শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় সাহিত্যিকের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। কেন এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় কি?

আবদুল মান্নান তালিব: আমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা তো একটা প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের মধ্য থেকে একটি ধারা সৃষ্টি করতে চাইছি। এই চেষ্টাটা কিন্তু আজকের নয়। হাজার বছর ধরে মুসলমানরা সাহিত্যে ইসলামকে আনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। জীবনের সাথে ইসলামের যে সম্পর্ক তাকে সাহিত্যে প্রতিফলন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। এখন গোটা বিশ্বকে সামনে রাখতে হচ্ছে।

তবে বিশ্ব পরিস্থিতি ইসলামী সাহিত্যের প্রতিকূল কিন্তু নয়। মানুষ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে জীবনের সমাধান খুঁজে পায়নি। গণতন্ত্রের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটা জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি আনবে, মানবজীবনে সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু গণতন্ত্র কি সেটা পারছে? এই ধরনের বস্তুবাদী চিন্তা নিয়ে যারাই অগ্রসর হয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এই চিন্তাধারার সাহিত্যিকরা এখন আর জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না কেন?

এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী ভাবধারার টিকে থাকার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। এই ধারায় সাহিত্যের সম্ভাবনাও অধিকতর উজ্জ্বল এবং কার্যকরী। এর জন্য প্রস্তুতি দরকার। এই ধারায় আগে যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা আমাদের সামনে থাকা দরকার। আমাদের পূর্বসূরি যারা বাংলা সাহিত্যে ইসলামকে ব্যাখ্যা করেছেন– সেটা তারা কীভাবে করেছেন, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। আমার মনে হয়েছে, ইসলামী ভাবধারার বহু কবি-লেখক সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। এর উপর তেমন কাজ হয়নি। কেবলমাত্র নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান যা একটু চেষ্টা করেছেন। তিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের বাকি যেসব ইতিহাস লেখা হয়েছে সেগুলোর কোনোটাই পূর্ণাঙ্গ নয়। মুসলিম সাহিত্যিকরা ইসলামকে কিভাবে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন তা আমাদের সামনে থাকা দরকার। আরেকটি কথা, আমরা আসলে কী করতে চাই, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। আমরা ইসলামী সাহিত্য বলতে ধর্মীয় সাহিত্য বুঝি। এটা কিন্তু সঠিক নয়। আমাদের মনে রাখা দরকার ইসলামই বিশ্বসাহিত্যের একমাত্র ভাবধারা হতে পারে। ইসলামই হতে পারে বিশ্বসাহিত্যের মৌলিক উপাদান। কারণ ইসলামই হতে পারে মানবজাতির একমাত্র ধর্ম। অন্য কোনো ধর্ম নয়। কারণ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনের কথা বলে।

www.pathagar.com

ইসলামী সাহিত্যের প্রধান বিষয় হলো বিশ্বাস। এই বিশ্বজাহান যিনি তৈরি করেছেন- তাঁর উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তিনি মানবজাতির জন্য একটি বিধান দিয়েছেন। ভালো-মন্দ বিবেচনা করে মানুষকে ভালোটা গ্রহণ করতে হবে। কাজেই ইসলামী সাহিত্যের ভাবধারা হবে কল্যাণময়। এটি হবে নেকি বা আমেলুস সালেহ, ইসলামী সাহিত্য রচনার অর্থ হবে একটি উত্তম কাজ করা। ইসলামী সাহিত্যিকদের মনে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে তার মূলে রয়েছেন আল্লাহ। আমাদের সাহিত্যে প্রায়ই হতাশার চিত্র দেখি। এটা ঠিক নয়। ইসলামী সাহিত্যিককে বিশ্বাস রাখতে হবে বিপদ-মুসিবত সবকিছুই আল্লাহই দিয়ে থাকেন। আমাদের সাহিত্যের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। জীবনের সাথে আল্লাহর সম্পৃক্ততার কথা প্রকাশ করতে হবে। আমরা আমাদের সাহিত্যে কোনো অন্যায়কে সমর্থন করতে পারি না। আল্লাহ্ মানুষকে খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন জুলুমের প্রতিবিধান করতে। আমাদের সাহিত্য হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। অন্যায়কে অন্যায় বলেই দায়িত্ব শেষ করা যাবে না। এটার প্রতিবিধান কীভাবে করা যায় সেটাও করতে হবে। সাহিত্যিককে এই দায়িত্বের কথা ভুললে চলবে না।

www.pathagar.com

'সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা একটা গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি করতে পেরেছি'
– আবদুল মান্নান তালিব

[আবদুল মান্নান তালিব বহুমাত্রিক এক প্রতিভার নাম। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, গবেষক, অনুবাদক, সম্পাদক, সংগঠক, সাংবাদিক ও শিশু-সাহিত্যিক। ষাটের দশক থেকে তিনি আমাদের এ অঞ্চলে চিন্তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। বিশাল এক কর্মময় জীবন তাঁর। আজীবন কাজ করেছেন সব্যসাচীর মতো দু'হাতে। তাঁকে বলা যায় আমাদের মননের বাতিঘর। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে জন্মগ্রহণ করলেও উপমহাদেশের তিনটি দেশেই কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। একাধারে উর্দু ও বাংলা সংবাদপত্রে কাজ করেছেন তিনি।

আবদুল মান্নান তালিব সেইসব বিরলপ্রজ মানুষদের একজন যাঁরা ঈমানের প্রদীপ্ত চেতনা নিয়ে, সত্য ও সুন্দরের বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পার্থিব জিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্ত যাপন করেন। বার্ধক্যে এসেও যে কোনও তরুণের মতোই তিনি কাজ করেছেন। তাঁর কর্মময় নিরলস জীবন সত্যিকার অর্থেই এক অনুকরণীয় জীবনে পরিণত হয়ে আছে। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষদের তাওহীদী মনন গঠনে তাঁর চিন্তা-গবেষণা ও অনুবাদ কর্ম পরিণত হয়েছে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদে।

আবদুল মান্নান তালিব বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব। তিনি কুরআন-হাদীসে সুবিজ্ঞ এবং সাহিত্য সাধনায় অন্যতম পথিকৃৎ ব্যক্তি। একাধারে তিনি আল কুরআন, হাদীস অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী নানা বিষয়ে

www.pathagar.com

বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি শিশুদের মানস গঠনে যেভাবে ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য কেমন হবে তার দিকনির্দেশনামূলক বহু মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছেন। বিভিন্ন সাহিত্য ও গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকাও তিনি সার্থকভাবে সম্পাদনা করেছেন। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি সমকালীন বিষয় ও যুগ জিজ্ঞাসামূলক বহু নিবন্ধ ও প্রবন্ধ লিখে গেছেন।

জন্ম: আবদুল মান্নান তালিব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার থানা-মগরাহাটের অর্জুনপুর গ্রামে ১৫ মার্চ ১৯৩৬ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তালেব আলী মোল্লা। মাতা-মরহুমা মেহেরুন্নেসা।

শিক্ষা জীবন: আবদুল মান্নান তালিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। এইচএসসি পাস করেন ঢাকা বোর্ড থেকে ১৯৬৬ সালে। অতঃপর জামেয়া আশরাফিয়া, লাহোর থেকে দাওরা-ই-হাদীস পাস করে হাদীসশাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। লেখাপড়ার প্রতি তিনি অন্য রকম আকর্ষণ অনুভব করতেন, বিশেষ করে নানাবিধ ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ছিল খুব বেশি। ফলে তিনি বাংলা, ইংরেজি, আরবি, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি এই ছয়টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এ সকল ভাষা থেকে সাহিত্যসহ গবেষণাধর্মী অনেকগুলো বিষয় অনুবাদ করেছেন।

কর্মজীবন: আবদুল মান্নান তালিবের কর্মময় জীবন শুরু হয় মূলত সাংবাদিকতার মাধ্যমে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিকসহ বহু পত্রিকায় তিনি সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন। রচনা করেছেন মৌলিক গ্রন্থ, গবেষণা গ্রন্থ। বই সম্পাদনাও করেছেন প্রচুর। অনুবাদকর্মেও রয়েছে তাঁর বিরাট ভূমিকা। তিনি ১৯৬৭-৭১ ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী ঢাকার রিসার্চ স্কলার ছিলেন। রিসার্চ স্কলার ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারে ১৯৭৫-৮৫। আমৃত্যু তিনি বাংলা সাহিত্য পরিষদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৮৭ সাল থেকে। আমাদের ঐতিহ্যিক ধারার সাহিত্য আন্দোলনে আবদুল মান্নান তালিবের রয়েছে পথিকৃতের ভূমিকা। তিনি আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে একজন শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিবের বিশাল কর্মময় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি প্রদানের জন্যও প্রয়োজন বিশাল পরিসরের। সে অবকাশ এখানে নেই। এই মহান মনীষী বর্তমানে বার্ধক্যজনিত নানা প্রকার অসুস্থতায় শয্যাশায়ী। তাঁর এই মূল্যবান সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন কবি ওমর বিশ্বাস।]

প্রশ্ন: আপনি লেখালেখির ব্যাপারে বর্তমানে কি করছেন?

উত্তর: লেখালেখি বেশ কিছু দিন থেকেই কমে গেছে। খুব কম লিখছি আর কি? তবে শরীর ও মুড একটু ভালো থাকলে হয়ত কোনো দিন কিছু লিখে ফেললাম এই অবস্থা দাঁড়ায়। স্বাস্থ্যগত কারণে এখন আগের মতো লেখালেখি করার ক্ষমতা আর নেই। তারপরে এখন শরীর যে অবস্থায় পৌঁছে গেছে এতে বেশ কিছু দিন মনে হয় ধকল সইতে হবে। আল্লাহ

www.pathagar.com

তাআলা যদি সুস্থ করে তোলেন তবে ইনশাআল্লাহ আবার লেখালেখি শুরু করা যাবে। আমার কথা হলো লেখালেখিই তো আমার জীবন। লেখালেখি তো আমি ছেড়ে থাকতে পারি না। কাজেই লিখতেই হবে।

প্রশ্ন: সর্বশেষ কি করছিলেন?

উত্তর: এখন তো আসলে 'ইসলামী আইন ও বিচার'-এর কাজ নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকি। ওর সম্পাদকীয় লেখা, লেখাগুলো তৈরি করা, লেখকদের সাথে যোগাযোগ করা এবং তাদের লেখায় সহযোগিতা করা। এই কাজেই বেশি ব্যস্ত থাকতাম আর কি! তার মধ্যে আবার সাহিত্যের বেশ কিছু কাজ করতে হচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে যে প্রবণতা শুরু হয়েছে পাকিস্তান হবার আগে থেকেই, আমাদের সাহিত্যে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি যে বিরূপতা আসছে ইতিপূর্বে বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। হিন্দুদের তৈরি নতুন বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখকদের সংখ্যা ছিল তখন অনেক কম। তারপরও ওই কম সংখ্যক মুসলিম লেখকদের মধ্যে একটা একমুখিতা গড়ে ওঠে। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব থেকে পুরাতন হিন্দু ঐতিহ্যবাহী সংশয়বাদ এবং নতুন মার্কসবাদী নাস্তিক্যবাদ আমাদের তরুণ লেখকদের মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই তারা আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলতে থাকেন। এই প্রশ্ন পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানউত্তর বামপন্থী ধারার সৃষ্টি করে। এই ধারা আমাদের সাহিত্যকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এদের আসল চিন্তাদর্শন তার মূল ভূখণ্ডে মার খেয়ে গেলেও এ চিন্তার রেশ এখনো কাটেনি। আমাদের সাহিত্যে এর প্রভাব এখনো রয়েছে। এদের বিভ্রান্ত চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে সঠিক ও সঙ্গত চিন্তার দিকে ফিরে আসার জন্য আমি কুরআনের সাহিত্য চিন্তাকে উপস্থাপন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, যাতে আমাদের ইসলামী ধারাকে উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করতে পারি। এই দিকে কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন: সুস্থ সাহিত্য ধারার বা ইসলামী ধারার চর্চা ঠিক মতো হচ্ছে কি?

উত্তর: ইসলামী ধারা যেটা চলছে এটাকে আসলে ঠিক শক্তিশালী ধারা বলা যায় না। তবে চলছে ঠিক মতোই। কারণ বাংলা সাহিত্যে আমাদের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে গত সাত-আটশ' বছর থেকে, সে ঐতিহ্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি এই ধারা, বরং ওই ধারাটাকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় এটাই এখন আমাদের দেখার বিষয়। কারণ হলো, সম্প্রতি দুনিয়ায় যে বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের প্রসার ঘটেছে এর ফলে ইসলামী ধারাকেও বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে এর মোকাবিলা করতে হবে। আমরা সেই পথে ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছি। শুধু আবেগ নয়, সঙ্গে যুক্তিও থাকতে হবে।

প্রশ্ন: এ শক্তির উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর: এই শক্তিটাকে উপলব্ধি করতে গেলে আমাদের এর উৎসের দিকে ফিরে যেতে হবে। ফিরে যেতে হবে কুরআন আর হাদীসের দিকে। আমাদের যারা ইসলামী ঐতিহ্যের চর্চা করে তাদের এগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এখানেই এর মূল শক্তি নিহিত রয়েছে। এর অন্তর্নিহিত শক্তি এতই প্রাচুর্যময় যে, দুনিয়ার অন্য কোনো শক্তি তার

www.pathagar.com

মোকাবিলাই করতে পারবে না। অন্য শক্তি তার মোকাবিলায় কোনো শক্তিই নয়। কাজেই কুরআন থেকে আমাদের সাহিত্য ধারা ও সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি আহরণ করতে হবে। এখান থেকেই সকল শক্তি দৃষ্ট হয়েছে। এর মোকাবিলা করতে গিয়ে যে বিরূপতা আসছে এই শক্তির কাছে তা কিছুই নয়। আসলে আমরা এই শক্তি থেকে, কুরআন এবং হাদীস থেকে বিচ্যুত হবার কারণে আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, মূল্যবোধহীনতা, ধর্মহীনতা আসছে। আমাদের এই শক্তির দিকেই ফিরে যেতে হবে অর্থাৎ মূলধারার দিকেই ফিরে যেতে হবে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমাদের সাহিত্যিক মূল্যবোধ আহরণ করতে হবে। বর্তমানে আমি এর উপর কিছু কাজ শুরু করে দিয়েছি।

প্রশ্ন: এর জন্য যে ধরনের লেখক দরকার সেরকম লেখক কি আছেন?

উত্তর: এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের লেখক দরকার এবং আমাদের লেখক তৈরি করতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী লেখক যারা আগে ছিলেন, যারা আমাদের পূর্বসূরি সেখান থেকে আমরা কিছু শক্তি সঞ্চয় করতে পারি এবং বর্তমান এই পরিবর্তিত বিশ্বে আমাদের এই শক্তি উপলব্ধি ও আত্মস্থ করে লেখক তৈরি করতে হবে। আমাদের এই সাম্প্রতিক কালে যে বড় বড় লেখক এসেছেন নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ প্রমূখ সাহিত্যের এ ধরনের বড় বড় দিকপাল দরকার। উপন্যাসের দিক থেকে আমরা খুব বেশি এগুতে পারিনি। কিন্তু গদ্য সাহিত্যের দিক থেকে সামান্য এগিয়েছি। তবে কবিতার দিক দিয়ে আমরা এগিয়ে গিয়েছি অনেকটা। অন্তত এই ধারার সাহিত্যে যদি আমরা বিপুল সংখ্যক লেখক সৃষ্টি করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা আরো শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারব। তবে আশার কথা, ইতিমধ্যে এই ধারায় আমাদের বেশ কিছু লেখক তৈরি হয়ে গেছেন। বিগত কয়েক দশক থেকে তারা লেখালেখি করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে জামেদ আলী, মুহম্মদ মতিউর রহমান, আবদুল হালীম খাঁ, কবি মতিউর রহমান মল্লিক, সাজ্জাদ হোসাইন খান, কবি গোলাম মোহাম্মদ, হাসান আলীম, সোলায়মান আহসান, মোশাররফ হোসেন খান, বুলবুল সরওয়ার, নাজীব ওয়াদুদ, ফাহমিদ-উর-রহমানের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো।

প্রশ্ন: লেখক তৈরি করার দায়িত্ব কার?

উত্তর: লেখক তৈরি করার দায়িত্ব তো আসলে আমাদের সবার। এটা তো না কোনো রাষ্ট্রের, না কোনো সমাজব্যবস্থার, না কোনো দলের। এটা হচ্ছে আমাদের সবার। যারা এই ধারাকে ভালোবাসেন তাদের সবার দায়িত্ব এটা।

প্রশ্ন: তালিব ভাই, আপনিও তো অনেক দিন ধরে কাজ করছেন। বাংলা সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমেও কাজ করছেন। আপনি কি মনে করেন যাদের এই দায়িত্ব তারা ঠিকমতো তাদের দায়িত্ব পালন করছেন?

উত্তর: আমি তো গোড়া থেকেই কাজ করছি। সেই প্রথম থেকে, ১৯৫৯ সাল থেকে, যখন আমি বিষয়টি উপলব্ধি করেছি। মানে সাহিত্যের দিকে মনোনিবেশ করেছি তখন থেকে আমি এই ধারাকে উজ্জীবিত ও

www.pathagar.com

পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছি। গোড়াতেই ১৯৬০ সালে আমরা করেছিলাম পাক সাহিত্য সংঘ, ইসলামী ভাবধারাভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। তারপর আমাদের যে বাংলা সাহিত্য পরিষদ আসছে সেই একই ধারাভিত্তিক। আমরা চেষ্টা করে আসছি। সারা দেশে এখন আমাদের সমমনা অসংখ্য সাহিত্য সংগঠন গড়ে উঠেছে। আমাদের সাথে এখন শত শত লেখক জমায়েত হয়ে গেছেন। আল্লাহর রহমতে আমাদের এখন হতাশার কোনো কারণ নেই। কারণ আমরা লেখকের সংখ্যা বাড়াতে পারছি এবং অসংখ্য আগ্রহী লেখক এখানে চলে আসছেন। মানে এতে আশার সঞ্চার হচ্ছে, আমরা কিছু করতে পারব। আমরা বাংলা সাহিত্যে একটা শক্তিশালী ইসলামী ধারা সৃষ্টি করতে পারব।

প্রশ্ন: লেখকের সংখ্যা বাড়ছে। মান কি বাড়ছে?

উত্তর: মানটাই হলো বড় কথা আর কি? মান তো আর এক দিনে বাড়বে না লেখকের সংখ্যা যেভাবে বাড়ে। কিন্তু মান আস্তে আস্তে বাড়বে। সময় লাগবে। যেমন আমাদের যাঁরা বড় বড় কবি-সাহিত্যিক আছেন তাঁরা এক দিনে বড় হননি। তাঁরাও কয়েক বছর ও যুগ ধরে সাধনা করে বড় হয়েছেন। আমাদের আসলে সাধনা করতে হবে। যত বেশি আমরা সাধনা করব ততই বেশি আমরা লেখার মান বাড়াতে পারব। মানসম্পন্ন লেখক তখন তৈরি হতে পারবে। মানের সাথে সাথে আমাদের আদর্শিক চেতনা বাড়াতে হবে।

প্রশ্ন: সাধনার জন্য কি করতে হবে?

উত্তর: সাধনার জন্য তো বেশি পড়াশোনা করতে হবে। শুধু আমাদের বইপত্র-সাহিত্য নয়, অন্যদের এবং দুনিয়ার অন্য সমস্ত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা পাঠ করতে হবে। শুধু সাহিত্য নয়, সাহিত্যের সাথে জীবন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ও পাঠ করতে হবে। সেখান থেকেও জ্ঞান লাভ করতে হবে। কারণ জ্ঞানই দুনিয়ার আসল সম্পদ। আমাদের প্রিয় রসূল বলেছেন, জ্ঞান মুমিনের হারানো ধন। দুনিয়া জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়েছে। সবাই মিলে মানে মানবজাতির সবাই মিলে আমরা এগিয়ে চলছি। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সাহায্য করছে। হয়ত এই সাহায্য আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আসলে এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের সাহিত্যকে সাহায্য করছে। কাজেই আমাদের দুনিয়ার সাহিত্য পাঠ করতে হবে এবং আমাদের ধারা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

প্রশ্ন: আমাদের এখানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি ভালো পৃষ্ঠপোষকতা আছে?

উত্তর: আগে তো দিয়েছিল জমিদার, জায়গীরদার, সামন্তরাই। রাজা-বাদশারাও সাহিত্যে পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। কিন্তু যখন থেকে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে ফিরে আসছি, যখন থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছি তারপর থেকে রাজা-বাদশা এবং সামন্ত জমিদাররা উচ্ছেদ হয়ে গেছেন। এ গণতান্ত্রিক প্রথায় এখানে আসলে রাষ্ট্রের উপরে দায়িত্ব পড়ে গিয়েছে আমাদের সাহিত্যকে সহায়তা করার। রাষ্ট্র যদি আমাদের সাহিত্য ধারা সম্পর্কে সচেতন হয়, রাষ্ট্র যদি অনুভব করতো, যে রাষ্ট্রের নব্বই ভাগ মুসলমান বাস করে সে রাষ্ট্রের সাহিত্য ধারা

www.pathagar.com

ইসলামই হওয়া উচিত, তাহলে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা করত। কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু এটা অনুভব করে না, বরং রাষ্ট্রের অনুভূতি ভিন্ন, কাজেই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা দূরে থাক বরং রাষ্ট্র এর প্রতি বিরূপ। তাই এখানে আমাদের পৃষ্ঠপোষক আমাদেরই গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন: আপনি দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য চর্চা করছেন, অনুবাদ করছেন। আপনার কাজকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উত্তর: আমার কাজ, আমি যা করে আসছি, আমি তো নিজের দায়িত্ব হিসেবেই করেছি। যা কিছু করে আসছি এখনো দায়িত্ব হিসেবেই করে আসছি। মানে আমি আমার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছি কি না এটা আমি সব সময় বিচার করি। যখন থেকে আমি সচেতনতা লাভ করেছি যে বাংলা সাহিত্যে আমার নিজের দায়িত্ব পালন করা দরকার তখন থেকেই আমি আমার অন্য সব দায়িত্ব সত্ত্বেও এগিয়ে এসেছি। আমি দেখেছি আমাদের সাহিত্যে শাহ মোহাম্মদ সগীর থেকে নিয়ে আমরা যে একটা ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ধারা সৃষ্টি করেছি এবং যে ধারাটিকে বিগত সাত-আটশো বছর থেকে আমরা নজরুল-ফররুখ পর্যন্ত লালন ও বিকশিত করে আসছি তার মধ্যে আমরা একটা আদর্শিক সংযোজনে সক্ষম হয়েছি। একে একটা গুণগত উৎকর্ষ বলা যায়। এটা হচ্ছে সাহিত্যে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন। মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি আর ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এর মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য আছে। মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ কিন্তু ইসলাম সম্প্রদায় বিশেষ নয়, বরং একটা যুক্তিগ্রাহ্য মানবিক আদর্শ। যে কোনো বর্ণের সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য এ আদর্শ সমান লাভজনক এবং তার কাছে এটা গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। আর এটা কোনো নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক আদর্শ নয়, বরং বিগত বারশো বছর থেকে বিশ্বের বুকে এ আদর্শের জোরে আমরা যেনতেন প্রকারে হলেও টিকে ছিলাম। আমাদের টিকে থাকা ছিল ইসলামের জোরে, মুসলমানিত্বের জোরে নয়। আমার মনে হয়, আমরা আবার সেই আদর্শিক চেতনা বাংলা সাহিত্যে ফিরিয়ে আনতে পারছি। এভাবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি সাধ্যমতো।

বাকি রইল লোক তৈরি করা, সাহিত্য সৃষ্টি করা। এর কাজ তো চলছে এবং চলতে থাকবে, মানে থেমে থাকেনি। মানে লোকদের প্রতিভা, ক্ষমতা, দক্ষতা এগুলোর উন্নয়নে আল্লাহ তাআলারও সাহায্য দরকার। তবে কিছু কাজ আমরা করতে পেরেছি, যার ফলে আজকে আমাদের ধারার চর্চা হচ্ছে এবং আমরা চিন্তা করতে পারছি আমরা একটা ধারা সৃষ্টি করতে পেরেছি।

প্রশ্ন: আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি রকম?

উত্তর: মানে আমি আসলে এখন বয়সের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যে, লম্বা চওড়া কোনো পরিকল্পনা করার তো কোনো প্রশ্নই নেই। সেখানে বরং যারা এখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাজ করছে লিখে যাচ্ছে ওদেরকে কিভাবে সহায়তা করা যায় এটাই এখন আমার আসল পরিকল্পনা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: আপনার পরিকল্পনা মাফিক এখন এমন কোনো কাজ করতে পারেননি- এরকম আছে কি?

উত্তর: জীবনে বহু জিনিস, বহু ব্যাপারেই অতৃপ্তি থেকে যায়। বহু কাজ অসম্পন্ন থেকে যায়। আমরা অনেক পরিকল্পনা করি কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়ন অনেক সময় সম্ভব হয় না। আবার অনেকগুলো সম্ভব হয়। সবই আল্লাহর হাতে। যেমন আমার মূল পরিকল্পনা ছিল সাহিত্যে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করে মুসলিম সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্যের মধ্যে গুণগত পার্থক্য নিরূপণ করা এবং এই ধারায় একদল শক্তিশালী লেখক তৈরি করা। এ কাজে আল্লাহর অনুগ্রহে অনেকটা সফলতা এসেছে।

প্রশ্ন: আপনি এখন আপনার মৌলিক কাজের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, না অনুবাদ বা অন্যান্য দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন?

উত্তর: আসলে আমার মৌলিক কাজের দিকেই গুরুত্ব দিচ্ছি বেশি। তারপরেও অনুবাদ ও অন্যান্য কাজ এসে যায়, সেগুলো করতে হয়। কিন্তু মৌলিক কাজের দিকেই আমি গুরুত্ব দিচ্ছি বেশি।

প্রশ্ন: আপনি কি তরুণ প্রজন্মকে কাজের ব্যাপারে সে রকম উদ্যমী, অধ্যবসায়ী দেখেন?

উত্তর: তরুণ প্রজন্মের মধ্যে একটা বিরাট প্রশ্ন আছে যারা আসলেই কাজের ব্যাপারে বেশি উৎসাহী। তারা কাজ করতে চায় তারা যদি সহায়তা পায়, তারা যদি প্রেরণা পায়। তারা যদি মানে যাকে বলে উপাদান পায় তো কাজের ব্যাপারে তারাও অগ্রসর হতে পারে। তারাও সফলকাম হতে পারে। তাদের মধ্যে প্রচেষ্টা আছে। প্রচেষ্টা আছে বলেই তারা বেঁচে আছে।

প্রশ্ন: তাদের এই প্রচেষ্টা বর্তমান সময়ে বস্তুবাদের কাছে কি পরাজিত হচ্ছে?

উত্তর: এটা তো বাস্তবতা, যেখানে সংঘাত, সংকট সেখানে জয় এবং পরাজয় পদে পদেই আছে। বিজয় হলেও পরাজয় আসে আবার পরাজয় হলেও বিজয় আসে। কিন্তু আসলে কোনো পরাজয় পরাজয় নয় যদি মনোবল দৃঢ় ও অটুট থাকে, তাহলে পরাজয় হয় বিজয়ের সোপান। সে হিসাবে ওভার অল আমরা যদি তুলনা করি তাহলে আমরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি না বস্তুবাদের কাছে। বস্তুবাদ তো বিশ্বব্যাপী। এই বিশ্বব্যাপী বস্তুবাদের এই বিশ শতকে এবং একুশ শতকে যে অবস্থা আমরা দেখছি তার তুলনায় ইসলামিক চিন্তার অবস্থা অনেক সুস্থির এবং শক্তিশালী। যদিও কিছু দিন আগে ইসলামী চিন্তা এবং ইসলামী ধারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এখন এই ধারা তার নিজস্ব ভুবনে প্রবেশ করতে পেরেছে। কুরআন ও সুন্নাহর সাথে তার সংযোগ হচ্ছে অধিকতর। মানে ডাইরেক্ট যাকে বলা হয় সরাসরি সংযোগ হচ্ছে এবং আমরা অনুভবও করছি আসলে আমাদের কুরআন এবং সুন্নাহর ধারার দিকে ফিরে না গেলে আমরা আসলে ইসলামী ধারাকে উজ্জীবিত করতে পারব না। এখানে রয়েছে আমাদের শক্তির ভাণ্ডার। বস্তুবাদী বিশ্বে আসলে কোনো আদর্শ নেই। বস্তুবাদ কোনো আদর্শ নয়, এটা একটা জীবনোপকরণ। জীবনকে উপভোগ করার একটা মাধ্যম। আর জীবনে

www.pathagar.com

ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ের মিলিত অবস্থান। বস্তুবাদে ত্যাগ নেই, তাই তারা আসলে পিছিয়ে যাচ্ছে। যদি আমরা দেখি পঁচিশ পঞ্চাশ একশ' বছর আগের যে বস্তুবাদ, আমরা সেখানে তুলনা করতে পারব যে, আস্তে আস্তে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে। একশ' বছর আগে যে অবস্থা ছিল পঞ্চাশ বছর আগে তার চেয়ে আরো পিছিয়ে গেছে, পঁচিশ বছরে তার চেয়ে আরো পিছিয়ে আসছে এবং ইসলাম এখন সেই গ্যাপটা পূরণ করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলব না, ইসলাম বিজয়ী হচ্ছে। তবে ইসলামের সেই গ্যাপ পূরণ করার ক্ষমতা আছে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার পথেই সে এগিয়ে চলছে।

প্রশ্ন: বর্তমানে আমাদের সাহিত্যের যে ধারা চলছে বা যে রকম লেখালেখি হচ্ছে এখানে কিসের ঘাটতি অনুভব করেন?

উত্তর: বর্তমানে বাংলাদেশের সাহিত্যকে আমরা জাতীয় পর্যায়ে যদি বিচার করি তাহলে জাতির ঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না। এর কারণ হচ্ছে, এই যে আমি আগে বলেছি বামধারা আসলে জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন একটা ধারা। তারা ভিন্ন একটা ধারা আমাদের জাতীয় ধারার মধ্যে প্রবেশ করাতে চাচ্ছে। এক সময় তারা শ্রেণী-সংগ্রাম নিয়ে খুব মাতামাতি করেছিল। কিন্তু এর ব্যর্থতার পর এখন তারা যাচ্ছে সেকুলারবাদের দিকে। সেকুলারবাদ আসলে কোনো আদর্শ নয়, বরং আদর্শহীনতা, যার ফলে বাংলা সাহিত্যকে আসলে তারা তেমন কোনো সম্পদ দান করতে পারেনি, বরং তারা এই সাহিত্যকে আরো হীনবল করে দিয়েছে। আমরা যদি আমাদের পাশের দেশে, পাশের যে বাংলা পশ্চিম বাংলার সাহিত্যে দেখি সেখানে যে ধারা তাতে বাম ধারাও আছে, হিন্দুত্বের ধারাও আছে। বামধারা ও হিন্দুত্বের ধারা– এই দুই ধারা মিশিয়ে যে মিশ্র ধারার সৃষ্টি তারা করেছে তা তারা এক দুই বছরে করেনি। এরা একশ' বছর, দুশ' বছর থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তারা একটা ধারা তৈরি করে একটা মানে পৌঁছে গেছে। বিশ্বসাহিত্যের মোকাবিলায় তারা নিজেদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে পেরেছে। কিন্তু আমাদের এখানে এরা গত পঞ্চাশ বছর, ষাট বছর, সত্তর বছরে আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে কেবল পিছিয়ে দিয়েছে তাই নয়, তাকে দিশাহীন করে দিয়েছে। এখন আমাদের নিজেদের কোনা ধারা নেই। বাম ধারাকে আমরা নিয়ে আসছি। মানে বাংলাদেশের যে মুসলিম ধারা সে ধারার সাথে পাশ্চাত্য ধারা বা হিন্দুত্বের ধারা মিশিয়ে আমরা কিছু সৃষ্টি করতে পারিনি। এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা, বিরাট ব্যর্থতা। আমাদের মুসলিম ধারার বড় বড় লেখকদের তারা অগ্রাহ্য করে চলে গেছেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কলমকে শাণিত করে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে তছনছ করে চলে গেছেন। তারা নিজেরা ব্যর্থ হয়েছেন এবং জাতীয়ভাবে আমাদেরও ব্যর্থ করেছেন।

প্রশ্ন: অর্থাৎ এই ধারাটাই এখন আমাদের সাহিত্যে ঘাটতি সৃষ্টি করেছে?

উত্তর: জাতীয় পর্যায়ে আমরা আসলে ঘাটতির মধ্যে আছি। এজন্য আমি বলছি যে, ইসলামী ধারাকে যদি আমরা শক্তিশালী করতে পারি তাহলে এই ঘাটতি আমরাই পূরণ করতে পারব।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: সুস্থ ধারার সাহিত্য চর্চা বাড়ানোই এখন আমাদের এখানে জরুরি?

উত্তর: জরুরি অবশ্যই। আল্লাহর ফজলে আমরা আসলে সুস্থ সাহিত্য চর্চার দিকেই যাচ্ছি।

প্রশ্ন: আমাদের অগ্রজরা নবীনদেরকে কি সেভাবে পথ দেখাতে পারছেন?

উত্তর: আমাদের অগ্রজ যারা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারার সাথে সম্পৃক্ত তারা তো চেষ্টা করে গেছেন। তাদের প্রচেষ্টার ফলেই তো আমরা অনুপ্রেরণা পাচ্ছি। পথের সন্ধান পাচ্ছি। সার্বিকভাবে তারা নিজেদের ধারা থেকে বিচ্যুত হননি। আমরা যদি গত পঞ্চাশ ষাট বছরের আমাদের সাহিত্য ধারা দেখি, যখন থেকে আমরা কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঢাকাকে সাহিত্য কেন্দ্র করেছি তখন থেকে মুসলমানদের একটা ধারা এখানে সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় একটা ধারা ছিল সেটা ক্ষীণতম ধারা ছিল। এখানে মুসলমানদের একটা ধারা সৃষ্টি হয়েছে। এই ধারা সৃষ্টি হওয়ার পরে আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী লেখক কবি সাহিত্যিক তারা আসলে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তাদের ধারা থেকে আমরা শক্তি সঞ্চয় করছি।

প্রশ্ন: তাহলে কি আমাদের সাহিত্য আসলে সঠিক পথেই এগুচ্ছে?

উত্তর: আল্লাহর ফজলে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আসল পথ থেকে বিচ্যুত হইনি।

প্রশ্ন: এই পথকে আরো শক্তিশালী করতে গেলে কি করতে হবে?

উত্তর: শক্তিশালী করতে গেলে আসলে আমাদের লেখক সংখ্যা যেমন বাড়াতে হবে, আমাদের মানও সেভাবে আরো উন্নত করতে হবে।

প্রশ্ন: মানুষ কি বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সেভাবে আগ্রহ দেখাচ্ছে, না আমরা তাদের আগ্রহ জন্মাতে ব্যর্থ হচ্ছি?

উত্তর: প্রযুক্তি হলো জাতীয় বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। জাতীয় সামগ্রিকতার সাথে সম্পৃক্ত। সাহিত্য সেখানে তার একটা অংশ মাত্র। সাহিত্য প্রযুক্তিবিরোধী নয়। প্রযুক্তি যে একটা সম্পদ তাকে সাহিত্য অগ্রাহ্য করে না। সাহিত্যটা আসলে এই প্রযুক্তির মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলবে এবং এই ব্যাপারটা সাহিত্যের একটা অংশ। কাজেই এটা আমাদের জন্য কোনো সমস্যাই নয়, বরং এটা আমাদের সহায়ক।

প্রশ্ন: আমরা কি এর সঠিক ব্যবহার করতে পারছি?

উত্তর: ব্যবহার করতে আসলে আমরা এখন পর্যন্ত সঠিকভাবে তেমন পারছি না। এখানে আমাদের যারা লেখক তারা এই বিষয়ে খুব বেশি পাকাপোক্ত হতে পারেননি।

প্রশ্ন: আপনি আপনার লেখালেখি বা সাহিত্যের ঘাটতি কিভাবে দেখেন?

উত্তর: আমার লেখালেখি তো আসলে শুধু সাহিত্য নয়, বিভিন্নমুখী হয়ে থাকে। মানে সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ইতিহাস, ইসলামী বিষয়। মূলত আমি যে লেখালেখি করি সাহিত্য তার একটা অংশ বলা যায়। যেহেতু আমার সকল সামর্থ্য ও যোগ্যতাকে সাহিত্যের দিকে সেভাবে মেলে ধরতে পারিনি, তাই আমি এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু কাজ করার চেষ্টা করেছি এবং এই ইসলামী সাহিত্যকর্মকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা দান করেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্নঃ আপনাকে তো শিক্ষক ভাবা হয় এই লাইনে?

উত্তরঃ হয়ত এটা এজন্য হতে পারে যে, আমি আসলে এই ভাবধারার কথা প্রথম ভেবেছি। নয়তো ইতিপূর্বে আধুনিক আরবি ও উর্দু সাহিত্যে এ ইসলামী ভাবধারার চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি কেবল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর সূচনা করেছিলাম। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তখন যে ইসলামবিরোধী ধারা ছিল, এর আগে থেকে চলে আসা আমাদের ঐতিহ্যবাহী ধারা যে ধারা গোড়া থেকে চলে আসছিল সাতশ'-আটশ' বছর থেকে ওই ইসলামবিরোধী ধারার কাছে প্রায় চুপসে গিয়েছিল। আসলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী ধারাটিকে উজ্জীবিত করার জন্য আমরা এই ইসলামী ধারার আবির্ভাব ঘটাই। এটাই আমাদের আসল ধারা। ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে আমরা সঠিক ধারণা সৃষ্টি করেছি। ইসলাম যে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, জীবন থেকে আলাদা কোনো বিষয় নয়, বরং জীবনের সমস্ত বিষয়ই ইসলামী সাহিত্যের অঙ্গ। বিষয়টিকে প্রবল ও মুখ্য করার কারণে এতে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

প্রশ্নঃ উপন্যাস আমাদের সাহিত্যে শক্তিশালী হয়নি কেন?

উত্তরঃ দেখুন, কবিতার ধারা আমাদের এখানে শত শত বছর ধরে চলে আসছে। আর উপন্যাসের ধারা বাংলা সাহিত্যে এখানে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং এই ধারায় আমরা যাদেরকে পথিকৃৎ হিসেবে পেয়েছি তারা সবাই ভিন্ন চিন্তার ও ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে জড়িত। যেমন পশ্চিম বাংলার সাহিত্যে, সেখানে যারা প্রথম এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন তারা নিজেদের মতো করে এই ধারা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের লেখকরা পরবর্তী পর্যায়ে এসেছেন। তারা ওই ধারা থেকে আলাদা করে নিজেদের নতুন ধারা সৃষ্টি করতে পারেননি। তাদেরকেই গাইড মনে করে ওস্তাদ মনে করে এরা এগিয়ে গেছেন। ফলে আমাদের যে ইতিহাস-ঐতিহ্য তার প্রতি আমরা অবিচার করেছি বহু ক্ষেত্রে এবং তাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি। বহু জায়গায় তাকে আমরা আঘাত করেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এটা আমাদের জন্য সঠিক হয়নি। আমাদের যে কৃষ্টি এবং জীবনধারা সেটার প্রতি আমাদের আসলে সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমরা সহানুভূতিশীল হতে পারিনি। বরং আমরা তার সাথে নির্দয় ব্যবহার করেছি। এটা খতম করতে হবে। যেমন ধরেন, আমি আপনাকে বলি পীরবাদ। পীরবাদের সঙ্গে আসলে ইসলামের মৌল বিষয়ের তেমন কোনো সম্পৃক্তি নেই। কিন্তু আমাদের এখানে পীরবাদের মাধ্যমে ধর্মীয় যে আবহের সৃষ্টি হয়েছে সমাজে, জীবনে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পীরবাদের সাহচর্য ও কল্যাণমূলক কাজ এবং নেকীর কাজে প্রেরণা দান আমাদের জীবনধারায় যে গঠনমূলক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে তাকে তো অস্বীকার করা যায় না, কিছু পীরের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে আধুনিক যুগের সাথে এই পীরবাদ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছে না। এর মধ্যে অনেক গলদ দেখা যাচ্ছে এবং আমরাও এই গলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছি। এ ধারা এখন আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে মিশে গেছে। এ অবস্থায় এ ধারার উপর নির্মম আঘাত হানা মানে আমাদের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের উপর আঘাত হানা। এই অবস্থায় আমাদের সংবেদনশীল হওয়া উচিত

www.pathagar.com

ছিল। কোথায় এর গলদ, গলদটাকে চিহ্নিত করে এই ধারাটিকে সংশোধন করা উচিত ছিল। আমরা সেটা করতে পারিনি। পশ্চিম বঙ্গের যে সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে, মানে ইউরোপীয় ভাবধারার সাথে মিশিয়ে হিন্দু ভাবধারাসহ তারা বিশাল সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। তারা বামধারাও গ্রহণ করেছে। কিন্তু হিন্দু ভাবধারা অগ্রাহ্য করেনি। কিন্তু আমরা মুসলিম ঠিকই, কিন্তু আমাদের ধারার ভেতর তার সন্ধান করে ফিরতে হবে। আমাদের মুসলমানিত্বকে অগ্রাহ্য করে তাকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন: আমাদের ভবিষ্যত সাহিত্য সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন?

উত্তর: আমাদের ভবিষ্যত সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসকে বাদ দেয়া যাবে না। ইসলামকে একটা ধর্ম মনে করে তাকে অবহেলা করা যাবে না, বরং ইসলাম একটা আদর্শ, একটা জীবনবিধান ও জীবনব্যবস্থা। আর আমরা যে সাহিত্য করি তা জীবনভিত্তিক। কাজেই আমাদের জীবন, আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য সব কিছুকে ভিত্তি করে আমাদের সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। এটা অত্যাধুনিক হবে। আধুনিকতা পরিহার করে আমাদের এগিয়ে গেলে চলবে না, বরং আধুনিকতাসহ আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং ভাবধারা নিয়ে আমাদের সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। আর আধুনিকতা মানে কাল ও পরিবেশে জীবনের সঠিক ও সুন্দর বিকাশ।

প্রশ্ন: আমাদের সাহিত্যের পিছনে বর্তমানে সংস্কৃতির ভূমিকাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তর: বর্তমানে যে কালচার আমাদের এখানে গড়ে উঠেছে এই কালচারের মধ্যে ইসলামী ভাবধারা খুব কম। এর মধ্যে বরং সেকুলার ভাবধারা, পাশ্চাত্যবাদী ভাবধারা, বাম ভাবধারা, হিন্দুবাদী ভাবধারা সক্রিয়ভাবে আছে। এগুলো মিলিয়েই আমাদের কালচারটা এগিয়ে চলছে। কাজেই এই মেকি কালচারভিত্তিক সাহিত্য গড়ে তোলার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের সাহিত্য আমাদের কালচারভিত্তিক গড়ে তুলতে হবে। এজন্য যে কালচার আমাদের জীবধারার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে তার ভিত্তিতেই আমাদের সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে। কালচার তো আমরা বানাতে পারি না। জীবন যেভাবে বানাবো, জীবন যেভাবে তৈরি করবো কালচারও সেভাবে তৈরি হবে। তো আমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। আমাদের জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে, যা ইসলামের পথে চলবে। তার ফলে আমাদের কালচারও সেই পথে গড়ে উঠবে এবং আমাদের সাহিত্যও স্বাধীনভাবে এগিয়ে যেতে পারবে।

প্রশ্ন: এই অসুস্থ অবস্থায় সময় দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

উত্তর: অসুস্থতা আল্লাহর নিয়ামত। কারণ অসুস্থতার মাঝে মানুষ সুস্থতার মূল্য বোঝে। কাজেই সুস্থ অবস্থায় আমি যা করতে পারতাম অসুস্থ অবস্থায়ও তা আদায় করতে পেরেছেন বলে আপনাকেও ধন্যবাদ।

www.pathagar.com

‘জীবনকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করাই সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব’

–আবদুল মান্নান তালিব

প্রশ্নঃ বর্তমান সময়ে আমাদের সাহিত্য মূলধারার সঙ্গে কতটুকু সাযুজ্যপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

আবদুল মান্নান তালিবঃ মূলধারা বলতে এখানে জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির মূলধারা। আমাদের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির মূলধারা আসলে বলতে গেলে দু’টো ধারাই এখানে চলছে। দু’টো ধারাকে চিহ্নিত করা হয়েছে পাকিস্তান হবার পরে। পাকিস্তানের আগে আসলে একটা ধারাই আমাদের ছিল। ইংরেজ শাসন আমলের শেষের দিকে কলকাতাকেন্দ্রিক আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা যে ধারা সৃষ্টি করে সেটা একমুখী ধারা ছিল এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পরে যখন কলকাতা থেকে ঢাকায় আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি স্থানান্তরিত হলো তখন ঐ ধারাটিই স্থানান্তরিত হলো। দুই ধারা তখন ছিল। আমাদের সাহিত্যের যে ধারা সেটা মুসলিম সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে শাহ মোহাম্মদ সগীর থেকে চৌদ্দ শতকে বা তার আগে থেকে শুরু হয়। শাহ মোহাম্মদ সগীরের আগেও দুই তিনশ’ বছর থেকেই মুসলিম গণপর্যায়ে সাহিত্য চর্চা হতো। তার ফলেই তাঁর মতো সাহিত্যিকের জন্ম হয়। হঠাৎ করে তাঁর মতো একজন বড় কবির জন্ম হয়নি। তারপর থেকে বৃটিশ আমলের শেষ পর্যন্ত মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের যে সাহিত্য চর্চা সেটা একই ধারায় চলছিল। একমাত্র বাউল সাহিত্যের মুসলিম ধারার উপর কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

এছাড়া এখানে অন্য কোনো ভাবধারা বিস্তার করতে পারেনি। এটাই আমাদের মূলধারা।

ঢাকাকেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চার পরে এই মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরেকটা ধারার সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামী ও মুসলিম ভাবধারা থেকে আলাদা হবার জন্য এর সৃষ্টি। এই ধারার মূল যে বিষয় তা হলো ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া, আমরা যাকে বাম ধারা বলি। সেক্যুলার হিসেবেই এখন তা পরিচিত। ১৯৪৭ থেকে ২০০৭ এই ৬০ বছরের মধ্যে এই ধারাতেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়, বিশেষ করে রাশিয়া ও চীনে মার্কসবাদের পতনের পর এ ধারাটি সেক্যুলারদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই এটা আমাদের জাতীয় মূলধারায় একীভূত না হয়ে বিচ্ছিন্নই থেকে যাচ্ছে। সাহিত্য যেহেতু জীবনকেন্দ্রিক কাজেই জাতীয় জীবন থেকে সরবরাহ না পেয়ে এ ধারা একদিন বিশুষ্ক হয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শাহ মোহাম্মদ সগীর থেকে চৌদ্দ শতকে আমাদের যে ধারা শুরু হয়েছিল এবং বিশ শতকে নজরুল ইসলাম এসে যে পুনর্বার শক্তি অর্জন করল ঢাকায় স্থানান্তরের পরে আমাদের এই ধারাটি ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফাসহ অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে। স্বাধীন বাংলাদেশে সত্তর ও আশির দশকে এই ধারাটি নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়। আমাদের জাতীয় ভাবধারায় ইসলামী মূল্যবোধ সংযোজন করে এই অঙ্গনটি নতুনভাবে পরিচিত করা হয়। ধীরে ধীরে এই ধারাটি ব্যাপকতা লাভ করছে। জাতিকে উজ্জীবিত করছে এবং জাতীয় সাহিত্যে মূলধারাকে যথেষ্ট সুস্পষ্ট করে তুলছে।

প্রশ্নঃ সাহিত্য তথা কবিতায়, নাটকে, উপন্যাসে, গল্পে নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তা কতটুকু শিল্পসম্মত হচ্ছে?

আবদুল মান্নান তালিবঃ নারী সাহিত্যেরই একটি অংশ। নারীকে বাদ দিয়ে কোনো সাহিত্য হয় না। পুরুষ ও নারী উভয়কে নিয়েই সাহিত্য। তবে সুদীর্ঘকাল থেকে নারীর সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক মূলত প্রেম দিয়েই করা হচ্ছে, অথচ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক। আর নারীর সঙ্গে আছে নারীত্ব। এই নারীত্বের বিকাশ- একটি মেয়ে যখন থেকে সচেতন হয় তখন থেকেই তার বিকাশ শুরু হয়। শুধু যৌবনটাই বড় কথা নয়। বিয়ের পর নারী যে একটা সংসার করে, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক, সন্তান-সন্ততি লালন-পালন, সংসারের অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে, এ সবগুলোর সঙ্গেই নারীত্বের সম্পর্ক আছে। মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা, প্রেম, ঘর-সংসারের দায়িত্ব পালন, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য, প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুর প্রতি একটি মেয়ের যে দায়িত্ব পালন সবগুলো নিয়েই নারীত্ব। কাজেই সাহিত্যে কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, রম্য রচনায়, প্রবন্ধে সবক্ষেত্রেই নারীর এই পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বের প্রতিফলন তুলে ধরাই শিল্পসম্মত। খণ্ডিত শুধু প্রেমের উপাখ্যানই শিল্প নয়, শুধু আমাদের সাহিত্যেই নয়, বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে আমরা যদি দেখি ইংরেজি, ফরাসি, ইতালি, জার্মান, রাশিয়ান ইত্যাদি সাহিত্যে প্রায় সর্বত্র নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবেই উপস্থাপন করা হচ্ছে। এজন্য

www.pathagar.com

অশ্লীলতার কোনো অঙ্গনকেই বাদ দেয়া হচ্ছে না। এটাকে শিল্পসম্মত বলা তো যায়ই না, বরং এটা শিল্পই নয়।

প্রশ্নঃ শিল্প সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষে নারী উপস্থাপন কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

আবদুল মান্নান তালিবঃ শিল্প সাহিত্যে আসলে নারীকে একজন দায়িত্বশীল সমাজ প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত। কারণ আল্লাহ তাআলা পুরুষকেও দায়িত্ব দিয়েছেন, নারীকেও দায়িত্ব দিয়েছেন পৃথক পৃথকভাবে। পুরুষকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন নারী দায়িত্বের মধ্যে তার থেকে একটি বাড়তি দায়িত্ব আছে। সেটা হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি। পুরুষ এবং নারী উভয়েই এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও নারীই এর মূলকেন্দ্র। নারী ও পুরুষের ভালোবাসা-প্রেম যা কিছু আমরা বলি, সব এর সাথেই সম্পর্কিত। আমাদের যে সংসার এ সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়ে ওঠে সেখানে পুরুষের সাথে সাথে নারীকেও বড় রকমের দায়িত্ব পালন করতে হয়। কাজেই আমাদের শিল্পে ও সাহিত্যে এই দৃষ্টিতে নারীকে পুরোপুরি উপস্থাপন করা উচিত। খণ্ডিতভাবে নয়, পুরোপুরি উপস্থাপন করতে হবে। সমস্ত জীবনব্যাপী নারী যে দায়িত্ব পালন করে তার অবস্থান সাহিত্যে এবং শিল্পে সেভাবেই হওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ ধর্মকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা আমাদের সাহিত্যে এলো কোথা থেকে?

আবদুল মান্নান তালিবঃ এখানে শুধু ধর্মের প্রসঙ্গে আসা হচ্ছে। কিন্তু আসলে বিষয়টি আরো গভীরে পৌঁছে গেছে। নাস্তিক্যবাদী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা আমাদের সাহিত্যে যখন থেকে প্রবেশ করে তখন থেকেই ধর্মের বিরুদ্ধে একটা আবহ সৃষ্টি হয়। সেটা আমরা দেখি মুসলিম শাসনের পরে বৃটিশ শাসনের যুগ থেকে চিন্তায়, ভাবধারায়, শিক্ষা ব্যবস্থায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে ইউরোপীয় প্রভাব বিস্তার লাভ করে প্রাচীন ভারতীয় শিরকবাদ এবং নাস্তিক্যবাদের সাথে তা একটা আপস করে নেয়। আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে প্রথম দিকের প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ধর্মবিরোধী একটা চিন্তা কাজ করতে থাকে। ইউরোপে এর আগে গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বে গির্জা শাসনের পতন হয়। এই পতন ধর্মকে দুর্বল করে দেয়। এর প্রভাব ইউরোপীয় চিন্তায়, ভাবধারায়, সাহিত্যে, মননে যেভাবে পড়ে সেটা আমাদের দেশেও স্থানান্তরিত হতে থাকে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তখন ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হবার কারণে আমাদের সাহিত্যে ধর্ম বিরোধিতা ও নাস্তিক্যবাদ সঙ্গোপনে অনুপ্রবেশ করে। এরই চূড়ান্ত রূপ রুশ বিপ্লবের পরে রুশীয় সাহিত্যের যে প্রভাব আমাদের দেশে পড়ে মানে রুশীয় সাহিত্য ও মার্কসবাদী ভাবধারার যে প্রভাব পড়ে যেটা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, আসলে এই পথ দিয়েই ধর্মকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করে।

প্রশ্নঃ আপনাদের জীবন যৌবনকালের সাথে বর্তমানকালের আপনার অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সাহিত্যের পার্থক্যটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবঃ সাহিত্য চর্চা আগে থেকে ব্যাপকতা লাভ করেছে। আগে জীবন উপলব্ধি এ পর্যায়ে ছিল না। এখন জীবনকে যেভাবে চতুর্মুখী দেখা হচ্ছে সেকালের জীবন সে তুলনায় ছিল অনেকটা ঘরমুখী বা অন্তরমুখী। কাজেই সেকালের সাহিত্যটা এ কালের মতো ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। দুই নম্বর হচ্ছে মূল্যবোধের অনেক পার্থক্য ঘটে গেছে। সেকালের মানুষের জীবন ছিল সহজ সরল। জটিলতা অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হতো না এবং মানুষ সৃষ্টি করতে চাইতও না। কাজেই সেকালের সাহিত্যে আমরা যে সৌন্দর্য ও সুস্থিরতা দেখেছি একালের সাহিত্যে তার রূপ ভিন্ন। একালের সাহিত্যের যে সৌন্দর্য তা অনেকটাই কৃত্রিম। যেখানে হাদীসে বলা হয়েছে, 'ইন্নাল্লাহা জামিনুল ওয়া ইউহিব্বুল জামাল'– আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য বা সুন্দরতা পছন্দ করেন। এর মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই। নিখাদ এবং অকৃত্রিম সুন্দরতা এটাই হচ্ছে সৃষ্টির আসল চেহারা। বর্তমান সাহিত্য চর্চার মধ্যে সৌন্দর্যের এই চেহারা অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম রূপ নিয়েছে। এ কৃত্রিমতার মধ্যে সেই অকৃত্রিমতাকে উপভোগ করাই এখন একজন সাহিত্য বোদ্ধা বা সাহিত্য পাঠকের কাজ।

তৃতীয় সাহিত্য ও সাহিত্য চর্চা বর্তমানে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং আরো এগিয়ে যাবে। আর সেকালের সাহিত্য চর্চা এতটা এগুতে পারেনি। জীবনের একটা অংশেই (সদাচার) ছিল তার বিস্তার। আর এখন সাহিত্য সবক্ষেত্রেই বিস্তার লাভ করছে। জীবনকে এখন সার্বিকভাবে উপভোগ করা হচ্ছে। যেটা সেকালে সম্ভব হয়নি।

প্রশ্নঃ বর্তমানে জীবনের যে সাহিত্য তা কী পূর্ণাঙ্গ?

আবদুল মান্নান তালিবঃ বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ জীবন নিয়ে সাহিত্য চর্চা হচ্ছে। জীবনের কোনো অঙ্গন বাদ দেবার চেষ্টা নয়, বরং আরো বিভিন্ন অঙ্গন খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে জীবনকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করাই সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের দায়িত্ব। যেমন এক্ষেত্রে আমরা কুরআনের দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারি। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ ও জুলেখার মধ্যেকার টানাপোড়েন, জুলেখা ইউসুফকে প্রেম নিবেদন করছে, কিন্তু ইউসুফ মিশরের গভর্নর এবং মহান প্রভু আল্লাহর প্রতি অনুগত থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করেন। যৌবনের চাহিদার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেননি। এই যে সত্যিকার জীবন উপলব্ধি আজকের সাহিত্যে তা অনুপস্থিত। এই দিক দিয়ে সাহিত্য জীবনের প্রতি তার যে অঙ্গীকার তা পূর্ণ করতে পারছে না। এটা মানব জাতি এবং মানব সভ্যতার জন্য বিপর্যয়কর।

প্রশ্নঃ বর্তমান সাহিত্যে জীবন ঘনিষ্ঠতার এত অভাব কেন?

আবদুল মান্নান তালিবঃ এটা আসলে বর্তমান সভ্যতারই প্রকট সংকট। যেভাবে মানুষকে একটি উৎপাদনশীল যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে এবং মানুষের মানবিক গুণাবলীকে পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত করা হয়েছে, যার ফলে মানুষ জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে তার সময়ের বিপুল অংশ বা সিংহভাগ ব্যয় করছে। ফলে এই পরিবেশ তাকে জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার পরিবর্তে ভোগের দিকে এগিয়ে

www.pathagar.com

নিয়ে যাচ্ছে। জীবনকে সে হালকা করে দেখছে। কাজ করো, খাও দাও, ফুর্তি করো।

প্রশ্নঃ একটু অন্য প্রসঙ্গে আসছি। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশীয় সাহিত্য, কৃষ্টি-কালচারের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলছে?

আবদুল মান্নান তালিবঃ রাজনীতি সব সময়ই সাধারণ জনগণের চিন্তা-ভাবনায় কাজে-কর্মে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন আরবিতে একটা প্রবাদ আছে, আননাস আলা দিনিমুলুতিহীন– শাসকদের চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা অনুযায়ী জনগণ তাদের জীবন গড়ে তোলে। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে আমাদের কৃষ্টি-কালচার সাহিত্য আলাদা থাকতে পারে না। আর বিশেষত আজকের যুগে যেখানে রাষ্ট্র জীবনের সমস্ত অংগনে তার প্রভাব খাটায় (রাজনীতি অর্থনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষায়) সেখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাদ থাকতে পারে না। কারণ সাহিত্য সংস্কৃতির সাথেই জড়িত থাকে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ। আর তারা রাষ্ট্রের সব বিভাগের সাথে জড়িত। কাজেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে আলাদা থাকার উপায় নেই। রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাইরে গিয়ে অন্য ধরনের কোনো সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক অঙ্গন তৈরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। রাজনীতিকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, ভাঙ্গা-গড়া ও নোংরামি এটা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও প্রবেশ করে, যার ফলে আমাদের সাহিত্যাঙ্গনে রেষারেষি দলাদলি অনুপ্রবেশ করেছে। এটা রাজনীতির কুপ্রভাব, যার ফলে সাহিত্যের কল্যাণমুখিতা বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাহিত্যিকদের সাথে ব্যবহার করার সময় রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতাকে গুরুত্ব দিয়ে অনেক দুঃস্থ কবি সাহিত্যিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ সমাজের সর্বত্র দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়নের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এটা কেন?

আবদুল মান্নান তালিবঃ এটা আমাদের জাতির চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এক ব্যক্তি ভুখা থেকেও সৎ থাকতে পারে। সে চুরি করে না, দুর্নীতি করে না। অন্য ব্যক্তি অনেক পাওয়ার পরও তার ক্ষুধা মিটে না। সে দুর্বৃত্তায়নের পথে এগিয়ে চলে। অন্যদিকে মুসলিম হওয়ার কারণে সৎ ও সততাই আমাদের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিগত ৫০/৬০ বছরে একদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও দুরবস্থা জাতিগতভাবে আমাদের চরিত্রকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা এমনভাবে সাজাতে পারিনি যার ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা অন্যায় এবং অসততার প্রতি উপলব্ধ না হয়ে সততা ও ন্যায়নীতির অনুগামী হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা এক্ষেত্রে তাদেরকে সৎ হয়ে গড়ে ওঠার ব্যাপারে কোনো সহায়তা করেনি। আমরা শিক্ষিতদের তুলনায় অশিক্ষিতদের মধ্যে সততা ও ন্যায়-নীতির প্রভাব বেশি লক্ষ্য করি। এজন্য যে তারা শিক্ষা লাভ করেনি।

দ্বিতীয় সাধারণ মানুষের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের সুযোগ শিক্ষিত মানুষের তুলনায় অনেক কম। ভোগের যে নীতি আমাদের এখানে গড়ে

www.pathagar.com

উঠেছে জীবনকে উপভোগ করার জন্য চতুর্দিকে যেভাবে বস্তুসামগ্রী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা আহরণ করার জন্য আকর্ষণীয় ও লোভনীয় বিজ্ঞাপন ও প্রপাগান্ডা করা হচ্ছে, যার ফলে সেগুলো নাগালে আনার জন্য মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ স্বাভাবিকভাবে সোজা পথে সেগুলো আহরণ করার ক্ষমতা সবার নেই। সৎভাবে জীবন যাপন করে এসব লোভনীয় ভোগ্যসামগ্রী লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই দুর্নীতির দিকেই এগুলো মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি এমন হতো যে, আমাদের প্রত্যেককে দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলতো, আমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমার সংগ্রহ করার দরকার এবং আমাদের নিজের প্রয়োজন ছাড়াও অন্যের প্রয়োজন পূরণে যে আমাকে সহায়তা করতে হবে– এ ধরনের ভাবধারা সৃষ্টি করতে পারত, তাহলে নিজের স্বার্থকে আমি বড় করে দেখতাম না। নিজের স্বার্থ পূরণ করার সাথে সাথে অন্যের স্বার্থ পূরণে সহায়তা করতে আমি এগিয়ে যেতাম, দুর্নীতি করার প্রতি আগ্রহী হওয়ার কোনো ভাবধারাই আমার মধ্যে জাগত না। আমি হতাম একজন মর্যাদাশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সেভাবে গড়ে তুলছে না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদেরকে একদল ভুখা স্বার্থ শিকারীতে পরিণত করছে। ফলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের পথই প্রশস্ত করেছে। জাতিকে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের হাত থেকে বাঁচাতে হলে এই শিক্ষা ব্যবস্থাতেই প্রথমে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। আর এই পরিবর্তনটা ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমেই সম্ভব। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম সাত থেকে আট বছর শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যার ফলে একটি শিশুর কোমল মনে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতি ঘৃণা জন্মায়। প্রথমত শিশু মনে একটি বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে বেঁধে দিতে হবে যে সে শুধু একটি শিশুই নয়, তাকে বড় হতে হবে এবং নিজের দেশ ও জাতির প্রতি তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। এর প্রথম বিষয় হচ্ছে তাকে একজন মহান স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, তাকে একটা বড় দায়িত্ব দিয়ে। তাকে দায়িত্বহীন নয়, দায়িত্বশীল হতে হবে। এই প্রথম সাত আট বছর যদি তাকে একমুখী করা যায়, তার মনে একটি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, সেই বিশ্বাসের প্রতি যদি তাকে অনুগত করা যায়, তাকে যদি এই শিক্ষা দেয়া যায় যে, শুধুমাত্র লেখাপড়া শেখা, খাওয়া-দাওয়া করা, খেলাধুলা করাই জীবন নয়, বরং এগুলোর মাধ্যমে যে জীবন গড়ে উঠবে সেখানে তাকে আরো বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সে দায়িত্ব পালনে তাকে সৎ ও পরিশ্রমী হতে হবে এবং তার প্রত্যেকটা কাজের ভালো ও মন্দ ফল আছে। ভালো ফলের জন্য তাকে ভালো বলা হবে, মন্দ কাজের জন্য তাকে মন্দ বলা হবে। কাজেই যাতে সে পরবর্তী পর্যায়ে মন্দ ও দায়িত্বহীন হিসেবে পরিচিত না হয়ে ভালো ও দায়িত্বশীল হিসেবে পরিচিত হতে পারে। এভাবেই তার নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই মূল্যবোধগুলো একমাত্র ধর্মীয় ভাবধারাই সরবরাহ করতে পারে। আরেকটি হলো ভোগের প্রতি লিপ্সা সৃষ্টি করা হয়, যা আগেই উল্লেখ করেছি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন: আমাদের সমাজব্যবস্থায় কেমন যেন একটা ধস নেমেছে! এর থেকে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে কিভাবে রক্ষা করা সম্ভব?

আবদুল মান্নান তালিব: আমাদের সমাজব্যবস্থায় যে ধস নেমেছে এটা এজন্য যে, আমরা আমাদের পথে থাকিনি, অন্যপথে চলছি। আমরা আমাদের সমাজটাকে আমাদের মতো গড়ে তুলিনি। অন্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছি। আমাদের বাংলাদেশে যে সমাজ এটা বৃহত্তর উপমহাদেশীয় সমাজের একটা অংশ। মুসলমানরা এদেশে এসে এদেশের সমাজব্যবস্থার একটা মৌলিক পরিবর্তন আনে। এখানে ছিল শিরকবাদ, বহু ঈশ্বরের উপাসনা, জীব ও জড় এবং অদৃশ্য বহু ঈশ্বরের উপাসনার এখানে প্রচলন ছিল। ইসলাম এখানে মানুষকে এক আল্লাহমুখী করে। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাসনা, আরাধনা, পূজা, ইবাদত-বন্দেগী করা যায় এমন কোনো সত্তা নেই। শুধু উপাসনা, আরাধনা নয় আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক, নিরাপত্তা বিধানকারী এবং জবাবদিহিতা একমাত্র আল্লাহর কাছেই করতে হবে। এই ধরনের সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এক আল্লাহতে বিশ্বাস মানুষের মধ্যে প্রবেশ করায় এরই ভিত্তিতে একটা জীবনধারা এখানে গড়ে ওঠে, একটা সমাজ গড়ে ওঠে।

এখানে ছিল একটা বর্ণবাদী সমাজ। তার জায়গায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে একটি নিশ্ছিদ্র বর্ণহীন সৌভ্রাতৃত্বে পূর্ণ একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা। ইসলাম মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে 'কুল্লুকুম রাইন ওয়াকুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইইয়াতিহীম অর্থাৎ প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।' এ জবাবদিহি অবশ্যই হবে এবং এই জবাবদিহি হবে কেয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে। সেদিন সে আদালতের সর্বময় কর্তা হবেন একমাত্র আল্লাহ। সেখানে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। প্রত্যেকের কাজকর্ম ভালো-মন্দ তুলাদণ্ডে ওজন করা হবে। তারপর ভালো কাজকে পুরস্কৃত ও খারাপ কাজের জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এর হাত থেকে কেউই রেহাই পাবে না। এই ভাবধারাভিত্তিক যে সমাজ ইসলাম কায়েম করে সেটিই ছিল মুসলমানদের সমাজ।

বিগত সাত আটশ বছরের অনুশীলনে মূল্যবোধের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমরা ইসলামের অনেক মূল্যবোধকে ধরে রাখতে পারিনি। অনেক মূল্যবোধকে বিকৃত করেছি। অনেক মূল্যবোধের নিজেদের ব্যাখ্যা মতো নতুন রূপ দিয়েছি। এভাবে আমরা মূল ইসলামী সমাজ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আমাদের সমাজে যে ধস ও অবক্ষয়ের দেখা পাচ্ছি তা হচ্ছে আসলে আমাদের জাতীয় মূল্যবোধবিরোধী ভাবধারা ও কার্যক্রমের ফল। আসলে আমাদের নিজেদের মূল সমাজ চিন্তা ও সমাজচিত্রের দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং এটা কোনো অসম্ভব বিষয় নয়। কারণ আমাদের সমাজব্যবস্থার মূল ভাবধারা ও কাঠামোর কুরআন হাদীস ও আমাদের সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ সদাচারিগণের আদর্শ আজো অটুট আছে। তারই ভিত্তিতে নতুন আঙ্গিকে সমাজব্যবস্থাকে এ কালের মতো করে পুনর্গঠন করতে হবে। [সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ওমর বিশ্বাস]

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান তালিবের

কয়েকটি কবিতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হে শহীদেরা!

উড়বে যতই উড়ুক আকাশে হেলিকপ্টার গানবোট-
ভাঙুক পোড়াক জ্বালুক যতই আগুন
পাহাড় শস্যক্ষেত ফলের বাগান
নাই থাক কিছুই
আকাশটা তো আছে।

আহা চেংগীস খানের সিপাহীরা দয়ার শরীর
শত্রুর মাথার খুলি দিয়ে পাহাড় বানাতো
শত্রুর শেষ রাখতে নেই
তাই সদ্যোজাত শিশুটাকেও ছাড়তো না
তাদের কলংক তোমাদের জয়ের নিশানী।

আমরা তো লড়াকু
মিন্দানাও ইরিত্রিয়া আফগানিস্তান
সর্বত্রই প্রতিরক্ষার লড়াই
আমরা কোথাও থেমে নেই
আমাদের লড়াই চলবে।

এশিয়া ও আফ্রিকায় আমাদের সংগ্রাম চলছে
জীবন বিধানকে আঁকড়ে ধরেছি
জিব্রীল যে বাণী এনেছিলেন
একদিন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল চতুষ্কোণ কাবা গৃহে
আজ তাই আমাদের প্রতি গৃহে আলোচনার বিষয়
আমরা ঝরাচ্ছি বুকের রক্ত
হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে
আমরা কোথাও থেমে নেই।
একটি অংগীকারে বাঁধা আমরা সবাই
হে শহীদেরা! তোমরা সফলকাম
সত্য প্রমাণ করলে যা অংগীকার করেছিলে
আমরা প্রতীক্ষারত লাখো জনতার মিছিলে।

www.pathagar.com

তারকাপুঞ্জে আলাপ

১ম ঃ সব গৌরব সকল গরিমা জানি শুধু আল্লাহর
নিখিল স্রষ্টা, মহিমান্বিত, শেষ নাই করুণার।
তামাম আলম, কুল মাখলুক পায় সে করুণা ধারা
পায় সে করুণা অনুকণা থেকে সুবিশাল গ্রহ-তারা
তবুও ভাগ্য দেখে পৃথিবীর জাগে প্রাণ বিস্ময়,
বুকের অতলে রাখে সে অশেষ শহীদের সঞ্চয়,
খোদার রহমে লক্ষ শহীদ পেল যে বক্ষে ফিরে
শহীদ মালেক ঘুমায় এখন সেই ধরনীর নীড়ে।

২য় ঃ অনন্তকাল জ্বলি আমি আসমানে
আঁধার বিশ্বে ছড়ায়ে আলোক
যন্ত্রণা জাগে প্রাণে।
একটি শহীদ একটি মানিক ঘুমাতো যদি এ বুকে
হয়তো পেতাম প্রশান্তি প্রাণে অনিবান এ দুঃখে।

কুতুব তারা ঃ ঐ দুঃখিনী ধরার ভাগ্যে হয়ো না ঈর্ষাতুর,
তার যন্ত্রণা আরো দুঃসহ, কাহীনি সে অশ্রুর!

৩য় ঃ শস্য শ্যামলা যে ধরনী তার কি আছে যন্ত্রণার?

১ম ঃ আগ্নেয়গিরি আছে তার বুকে অশান্ত পারাবার।
হিংস্র হায়েনা, বিষাক্ত সাপ, বৃশ্চিক আছে ঢের
তার সুগোপন বেদনার কথা তোমরা পাওনি টের।

৪র্থ ঃ দীর্ঘ রাতের প্রহরী তারকা আকাশে তন্দ্রাহারা
তুমি বলো সেই সুদূর ধরার কাহিনী কুতুব তারা।

কুতুব তারা ঃ উন্মাদ এসেছিল ঐ পৃথিবীর প্রান্তরে,
অবিশ্বাসের আঁধি ছিল তার অশান্ত অন্তরে।
স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে ভেবেছিল শুধু সৃষ্টির কথা,
চিরসত্যকে বলেছিল শুধু চরম সে অজ্ঞতা,

www.pathagar.com

বিপথগামী সে মুর্খের পথে হারায়ে দিগ্বিদিক,
জ্ঞানহীন যারা সাজলো সহজে জড়বাদী নাস্তিক
শোষণ, শাসন, অবিচার আর জুলুম চালায়ে যত
প্রশান্তিময় পৃথিবীর বুক করে তারা বিক্ষত।
কখনো শহীদ আসে সিদ্দীক রহমতে আল্লাহ'র
পায় সে ক্ষণিক সান্ত্বনা তাতে পৃথিবী দুঃখে তার।

৫ম ঃ ভুলের সড়কে চলবে মানুষ হবে কি অন্যথা?
তারা কি শোনেনি, শুনবে না তারা আখেরী নবীর কথা।

কুতুব তারা ঃ জানি না কি চায় বিপথগামী সে ভ্রান্ত মানুষ আজ
হয়তো এখনো ভাল লাগে তার মিথ্যার কারুকাজ।

৬ষ্ঠ ঃ আসে নাই কোন বিজ্ঞানবিদ-বিজ্ঞ দার্শনিক
আসে নাই কোন জ্ঞানী-গুণী ফিরে দেখতে পন্থা ঠিক?
কুতুব তারা ঃ বহু জ্ঞানী, গুণী, বোঝায়েছে সেই কথা।
বিজ্ঞানবিদ বলেছে কোথায় মিথ্যার ব্যার্থতা
যুক্তির কথা, গণিতের কথা, মানেনি সে নাস্তিক
হিংস্রতা, পাপ, প্রতারণা নিয়ে তাকায়েছে অনিমিখ।

১ম ঃ তবে কি হত্যা করেছে ওরাই হিংস্র পশুর মত,
শহীদ মালেক ওদের হাতে কি হলো ক্ষতবিক্ষত?
বুকে নিতে চায় যাকে আসমান, জান্নাত চায় যাকে
নাস্তিকতার বাহকেরা মিলে হত্যা করেছে তাকে।

কুতুব তারা ঃ হত্যা করেছে ওরাই মাসুম আল্লাহর বান্দাকে
নাস্তিকতার বাহকেরা মিলে হত্যা করেছে তাকে।
দোয়া কর শুধু দোয়া কর আজ আল্লাহর দরবারে,
মানুষের দিন আসে যেন ফিরে পৃথিবীর কান্তারে।
যেন মিথ্যার নাস্তিকতার রাত হয় অবসান,
পায় ধরাতল যেন সত্যের, শান্তির সন্ধান।

www.pathagar.com

জানা সব আল্লাহর

রজব আলী দফাদার
খায় নাড়ু পান্তা
রোজ রোজ বলে শুধু
সেই সব জান্তা।

আকাশেতে কত তারা
সেই নাকি গুণেছে
কাক পাখি বানরের
সব কথা শুনেছে।

এক দিন ওপাড়ার
বুড়ো দাদু আসলো
তাই দেখে রজব আলী
খুব করে হাসলো।

হঠাৎ শুধায় দাদু
বল দেখি রজব আলী
সব যদি জেনে থাকো
এইটুকু বলো খালি।

কত দিন তুমি আর
পৃথিবীতে বাঁচবে?
কত দিন তোমার আর
সুখে দিন কাটবে?

রজব আলী দফাদার
মুখে নেই রা'টি তার,
তারপর জানো শেষে
কি জবাব দিল হেসে।

বললো সে দফাদার
জানা সব আল্লাহর!

www.pathagar.com

অ্যালবাম

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত ৪র্থ জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন, গাইড হাউজ মিলনায়তনের অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

বিশিষ্ট লেখক সানাউল্লাহ্ নূরীর সাথে করমর্দন করছেন কমোডর আতাউর রহমান, পাশে আবুল আসাদ ও সবশেষে আবদুল মান্নান তালিব।

বাংলা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ৪র্থ জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের মাঝে ডা.স.ম. রফিক, আবুল আসাদ, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, কবি আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান তালিব ও মাহবুবুল হক

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদের ২০০তম সাহিত্য সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ (বামদিক থেকে) আবুল আসাদ, কবি আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান তালিব, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, কবি সোলায়মান আহসান, শাহাবুদ্দীন আহমদ

বাংলা ১৪ শতক উদযাপন কমিটির উদ্যোগে গুণীজন সংবর্ধনায় পুরস্কৃত করা হয় আবদুল মান্নান তালিবকে (মাঝে)

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদের অফিসে একান্ত আলাপচারিতায় অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, আবদুল মান্নান তালিব ও ড. আসকার ইবনে শাইখ

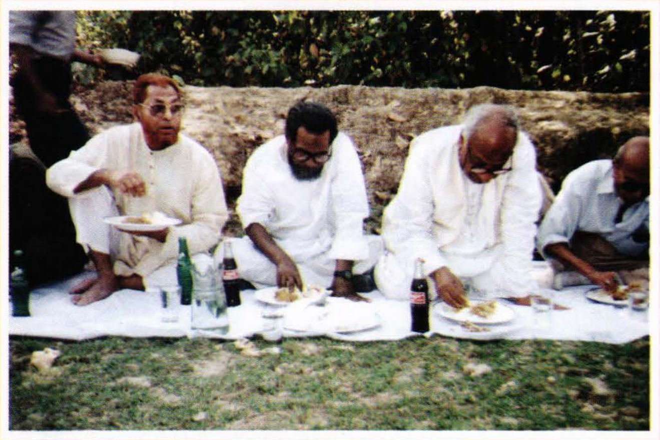

বাংলা সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক বনভোজনে অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, আবদুল মান্নান তালিব, ড. আসকার ইবনে শাইখ ও কবি আল মাহমুদ

www.pathagar.com

দেশের বিশিষ্ট গুণীজনদের মাঝে আবদুল মান্নান তালিব

সাহিত্য আসরে শ্রোতার আসনে আবদুল মান্নান তালিব (বামে)

www.pathagar.com

অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকারের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আবদুল মান্নান তালিব বামে কমোডর আতাউর রহমান ও আবুল আসাদ

মরহুম কবি গোলাম মোহাম্মদের দোয়ার অনুষ্ঠানে আলোচনারত কবি মতিউর রহমান মল্লিক। (বাম থেকে) মুহম্মদ মতিউর রহমান, আবদুল মান্নান তালিব, শাহাবুদ্দীন আহমদ, কবি সোলায়মান, হাসান মুর্তাজা ও কবি আসাদ বিন হাফিজ

www.pathagar.com

জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন '৯৭ বিশিষ্ট গুণীজন ড. মইন উদ্দীন আহমদ খানের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আবদুল মান্নান তালিব (ডানে)

ড. আসকার ইবনে শাইখের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়ার মুহূর্ত (ডানে) সবশেষে আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

১০ম বার্ষিক সাধারণ সভায় খাবার গ্রহণ করছেন আবদুল মান্নান তালিব ও অন্যরা

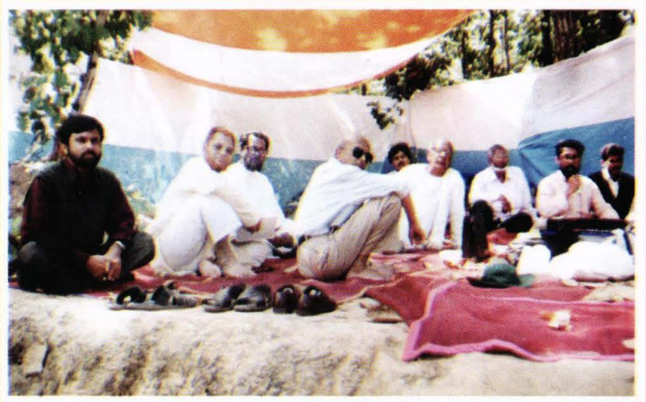

গাজীপুর জাতীয় উদ্যানে বনভোজনের বিশেষ মুহূর্তে অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, আবদুল মান্নান তালিব, কবি আল মাহমুদ, ড. আসকার ইবনে শাইখ, কবি সোলায়মান আহসান ও অন্যরা

www.pathagar.com

কবি গোলাম মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন পুরস্কার গ্রহণ শেষে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করছেন আবদুল মান্নান তালিব

নিজস্ব স্ট্যাডি রুমে লেখালেখি ও গবেষণারত বিশিষ্ট লেখক আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

বনভোজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কবি আল মাহমুদ

(বাম দিক থেকে) নাসির হেলাল, মাহবুবুল হক, ঔপন্যাসিক জামেদ আলী, কবি আবুল হোসেন, আবদুল মান্নান তালিব ও আবুল আসাদ

কবি আবুল হোসেনের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বাংলা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আবুল আসাদ, সবশেষে আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

নাতিদের সাথে বিশেষ মুহূর্তে আবদুল মান্নান তালিব

স্ত্রী নূরজাহান বেগম ও নাতিদের সাথে আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

বড় জামাই, দুই মেয়ে ও বড় মেয়ের সন্তানদের সাথে আবদুল মান্নান তালিব

স্ত্রী নূরজাহান বেগম ও মেয়েদের সাথে আবদুল মান্নান তালিব

www.pathagar.com

বই কিনুন। বই পড়ুন। প্রিয়জনকে বই উপহার দিন

একটি ঐতিহ্যবাহী মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

অ ক I A BCBS Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয় : নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম, ফোন: ৬৩৭৫২৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয় : ১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, পিএবিএক্স- ৯৫৬৯২০১, ৯৫৭১৩৬৪ মোবাইল: ০১৭১১-৮১৬০০১

বিক্রয় কেন্দ্র : ১৫০-১৫২ নিউমার্কেট ঢাকা, ফোন : ৯৬৬৩৮৬৩ ❐ ৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা) বাংলাবাজার ঢাকা, ফোন : ৭১৬৩৮৮৫

www.pathagar.com

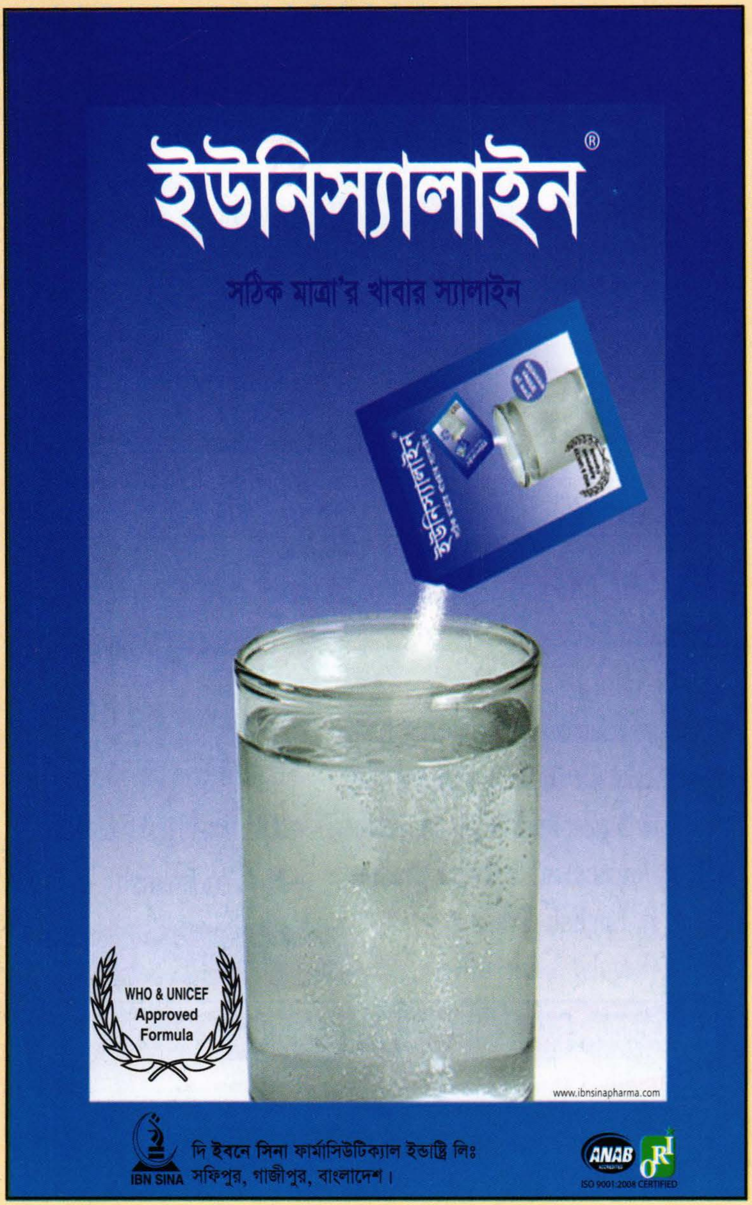

www.pathagar.com

MANARAT INTERNATIONAL UNIVERSITY

A Center of Academic & Moral Excellence

Admission Open-2015

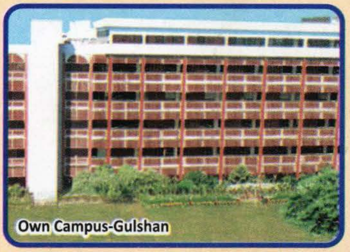

Scholarships

10%-100% Waiver applicable for * Poor * Meritorious * Freedom Fighters Quota * Low Income Group

Our Programs

@ MIRPUR CAMPUS

- **B.Pharm** (Hons.)
- **LL.B.** (Hons.)
- **Computer Science & Engineering (CSE)**
- **Electrical & Electronic Engineering (EEE)**
- **CSE, EEE (Evening Batch For Diploma Holders)**
- **B. of Journalism & Media Studies**
- **M.A. in English** (Evening)
- **MBA** (Regular & Executive)

@ GULSHAN CAMPUS

- **BBA**
- **B.A.** (Hons.) in English
- **MBA** (Regular & Executive)
- **M.A.** in English

Admission Office Open Everyday

Main Campus Gulshan PLOT-CEN 16, ROAD-106, GULSHAN, DHAKA-1212. TEL : 8817525, 9862251, 9884736, 9858058, CELL : 01780-364414

Mirpur Campus PLOT-01, BLOCK-B, SECTION-01, ZOO ROAD, MIRPUR-01, DHAKA-1216. TEL : 9026223, CELL : 01780-364415, 01819-245895

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

International Islamic University Chittagong

IIUC combines quality with morality

4-Year Bachelor's Programs :

- Qur'anic Sciences & Islamic Studies (QSIS)
- Da'wah & Islamic Studies (DIS)
- Hadith & Islamic Studies (HIS)
- Computer Science & Engg. (CSE)
- Electronic & Telecommunication Engineering (ETE)
- Electrical & Electronic Engg. (EEE)
- Bachelor of Pharmacy (B. Pharm)
- Bachelor of Business Administration (BBA)
- English Language & Literature (ELL)
- Bachelor of Laws (LL.B Hons.)
- Economics & Banking

Master's Programs :

- **MBA** *(Regular)*
- **MBA** *(Executive)*
- **MBM** *(Master of Bank Management)*
- **MA in ELL** *(Preliminary & Final)*
- **MA in ELT** *(Preliminary & Final)*
- **MA in QSIS**
- **MA in DIS**
- **LL.M** *(Preliminary & Final)*

Diploma/Certificate Programs :

- Post Graduate Diploma in Library & Information Science (PGDLIS)
- Professional Diploma in Computer Science (PDCS)
- Arabic Language Course
- Chinese Language Course

One of the top Graded Private Universities
Engineering Program accreditated by The Board of Accreditation For Engineering & Technical Education (BAETE)
Bachelor of Pharmacy (Hons.) [B. Pharm] Program is approved by Bangladesh Pharmacy Council

Kumira, Sitakunda, Chittagong, Bangladesh.
Tel : 03042 51154-61, Fax :03042 51160, E-mail : info@iiuc.ac.bd, www.iiuc.ac.bd

City Liaison Office : 154/A, College Road, Chittagong-4203, Bangladesh.
Tel : 88-031-610085, 610308, 625230, 638656, 638657, 639981.
Fax: 88-031-610307

Female Academic Building : Chandgaon (Opposite to Swadhinota Complex), Chittagong. Tel : 257322225-7, 670071, 670069, 670081, 610015